~ www.amarboi.com ~

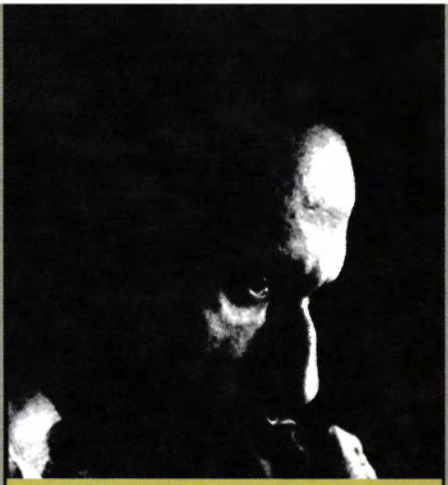

কায়েস আহমেদ সমগ্র

~ www.amarboi.com ~

একনামে সবাই চেনে, কায়েস আহমেদ ঠিক সেরকম জনপ্রিয় লেখক ছিলেন না। বাংলাদেশে বিভাগোত্তর ষাটের দশকে যে-নতুন ধরনের সাহিত্যচর্চা শুরু হয়, কায়েস আহমেদকে তার শক্তিমান প্রতিনিধি বলা যায়। খ্যাতি, বিত্ত, ঐশ্বর্য-এসব কিছুরই তোয়াক্কা না করে নিজের নির্জনে তিনি যুক্ত ছিলেন সাহিত্যসাধনায়; অথচ আজ, এর মধ্যেই, এই মহৎ নিভৃতচারী লেখক মাটি ও মহাকালের অংশ।

জীবৎকালে চারটি মাত্র বই বেরোয় : "অন্ধ তীরন্দাজ" (১৯৭৮) "দিনযাপন" (১৯৮৬) "নির্বাসিত একজন" (১৯৮৬) "লাশকাটা ঘর" (১৯৮৭)। গল্প উপন্যাস মিলিয়ে এ ক'টি বই ছাড়া কায়েস আহমেদ আর কিছু রেখে যান নি—অথচ এই অল্পসংখ্যক রচনার মাধ্যমেই বাংলা সাহিত্যে কথাশিল্পী হিশেবে তাঁর স্থান প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

'কায়েস আহমেদ সমগ্রে' তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত সকল গ্রন্থগুলোর সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে অগ্রন্থিত আরো অনেক লেখা। যে-কোনো অনুরাগী রসজ্ঞ পাঠকের চোখেই এই সংগ্রহ মহার্ঘ মনে হবে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কায়েস আহমেদ বিভাগোত্তর বাংলাদেশের শক্তিমান কথাশিল্পী। জন্ম ২৫শে মার্চ ১৯৪৮; গ্রাম বড়তাজপুর, থানা শ্রীরামপুর, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ। তিন ভাইয়ের মধ্যে তিনি বড়ো। মাতা ওলিউন্নেসা, পিতা শেখ কামাল উদ্দীন আহমেদ—দেশভাগ ও পিতার চাকরিবদলের সূত্রে ঢাকা আগমন ও বসবাস। ম্যাট্রিক পাশ ১৯৬৪ সালে, আই.এ ১৯৬৬ সালে এবং অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগে ভর্তি–কিন্তু অনার্স শেষবর্ষে অধ্যয়নে ছেদ পড়ে। আই.এ পড়বার সময় 'পূর্বদেশে' প্রথম গল্প প্রকাশ। দৈনিক 'গণকণ্ঠ' ও 'সংবাদ'-এ সাংবাদিকতা করলেও কায়েস আহমেদের আজীবনের পেশা ছিলো শিক্ষকতা। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলে বাঙলার শিক্ষক ছিলেন। বিয়ে ১৯৮৩ সালে; একমাত্র পুত্র : অনীক আহমেদ। হুমায়ুন কবির স্মৃতি পুরস্কার (১৯৯০)।
মৃত্যু ১৪ জুন ১৯৯২।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

অন্ধ তীরন্দাজ ১৭-৭৬

যাত্রা ২৭ বন্দী দুঃসময় ৩০ খঞ্জ রোদে শালিক ফড়িং ৩৭
বিবমিষা ৪১ অন্ধ তীরন্দাজ ৫৫ সম্পর্ক ৫৯ গন্তব্য ৬৮

নির্বাসিত একজন ৭৭-১১২

নির্বাসিত একজন ৭৯ জগদ্দল ১০৩

লাশকাটা ঘর ১১৩-২১৮

পরাণ ১১৫ মহাকালের খাঁড়া ১২৫ দুই গায়কের গল্প ১৩৭
নিয়ামত আলীর জাগরণ ১৪৫ লাশকাটা ঘর ১৫১ গগনের চিকিৎসা
তৎপরতা ১৫৮ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈতৃক ভিটে ও মালপদিয়ার
রমণী মুখুজ্জে ১৬৪ নিরাশ্রিত অগ্নি ১৭৮ প্রতীক্ষিত লণ্ঠন ১৮৩
গোপাল কামারের তলোয়ার ১৮৬ নচিকেতাগণ ২০০
প্রতারক জোস্না ২০৫ ফজর আলীর গল্প ২১০ পারাপার ২১৪

দিনযাপন ২১৯-২৫২

কবিতা ২৫৩-২৫৮

প্রবন্ধ-নিবন্ধমালা ২৫৯-২৮৬

ঘূর্ণির টান ও নিরাবেগ বোঝাপোড়া ২৬১ শিল্পের দাবি, শিল্পীর দায় ২৬৫
অন্য অবলোকন (হাসান আজিজুল হক) ২৭০ নরেন্দ্রনাথ মিত্র ২৭৩
প্রতিকৃতি আত্মপ্রকৃতি ২৭৫ রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী ২৮২ চিঠি ২৮৭

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অন্ধতীরন্দাজ

প্রকাশকাল: ১৯৭৮

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অন্তর্লীন চখাচখী

অক্টোবর মাসের শেষ দুপুরের আলো শাদা চাদর-ঢাকা বিছানার ওপর এসে পড়ে রয়েছে চুপচাপ। এতোক্ষণ জানলার বাইরে ফলসা কাঁঠাল আর নোনা গাছে প্রায় জড়াজড়ি পাতার ওপর ঝিম ধ'রে ব'সে ছিলো, তারপর কোন কিছু ভালো না-লাগা ক্লান্ত যেনো জানলা দিয়ে ঢুকে একেবারে মূর্ছিতের মতো সটান শুয়ে পড়েছে বিছানার ওপর।

সেই শুয়ে থাকা হলদেটে আলোকে মাঝখানে রেখে তারা দুজন মুখোমুখি বসেছিলো। বাইরে তখন কাঁঠাল গাছের শুকনো ডালে অস্থির কাঠবেড়ালী ডাকছিল-চিড়িক চিড়িক।

দোলা নামের মেয়েটি কাঁধ ডিঙিয়ে বুকের ওপর পড়ে থাকা আঁচলকে অল্প তুলে আরো একটু টেনে এনে বুকের ওপর রাখে এবং চকিতে ছেলেটির, মানে পল্টু নামের বাইশ-তেইশ বছরের যুবকটির দিকে তাকালে দেখে, সে তখন তার বাঁদিকের দেওয়ালে গভীরভাবে কি যেন নিরীক্ষণ করছে। দোলা মেয়েটি চারপাশে তাকিয়ে বলে, 'কী ঠাণ্ডা।'

ছেলেটি তখন চুন খসে পড়া দেওয়ালের গায়ে সামনে বসে থাকা পোকার দিকে সন্তর্পণে অগ্রসরমান টিকটিকি থেকে চোখ ফিরিয়ে যেনো অনেক নীচে থেকে উঠে আসতে আসতে বলে-'অ্যাঁ?'

মেয়েটি কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গিয়ে ছেলেটির দিকে না তাকিয়ে শাদা চাদরের ওপর হলদে আলোয় চোখ রেখে বলে 'কিছু নয়।'

ছেলেটি বুঝতে না পেরে অত্যন্ত হালকা সলজ্জ হাসে।

মেয়েটি হঠাৎ বলে ওঠে, 'আমি উঠি।' এবং খয়েরী রঙের শাড়ি জড়ানো একটি ঋজু নিটোল রেখা কেঁপে উঠে স্থির হয়ে দাঁড়ায়। ছেলেটি তখন বাঁ হাত দিয়ে বালিশটাকে পিঠ এবং কোমরের মাঝামাঝি রেখে আধশোয়া অবস্থায় মেয়েটির দিকে চেয়ে বলে, 'এক্ষুণি যাবে?'

মেয়েটি এক পলক তার দিকে চেয়ে নিরুত্তাপ অথচ স্থির গলায় মৃদুস্বরে বলে, 'হ্যাঁ'।

ছেলেটি ঠোঁটের কোণে স্মিত একটু হাসি এনে বলে, 'আচ্ছা, আবার এসো।' এবং তার দিকে তাকিয়ে ডান হাতে বালিশের পাশে রাখা একটি বই টেনে নেয়। মেয়েটি কোন কথা না বলে নিজের পায়ের নোখের দিকে তাকায়, তারপর নিঃশব্দে পেছন ফেরে এবং দরজা পেরিয়ে চলে যায়। আর ছেলেটি বই হাতে তার চলে যাওয়া দেখে অন্যমনস্কের মতো, তার যেনো শুধুই অভ্যাস বশে বইয়ের মাঝামাঝি একটা পাতা খুলে তার ওপর দুই চোখ নিবদ্ধ করে এবং হঠাৎ কিঞ্চিৎ শীত ও সেই সঙ্গে তৃষ্ণা অনুভব করে সে। কিন্তু উঠতে ভালো

দুনিয়ার পাঠক এক হও

লাগলো না। বালিশ থেকে পিঠ নামিয়ে সেখানে সমস্ত মাথার ভার রাখে। শরীর সামনের দিকে লম্বা করে মেলে দেওয়ায় শীতের অনুভূতি অপেক্ষাকৃত তীব্র হয়। সে পাশ ফিরে হাঁটু দুটো প্রায় বুকের কাছে এনে চোখ বুজে পড়ে থাকে। চঞ্চল কাঠবেড়ালীটার কোন সাড়া-শব্দ আর পাওয়া যাচ্ছে না এখন। অনেক দূরে কে যেনো কাকে রাগী গলায় ডাকছে। চাদরের ওপর পড়ে থাকা আলোটা এখন পেছনের দুটি-পা খোঁড়া কুকুরের মতো অতি কষ্টে ধীরে ধীরে ঘষটে ঘষটে জানলার বাইরে চলে যাচ্ছে।

মেয়েটির ঘরের বাইরে আকাশে চাঁদ উঠেছে। ভিজে ভিজে নরোম জ্যোৎস্না এসে পড়েছে ঘরের ভেতর। তাকের ওপর টাইমপিসে অনবরত টিক টিক শব্দ। শুনতে শুনতে মনে হয় তাকে নয়, তার মাথার ভেতরে। শুয়ে শুয়ে সেই শব্দ শোনে; শুনতে শুনতে পাশে শুয়ে থাকা নিদ্রিত রুবীর নিঃশ্বাসের শব্দ। সেই জ্যোৎস্নার ভেতর রুবী নামের তার চোদ্দ পেরোনো বোনটিকে দেখে, তার দিকে পেছন ফিরে কাত হয়ে শুয়ে আছে; গায়ের ওপরকার চাদর পায়ের কাছে দলা পাকিয়ে রয়েছে, পরনের কামিজ কোমর পেরিয়ে আরো ওপরে উঠে আছে, কোমরের ওপরকার উন্মুক্ত কিছুটা চিকচিকে অংশ দেখা যায়। পিঠের দুপাশ থেকে ঢালু হয়ে শিরদাঁড়ায় খাদটা গভীর হয়েছে।

সম্ভবত শীত অনুভূত হওয়ায় দু'পা কুঁকুড়ে হাঁটুজোড়া বুকের কাছে নিয়ে এসেছে, ফলে কামিজ তোলা কোমরের নীচে থেকে সালোয়ার ঢাকা বাঁকানো-ভরাট রেখা পষ্ট হয়ে উঠেছে। তার নিটোল পিঠ, খোঁপার নীচে মসৃণ গ্রীবা দেখতে পায় সে। আর তখন রুবী মেয়েটা দুই উরুর মাঝখানে স্থাপিত পাশ বালিশটা বুকের ওপর নতুন ক'রে তীব্র আঁকড়ে ধ'রে ঘুমের ভেতর অস্ফুট হুঁ হুঁ শব্দে কেঁদে ওঠে। দোলা নামের সেই তন্বিষ্ঠ যুবতীটি তখন হঠাৎ সচেতন হয়ে তার ছোট বোন রুবীর বালিশের কাছে এগিয়ে গিয়ে পাশ ফেরানো মুখের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে জিজ্ঞেস করে, 'কি হলো রুবী?' কোন উত্তর পায় না। দেখে, রুবীর মুখে কষ্টের রেখা ফুটে উঠেছে এবং এক সময় তা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গিয়ে আবার স্বাভাবিক ঘুমন্ত রুবীর আদল ফিরে আসে। তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ায় দোলা তার বোনের চুলে এবং মুখে সর্বোপরি তার সমস্ত শরীর থেকে বয়ঃসন্ধির বিচিত্র গন্ধ পায়।

পাশের ঘরে বড় ভাই-ভাবী শুয়ে আছে। ছোট ভাই বাজারে ওষুধের দোকানে। মা-বাবা সবাই শুয়ে আছে। হয়তো বা ঘুমিয়েছে। কোন শব্দ নেই। বাইরে নিঃশব্দ শিশিরপাত, ভিজে ভিজে নরোম জ্যোৎস্না। সে রুবীর গায়ে ভালো ক'রে চাদরটা ঢাকা দিয়ে নিজের বালিশে ফিরে চাদরের নীচে অনুভব করে শোবার সময় রোজকার মতো আজ ব্রেসিয়ার খুলে শোয়নি। তখন শুয়ে শুয়েই পিঠ উঁচু ক'রে পেছনে হাত চালিয়ে ব্লাউজের বোতাম খোলে, ব্রেসিয়ারের হুক খোলে, দু'কাঁধের ওপর দিয়ে নেমে আসা ফিতে খোলে এবং অবশেষে ব্রেসিয়ারটা টেনে বার ক'রে নাকের কাছে এনে অকারণে নিঃশ্বাস নেয়, অতঃপর বালিশের নীচে রেখে দিয়ে ব্লাউজের বোতাম লাগায়। তখন হঠাৎ সেই দুপুর ফুরিয়ে আসা বেলা আর মাথাভর্তি এলোমেলো নরোম চুল, ফরসা-কিঞ্চিত ক্লান্ত মুখাবয়ব, একজোড়া অন্যমনস্ক চোখের সেই বাইশ-তেইশ বছরের পল্টু নামের যুবকটির কথা মনে পড়ে: 'জানো, আজ নদীর ধারে গিয়েছিলাম। সেই যেখানে একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
প্রকাণ্ড বটগাছ আছে। বটগাছের পাশ দিয়ে শাদা ধুলো-ঢাকা আঁকাবাঁকা রাস্তা। মাঝে মাঝে গরুর গাড়ী আসে যায়। আশপাশে কোন বাড়ীঘর, দোকানপাট নেই। নদীর অপর পারে ফসলের ক্ষেতে রোদ পড়েছে। পানি সরে গেছে অনেক দূরে, এ পারে চড়ার বালির ওপর একজোড়া চখাচখী।' ছেলেটা যেনো সেই চুন-খসে-পড়া দেওয়াল-ঘেরা ঠাণ্ডা ঘরে ব'সে ব'সে আপন মনে সেই ছবি দেখতে পাচ্ছিলো। তার চোখ মেয়েটিকে নয়, জানলার বাইরে দিয়ে সেই দৃশ্যের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলো। দোলা নামের মেয়েটি দেখে ছেলেটির মুখে সেই রৌদ্রস্নাত ধানক্ষেতের নিবিড় ছায়া এসে পড়ছে যেনো। মেয়েটি সেই ছায়া থেকে চোখ সরায় না, ছেলেটি এবার দোলার মুখের দিকে সরাসরি চেয়ে বলে-'জানো, চখাচখী সম্বন্ধে একটা কাব্যশ্রুতি আছে-তারা সারাদিন খুব কাছাকাছি থাকে, পাশাপাশি, দিন শেষ হ'য়ে রাত নামলে একজন অপরজনকে আর দেখতে পায় না। সারা রাত পরস্পর পরস্পরকে ডেকে ডেকে ফেরে; কিন্তু কেউ কাউকে কাছে পায় না। এমনি সারারাত।'
এখন এই জ্যোৎস্নালোকিত রাতে দোলা নামের মেয়েটির সেই সব কথা মনে হতে থাকলে সে পাশ ফিরে বালিশের ওপর মুখ গুঁজে পড়ে থাকে। বুকের ভেতর থেকে হু হু শব্দে কিছু একটা বেরিয়ে আসতে চায়। অবশেষে সত্যি সত্যি ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে মেয়েটি।

ছেলেটি তমাল, যমুনা, কদম্ব এবং আদিগন্ত বিস্তৃত গোঠের স্মৃতি নিয়ে বাড়ী ফিরলো দুপুরে। খালা তাকে অনুযোগের স্বরে বলে, 'হ্যাঁরে, তোর খাবার কথাও মনে থাকে না? কখন সেই সক্কালে বেরিয়েছিস, আর এখন এই দুপুরে ফিরছিস, কি ছেলে বাপু, কিচ্ছু বুঝি না।'
সে কোন উত্তর দেয় না।
সারা দুপুর রেডিওর গান শুনলো শুয়ে শুয়ে, জানলার বাইরে গাছপালা দেখলো, চৌকা স্লেটের মতো আকাশ দেখলো। দুপদাপ শব্দ করে ছাদে উঠলো রিনি, নেবে গেলো, চুপচাপ পড়ে পড়ে শুনলো সে। তারপর রেডিওর গান শেষ হয়ে গেলে আবহাওয়ার কথা বলে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করলে রেডিওর ভেতর কিছুক্ষণ ঘট ঘট আওয়াজ হতে থাকলে নব ঘুরিয়ে সে রেডিও বন্ধ ক'রে দেয়। আর তখন মেয়েটির কথা মনে প'ড়ে যায়। পায়ের কাছে তক্তপোশের কোণের জায়গাটায় চোখ যায় তার, মেয়েটা এসে ওইখানটায় বসে। আজ জায়গাটা ফাঁকা। তখন সকালের কথা মনে আসে। সকালে পুকুর পাড়ের রাস্তার ধারে দাঁড়িয়েছিলো সে। তখন দরজার ফাঁকে এক ঝলক দেখা গিয়েছিলো মেয়েটিকে। তাকে দেখে মেয়েটি চকিতে সরে গেলো। তার অমন করে সরে যাওয়ার কোন মানে বোঝেনি সে। মুখটা কেমন গম্ভীর, হাসিহীন, কিংবা না হাসলেও মানুষের মুখের রেখায় যেমন স্বাভাবিক শৈথিল্য থাকে তেমন নয়, অন্য রকম। অবশ্য সে মুহূর্তে এতোসব ভাবেনি। তাকে দেখে দ্রুত সরে যাওয়াটাই বেমানান ঠেকেছে তার। ভাবনাগুলো এসেছে পরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

দীর্ঘ সাত বছর পর সে তার খালার বাড়ী বেড়াতে এসেছে। সাতবছর আগে খালার সেজো মেয়ের বিয়েতে যখন সে এসেছিলো রিনি তখন ছোট্ট, বছর চারেক বয়েস। ওর আগে দুই মেয়ে হ'য়ে মারা গেছে। খালার দুঃখ একটা ছেলে নেই, সমবয়সী খালাতো বোন ডলির যখন বিয়ে হয় খালা দুঃখ করে বলেছিলো, 'কি কপাল নিয়ে যে দুনিয়ায় আসা আমার, খালি মাটির ঢিবিকে সাজিয়ে গুছিয়ে পরের হাতে তুলে দেওয়া'। তারপর কতো সময় কেটে গেলো, এতোদিন পর আবার সেই পুরনো জায়গায় এসে পল্টু সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে, কোথাও কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা। এবং অবাক হয়ে যাচ্ছে যে, এতোদিন পরও তেমন চোখে পড়ার মতো কোন পরিবর্তন হয়নি জায়গাটার। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় রেল লাইন টপকে বাজারে এলে সে মন্দিরার শব্দ এবং অত্যন্ত মিহি মিষ্টি কিন্তু চড়া সুরে গান শুনতে পেলে দ্রুত এগোতে থাকে এবং বাজারের মধ্যে এসে দেখতে পায়, ধূতি ফতুয়া পরা, গলায় কণ্ঠি, এক শীর্ণকায় প্রৌঢ় হারমোনিয়াম নিয়ে বসেছে স্যাকরার দোকানের সামনের রকে। তার পাশে তিরিশ-বত্রিশ বছর বয়সের আঁটসাট শরীরের শাদা কাপড় পরা, গলায় কণ্ঠি, কপালে রসকলি আঁকা মহিলা মন্দিরা বাজিয়ে কীর্তন গাইছে-'মরিলে ঝুলাইয়া রেখো তমালেরো ডালে-এ-এ....।' দাঁড়িয়ে পড়ে সে। বাজারের বেচা কেনা, মানুষজনের ব্যস্ততা, কলরব, ময়রার দোকানের সামনে কুকুর ঘুর ঘুর করছে,একটা কমলা শাদায় মেশানো রঙের গরু শাল পাতার শুকনো ঠোঙা চিবুতে চিবুতে আপন মনে চলে যাচ্ছে। সব ছাপিয়ে বৈষ্ণবীর কীর্তন, মন্দিরা, আর হারমোনিয়ামের ছন্দিত ঝংকার তাকে আবিষ্ট ক'রে দেয়, এবং তার মতোই আরো নানান বয়সী বেশ কিছু মানুষের ছোটখাটো ভিড় জমে উঠেছে সেখানে। পল্টু বৈষ্ণবী মহিলার মুখের দিক থেকে চোখ সরাতে পারছিলো না। ছোট্র টিকোলো নাকের ওপর থেকে কপাল পর্যন্ত রসকলি আঁকা, এলো চুলের রাশ কাঁধ ছাপিয়ে নেবে গেছে পেছনদিকে, সুষমামণ্ডিত মুখ, সব ছাড়িয়ে দু'টি চোখ, ঘন পল্লবের আড়ালে যেনো দু'টি গভীর কালো দীঘি থির হয়ে আছে। সেই গান, সেই চোখের মধ্যে দিয়ে সে যেনো কোন এক সুদূর শূন্যতার ভেতর চলে যেতে থাকে। চারপাশের জীবন এবং পরিবেশ ছাপিয়ে সে যেনো আরো কিছু দেখতে পাচ্ছিলো, অনুভব করছিলো।

গতকাল রাতে জ্যোৎস্না ছিলো, অনেকক্ষণ ধ'রে সেই জ্যোৎস্নার ভেতর দিয়ে একটা মালগাড়ী যাচ্ছিলো ককিয়ে ককিয়ে। দক্ষিণ জলার ফসলভরা মাঠ, গোরস্থান, ঝিম ধরে থাকা শিশির ভেজা বাগান পেরিয়ে সেই শব্দ আসছিলো, সেই নিথর-নিবিড় নির্জনতার ভেতর মালগাড়ী যাওয়ার একঘেয়ে ক্লান্ত শব্দটা শুনতে শুনতে তার মৃত্যুর কথা মনে আসে। আর তখন অদ্ভুত এক বিষন্নতার মধ্যে মুখ, চোখ, মাথাভর্তি পিঠ এলোনো কালো একরাশ চুল, খয়েরী রঙের শাড়িপরা সর্ব-অবয়ব নিয়ে মেয়েটির ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তখন ছেলেটি দেখে তার বিছানার ওপর পাখির পালকের মতো নরোম নীল নীল জ্যোৎস্না; সে উঠে বসে, মেয়েটি এলে তক্তপোশের কোণে যেখানটায় বসে সেখানে ফলসা গাছের একটা বড় পাতার ছায়া নিয়ে থির থির করে জ্যোৎস্না কাঁপছে। সে আস্তে আস্তে হাত বুলোতে থাকে জায়গাটায়। তারপর সারারাত ঘুম হয়নি। কখনো মৃত্যুর কথা, কখনো গাছপালা আকাশ প্রকৃতি নিয়ে চারপাশের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
নির্জন চরাচর, শৈশবের ভাঙা ভাঙা ছবি আর মেয়েটির কথা বার বার মনে এসেছে ঘুরে ফিরে। এইসব ভাবতে ভাবতে রিনি এসে গেলো, 'বাব্বা' বিকেল হয়ে গেছে, এখনো শুয়ে আছে। চলো চা হয়ে গেছে।'

বিকেলটা কত দ্রুত মরে যাচ্ছে। ধান ক্ষেত, জলা, রেল লাইন, রেল লাইনের ওপারে নীলচে ধূসর গাছাপালার ভঙ্গিল রেখার ওপর ঝুঁকে পড়া আকাশ, শেষ সূর্যের আলো মেখে মালার মতো শাদা বকের সারি ফিরে চলেছে।

সে তখন মাঠের বড় আলটার ওপর পুরনো উপড়ে পড়ে থাকা খেজুর গাছের পাশে ব'সে এই দৃশ্যাবলী দেখছিলো। ট্রেনের হুইসিল শোনা যাচ্ছে, যেনো বহু দূর থেকে কেউ কাউকে ডাকছে। কানপেতে শব্দটা শুনতে গিয়ে চমকে উঠলো, মনে হলো, অবিকল মানুষের গলায় কে যেনো ডাকছে, 'পল্টু উ.... উ...।' এবং সে-ও অজান্তে হঠাৎ বলে ওঠে,-'যা...ই।' তারপর সচেতন হ'য়ে গিয়ে দেখলো ধান ক্ষেত, রেললাইন, রেলালাইনের খাদ, সবকিছুর ওপর থেকে আলো ক্রমে সরে যাচ্ছে, যেনো বারান্দার রেলিঙের ওপর থেকে মেলে দেওয়ার শাদা একখানা শাড়ী টেনে নিচ্ছে কেউ।

সন্ধ্যা নামছে। কিন্তু ছেলেটা উঠলো না। থেমে থেমে হাওয়া আসছে কোথাও থেকে। নুয়ে পড়া বাসন্তী রঙের ধানগাছ ছুঁয়ে ছুঁয়ে সেই হাওয়া চলে যায় আর সন্ধ্যা নামতে থাকে। সামনের দিকে চেয়ে থাকলে মনে হয় যেনো ডানা মেলে শকুনের মতো ঝপ ঝপ অন্ধকার নামছে পারপাশে। ছেলেটা ওঠে না। ঠায় বসে বসে সেই অন্ধকার দেখতে থাকে, আর ট্রেনের অপেক্ষা করে; ছেলেবেলায় সে রেল গাড়ীকে ভয় করতো, মা-বাবার সঙ্গে মামাদের বাড়ী বেড়াতে যাবার জন্যে স্টেশনে ট্রেনের অপেক্ষা করতে হতো। এক সময় ট্রেন ছুটে আসার ঝক ঝক শব্দ শোনা গেলে তার বুকের ভেতর গুরগুর ক'রে উঠতো, ছুটে আসা ট্রেনের ইঞ্জিনের সামনের অংশটাকে মনে হতো অত্যন্ত গম্ভীর, কঠোর রাগী একটা বীভৎস মুখ ভয় দেখাতে দেখাতে তেড়ে আসছে। বাবা কিংবা মা দু'হাতে তার কান চেপে ধ'রে নিজের বুকের ওপর তার মুখ ফিরিয়ে রাখতো। ভয় লাগতো, কিন্তু দেখার জন্যে আবার একটা অস্থির, চাপা উত্তেজনাময় কৌতূহল থরথর করে কাঁপতো ভেতরে ভেতরে।

এখন এই ক্রমাগত অন্ধকার হয়ে আসতে-থাকা নির্জন মাঠে একাকী ট্রেনের অপেক্ষায় বসে বসে শৈশবের সেই সন্ত্রাস এবং কৌতূহলকে অনুভব করতে থাকে। কিন্তু ট্রেনের কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না। বাতাসের উল্টো দিকে কান পাতে সে, আশৈশব পরিচিত সেই ঝক ঝক শব্দটি শুনতে চায়, বদলে কেবল হাওয়া আর ধান গাছের সর সর আওয়াজ হতে থাকে।

সে চোখ তুলে রেললাইনের দিকে তাকালে সমতল থেকে কালো আবছা একটা চওড়া প্রলম্বিত রেখা ছাড়া আর কিছু বোঝা যায় না এবং সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনতে গিয়ে কয়েক হাত দূরের সরু আলটার ওপর তার চোখ আটকে যায়, দেখে আলের ওপর দিয়ে লম্বা সচল একটা কিছু চলে যাচ্ছে। সহজাত বোধ দিয়ে বোঝে সাপ। মাত্র কয়েক হাত দূর দিয়ে একটা সাপ চলে যাচ্ছে। সে দ্রুত চারপাশে তাকায় এবং দাঁড়িয়ে পড়ে, সাপটা এঁকে বেঁকে আলের ওপর নুয়ে পড়া ধান গাছের ভেতর অদৃশ্য হয়ে যায়। তার শীত অনুভূত হতে থাকে। চারপাশে ধান গাছের সরসর শব্দ এবং নির্জন অন্ধকার তাকে বিপন্ন করে তোলে। সামনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
দিকে তাকিয়ে ক্রমাগত পেছন হাঁটতে থাকে। কিন্তু বড় আল ছেড়ে সংকীর্ণ অমসৃণ আলের ওপর পেছন হেঁটে যাওয়া খুবই কষ্টসাধ্য। কাজেই আল থেকে কেবলই ধান ক্ষেতে পা ফসকে যায়। আবার মুখ ফেরাতেও পারছে না, কেননা আততায়ী সাপ গুটি গুটি তার পেছন নিতে পারে এই আশঙ্কা কেবলই ফণা তোলে। এমনি অবস্থা কিছুক্ষণ চলতে থাকলে এক সময় পায়ে অত্যন্ত নরোম আর ঠাণ্ডা কিছুর মৃদু স্পর্শ পায়, তার শরীর বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে ওঠে এবং এক সময় দেখে সে ক্রমাগত ছুটছে, হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে, হৃৎপিণ্ডের ধক ধক শব্দ নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটতে থাকে এবং অবশেষে মানুষের কণ্ঠস্বর শোনে, হ্যাট হ্যাট–দেখে গরুর গাড়ী যাচ্ছে, গাড়ীর নীচে দোদুল্যমান হারিকেন জ্বলছে।

হাঁটতে হাঁটতে বাড়ীর দিকে এগোতে এগোতে এতোক্ষণ পর পায়ের গোড়ালীতে কাদার মত ভিজে কিছু লেপ্টে আছে বলে মনে হয় তার, সে সোজা বাড়ী এসে রকের ওপর রাখা বালতির কাছে গিয়ে বলে, 'রিনি' হারিকেনটা আনতো। খালা বলে, কোথা গেসলি'? সে কোন উত্তর দেয় না, রিনি হারিকেন আনলে দেখে গোড়ালীর কাছে গোবর লেগে আছে। পা ধুতে ধুতে মনে মনে একটু হাসে। কাউকে কিছু বলে না।

খালা, রিনি ঘুমিয়েছে। এ ঘরে বিছানার চারপাশে ভালো ক'রে মশারি গুঁজে দিয়ে আলো জ্বালিয়ে সে শুয়ে আছে একা। ঘুম আসছে না। বার বার সাপটার কথা মনে আসছে, সেই লম্বা সচল অস্তিত্বটা তাকে ঘুমুতে দিচ্ছে না। বার বার মনে হচ্ছে তার চারপাশে এই যে চুন খসে পড়া, ইঁট বের হ'য়ে থাকা এবড়োথেবড়ো দেওয়াল, এর ফাঁক ফোকরে যে অমন দু–একটা কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে নেই তাই বা কি করে বলবো। ভাবতে ভাবতে মশরীর ভেতর থেকে চোখ মেলে ভয়ে ভয়ে চারপাশে চেয়ে দেখে, দেখে বিছানার ভেতর গুঁজে দেওয়া মশারীর কোথাও ফাঁক আছে কিনা। বুকের ভেতর আতঙ্ক চরে বেড়ায় এবং অসহায় সে একা শুয়ে থাকে। ঘুম আসে না।

বাইরে জ্যোৎস্না উঠেছে কি না, উঠে থাকলে সেই জ্যোৎস্না জানলার ও পাশের লাউ মাচা কিংবা ফলসা, কাঁঠাল, নোনা এবং অন্যান্য গাছগাছালির ওপর কেমন মাখামাখি হয়ে রয়েছে। এসব দেখতে পায় না সে, কেননা জানলা বন্ধ রেখেছে। শুয়ে শুয়ে দোলার কথা, ট্রেনের হুইসিল, অবিকল মানুষের গলার ডাক, তার উত্তর দেওয়া এবং কোন, ট্রেন না আসা এবং সাপ–চিন্তাগুলো তাকে ক্রমে ক্লান্ত করে ফেলতে থাকে, সে সেই অতল ক্লান্তির মধ্যে ডুবতে থাকে–এবং ডুবে যায় অতঃপর।

মাঠের মাঝখানে কেউ নেই, সে পোড়ো বাড়ীটার ধারে বকুল গাছের নীচে বসেছিলো একা। সামনের পুকুরে বিকেলের সোনালী রোদের আভায় আকাশের নীলচে শাদা ছায়া পড়ছে। মাঝে মাঝে হালকা দমকা হাওয়ায় পুকুরের পানি শিরশিরিয়ে উঠতে থাকলে আকাশ এবং গাছপালা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হয়ে ভেঙে ভেঙে পড়ছিলো। আর তখন দ্রুত ছুটে আসতে থাকা পায়ের শব্দ এবং আতঙ্কিত অস্ফুট আর্তনাদ সচকিত ক'রে তোলে তাকে। সে চোখ তুলে অবাক হয়ে দেখে মাঠের আল ছেড়ে ধানক্ষেত মাড়িয়ে দোলা ছুটে আসছে উর্ধ্বশ্বাসে। দ্রুত উঠে দাঁড়ায় সে এবং সামনে এগিয়ে যেতে থাকে, দোলা তাকে দেখতে পেয়ে তাঁর দিকে ছুটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
আসতে থাকে।
তখন ঘুম ভেঙে যায়। দেখে মশারির ভেতর সে শুয়ে। ঘরের ভেতর আলো জ্বলছে। ধকধক করতে থাকে বুকের ভেতর। এবং সে সটান শুয়ে থাকে তেমনি চিৎ হ'য়ে। মশারির চালের দিকে তাকিয়ে ভাবতে থাকে। স্বপ্নটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে থাকে মনে মনে: আচ্ছা, সে না হয় মাঠের ওখানে বকুলগাছের নীচে বসে থাকলো; কিন্তু দোলা কোত্থেকে এলো। তা-ও আবার অমন আতঙ্কিত হয়ে ছুটতে ছুটতে? কি দেখেছিলো সে, কেনো ভয় পেলো? এইসব জটিল ভাবনাগুলো তাকে ভাবাতে থাকলে এক সময় শাঁ করে সন্ধ্যার মুখে মাঠে দেখা সাপটার কথা মনে পড়ে। দোলা কি সাপ দেখে ছিল? সাপটার কথা মনে আসতেই আবার একটু ভয় ভয় করতে থাকে। মশারির ভেতর থেকে আবার চারপাশে দেখে নেয়। তারপর আবার চারপাশে দেখে নেয়। না ভেঙে গেলে স্বপ্নটার পরের পর্যায় কি হতো। ভাবতে ভাবতে কেমন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে এবং দোলা মেয়েটার জন্যে একটু একটু মায়া অনুভব করতে থাকে। আজ বাইশ দিনের পরিচয়ের বিভিন্ন মুহূর্তেগুলো সে উল্টেপাল্টে দেখতে দেখতে ধীরে ধীরে এক অদ্ভুত অসুখে আক্রান্ত হয়। সারারাত ঘুম এলো না, সেই অসুখে পড়ে থাকলো বুঁদ হয়ে।

ব্লাউজের বোতাম টাঁকছিলো দোলা ঘরের ভেতর বসে বসে। মা তাকে বারবার ডাকলেও কোন সাড়া দিলো না। অবশেষে অত্যন্ত ঝাঁঝালো স্বরে প্রায় চিৎকার ক'রে নাম ধ'রে ডাকতেই সে অভিমান আর প্রায় কান্না মেশানো স্বরে চেঁচিয়ে উঠলো ঘরের ভেতর থেকে, 'কি দরকার? আমি কিচ্ছু পারবো না।' শেষ কথা ক'টিতে গলা যেনো ডুবে আসতে চায়। মা তখন তেমনি ঝাঁঝের সঙ্গে বলে,
কেন, কি তোমার এমন কাজ পড়ে গেছে, সারাদিন তো সংসারের একটা কুটো নাড়ো না, খালি গল্পের বই পড়রা আর এ বাড়ী ও বাড়ী আড্ডা দিয়ে বেড়ানো, ধিঙ্গি মেয়ের লজ্জা শরম নেই, আসুক তোর বাপ.....'
এসব ঘটছে সকাল বেলা, যখন বড় ভাই চলে গেছে অফিসে, বাবা বেরিয়েছে খবরের কাগজ পড়তে, রুবী বারান্দার রকে বসে পড়া মুখস্থ করছে, ছোট ভাই ওষুধের দোকানে; তখনকার কথা। এখন দুপুরের খাওয়ার পাট চুকিয়ে সবাই অবসর নিয়েছে। রুবী স্কুলে। বড় ভাই আসবে সেই সন্ধ্যা উৎরে গেলে। ছোট ভাই দোকানেই থাকে। দুপুরে একবার খেতে আসে। সন্ধ্যা রাতে একবার দোকান বন্ধ করে বাড়ী থেকে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আবার দোকানে চলে যায়। আগে সে, রুবী, ছোট ভাই এ ঘরেই শুতো। সেবার দোকানে চুরি হয়ে যাওয়ার পর থেকে ছোট ভাই রাতে দোকানেই থাকে। কাজেই সে আর রুবী। এখন রুবী স্কুলে এবং সে একা শুয়ে আছে। বাবা-মা হয়তো ঘুমিয়েছে, ভাবীও হয়তো। বাইরের দুনিয়াটা দুপুর বেলার নির্জন রোদে কেমন ঝিম ধরে আছে। ভাবীটা আজকাল কেমন যেন হয়ে গেছে, সারাদিন কাজ করে, তার দিকে দূর থেকে কেমন করে যেন তাকায়, কি যেন বুঝতে চায়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
মার সকালবেলার কথাগুলো মনে এলো। ইঙ্গিতটা যেনো বড় বেশী স্পষ্ট। শুয়ে শুয়ে সে এইসব ভাবতে থাকে, জানলার বাইরের দুপুরটা ক্রমে শেষ হয়ে আসছে, আর তার ভেতর একটা অস্বস্তি, অস্থিরতা, দ্বিধা, অভিমান, কষ্ট, মায়া সবকিছু মিলিয়ে কেবল কান্না পেতে থাকে।

গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে, জণ্ডিস রোগীর মতো ফ্যাকাশে, ক্রমাগত নিঃশেষিত হয়ে আসতে থাকা বনতুলসী, চিচ্চিড়ে, আশ শ্যাওড়া বন আর পিঙ্গল ঘাসের গায়ে লেপ্টে থাকা প্রায় ফুরিয়ে আসা দুপুর কেমন থমকে আছে, গাছের পাতা নড়ে না, তামাটে রঙের উপুড় হয়ে থাকা বিশাল সরার মতো আকাশের নীচে শেষ অক্টোবরের পৃথিবীটা চুপ করে আছে।
চারপাশের সেই ঠাণ্ডা, শুকনো পারিপার্শ্বিকের ভেতর ঘাস, মাটি, গাছপালা এবং রোদের সম্মিলিত গন্ধে সে হাঁটতে থাকে। ছোট্ট ছাতিম গাছের পাশে একাকী বাঁশ ঝাড়ের নীচে বাঁশ এবং তার পাতার ফাঁক দিয়ে রি রি করে আসতে থাকা সূর্যরশ্মি এসে পড়ছে চারপাশে ছড়ানো শুকনো বাঁশ পাতার ওপর, আর সেই এলোমেলো ছড়ানো পাতার ফাঁকে একটা মরা, শুকিয়ে আমসি হয়ে যাওয়া ব্যাঙকে চার পা তুলে পড়ে থাকতে দেখে যে থমকে দাঁড়ায়, মরা শুকনো খটখটে কালচে হয়ে যাওয়া ব্যাঙের সর্ব অবয়বে সূর্যের আলো পড়ে অদ্ভুত দেখাচ্ছে। মৃত ব্যাঙটির সেই ভঙ্গির মধ্যে নিরুপায় একটা আকুল বাসনা স্থির হয়ে আছে ভাবতে গিয়ে চারপাশের মগ্ন চরাচরের মতো ভীষণ বিষন্ন হয়ে যায় সে।
তখন অদূরে গুঁড়ি বাঁকানো নারকেল গাছের গোড়ায় চিড়িক চিড়িক শব্দে কাঠরেড়ালীর আওয়াজ ওঠে, কাঠবেড়ালীটাকে দেখা যায় না, শুধু একবার তার পুচ্ছের ধূসর ফোলানো লোমের খানিকটা অংশ সুর্যালোকে ঝিকিয়ে উঠে অদৃশ্য হয়ে যায়। হাঁটতে হাঁটতে সে দেবদারু গাছের মতো এক সার আম গাছ ডান দিকে রেখে বাঁক নিলে আনারস, আর বাসক বনের পাশে সরু পথটার নীচে জলহীন, মাটি ফেটে যাওয়া শুকনো ডোবার ধারে এসে পড়ে, ডোবার অপর পাড়ে গোরস্থানের সরু প্রলম্বিত পাঁচিল বরাবর পূর্ব-পশ্চিমে চলে গেছে, পাঁচিলের গায়ে কালচে রঙের শ্যাওলা পড়া দাগ, সেই নীচু পাঁচিল আর গোরস্থানের ওপারে ফসল ভরা মাঠ, তারপর খাদ, খাদের পর রেল লাইন, পল্টু সেই আনারস আর বাসক বনের পাশে দাঁড়িয়ে রেল লাইনের দিকে তাকিয়ে থাকে, কান পাতে কোন ট্রেন আসার শব্দ হচ্ছে কিনা, দেখে লি লি করতে থাকা রেল লাইন ঝকমক করছে। তার ওপারে নীলচে ধূসর স্থির নিসর্গরেখা এবং ঝুঁকে থাকা আকাশ; আর তখন হিস-স শব্দ হয় এবং পায়ের ওপর হাওয়া এবং চিড়িক্ ক'রে ওঠা জ্বালা অনুভব করলে সে চোখ ফিরিয়েই দেখতে পায় শরীরের অর্ধাংশ তুলে বিশাল ফণা নিয়ে দুলছে তার সামনে, মুখের ভেতর থেকে সরু সুতোর মতো জিভ খুব দ্রুত আসা যাওয়া করছে, দুর্বোধ্য উল্কিকাটা ম্যাটমেটে শরীরের ওপর সূর্যের আলোয় অপূর্ব বিভা চমকাচ্ছে, পল্টু নড়তে পারলো না,

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
নিজের পায়ের দিকে তাকাতে পারলো না, তার দৃষ্টিসীমার মধ্যে কেবল আল্পনা আঁকা কুলোর মতো বিশাল ফণা, প্রায় ঘিরে রঙের চকচকে গলা, পেট, কুণ্ডলী পাকানো ম্যাটমেটে রঙের নিম্নাংশ, প্রসারিত ফণা এবং ঠোঁটের ওপর সূর্যালোকের বিকীর্ণ হীরক দ্যুতি নিয়ে দোদুল্যমান সেই অহংকারী রাজকীয় ভঙ্গি তাকে সম্মোহিত করে ফেলে।
অতঃপর পল্টু নামের সেই বাইশ-তেইশ বছরের ছেলেটিকে নিতান্তই অকাট নির্বোধ মনে করে কিংবা 'কাজটা বোধহয় ভালো করলাম না, ভাবতে ভাবতে তাকে সেখানে দাঁড় করিয়ে রেখে ফনা গুটিয়ে ডোবার ঢালু পাড় বেয়ে দ্রুত নেমে চলে গেলো ওপারে পাঁচিলের গায়ের কাছে জড়াজড়ি ক'রে থাকা বন-পালার ভেতর।

আলো ক্রমে সরে যাচ্ছে, চারপাশে ভিড় ক'রে থাকা অসংখ্য মানুষ, বিভিন্ন কণ্ঠের অবিরাম বিলাপধ্বনি, হাঁটুর ওপর উরুর মাঝ বরাবর শক্ত বাঁধনটা অসহ্য টনটন করছে, একটি শাদা শশ্রুমণ্ডিত মুখ নড়ছে তক্তপোষের ওপর থেকে তার ঝুলিয়ে রাখা পায়ের গোড়ায়, আর থেকে থেকে গামছার আঘাত করছে সেখানে, তেতো তেতো মুখে প্রবল তৃষ্ণার ভেতর তার কেবলই ঘুম আসতে থাকে। আর কে একজন তাকে ধ'রে জোর ক'রে বসিয়ে রাখছে, আর কান্না মেশানো, 'আমি ওর মাকে কি জবাব দোবো গো, আল্লা এ তুমি কি করলে মাবুদ' -শুনতে পায় এবং ঘুমে সমস্ত শরীর ভেঙে আসতে চায় তার। তাকে জড়িয়ে ধরে থাকা মানুষটার কাঁধে সে মাথা রাখলে দেখতে পায় ফসল ভরা মাঠের ওপর থেকে আলো সরে যাচ্ছে ক্রমে, ককিয়ে ককিয়ে বিশাল এক মালগাড়ী পার হয়ে যাচ্ছে। কোথা থেকে যেনো তরঙ্গায়িত সম্বোধন ধ্বনিত হয় 'পল্টু-উ'-,আর সে 'যা-ই'-বলতে গিয়েও থমকে গিয়ে দেখে, তার সামনে একটা খয়েরী রঙের শাড়ী জড়ানো শরীর, একটা ঝুঁকে পড়া শ্যামলা মুখ, পাতলা ঠোঁট থির থির কাঁপছে বাতাসে স্পন্দিত পাতার মতো।
ঘন পল্লবের আড়ালে পাড় ওপচানো টলমলে জল নিয়ে গভীর কালো দীঘির মতো, এক জোড়া চোখ, অতল নির্জনতার ভেতর ডুবে যেতে যেতে পল্টু নামের বাইশ-তেইশ বছরের ছেলেটা তখন শুনতে পেলো কোথায় যেনো মন্দিরা বাজছে।

যাত্রা

গাড়ী থেকে নেমে তার মনে হলো ভুল ষ্টেশনে নেমে পড়েছে সে। চারপাশে অন্ধকার, ল্যাম্প পোষ্টের মাথায় চৌকো কাঁচের ঢাকনীর ভেতর মিটমিট কুপি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
জ্বলছে। শেডহীন প্লাটফরমের ধার ঘেঁষে তারের বেড়া, অন্ধকারে ঠিক ঠাহর হয় না। তার নীচেই খাদ, খাদের পাড়ের এক পাশে প্লাটফরম বরাবর উঁচু খানিকটা জায়গা জুড়ে এক দঙ্গল গাছপালা গা ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে দাঁড়িয়ে আছে।
প্লাটফরমে মানুষ বলতে সে এবং আর একজন লোক চাদর মুড়ি দিয়ে হন হন করে হেঁটে যাচ্ছে, আরকেউ নেই। নভেম্বরের শীতে যেন সব কিছু মরে গেছে ভাবতে ভাবতে সেই হন হনিয়ে হেঁটে যাওয়া চাদর জড়ানো লোকটাকে ডাকতে চাইলো। কেননা স্টেশনটাকে কোন মতেই চিনতে পারছে না সে। গাড়ীটাও অনেক দূরে চলে গেছে, পেছন দিককার লাল আলোটা নজরে আসছে কেবল, বাকীটুকু অন্ধকারে একাকার এবং ষ্টীলের পাতের ওপর দিয়ে গড়িয়ে যাওয়া চাকার ক্ষীণ শব্দ ক্রমে মিলিয়েগেছে।
কিন্তু এ কেমন ষ্টেশন, আর কোন যাত্রী নেই, পয়েন্টসম্যান নেই, টিকিট চেকার নেই, ষ্টেশন মাষ্টার নেই, সাড়া শব্দও নেই কোনো।
মাথার ওপর কালো আকাশ, নির্জন অন্ধকারে কুয়াশা আর ঠাণ্ডা বাতাসে মরে পড়ে থাকা পারিপার্শ্বিকের ভেতরে সে লোকটাকে ডাকতে চাইলো, 'এই যে ভাই, এটা কোন ষ্টেশন।' ডাকতে গিয়েও থমকালো, এই নির্জন অন্ধকারময় অপরিচিত জাগায় এ ধরনের প্রশ্ন করাটা ঠিক হবে কিনা ভাবে।
লোকটার গায়ে ধুসর রঙের একটা চাদর আর চেক চেক লুঙ্গির খানিকটা অংশ ছাড়া আর কিছুই বোঝা যাচ্ছে না পেছন থেকে, আস্তে আস্তে দূর চলে যাচ্ছে লোকটা, অন্ধকারে ভেতর অস্থিরতার জন্ম হতে থাকে এবং বিপন্নতা, তখন সে ডাকে, 'এই যে ভাই শুনুন।' চাদর জড়ানো লোকটা বোধহয় শুনতে পেলোনা, এই নির্জন অন্ধকারময় চরাচরে তার প্রতিধ্বনি শত সহস্র খান খান হয়ে চারপাশে মেঝের ওপর কাঁচের প্লেট ভাঙার মতো ঝন ঝন ক'রে উঠলো।
সেই শব্দ দুললো, অন্ধকারে, ঠাণ্ডা কুয়াশা মাখা বাতাসে মিশলো, তারপর তার বুকের ভেতরে ঢুকে গিয়ে গুরগুর ক'রে উঠতে থাকালো। কেননা সেই শব্দের ভেতর ভয়, বিপন্নতা এবং ভালোবাসা। কেননা তখন তার মা' ছোট যে ভাইটা মাটি এবং ভালোবাসার জন্যে প্রাণ দিয়েছে, পরিচিত মানুষজন, শৈশব, কৈশোর, দৃশ্যমান এবং কল্পনার বিশাল ভুমণ্ডলের সমস্ত কিছু জেগে উঠছিলো। মনে পড়ছিলো হায়নার মতো ধেয়ে আসা সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বীর উদাত সঙ্গীন থেকে নদী সাঁতরে এক গ্রাম্য মসজিদে ঢুকে প্রতিপদে অনুভব করেছিলো বেঁচে থাকা তার কাছে কী বিপুলভাবে কাম্য।
তখন কাকের ডাক শোনে অবাক হয়ে। চারপাশে এখনও অন্ধকার অর্থাৎ রাত, অথচ কাক ডাকছে। কাকের ডাকে নতুন করে সে লোকটার প্রতি মনোযোগী হয়। লোকটা এখন প্লাটফরমের শেষ সীমায় পৌঁছে ঢালু দিয়ে নীচে নামছে দেখতে পেলে এবার সে মরিয়া হয়ে ডাকে, এই যে ভাই শুনছেন?'
চাদর জড়ানো লোকটা দাঁড়িয়ে পড়েছে। স্পষ্ট কিছু বোঝা যায় না, শুধু মানুষের অবয়বের পরিচিত রেখা সেই অন্ধকারে অস্পষ্ট জেগে আছে। জোরে পা চালাতে থাকে সে এবং এক সময় লোকটার কাছাকাছি গেলে তার কপালে, গালের ওপর, হাতের তালুতে ঘাম অনুভুত হয়, হৃৎপিণ্ড শব্দ তোলে ক্রমাগত; কাছে গিয়ে লোকটার মুখ দেখতে চাইলো,দেখতে পেল না, কেননা মাথা পর্যন্ত তার চাদর ঢাকা এবং অন্ধকারের ভেতর মুখ অন্য দিকে ফেরানো, অতএব সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
অপরিচিত নির্বিকার লোকটিকে সে জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কোথায় যাবেন ভাই?' অনুভব করে তার স্বর কাঁপা, শুকনো এবং এলোমেলো। লোকটি কোন উত্তর না দিয়ে আঙুল বাড়িয়ে সামনের কুয়াশায় ঢাকা অন্ধকার শূন্যতার প্রতি নির্দেশ করে। ফলে সে আরো বিপন্ন হয়।

লোকটা হাঁটতে শুরু করেছে এবার। এবং অসহায় সে অনুসরণ করে তাকে এবং ভীষণ অবাক হয়ে ভাবতে থাকে, কোন্ স্টেশনে যেনো নামবার কথা। কিছুতেই মনে করতে পারে না। কেবলই ঘামতে থাকে। নভেম্বর মাসের শীতের ভেতর কপাল, চোয়াল, হাতের তালু, বুকের খানিকটা অংশ, বগল ভিজে ভিজে ঠেকে, রেল লাইনের পাশে রুক্ষ ধূসর, ধূলিময় পথ, মাঝে মাঝে আগাছার স্পর্শ, নুড়িপাথরের কঠিন অস্তিত্ব তাকে হোঁচট খাওয়ায় বার বার। আর সেই অপরিচিত লোকটার পেছনে পেছনে–যার মুখাবয়ব এখন পর্যন্ত সে দেখেনি, হাঁটতে থাকে। হাঁটতে হাঁটতে অন্ধকারের অস্পষ্টতায় দেখে, যেখান দিয়ে তারা হাঁটছে তার নীচেই খাদ এবং সেই খাদে নিথর কালো পানি, খাদের ওপারে, যেদিকে লোকটা অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলো সেটা একটা বিশাল ফাঁকা মাঠ, জলার মতো। লোকটা এখন ঢালু বেয়ে সেই খাদের দিকে নামছে। এবং সে সেই মূর্তিমান অনিশ্চয়তাকে উপায়হীন অনুসরণ করে। খাদের পাড়ে এসে লোকটা তাকে আহবান করে হাত বাড়িয়ে, এবারও সে তার মুখ দেখতে পায় না। থমকে দাঁড়ায়। লোকটা হাত বাড়িয়েই থাকে, তখন সে তার দিকে এগোয় এবং লোকটা যেনো একটা শিশুকে তুলে নিচ্ছে এমনিভাবে তাকে নিজের কাঁধে স্থাপন করলে সে ভীষণ অস্বস্তি নিয়ে বলে, একি হচ্ছে, না, না, একি হচ্ছে।' লোকটা কোন কথা না বলে নির্জন কালো জল কেটে কেটে তাকে কাঁধে নিয়ে খাদ পেরুতে থাকলে ভয় প্রবল জাপটে ধরে: লোকটা এবার আমায় ডুবিয়ে মারবে। এবং মনে হয় তাকে কাঁধে তুলে নেবার সময় সে যেনো চকিতে দেখতে পেয়েছিলো লোকটার কোন চোখ নেই, নাক নেই, গোল গোল কয়েকটা ছোট বড় ছিদ্র এবং সর্বোপরি তার মুখে কোন মাংস নেই। তার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। সমস্ত শরীর হিম হয়ে আসে। কিন্তু কোন উপায় নেই, কেননা তার শক্তি ক্রমশ: অবলুপ্ত হ'য়ে আসছে এবং তার ঝুলন্ত হাত দুটো লোকটার খসখসে শক্ত মুঠির ভেতর বন্দী।

খাদের পানির গভীরতা বেশী নেই, কিন্তু তার বারবার মনে হ'তে থাকে লোকটা খুন করে এই খাদে তাকে পুঁতে রেখে যাবে। ছটফট করতে থাকে সে, সমস্ত অস্তিত্ব থেকে ভালবাসা চিৎকার করে উঠতে চাইছে, আর লোকটা কোন কথা না বলে সেই নির্জন চরাচরে জলের ওপর শব্দ তুলে তুলে সামনের কুয়াশা ঢাকা বিশাল অন্ধকার শূন্যতার দিকে তাকে কাঁধে নিয়ে এগোতে থাকে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বন্দী দুঃসময়

গণ্ডিটা ছোট হয়ে আসছে ক্রমে।
টেবিলের ওপর চারপাশের পানির বৃত্তের ভেতর বন্দী পিঁপড়েটা বেরুবার জন্যে অস্থির হয়ে ঘুরছে আর সে গ্লাস থেকে টেবিলের ওপর ছলকে পড়া পানিতে আঙুল ডুবিয়ে বন্দী পিঁপড়ের চারপাশের বৃত্তটা ক্রমে ছোট করে আনতে থাকে আর পিঁপড়েটা তার ভেতর ভীষণ বিপন্ন এপাশ ওপাশ সামনে পেছনে ছোটাছুটি করতে থাকে এবং ক্রমাগত অঙ্গুলী স্পর্শে সরু বৃত্ত ভরাট হতে হতে এক সময় শুকনো ডাঙা সম্পূর্ণ জলমগ্ন হয়ে গেলে তার ভেতর দূরাগত এক কিশোরের কণ্ঠ শোনে, 'পানি পার পানি পার।'
ভীষণ চমকে ওঠে সে। চারপাশে পানির বৃত্তটা ছোট করে আনতে থাকলে তার ভেতর পিঁপড়েটার আকুলি বিকুলি দেখে এতক্ষণ যে নিষ্ঠুর উল্লাস আর হিংস্র উত্তেজনা জাগছিলো এখনো নিদারুণ বিস্ময়ে তা নিতে গিয়ে প্রশ্ন জাগছে, কোথায় যেনো শুনেছিলাম?
মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে, কীচেন সংলগ্ন রেষ্টুরেন্টের ভেতর তবু ভ্যাপসা গরম। সামনে হা হা করা বিশাল দরজার বাইরে রৌদ্রতপ্ত রাস্তার ওপর ধূলো উড়িয়ে খালি একটা ট্রাক ছুটে গেলো, চকিতে সেই গর্জমান ট্রাকের নিষ্ঠুর অবয়ব, তার ওপর খাড়া রোদে ধূলো আর ঘাম মাখা ভাঙাচোরা কতিপয় মানুষ মুহূর্ত–মাত্র দেখা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো; একটা ধূলোর ঢেউ দুলতে দুলতে রেষ্টুরেন্টের সেই হা–খোলা দরজার ভেতর দিয়ে ঢুকে পড়লো। রাস্তার অপর পাশে গোল ডাষ্টবিনের কাছাকাছি পড়ে থাকা নোংরা ক'টা ছেঁড়া দোমড়ানো কাগজ অল্প একটু উড়ে ডানা ভাঙা পাখীর মতো মুখ থুবড়ে পড়লো রাস্তার ওপর। মাথায় আঁচল তোলা শুকনো একজন মহিলা হেঁটে গেলো।আর কোথা থেকে হলদে রঙের একটা কুকুর ডাষ্টবিনের পাশে প'ড়ে থাকা আবর্জনা শুঁকে শুঁকে পেছনের এক পা তুলে ডাষ্টবিনের গায়ে প্রস্রাব করে দিয়ে চলে গেলো। ডাষ্টবিনের গায়ে তার সেই প্রস্রাবের আঁকাবাকা ধারার মধ্যে হাত পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা একটা মানুষের এ্যাবষ্ট্রাক্ট ফর্ম ফুটে উঠেছে বলে মনে হলো তার।
হোটেল থেকে খাওয়া–দাওয়া শেষ ক'রে বেরিয়ে মোড়ের দোকান থেকে সিগারেট কিনেছিলো, অন্যমনস্কের মতো সিগারেট বের করে ঠোঁটে চেপে ধ'রে দেশলাই জ্বালালে খস ক'রে শব্দ হয়, সেই শব্দ তাকে জ্বলন্ত কাঠির দিকে মনোযোগী ক'রে তোলে, দেখে কাঠির বারুদ দাউদাউ ক'রে জ্বলছে, সিগারেট ধরিয়ে সে শূন্য কাপে কাঠিটা ঠেসে ধরে, ফ্যাস ক'রে আওয়াজ হয়, হাল্কা ভিজে ধোঁয়ার, কটু গন্ধ আসে নাকে। সেই গন্ধ সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধের সঙ্গে মিশে নাক গলে পেটের ভেতর গেলে টকটক ঝাঁঝালো কিঞ্চিত উদ্গার ওঠে। সে

~ www.amarboi.com ~
রেষ্টুরেন্টের বয়কে ডাকে, 'পিটার।' কালো যণ্ডা মার্কা পিটার এলে তাকে বলে, 'ধনে।'

শরীর শুকিয়ে ওঠা ভাবটা আবার তাকে পেয়ে বসেছে, ক'দিন থেকেই এমন চলছে, কয়েক বালতি পানিতে গোসল করেছে আজ, পেট থাবড়ে থাবড়ে পানি ঢেলেছে, তবু মনে হচ্ছে চোখ দুটো যেন কোটরে ঢুকে গেছে, হালকা জ্বালা জ্বালা ভাব, মাথা ভার ভার ঠেকে, শরীরের কোথায় যেনো অবসাদ, এই সব ভাবতে ভাবতে টেবিলের ওপর জলাবদ্ধ সেই পিঁপড়ের দিকে দৃষ্টি গেলে দেখে পিঁপড়েটা নির্জীব হয়ে প'ড়ে আছে। চায়ের কাপ থেকে জোড়া কাঠিটা তুলে জলের আবেষ্টনী থেকে উদ্ধার করে তাকে। শীতের রাতে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকা পিঁপড়েটের জন্য শোকাচ্ছন্ন হয় সে। কাঠি দিয়ে মৃত কুকুরের মতো নিষ্প্রাণ পিঁপড়েটাকে নাড়াচাড়া করতে করতে ভাবে, পিঁপড়েটা মেয়ে না পুরুষ? ছোটখাট লালচে শরীরের কোথায় এর যৌনাঙ্গ কে জানে। মেয়ে কিংবা পুরুষ যা-ই হোক না কেনো এই শরীরের ভেতরই সব কামনা-বাসনা, ঘৃণা, ভালবাসা, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, সুখ কিম্বা দুঃখ সমস্ত কিছু। পিঁপড়েটা হয়ত সন্তানবর্তী ছিলো,যদি পুরুষ হয় তাহলে জ্বলজ্বলে কামনা নিয়ে কোন নারী পিঁপড়ের কাছে যাচ্ছিলো হয়তো। মনে মনে হেসে ফেলে, দূর, কি সব ভাবছে সে পাগলের মতো।

পিরিচ থেকে ধনে তুলে মুখে দেয়, কিঞ্চিত নোনতা আর সোঁদা স্বাদ; দেখে, হাতের সিগারেটের মাথায় পোড়া ছাই হাদীর সুঁড়ের মতো লম্বা হয়ে ঝুলে পড়েছে প্রায়। ছাই ঝেড়ে টানতে গিয়ে অনুভব করে,নিভে গেছে, নিভে যাওয়া সিগারেটের তেতো বোঁটকা গন্ধে মাথা ঝিমঝিম করে, জিভ বিস্বাদ ঠেকে, গা গুলিয়ে ওঠে, থু থু ক'রে মুখের ভেতরকার চিবোনো ধনে ফেলে দিয়ে একগ্লাস পানি চেয়ে নিয়ে বেসিনে দু'তিনবার কুলকুচো ক'রে কয়েক চোক পানি খায়, চোক মুখে পানি দেয়, রুমালে হাত মুখ মুছতে মুছতে চেয়ারে এসে বসে। পিটারকে ডেকে পান আনিয়ে খেয়ে কিঞ্চিত সুস্থির বোধ করে।

রেষ্টুরেন্টে অন্য কোন খদ্দের নেই। এ সময় থাকার কথাও নয়। কাউন্টারে ছোকরা ম্যানেজার ঝিমুচ্ছে, বয় বেয়ারাদের কেউ কীচেনে, কেউ পেছনের দরজাহীন কেবিনের মতো রুমটায় বসে গুলতানি দিচ্ছে, মাথার ওপর অবিরাম ফ্যান ঘুরে চলে, কীচেনের উনুনের উত্তাপ ফ্যানের হাওয়ার সঙ্গে মিশে সমস্ত রেষ্টুরেন্টে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সামনের টেবিলের ওপর জীর্ণ-প্রায় খবরের কাগজ থেকে: পাবলো নেরুদা কোথায়? শিরোনাম সম্বলিত খবরের একাংশ উকি দেয়।

চায়ের দাম মিটিয়ে রাস্তায় নামলে এতো রোদের মধ্যেও শীতলতা অনুভব করে সে। মাথার ভেতরে কোথাও চিনচিনে ব্যথা ভার হয়ে রয়েছে এবং ঘুমের প্রয়োজন অনুভূত হয়।

গতকাল সারারাত ঘুম হয়নি। এমনিতেই ঘুম তার কম। শরীর অবসন্ন থাকে, মাথা ভার ভার লাগে। দুটো-আড়াইটা পর্যন্ত বিছানায় এপাশ ওপাশ ক'রে ক'রে অন্ধকারের ভেতর একের পর এক সিগারেট টেনে কখন এক সময় অচেতন হয়ে যায়। অতঃপর মানুষের কণ্ঠস্বর, কাকের চিৎকার, বালতি টানাটানির শব্দ, মসজিদে শিশু কণ্ঠের একটানা কোরান পাঠের মিলিত চিৎকার; এ ছাড়া সকাল হয়ে যাওয়ার সহজাত অনুভূতি তাকে সজাগ ক'রে দিলেও সারা শরীর জুড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
এক ধরনের ভেঙে পড়া ক্লান্তি তাকে বিছানার ওপর জাগিয়ে ফেলে রেখে দেয়। কিন্তু গত রাতে একটুও ঘুম হয়নি। গতরাতে দগদগে চাঁদ ছিলো তার জানালায়। ঘুম আসেনি। রাত তখন কতো জানে না। একসময় যখন সেই দুর্বিনীত ঔজ্জ্বল্য মুছে গিয়ে অনেক দিন না মাজা কাঁসার থালার মতো চাঁদটা ঢলে পড়েছিলো নারকেল গাঠের মাথা ডিঙিয়ে, তখন তার ছোট নির্জন একাকী ঘরের জানালার উল্টো দিকে হাত কয়েক দূরের পাশের বাড়ীর ঘরটিতে হঠাৎ ক'রে আলো জ্বলে উঠেছিলো। তারপর দরোজা খোলার শব্দ, একজন বাইরে গেলো ফিরে এসে দরোজা লাগালো, বাতি নেভানোর শব্দ হলো, তারপর নারী কণ্ঠের চাপা স্বরে, 'না, না, দূর'–শুনতে পেলো, অতঃপর বিছানার ওপর শরীর পতনের শব্দে সবকিছু স্পষ্ট হয়ে যায়।

তখন হঠাৎ তার বয়সের কথা মনে প'ড়ে যায়। আগামী মাসের উনিশ তারিখে সে আটাশ বছরের পড়বে। এবং মনে হতেই কেমন অস্থিরতা বোধ করে, ধীরে ধীরে তার শৈশবকে মনে পড়তে থাকে। কোথায় যেনো পড়েছিলো, মানুষ চেষ্টা করলে তার জন্ম মুহূর্তের স্মৃতিকে মনে করতে পারে। কিন্তু শত চেষ্টা ক'রেও সে তা না পেরে অবশেষে টিনের ঢাকনি দেওয়া অকেজো কুয়োর উচু বাঁধানো চত্বরে গিয়ে ব'সে ব'সে নারকেল গাছ ডিঙিয়ে ওপারে বাড়ীর ছাদের কার্নিশের আড়ালে প্রায় ঢাকা প'ড়ে যাওয়া চাঁদ, নারকেল গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে পিছলে পড়া রুগ্ন জ্যোৎস্না, আকাশের গায়ে দীর্ঘ ব্যবধানে মিটমিট করে জ্বলতে থাকা তারা, মেঘের রঙ, এবং স্বল্পস্থায়ী কিম্ভূত আকৃতি দেখতে দেখতে মনে পড়ে, আগামীকাল রোববার। এই উপলব্ধি তার ভেতর হাত পা এলিয়ে দেওয়া এক ধরনের শিথিলতা এনে দেয়। অতঃপর তার অফিসের চেয়ার এবং একে একে রুমের সবকিছু মনে পড়ে। তখন ছুঁচো চিক চিক শব্দ তোলে, কোথায় যেন কুকুর ডাকে, দূরে স্কুটার যাওয়ার আওয়াজ আসে। আশে পাশের বাড়ী থেকে কোন সাড়া শব্দ নেই। তার মনে হয়, রমণরত তার প্রতিবেশী স্বামী স্ত্রীকে ডেকে বলে, 'এই যে শুনছেন, আমরা চার ভাই একবোন, আমার মা ডেলিভারী হতে গিয়ে মারা যায়, মা মারা যাওয়ার পর আমাদের খুব কষ্ট গেছে ছেলেবেলায়। বলতে গেলে মা'র অভাবে মানুষই হতে পারলাম না আমরা। আপনাদের একমাত্র সন্তান মেয়েটার বয়স বড়জোর তিন, এই সময় যদি'...আবার লাইট জ্বলে ওঠে, নারী কণ্ঠের চাপা হাসি ভেসে আসে, দোর খোলার শব্দ হয়।

হাঁটতে হাঁটতে মোড়ের মাথায় এসে পাশ দিয়ে স্বল্প এগোনো রিক্সা থেকে হঠাৎ তার নাম ডেকে ওঠে, 'বাবলু।' এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হাসি হাসি মুখে বিশু চেঁচিয়ে ওঠে, 'বাসায় আসিস;' সে নির্বিকার প্রায়, শুধু হাত তোলে, বিশু চকিতে হুড তোলা রিক্সার ভেতর কচ্ছপের মতো মাথা গুটিয়ে নেয়। পেছন থেকে হুডের ঘুলঘুলী দিয়ে খোঁপা, ঘাড়, রঙিন শাড়ি, ব্লাউজের আংশিক দেখতে পায়। নির্ঘাত সিনেমা দেখতে বেরিয়েছে। তা কেমন হাসি পায়, রাস্তার ওপর এ ভাবে ডেকে বাড়ীতে যাবার আমন্ত্রণ আর কিছু নয়, বউকে নিয়ে ও যে সিনেমায় যাচ্ছে তাই জানানো, অর্থাৎ দেখো, আমার একটা বউ আছে, দুপুর বেলা খাওয়া-দাওয়া সেরে সেজে-গুজে তাকে পাশে বসিয়ে সুখী দম্পতি কেমন সিনেমায় চলেছি।

গত রাতের কথা মনে আসে। এখন এই ছুটির দুপুরে তার প্রতিবেশী দম্পতি কি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
সিনেমায় যাচ্ছে, না লেপ্টে পড়ে আছে। কলেজে পড়ার সময় সহপাঠি হোষ্টেলবাসী বন্ধুদের মুখে শুনেছিলো, কলেজের এক অধ্যাপক হোষ্টেল সুপারিনটেনডেন্ট ছুটির দিন দুপুরে তার চার পাঁচ বছরের ছেলে দু'টোকে বাইরে খেলা করতে ব'লে দরোজা লাগিয়ে দিতো বউকে নিয়ে। পুরোনো দরোজার গোপন ফোকর দিয়ে সেই দৃশ্য দেখার রগরগে বর্ণনা দিতো বন্ধুরা, অথচ কলেজে ভদ্রলোককে নিতান্ত ঠাণ্ডা, মিষ্টি ধরণের মনে হতো। বন্ধুরা বলতো, স্বামী-স্ত্রী দুজনেই দারুণ সেক্সী।

কি জানি, হতেও পারে। কে জানে, এই ছুটির দুপুরের ঠিক এই মুহূর্তে ঢাকা শহরে কতো হাজার দম্পতি যৌনক্রীড়ায় মত্ত আছে। ভাবতে ভাবতে মনে হয় এখন সে সদরঘাটের এই চার মাথায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতার ঢঙে বলে, 'প্রিয় দেশবাসী ভাই ও বোনেরা, শত্রুরা এদেশকে শ্মশান করে দিয়ে গেছে, তার পর বন্যায় ফসল নষ্ট হচ্ছে, মিল কারখানায় উৎপাদন নেই, বেকার সমস্যা আতঙ্কজনকভাবে বাড়ছে, দেশে দারুণ অভাবের কাল এখন, জনসংখ্যা রোধ অপরিহার্য, শুধু পরিবার পরিকল্পনা নয়, আপনারা রতিক্রিয়া বন্ধ করুন। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে ভাই বোন ভাবুন।'

দেখে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে পড়েছে সে। ঠোঁট নড়ছে। হাসি পেলো তার। এক বুড়ো রিক্সাঅলা এগিয়ে এসে বলে, 'যাইবেন নি সার'? সে কোন দ্বিরুক্তি না ক'রে রিকসায় উঠে তার গন্তব্যের নাম বলে।

দু'পাশে বন্ধ দোকানপাট, রঙিন সাইন বোর্ড, হেঁটে যাওয়া মানুষ, রিক্সা কিংবা মোটর গাড়ী পেরিয়ে যেতে যেতে ছেলে বেলায় ট্রেনে চড়ার কথা মনে হয়। ট্রেনের জানালার বাইরে দিগন্ত ছোঁয়া বিশাল বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠ তার সমস্ত ডিটেল নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে পেছন দিকে চলে যেতে থাকে।

অতঃপর সেই গতিশীল মাঠ স্থির ষ্টেশন হয়ে যায়। ওভারব্রীজ টপকে আব্বার হাত ধরে সে প্লাটফরমে নেমে আসে। প্রথম কৈশোরের কৌতূহলী দৃষ্টির ক্যামেরায় যাত্রীকুল, প্লাটফরমের খুটিনাটি, প্লাটফরমের বাইরে সামনে পেছনের দৃশ্যাবলীর কোন কিছুবাদ যাচ্ছিল না।

শেড ফুঁড়ে মাথা তুলে দাঁড়ানো বটগাছটার নীচের বাঁধানো চত্বরের কাছে জটলাবদ্ধ মানুষের মধ্যে হঠাৎ চাঞ্চল্য, কোলাহল, ছোটাছুটি দেখে সেদিকে এগিয়ে যায়। সরু কালো পাড়ের সাদা ধবধবে ধুতি এবং নিমা পরা, রোগা পাতলা প্রায় বৃদ্ধ মানুষটা কাৎ হয়ে বুকের কাছে হাঁটু মুড়ে নিস্পন্দ প'ড়ে রয়েছে সেই বাঁধানো চত্বরের ওপর। পাশে মুড়ে রাখা একটা ছাতা। অত্যন্ত মসৃণ করে শেভ করা ছুঁচোলো শীর্ণ মুখ এক পাশে কাৎ হয়ে থাকায় গালের গর্ত এবং হনুর হাড় আরো প্রকট হয়ে রয়েছে। একটি চোখ বন্ধ অপরটি কিঞ্চিৎ স্ফারিত। মিনিট পরেনো আগে সে লোকটিকে উবু হয়ে বসে অন্য একজন প্রৌঢ়ের সঙ্গে আলাপরত দেখে গেছে। ভিড় ক'রে থাকা যাত্রীদের কথাবার্তায় জানতে পারে লোকটি মেয়ের বিয়ের দিন ধার্য করতে যাচ্ছিলো।

সে বিমূঢ় হয়ে যায়, মাত্র কয়েক মিনিট আগে যে লোক সুস্থ মানুষের মতো ব'সে ব'সে আলাপ করছিলো, এখন সে মরে পড়ে আছে। এই গ্রাম্য ষ্টেশনে লোকটা হয়তো কয়েক মাইল দূর থেকে গাড়ী ধরতে এসেছিলো, একটু পরেই তার মৃতদেহ খাটিরায় করে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে; আসন্ন পারিবারিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
দৃশ্যটি কল্পনা করতে করতে ভীষণ বিপন্ন হয়ে পড়তে থাকে ভেতরে ভেতরে। তার চোখে অজানা মেয়েটির মুখের আদব ভাসে। হয়তো মেয়েটি কালো, অসন্দুর হয়তো তার বিয়ে হচ্ছে না দীর্ঘদিন ধরে, হয়তো শান্ত মেয়েটি বাবার সবচেয়ে প্রিয় ছিলো। ভাবতে ভাবতে সমবেদনা, ভালোবাসায় বারো বছরের কিশোর বুক কুল কুল ক'রে জলে ভ'রে যেতে থাকে।

মিষ্টির দোকানটির মোড় ঘুরতেই দেখতে পেলো অশোক হেঁটে আসছে। ছোকরার স্বাস্থ্যখানা তো বেশ ষণ্ডা মার্কা হয়েছে। চওড়া গোঁফ, চোখে চশমা, জংলা রঙের হাওয়াই শার্ট, প্যান্ট, পায়ে চপ্পল, সুখেই আছে মনে হয়।

ছেলেবেলায় বাবা মারা গেছে। দাদুর কাছে মানুষ। বিধবা মা কলকাতায় ভাগলো কোন এক লোকের সঙ্গে যেনো। বোনটাকে তো মামা হারামজাদাই নষ্ট করে শেষে কোথা পাঠালো কে জানে। ও নিজে গিয়ে ভিড়লো সিনেমার টিকিট ব্ল্যাকারদের সঙ্গে। শেষে কোথায় যেনো সাইকেল চুরির দায়ে হাজত খেটে এলো ক'মাস। ফিরে এসে দাদুর টাকা মেরে হাওয়া হয়ে থাকলো ক'দিন। দাদু আর জায়গা দিলো না। তারপর কিভাবে না কি ভাবে যেনো লাইসেন্স বাগিয়ে স্কুটার ড্রাইভিং করলো কিছুদিন। লাইসেন্স বাবদ গোটা বিশেক টাকা ধার নিয়েছিলো তার কাছ থেকে ফেরত দেয়নি, এবং তারপর থেকে আর দেখাও হয়নি বহুদিন। শেষে তো দেশে গণ্ডগোল লেগে গেলো।

এতোদিন পর দেখা, মনে হলো ডাকে, ভাবতে ভাবতে রিক্সা অতিক্রম করে গেলো, যাক লক্ষ্য করেনি তাকে, যেনো কিঞ্চিৎ স্বস্তি অনুভব করলো সে।

দরোজা খুলে মেঝের ওপর একসঙ্গে দু'খানা চিঠি পেলো। একটি খাম অপরটি পোষ্ট কার্ড। পোষ্ট কার্ড খানায় চোখ বুলোলো। কয়েক লাইনের চিঠি, ঠাকুরগাঁ থেকে আলমগীর লিখেছে, পনেরো–ষোল দিনের মধ্যে ঢাকায় আসছে, বহুদিন থেকে ঢাকায় পোষ্টিংয়ের চেষ্টা করছিলো; এতো দিনে মঞ্জুর হয়েছে। খামের চিঠিখানা সুশান্তর কুমিল্লা থেকে লিখেছে: 'এ মাসে টাকাটা আমার বাড়ীতে দিয়ে দিও। আসার সময় বেশী টাকা দিয়ে আসতে পারিনি, তাই একটু অসুবিধে হয়ে গেলো। মনে কিছু করো না। টাকাটা অবশ্যই দিয়ে দিও মনে ক'রে। দুলুর ব্যাপারটা তো জানালে না। কি হয়েছে শেষ পর্যন্ত, জানাবে। খুব সম্ভব এবার পূজোর সময় ঢাকা যেতে পারবো না। কয়েকদিন পর পরই উদর্ধটথমভথ যেতে হয়। একটু ঝামেলায় আছি, পূজোর পর অবশ্যই আসবো.....।

চিঠিখানা ভাঁজ করতে করতে অবসাদ মেশানো অস্থিরতা বোধ করতে থাকে। বুকের ভেতর মনে হয় কেউ নখ দিয়ে আঁচড়ায়। জামা কাপড় না ছেড়েই সে সটান শুয়ে পড়ে বিছানায়। চোখ বন্ধ করে মনে মনে সম্ভাব্য মানুষগুলোর কাছে ঘুরে আসে একে একে; কিন্তু জোর পায়না। টাকা ক'টা কোথে কে ম্যানেজ করা যায়, এমনি একটি মারাত্মক প্রশ্ন তাকে কেবলই আলোড়িত করতে থাকে।

পকেট থেকে সিগারেট এবং দেশলাই বার ক'রে শুয়ে শুয়েই সিগারেট ধরিয়ে লম্বা লম্বা টান দিয়ে তার অতি সন্নিকটবর্তী শূন্য এলাকা ধোঁয়াচ্ছন্ন ক'রে ফেলে মুহূর্তের মধ্যে।

চোখের সামনে এখন দেওয়াল, জায়গায় জায়গায় চুন খসা, স্যাঁতা লাগা, ভিজে ভিজে দাগ, ব্রাকেটে ব্রাকেটে ঝুলন্ত জামা কাপড়ের ফাঁকে খবরের কাগজের বোল্ড হেডিং INSEARCH OF তারপর পাঞ্জাবীর হাত ঢাকা, তার ফাঁকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
NDS লেখা চোখে পড়ে। ঝোলানো জামা কাপড়ের পাশে আবরণহীন দেওয়াল আলমারীর থাকগুলোয় সাজানো কি এলোমেলো বই, তার মাথায় ঝুলন্ত বিদেশী কালেণ্ডার: গাঢ় মেটেরঙের উঁচু নীচু প্রান্তর, দূরে দূরে ইতস্তত: ক'টি বিরলপত্র আগাছার উর্ধ্বমুখী শীর্ণ শাখা, দিগন্ত-শেষে প্রায় মাটি ছোঁয়া উধাও নীল শূন্যতা-মনে হয়, দিগন্ত রেখার পরেই যেনো কিঞ্চিৎ কুয়াশাচ্ছন্ন দিক চিহ্নহীন সমুদ্র। তাকে প্রায় পেছনে রেখে সেই মেটে রঙের বন্ধুর প্রান্তর পেরিয়ে মাথায় হ্যাট, হাতে ছাতা, পাদরীদের মতো পোশাক পরা একটি মানুষ হেঁটে চলেছে একা। চয়ে থাকতে থাকতে ধীরে ধীরে সে ভীষণ অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

-'ঘুমাইয়াছেন নাকি।'

-'এ্যাঁ, ও, না।'

-'চিঠি দুইটা পাইছেন?'

-'হ্যাঁ'।

-'গতকাল আইছে, আপনে ছিলেন না, পরে দিতে মনে আছিলো না।'

তার ঘরের দরোজার বাইরে দাঁড়িয়ে মেসের লোকটা কৈফিয়ত দেওয়ার মতো ক'রে বলে কথাগুলো। সে তেমনি শুয়ে শুয়েই বলে, 'ঠিক আছে।' পায়ের শব্দেটের পায় লোকটা সদর দরোজা পেরিয়ে বাইরে চলে গেলো।

তাইতো, আজ ছুটির দিন, পোষ্ট অফিস বন্ধ, চিঠি দুটো পাওয়ার পর একবারও তো মনে হয়নি, কিভাবে এলো? পারম্পর্যহীন ভাবে হঠাৎ কবীরের কথা মনে হয়। কবীরের সঙ্গে প্রায় মাস দু'য়েক দেখা নেই, যদিও নিজেরা বাড়ী ক'রে নতুন ঢাকার শেষ প্রান্তে-প্রায় চলে গেছে, তবুও মাঝে মাঝেই দেখা সাক্ষাৎ হতো। কখনও দিনে, কিংবা কখনও রাত একটা দেড়টায় হঠাৎ করে এসে হাজির হতো রা'ত কাটানোর জন্যে। সে জানে কবীর পলিটিক্স নিয়ে মেতে আছে, হয়তো পার্টির কোন কাজে পুরোনো শহরে এসেছিলো, এতো রাতে ফিরে যাওয়া অসুবিধে, কাজেই ব্যাচেলর বন্ধু রুমে রাত কাটানো সুবিধে ভেবে তার কাছে আছে।

ইদানিং পাত্তাই নেই। পরিচিত বন্ধু-বান্ধবও কেউ বলতে পারে না। কারুর সঙ্গে দেখাও হয় না। দুলু সেদিন বলছিলো, 'কি জানি আণ্ডার গ্রাউণ্ডে' গেলো নাকি।। কবীরকে সে কোনদিন ওর পার্টির কথা খুব বড় একটা জিজ্ঞেস করেনি, করলেও তা নিতান্তই সাধারণ, একজন রাজনৈতিক কর্মী তার পার্টির গোপনীয়তা রক্ষা ক'রে সাধারণভাবে যতটুকু প্রকাশ করতে পারে, সেটুকু, তার বেশী নয়। কবীর তার ছেলেবেলার বন্ধু, তবু করেনি, করাটা উচিত নয় ভেবেই। কাজেই ওর এই হঠাৎ অন্তর্ধানের যদি তেমন কোন কারণ থেকেও থাকে, তা তার অজানা।

কবীর দুলুর ব্যাপারটা জানে না; আলমগীরও নয়, বন্ধুদের মধ্যে কেবল মাত্র জানে সুশান্ত, তপু আর সে।

সন্ধ্যায় দুলু খবর নিয়ে ফিরবে, কি জানি কি খবর আনে

আহ্ সুশান্ত'র টাকাটার যে কি ব্যবস্থা রি।

সেপ্টেম্বর মাসের দিন ক্রমে শেষ হয়ে আসছে। ঘরের ভেতর তার ছায়া এসে পড়েছে। সে উঠলো না। শুয়ে শুয়ে গাঁয়ের কথা ভাবলো, তার শৈশবের কথা ভাবলো, কৈশোরকে দেখলো বগলাদাবায় ফুটবল নিয়ে হৈচৈ করতে করতে মাঠে চলেছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
সাতটা সাড়ে সাতটার দিকে বিছানা ছেড়ে উঠলো। মেসের সবাই এখন বাইরে। সারা বাড়িটা ঝিম মেরে অন্ধকারের ভেতর প'ড়ে রয়েছে। মুখ হাত ধুয়ে জামা-কাপড় প'রে রুমের দরোজায় তালা দিয়ে সে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো।

সম্ভাব্য জায়গাগুলোতে পাওয়া গেলো না কাউকে। গোবিন্দ পালের চা'র দোকানে উঠতেই হাসি হাসি মুখে হাত নেড়ে কুতুব সাহেব এ্যাকনলেজ করার ভঙ্গি করলেন। ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে। এখনো বিয়ে করেননি। ইংরিজি বলেন চমৎকার। ভালো গজল গাইতে পারেন। কোণের টেবিলে বসে আছেন একা-সামনের দুটি চেয়ার খালি, সে একটিতে গিয়ে বসে। কুতুব সাহেবের টাক পড়া মাথার রেশমের মত চিকন চুল কিঞ্চিত এলো-মেলো, ভরাট মুখে একধরনের চকচকে সুখী ক্লান্তি। চেয়ারে বসে সেদিকে চেয়ে বলে, 'লুকিং রোম্যান্টিক।',

....'মী? ও নো, ফিলিং টু টায়ার্ড,' হাসি হাসি মুখে ঘুমেল চোখে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন।

...'লাইক টু হ্যাভ টি?'

নো, থ্যাঙ্কস।'

সে কাসেমকে ডেকে চা দিতে বলে। কুতুব সাহেব ঝিম ধ'রে ব'সে আছেন। অর্থাৎ পুরো ফর্মে আছেন এখন। চোখের ভেতর চকচকে আভা দেখে টের পায় সে। বুঝতে পারে, ভদ্রলোকের আলাপ করার মুড নেই। সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে দুর্জ্ঞেয় একটি সুখকে এখন তারিয়ে তারিয়ে পান করছেন তিনি। আমার এখন ওঠা উচিত, ভয়ানক অস্বস্তি নিয়ে চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে সে ভাবে। আর তখন মোটা মত লোকটা কুতুব সাহেবকে ডেকে নিয়ে যায় পেছনের কুঠরীতে। সে অনুভবে টের পায় সেখানে আরও ক'জন আছে। অর্থাৎ রোজকার মত মদ্যপান চলবে এখন। কুতুব সাহেব এবং সঙ্গীদের মধ্যে কেউ হয়তো একটু আগে মদ খেয়ে ব্রোথেল থেকে ঘুরে এসেছে, অথবা একটু পর রিক্সা নিয়ে বেরুবে।

রেষ্টুরেন্টের স্বল্প পরিসর ঘরের ভেতর মানুষ-জনের ভিড়, হাসি, কথাবার্তা, হাঁকডাক, বয়-বেয়ারাদের ব্যস্ততার মধ্যে সে তেমনি চুপচাপ ব'সে ব'সে সিগারেট টানে। যেনো কোথাও যাওয়ার নেই, যেনো কোন কালে কোথাও যাওয়ার কিছু ছিল না তার। হঠাৎ কার্যকারণহীনভাবে সামনের শাদা দেওয়াল ভেদ ক'রে দেখতে পায় মেঝের ওপর উপুড় হ'য়ে শুয়ে লম্বা সুঠামদেহী আলেন্দে সাব-মেশিনগান থেকে অবিরাম গুলীবর্ষণ করে যাচ্ছে।

সে ধীরে ধীরে উঠে কাউন্টারে চায়ের পয়সা এগিয়ে দিতে গিয়ে দেখে তার প্রসারিত হাতের আঙুল মৃদু মৃদু কাঁপছে। দাম মিটিয়ে তাড়াতাড়ি রাস্তায় নেমে হাঁটতে থাকে।

দু'পাশের দোকানপাট বন্ধ। রাস্তার ধারের লাইট পোষ্ট অন্ধের মতো দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারময় আবছা আলোর ভেতর দূরে দূরে পানের দোকানগুলো দ্বীপের মতো জ্বলছে।

অনাবশ্যকভাবে এ রাস্তা সে রাস্তা ঘুরে ঘুরে সে মেসে ফিরে দেখলো লাইট নিভিয়ে শুয়ে পড়ছে সবাই। ওপরের কোণের ঘর থেকে রেডিওর ক্ষীণ শব্দ আসছে।

রুমের তালা খুলতে খুলতে তার হঠাৎ মনে পড়ে, আর তেত্রিশ দিন পর তার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
বয়স হবে আটাশ বছর। শিথিল হাতে দরোজা ঠেলে ঘরে ঢুকে অন্ধকারে ভেতর কাপড় ছাড়ে। টাওয়াল নিয়ে বাইরে এসে মুখ ধুয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে দরোজা বন্ধ' করে আলো জ্বেলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখ মুছতে মুছতে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে নিজেকে। দেখতে দেখতে এক সময় স্থির হ'য়ে চেয়ে থাকে।
ধীরে ধীরে বুকের ভেতর কুল কুল ক'রে জলে ভ'রে যেতে থাকলে সে অভিভূতের মতো ডেকে ওঠে, 'বাবুল!' অতঃপর হাতদুটি তার কপালে দুপাশে উঠে যায় এবং মাথা নীচু করে দু'হাতের তালুর ওপর তার ভর ন্যস্ত ক'রে সে ধীরে ধীরে খাটের ওপর বসে পড়ে। সবশেষে বিছানার ওপর উপুড় হয়ে প'ড়ে বালিশে মুখ গুঁজে দেয়। আলো তেমনি জ্বলতে থাকে।
শেষ রাতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে, টেবিলের ওপর পানির বৃত্তের ভেতর বন্দী পিঁপড়ে আঁকুপাকু করছে বেরুবার জন্যে, আর লম্বা একটা আঙুল বৃত্তটাকে ছোট ক'রে আনছে, ক্রমেই ছোট ক'রে আনছে।

খঞ্জ রোদে শালিক ফড়িং

লোকটা কতবেল তলায় বসেছিলো।
দরজা খোলা মালগাড়ির মধ্যে পা ঝুলিয়ে ঢ্যাঙা ছোকরাটা বসে' ব'স আখ চিবোতে চিবোতে হঠাৎ ক'রে দেখলো, কেমন নির্জীব পুটুলির মতো কতবেল গাছের ছায়ায় বসে আছে লোকটা
রেল লাইনের ধারে খাদের ওপর নুড়ি কাঁকরময় পথটা জুড়ে বেশ খানিক ছায়া পড়ে। গাছটার ডানে-বাঁয়ে আশশ্যাওড়া, বনতুলসী, চিচ্চিড়ে আর আকন্দের ছোট ছোট ঝোপ-রাবণ লতায় জড়ানো একটা বেঁটে কুল গাছ নুয়ে আছে-সেই গাছের ভেতর কখনও দুর্গা টুনটুনি ন'ড়ে ওঠে, কতবেল গাছের গোড়ায় কি আকন্দের ঝোপের ভেতর পোকা-মাকড় খুঁটে খায় একটি কি দু'টি শালিক। হয়তো একটা ফিঙে হঠাৎ করে উড়ে গিয়ে টেলিগ্রাফের তারে ব'সে দোল খায়! মাঠের দিক থেকে হয়তো একটা ফড়িং-এর ঝাঁক দু'একবার পাক খেয়ে একদিকে চলে যায়, তাদের মধ্যে থেকেই ফুর্তিবাজ কেউ হয়তো খাদের পানি ছুঁই ছুঁই কলমীর ডগার চান শুরু করে দেয়-আর জায়গাটা গা এলিয়ে দেওয়া আলস্য নিয়ে যেনো হাই তুলতে তুলতে এইসব দেখে প'ড়ে প'ড়ে ।
ট্রেন এসে জায়গাটায় কাঁপন জাগে। শালিকটা উড়ে যায়, দুর্গা টুনটুনিটাকে খুঁজে পাওয়া যায় না কোথাও, ফড়িং-এর ঝাঁক মাঠের আরও ভেতরে চলে যায়! ফিঙেটা টেলিগ্রাফের তারে বসে লেজ দোলায়।
ট্রেন পেরোতে থাকলে ধূলোর খানিক ঘূর্ণি ওঠে, লাইনের ধারে খোয়ার ওপর প'ড়ে থাকা শালপাতার মোছড়ানো ঠোঙা কিংবা ময়লা কাগজের টুকরো খানিক উড়ে গিয়ে আবার মুখ থুবড়ে পড়ে, কতবেল গাছটা, কুল গাছটা, আকন্দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
বনতুলসীর ঝোপগুলো আর একটু ধূসর হয়। এইসব মাঝমধ্যের হঠাৎ উৎপাত ছাড়া জায়গাটা নির্জনই।

ব্যস্ততা ওধারে, ষ্টেশনে। তা সেই ষ্টেশনও এখন ফাঁকা।প্লাট ফরমের ওপর দু'একজন ছাড়া-ছাড়া লোক নজরে আসে এখান থেকে)- কেননা কিছুক্ষণ আগে রাজধানী এক্সপ্রেস বেরিয়ে গেছে। তারও আগে বারুইপাড়া লোক্যাল। এদিক কিংবা ওদিক থেকে আপতত: কোন ট্রেন নেই। সেই একটা বিশে ডাউন থেকে আসবে ছানার ট্রেন। এর মধ্যে একটা কি দুটো গুড্স ট্রেন পাস করালেও করাতে পারে। হাঁ, কাল্কা মেল আছে অবশ্য। প্যাসেঞ্জারস ট্রেন একটিও নয়।গাছতলায় বসলে ষ্টেশনটাকে মনে হয়, লাল-হলুদ পেনসিলে আঁকা ছোট্ট একখানা ছবির মতন। এদিকে ডাইভার্সান লাইনকে দেখা যায় জং ধরা বাঁকা তলোয়ার যেনো। পড়ে থাকা মালগাড়ির দু'একটা বগি। একটা বেলগাছ, খেজুর গাছ দুটো, ছোটছোট কিছু আগাছা, তার ওপারে মাঠ, বাঁশ ঝাড়, কলা বাগানের বাঁখারির বেড়ার পাশ দিয়ে রাস্তা চলে গেছে গ্রামের ভেতরে। দু'একটা নারকেল গাছ, তারপর অনবরত নীলচে ধূসর গাছপালার জড়াজড়ির ভেতর গ্রামের আবছা কিছু টুকরো ছবি-এইসব চোখেপড়বে। কিন্তু লোকটা এ সবের কিছু দেখছে বলে মনে হয় না।পাগল নাকি!

ছেলেটা আখ চিবোতে চিবোতে মনে মনে ভাবলো, 'আজব লোক বটে!'

ভাবলো, কিন্তু নজর ঘোরালো ইদিক পানে, নোনাপোতার গেটের দিকে। বেশ বোঝা যাচ্ছে, পা ঝুলিয়ে ব'সে ব'সে আখ চিবোতে থাকলেও আসলে সে মনে মনে অস্থির, অস্থির হ'য়ে কারোর জন্যে অপেক্ষা করছে।

দেখলো, বাজারের ব্যাগ হাতে ক'জন লোক আসছে। একজন শাদা হাফ শার্ট গায়ে, চেক চেক লুঙ্গি পরা, ছাতা মাথায়, দোহারা গড়নের, ব্যাগের ভেতর থেকে যত্নে ভাঁজ ক'রে রাখা খবরের কাগজ উঁকি দেয়। শরীরের মজবুত গড়নের জন্যে মধ্য-বয়স্ক মনে হলেও আসলে লোকটা বুড়োই। গেঞ্জি গায়ে, লুঙ্গিটা কোমরের দু'দিকে গোঁজা, মাথায় গামছার আচ্ছাদন দেওয়া একজন তার পাশে পাশে হেঁটে আসছে। তাদের পেছনে পেছনে আর দু'জন-একজনের হাতে গামছার একটা পুটুলি ঝোলানো, অন্যজনের এক হাতে ব্যাগ আর এক হাতে মাঝখান থেকে কাটা লাউয়ের একটা চির।

কথা বলছে লোকগুলো। শাদা শার্ট কথা বলছে আর সবাই গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনতে শুনতে পথ হেঁটে আসছে। ঢ্যাঙা ছেলেটা এতো দূর থেকে শুনতে পেলো না, কতবেল তলার লোকটা চেয়েও দেখলো না, দেখলেও তাদের কথা তার পক্ষে শুনতে পাওয়া সম্ভব নয়।

লোক চারজনের মধ্যে এমনি সব কথা চলছিলো: 'বুইলে গো লস্করের পো, শান্তির আর আসবেনে। বুইলে না।'

-'হুঁ।'

-'হুঁ বাপু, শান্তি আর ফিরে আসবেনে।'

এই কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে তারা রেল লাইনের ওপরে উঠেএলে শাদা শার্ট কথা থামিয়ে দু'দিক দেখে নিয়ে খুব যত্নের সঙ্গে লাইন পেরোয়।

কী প্রকাণ্ড রোদ পড়ে আছে সারা মাঠ বিছিয়ে। লোকগুলো-কোনদিন আর শান্তি ফিরে আসবে না-এই বিমর্ষ-ভাবনা চোখমুখ এবং মাথার ভেতরে নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ফসলের মাঠে নেমে যায়।
ঢ্যাঙা ছেলেটা এবার গলা উচিয়ে বারবার দেখতে থাকে কলাবাগানের পাশ দিয়ে চলে যাওয়া রাস্তাটার বাঁকের দিকে। একজন মাথার তালুতে তেল ঘষতে ঘষতে খালি গায়ে গামছা কাঁধে বাগানের ভেতর ঢুকে গেলো।
'হারামজাদী শালী!' –দাঁত ঘষে গাল দেয়।
কয়লার চাঙটার দিকে চেয়ে দেখে, তা চাঙটা বেশ বড়োই দিয়েছে। ভেঙে দু'টুকরো করবো নাকি? মনের ভেতর একবার পাক খেয়ে গেলো ভাবনাটা। না, থাক।
মল্লিকদের বাগান থেকে বেছে বেছে পুরুষ্ট এক ছড়া কাঁচকলা পেড়ে এনে দিয়েছিলো। তা শালার ফায়ারম্যানের বোধ হয় পেট খারাপ, কাঁচকলার ঝোল খাবে, খুশি হয়ে বড়ো চাঙটাই ফেলেছিলো। কাঁচকলার ঝোলের কথা মনে হওয়ায় থালা ভর্তি শাধা শাধা ফুলকো ফুলকো গরম ভাত, আর ঝালে পোড়া তরকারীর বাটি চোখের সামনে ভেসে উঠলো। সেই ভাত আর তরকারীর যেনো গন্ধ নিতে চাইলো চোখ বু'ঝে। গন্ধ পেলো না, ক্ষিদে মোচড় দিয়ে উঠলো।
বেলা কতো হলো কে জানে। সূর্য যেন মই বেয়ে উঠে আসছে। তাকানো যায় না। ঝকমকে আকাশের সেই চমকানো আলো চারপাশের সটান পড়ে থাকা পৃথিবীর ওপর কেমন স্থির, শান্ত, উদাসীন। চেয়ে থাকতে থাকতে চোখ বুঁজে আসতে চায়।
কয়লার চাঙটার পাশে মোটা করে গামছা রেখে শুয়ে পড়ে টান টান হ'য়ে। কাত হ'য়ে শুয়ে দেখতে দেখতে মনে হয় সে অনেক ওপরে, আকাশ থেকে যেনো পৃথিবীকে দেখছে, গাছপালা, ঘাস–মাটি নিয়ে তার চেনাপৃথিবীটা ধীরে ধীরে ভারী অদ্ভুতভাবে প্রতিভাত হচ্ছে এখন। মনে হচ্ছে, সব কিছু যেনো রোদের ভেতর গলে গলে পড়ছে, গলে গলে পড়ছে....
ষ্টেশনে লোক জমতে শুরু করেছে। রেল সড়কের ওপর দিয়ে কাঁধে বাঁক নিয়ে ছানা–অলারা দুলে দুলে আসছে। তার মানে ছানার ট্রেন আসবার সময় হ'য়ে গেলো। উরেব্বাস, কখন থেকে শালার একটানা রয়েছি এখানে; পেলে হয় শালীকে, কয়লার চাঙ ভ'রে দোবো।
–খবর জানেন, লোকজন দু'টো ভাতের আশায় রুগী হবার জন্যে হাসপাতালে ভিড় করছে।
–হ্যাঁ, আজকের কাগজে আছে, মানুষ ঘাস সেদ্ধ খাচ্ছে। কি করে যে বাঁচবে মানুষ?
–আর বাঁচা!
এবম্বিধ কথপোকথন চালাতে চালাতে ছানা–অলাদের পাশাপাশি কিছু খবরের কাগজ পড়া ভদ্রলোক–প্যাসেঞ্জার হেঁটে গেলে সে নেমে পড়ে।
চকিতে: রশি কলে আজ গেলাম না, রোজটা মার গেলো–এই অপরাধবোধ চিনচিন করে ওঠে এবং সংসার, সমস্যা ইত্যাদি ধরনের কিছু ভাবনা মনের ভেতর বার কয়েক ঝিকিয়ে উঠলে সে কয়লার চাঙটা মাথায় নিয়ে হাঁটতে শুরু করে। কিছু দূর গিয়ে দেখতে পায়, বেগুনি রঙের আধ ময়লা ডুরে শাড়িপরা বছর চৌদ্দ বয়সের লম্বা ফর্সা মেয়েটা কাঁকালে ঝুড়ি নিয়ে অন্যান্য প্রায় অর্ধ–উলঙ্গ ক'জন ছেলেমেয়ের পেছনে পেছনে রেল সড়কের ওপর দিয়ে এদিকে আসছে।
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
তার চোখ জ্বলতে থাকে, হারামজাদী এতোক্ষণ লাগে। আবার দাঁত ঘষে। মেয়েটা তার দিকে চেয়ে মাথা নীচু করে। ছেলেমেয়েগুলো পাশ কাটিয়ে গেলে ডুরে শাড়ি পরা মেয়েটাকে ইশরা করে বোরোজের দিক যেতে। তারপর আবার তেমনি হাঁটতে থাকে। পেটের ভেতর সেই ক্ষিদেটাকে এখন আর অনুভব করছে না। রক্তের ভেতর ঝাঁ ঝাঁ করা একটা অনুভূতি কেবল পাক খাচ্ছে!

আস্তে আস্তে বোরোজের পাশে জগডুমুর আর কলাগাছের নীচের ছায়াময় নির্জন জায়গাটায় এসে মাথার ওপর থেকে কয়লার চাঙটা নামিয়ে সে ব'সে ব'সে গামছার বাতাস খেতে খেতে অপেক্ষা করে। খানিকক্ষণ পর ডুরে-শাড়ি পরা মেয়েটা এসে দাঁড়ালে তার হাত ধ'রে এক ঝটকায় কাছে টেনে একেবারে কোলের ওপর শুইয়ে ফেলে। ঝুড়িটা ছিটকে পড়ে একপাশে, সেই সঙ্গে তার মধ্যে রাখা কিছু শুকনো গোবর এবং ততোদিক শুকনো কিছু ভাঙা ডালপালা।

চাপা, স্বনিঃশ্বাস স্বরে বলে, 'এতো দেরী হলো কেনো?'

মেয়েটার তেলহীন রুক্ষ চুল, শুকনো মুখ লাল, নাকের ডগায় বিনবিনে ঘাম, বড়ো বড়ো চোখে থমকানো আতঙ্ক, শুধু থর থর ক'রে ঠোঁট দুটো কেঁপে ওঠে, সেই সঙ্গে শরীরও-ঢ্যাঙা ছেলেটা সেদিকে চেয়ে দু'হাতে সজোরে সাপটে ধ'রে সেই থর থর ক'রে ওঠা ঠোঁটের ওপর নিজের বিড়ি খাওয়া কালো ঠোঁট ডুবিয়ে দেয়।

একটা হাত খুলে নিয়ে মেয়েটার ব্লাউজহীন বুকের ভেতর চালিয়ে দিলে মেয়েটা নড়ে ওঠে। অতঃপর সেই হাত সাপের মতো সারা শরীরের চরে বেড়ায়। আস্তে আস্তে পায়ের দিক থেকে কাপড়ের নীচে দিয়ে ক্রমে ওপরের দিকে উঠতে থাকলে মেয়েটা শক্ত হ'য়ে ওঠে। ঢ্যাঙা ছেলেটা এবার শুয়ে পড়ে তার পাশে। কাছে টেনে নেয়। তারপর ওপরে উঠে পড়ে। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চায় মেয়েটার। এক সময় মনে হয়, ঝমঝম করে বৃষ্টি হচ্ছে, আর সে সেই বৃষ্টির মধ্যে শুয়ে শুয়ে ভিজে যেতে যেতে প্রবল শব্দে মাটিতে কম্পন অনুভব ক'রলে চমক উঠে শুনতে পায় ঝড়ের বেগে একটা ট্রেন বেরিয়ে যাচ্ছে।

লোক জড়ো হ'তে হ'তে ছোটখাটো জনতা হ'য়ে যায়। হুমড়ি খেয়ে দেখতে চায় সবাই। ষ্টেশনের কাছের কর্মরত কুলিগুলো গাঁইতি বেলচা কাঁধে আবার তাদের কাজে ফিরে যায়। কিন্তু মানুষগুলো যেনো নড়বে না। কালচে-ধূসর খোয়ার ওপর লাল রঙ ভারী মানিয়েছে। সূর্যের আলো এসে পড়েছে বুকের হাঁ করে থাকা পাঁজরের কাঠামোর ভেতরকার কলজে ইত্যাদির ওপর। সবচেয়ে দারুন দেখাচ্ছে মুণ্ডুহীন গলাটা। থকথকে চর্বির সঙ্গে লালের ছোপ, তার ওপর সূর্যের কটকটে আলো-মানুষগুলোকে একেবারে অভিভূত ক'রে দিয়েছে।

মাথাটার কিছু আর নেই বলতে গেলে, হাত কয়েক দূরে টিনের কৌটোর মতো ভেঙে দুমড়ে একশা হয়ে লাইনের সঙ্গে মগজ শুদ্ধু চেপ্টে গেছে। সবচেয়ে আশ্চর্য হ'লো এই যে, মাথা এবং মুখ-মণ্ডলের এতোসব পরিবর্তন হয়ে গেলেও একটি চোখ অক্ষত হ'য়ে রেল লাইনের গায়ে থ্যাতলানো চামড়ার সঙ্গে ঝুলে রয়েছে। যেনো লোকগুলো কাণ্ড দেখছে অবাক হয়ে! সেদিকে চেয়ে ছোকরা মতো একজন জিজ্ঞেস করে-কাউকে উদ্দেশ্য ক'রে নয়-জনতার আদালতে অভিযোগ পেশ করার মতো ক'রে বলে, 'কিন্তু লোকটার এভাবে মরার কারণটা কি।'

প্রশ্ন ক'রে সে আর সেই আশ্চর্য বিস্ফারিত চোখটির দিকে দ্বিতীয়বার তাকায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
জনতার ভেতর থেকেই প্রৌঢ় একজন, কপাল ও মুখের বলিরেখায় কুঞ্চন তুলে উত্তর দেয়, 'মানুষের মরার জন্যে কি কারণের অভাব? বেঁচে যে আছি এইতো ঢের!'

ঢ্যাঙা ছেলেটা এসবের কিছু দেখলো না বা শুনলো না–স্নানাহার শেষে এখন সে সেই আশ্চার্য দৃশ্য দেছে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েঃ গাছপালা, ঘাস–মাটি নিয়ে তার চেনা পৃথিবীটা রোদের ভেতর গলে গলে পড়ছে।

বিবমিষা

ছেলে বেলায় ভীষণ শখ ছিলো তার দেশ ঘোরার। কোথাও বেড়াতে যাবার কথা থাকলে আগের দিন রাতে ঘুমই আসতো না। যাবার দিন ভালো ক'রে খেতে পর্যন্ত পারতো না। মনের ভেতর কী যে উত্তেজনা হতো।

এখন বিরক্তই লাগে। রোদ নেই, বৃষ্টি নেই মানুষের কাছে গিয়ে ধর্ণা দেওয়া, খোশামোদ করা–নিজেকে ইনস্যুরেন্সের দালাল মনে হয় তার। মাঝে মাঝে মনে হয়, ধূর, এমন চাকরী মানুষে করে!

বি, এস, সি পাশ করে পাক্কা দু'বছর বসেছিলো সে। চাকরী ছাড়ার কথা ভাবলেই সেই সময়টার কথা মনে হয়আর তখন লম্বা করে নিঃশ্বাস নিলে বুকটা ভ'রে ওঠে।

কিন্তু সব সময় কি তা মনে থাকে। কখনও কখনও অতিষ্ঠ লাগে বৈকি, যেমন ফরিদাবাদের গোটা চারেক দোকান কভার করে ফিরতে ফিরতে আজ বেলা দুটো হ'য়ে গেলো।

আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে এক লাখ টাকার সেল টার্গেট ফিল–আপ করতে হবে তাকে, অথচ দোকানগুলোতে যাও–'আপনারা ওষুধের দাম বাড়াইছেন, বিক্রি বাটা নাই, কি নিমু'–এই ধরনের কথা। শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়েছে মনে মনে। কিন্তু তবু তাকে হাসি বজায় রাখতে হয়েছে। বানানো সমবেদনায় মুখ মলিন করতে হয়েছে, নানারকম ভজং–ভুজং দিতে হয়েছে। তাতেও যখন তেমন সুবিধে না হয়, তখন দু'বছরের বেকার জীবন কিংবা সাংসারিক চাপ ইত্যাদি ধরনের ব্যাপারগুলো ভুলে গিয়ে ব'লে ফেলে, 'ধুৎ তোর চাবুরীর নিকুচি করি।'

তা মেজাজটা রকিবের খিঁচড়ে আছে। তারপর এখন দেখো, এই দুপুর রোদে পোলের মুখে ট্রাফিক জ্যাম। পুরোনো ব্রীজ ভাঙা হচ্ছে, তার পাশে টেমপরারী কাঠের ব্রজী। এ মাথায় একজন ও মাথায় একজন ট্রাফিক পুলিশ। হুইসিল বাজিয়ে ক্লিয়ার দিলে তবে যাবার অনুমতি মিলবে। ততক্ষণ ব'সে ব'সে মাক্ষি মারো! অতএব, সে রিক্সায় ব'সে থাকে।

দুপুরের রোদ, ধুলোময় গরম হাওয়া, কপাল, মুখ, গলা এবং দুই হাতে ময়লা–চটচটে ঘাম, সারা শরীরের গা গুলিয়ে ওঠা ভ্যাপসা দুর্গন্ধময় ভাপ, চোখের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ভেতর জ্বালা, মাথার ভেতর মৃদু ঝিমঝিমে ব্যথা এবং মন-মেজাজ খারাপ করে বসেও সে মনে মনে ছক কাটে, আগামীকাল সকালে নরসিংদী গিয়ে একটা ঢুঁ দিয়ে আসতে হবে। সারাদিনে ওখানে যদি হাজার তিরিশেক টাকার অর্ডার বাগানো যায়, তাহলে তার পরদিনটা নবাবপুর, লক্ষ্মীবাজার, পাটুয়াটুলি, ইসলামপুর এবং আশপাশ ক'রে পরদিন সোজা টাঙ্গাইল। এইসব ভাবতে ভাবতে মনে মনে সেই ইতিমধ্যেই দিব্যি একটা সম্ভাবনাময় সুখের ভেতরে সেঁধিয়ে যায়। এবং রাস্তার দু'পাশের ফুটপাতের ওপর সারি সারি ছোট বড় ডেকচি-হাঁড়ি সাজানো ভাতের দোকানগুলো সামনে ইঁটের ওপর কিংবা উবু হ'য়ে ব'সে উদোম গায়ে কালো কালো মানুষগুলো প্রচুর ঝাল দেওয়া শোলমাছের ঝোল দিয়ে মোটা মোটা চালের ভাত খাচ্ছে, ঢাউস ঢাউস রুটি স্যাঁকা হচ্ছে তাওয়ার ওপর। সেই রুটি সের দরে বিক্রি হচ্ছে আর তুলোর দোকানের দোকনদারের 'এই হালার পো, কই পানি ফালাস'-চিৎকার পেছন ফেলে তার রিক্সা দোলাই খাল পেরোতে থাকে।

চোখের সামনে ভারী, স্ফীত, চ্যাটালো নিতম্ব দুলছে। সরোজের অফিস থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাঙলাদেশ বিমানের মোড়ের সামনে এসে দেখেছিলো মেয়েটিকে, পেছনে দেখে বয়েস আন্দাজ ক'রতে পারেনি, কালো ব্লাউজ আঁটা চওড়া পিঠ, লো-কাট ব্লাউজের ফাঁকে ঘাড় থেকে অনেকখানি নিচে পর্যন্ত পিঠের মসৃণ অর্ধবৃত্তাকার সোনালী চাঁদের মতো অংশ দুপুরের রোদে চিকচিক করে। আঁচলের ফাঁকে সুগোল হাতের লুকোচুরি এবং শাড়ীর পাড়ে ঘষা খাওয়া পায়ের গোছ।

যুগপৎ এইসব দেখতে দেখতে সে তার পেছনে পেছনে হাঁটতে থাকে। মেয়েটিকে নিয়ে কি করবে ভেবে পায় না রকিব। এমন ঠাসা শরীর তাকে ভারী অস্থির করে। বুঝতে পারে তার চোখ লাল হয়ে এসেছে, তার ওপর ঘোলাটে ভাব, কবিরাজ গলির নর্দমার ময়লা উঠে এসেছে দু'চোখে।

আর কে কে মেয়েটিকে লক্ষ্য করেছে সে দেখছে না, মানুষ-জন কিংবা গাড়ি কোনকিছুই তাকে অসুবিধে করে না, দীর্ঘদিনের শহরবাসের অভিজ্ঞতা এই সমস্তের ভেতর দিয়ে নিজের সাচ্ছন্দ্য এবং নিরাপত্তা তৈরী ক'রে নেওয়ার অসচেতন অভ্যাস তৈরী ক'রে দিয়েছে। বস্তুতঃ একটি মুহূর্তেও চোখ ছাড়া করতে চায়না সে। তার খুব ইচ্ছা হয়, মেয়েটিকে ডাকে, মাত্র কয়েক হাত ব্যবধানে তারা দুজন সামনে পেছনে হাঁটছে, আস্তে ক'রে বললেই হয়, 'এই যে শুনুন।'

মেয়েটি নিশয়ই ফিরে তাকাবে। কিন্তু তারপর, তারপর সে কি বলবে? এই ফাঁকে মুখটা দেখে নেওয়া যাবে। এমন যার পশ্চাদ্দেশ, বুকও তেমনি হবে নিশ্চয়ই। কিন্তু ফিরে তাকিয়ে যখন ভ্রুতে কুঞ্চন তুলবে, তখন সে কি বলবে?

ছটফট করে, গলা শুকিয়ে আসে। কানের পাশ দিয়ে ঘাম নামছে চুলের ভেতর থেকে, ভ্রুর ওপর, কপালের ওপর ঘাম জমেছে, পিঠ বগল ভিজে গেছে ঘামে। নিজের শরীরের নোনা গন্ধপায়, সে গন্ধ তার করোটির ভেতর গিয়ে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের মতো জমে।

ডি, আই, টি এক্সটেনশন চৌমাথায় এসে মেয়েটি দাঁড়ায়। রকিব এবার একপাশ থেকে তার মসৃন গাল এবং ডিমের মতো থুতনি দেখতে পায়, ছোট্ট সরু কিঞ্চিত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
চাপা নাক ও ঈষৎ মোটা ঠোঁটের একপাশ নজরে আসে।
রকিব হাঁটার গতি শ্লথ করে।
একটা খালি রিক্সা মেয়েটির সামনে এলে সে হাত তুলে তাকে দাঁড়াতে বলে। রিক্সা থামে। সে রিক্সায় উঠে কি যেনো বলে–রিক্সা ডি, আই,টির দিকে যেতে শুরু করে।
রকিব মুহূর্ত–কয়েক সেদিকে চেয়ে থাকে। পেছনের ঘুলগুলি দিয়ে মেয়েটির খোঁপা, ঘাড়, পিঠ দেখে, অতঃপর সে রাস্তা পেরিয়ে ষ্টেডিয়ামের দিকে এগোয়। এতোক্ষণ পর অনুভব করে তার প্রবল প্রস্রাব পেয়েছে। আশপাশের দিকে তাকায়, মনঃপুত জায়গা পায় না। হাঁটতে থাকে। ষ্টেডিয়ামের বারান্দায় রেষ্টুরেন্টের ভেতর থেকে উনুনের গরম তাপ, মানুষের শরীরের তাপ, আনারস, পেয়ারা, চিনাবাদাম, আগড়ম–বাগড়ম জিনিষপত্রের ঢালা সাজানো দোকান, ভিখিরি–এইসব ভিড় উজিয়ে এগোত থাকে। আইডিয়াজের সামনে এসে সটান ভেতরের দিকে চ'লে যায়। ভেজা সিঁড়ি দিয়ে অন্ধকার প্রায়, খোলা, ভিজে, স্যাঁতসেঁতে, দুর্গন্ধময় চত্বরটিতে উঠে প্যান্টের বোতাম খোলে। শিশ্ন কাঁপিয়ে প্রবল তোড়ে উষ্ণ জলধারা প্রবাহিত হ'তে থাকলে সারা শরীর জুড়ে আবেশ ছড়িয়ে পড়তে থাকে।
প্রস্রাবের গতি ধীরে ধীরে মন্দিভূত হ'তে হ'তে থেমে যায় এক সময়, এবার সে মেয়েটির নিতম্বে হাত রাখে, সেই স্ফীত, ভারী, চ্যাটালো মাংসপিণ্ডে সে হাত বুলোয়, চাপ দেয়, মুঠো ক'রে থামচে ধরে।
মেয়েটি নড়ে ওঠে। পেছন থেকে এবার সে প্রবলভাবে সাপটে ধরতে গেলে কাশির শব্দ শোনে এবং মেয়েটি মুহূর্তে ছিটকে বিরিয়ে যায় সামনের পাল্লাহীন দরজার মতো চৌকো ফাঁক দিয়ে।
রকিব দেখে,–সামনে, দেওয়ালে কালো কালো ময়লার ছোপ, তার সদ্য প্রস্রাবের আঁকাবাঁকা ভিজে জলরেখা। ছিপছিপে জলময় অন্ধকার গুহার মতো ষ্টেডিয়ামের নীচের তলায় কোথা থেকে অবিরাম, একঘেয়ে জল পড়ার শব্দ হচ্ছে। প্যান্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে পেছন ফিরে দেখে ওপাশে একজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করছে। চার পাশের তীব্র, ঝাঁঝালো গন্ধ তার মাথা ঝিমঝিম করে, জল–কাদার মাখামাখি নোংরা চত্বর থেকে নেমে এসে আইডিয়াজের বইপত্র দেখতে থাকে।
মাথার ভেতর ঝিমঝিম করা ভার–ভার ব্যথা ছড়িয়ে পড়তে থাকে ক্রমে, চোখ জ্বালা করে, শুকনো গলায় তেতো টকটক স্বাদ অস্বস্তি ভ'রে দেয়।
হাঁটতে হাঁটতে প্রভিন্সিয়ালের সামনে এসে দেখে প্রবল ভীড়, আরো খানিক সামনে এগিয়ে ইসলামিয়ায় ঢুকে একটা ফাঁকা টেবিল দেখে বসে।
সকালবেলা তার শরীরে কেমন অবসাদ লেপ্টে থাকে। অতএব, ঘুম ভাঙলেও প'ড়ে থাকে সে। প'ড়ে প'ড়ে কখনো কাত হয় কখনো চিৎ হয়, চোখ মেলে দরজা জানালার ফাঁক ফোকর দিয়ে আসা আলো, ঘরের দেওয়াল, ছাদের সিলিং, ব্রাকেটে ঝোলানো জামা–কাপড়, দেওয়াল আলমারিতে সাজানো কিংবা এলোমেলো বইপত্র। ঝোলানো ক্যালেণ্ডারে থাই–রমণীর হাসি, টেবিলের ওপর রাখা প্লাষ্টিকের জগ, গ্লাস, প্লেট, পেয়ালা, সরপোশ, বইপত্র, শূন্য চেয়ার ইত্যাদি দেখতে দেখতে আবার চোখ বন্ধ করে। বাইরে কাক ডাকে। মাঠওলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

হেঁকে যায়। বাড়ীর মানুষজনের ভিন্ন ভিন্ন গলার স্বর, তাদের কথাবার্তা, সংসারের জিনিসপত্র নাড়ার শব্দ, পাশের বাড়ীতে শিশুর কান্না কিংবা চাকরানীর সঙ্গে গৃহকর্ত্রীর গলাবাজি–এইসব শুনতে শুনতে এক সময় সে ওঠে। উঠে দরজা খোলে।

বাড়ীর লোকজনের সঙ্গে সম্পর্ক তার বড়ো ক্ষীণ। লোকজন মানে মা, বাবা, ছোট একভাই,একবোন।

সকালবেলা সে খেয়ে বেরিয়ে যায়। দুপুরে কোনদিন ফেরে কোনদিন ফেরে না। রাতের বেলা নিয়মিত টেবিলের ওপর তার ভাত ঢাকা থাকে। তাছাড়া বাড়ীতে থাকলেও টুকরো টুকরো দু'একটি নিতান্ত প্রয়োজনীয় ছাড়া কথাবার্তা তার সঙ্গে হয়ই না এক রকম। তার একা ঘরে সে একা থাকে। মা মাঝে মাঝে সংসারের এটা ওটা ব্যাপারে পরামর্শ চায়। রকীব বোঝে তার মতামত থাকা না থাকার কোন দরকার নেই, মানে সংসারে আর সবার মতামতের বিরুদ্ধে তার কোন বক্তব্য থাকবে না এ–কথা মা জানে। তবু বাড়ীর বড়ো ছেলে, তার একটা সম্মান বলেও তো কথা আছে।

কোন কোনো দিন সে নিজে থেকেই জিজ্ঞেস করে, 'আব্বার ওষুধ কি ফুরিয়ে গেছে?' কিংবা 'প্রেসারটা আর একবার চেক করা দরকার।'

রকীব দেখেছে এসব কথায় মা কেমন খুশী হয়ে ওঠে। মুখে এক ধরণের তাৎক্ষণিক দুশ্চিন্তা তৈরী করে নিয়ে গড়গড় করে সংসারের নানান কথা বলতে থাকে।

খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে রকিব বলে: 'অ।'

মা চুপ ক'রে যায়।

মতিঝিলে দেখা মেয়েটিকে নিয়ে গোসলখানায় ঢোকে সে।

গোসলখানার চারপাশে দরমার বেড়া। মাথার ওপর ফাঁকা পাঁচিলধারের পেয়ারা গাছের বড়োসড়ো একটা ডাল নুয়ে পড়েছে। সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে কালচে–সবুজ ছোট বড়ো অজস্র পেয়ারা–এই ডালপালা, পাতা, পেয়ারা সবকিছু মিলে বেশ খানিকটা অংশে ছাদ বা চালের কাজ করে। ফলে এই নৈসর্গিক ছাদের ফাঁকে ফাঁকে একটি বিশাল আকাশ কয়েক শ' ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আকাশ হয়ে থাকে এখানে।

রকিব সেই শত শত আকাশের নীচে মেয়েটিকে মাথা থেকে নামিয়ে দেয়। গোসলখানার দরজা বন্ধ ক'রে তার দিকে ফিরে তাকালে মেয়েটি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। রকিব পায় পায় তার দিকে এগায়, মেয়েটি একবার চোখ তুলে আবার মুখ নীচু করে। মুখটা ঠিক মতো স্পষ্ট হয় না।

না, অতো ধীরেসুস্থে নয়। অতএব, মেয়েটিকে ব্লাউজ খুলতে হয়। শাড়ি খুলতে হয়। ফলে নিরাবরণ মেয়েটির উপচে পড়া বুক, গভীর নাভি, বিশাল উরু, নিটোল বাহু, মেদহীন মসৃন পেট, সরু কোমর, কোমরের দুপাশের ঢেউ খেলানো গভীর খাঁজ এক সঙ্গে জলমল ক'রে ওঠে।

রকিব দু'বাহু বাড়িয়ে তাকে প্রবলভাবে কাছে টানতে গেলে মেয়েটি মুখ তোলে। আর তখন হঠাৎ সব এলোমেলো হয়ে যায়। মেয়েটি থাকে না। কখনও, রমনার একসার বিশাল রেনট্রী, কখনও মতিঝিলের দুপুর, [illegible] আই,টি'র চূড়া, সরোজের অফিস, টিন হাতে রুনু রান্না ঘরে ঢুকছে [illegible] নদীর ধারে শিকড়

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
বেরিয়ে থাকা বিশাল অশ্বত্থ গাছের নীচে বারো বছরের রকিব একা একা ব'সে আছে। যেনো স্টেশনে দাঁড়ানো রেলগাড়িতে খালি কামরা পেয়ে হুড়মুড় ক'রে যাত্রীরা উঠে এলোঃ 'এখানে, এ্যাই দুলু, খালি আছে এখানে।' কে যেনো চেঁচিয়ে ওঠে আর বারো বছরের রকিব বুড়ো অশ্বত্থের নীচে থেকে উঠে দৌড়োতে থাকে। 'ওহ্ হো', বলে সে দ্রুত হাতে গায়ে পানি ঢালতে থাকে এবং মাথার ভেতর বাস ছুটতে থাকে হু-হু করে।

পাঁচদোনায় এসে বাস বিকল হ'লো।

ড্যামরা থেকে ফেরী পেরিয়ে এপারে তারাবো'য় এসে দেখেছে এক্সপ্রেস বাস একটাও নেই; একবার ভেবেছে স্কুটারে যাই শেয়ারে, তারপর মনে হয়েছে কি দরকার, ঘন্টা দেড়েক কি দু'য়েকের মধ্যেই পৌঁছে যাবো, তারপর তো সারাটা দিনই পড়ে আছে, অতএব লোক্যাল বাসে উঠে জানালার ধারে জুৎসই একটা জায়গা বেছে বসেছিলো সে।

তারাবো থেকে হেলপার ছোকরাটি ঠেসেঠুসে লোক ভরেছিলো; তারপর বড়পা, ভুলতা, গোলাকান্দা, পাঁচরুখি কিংবা পুরিন্দা থেকে দু'একজন ক'রে উঠেছে, নেমেছে সে তুলনায় নগন্য; ফলে বাসের ভেতর এক শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা।

জানালার ধারে বসাতে সেই ঠেলা ধাক্কা থেকে সে নিস্কৃতি পেয়েছে, তারপর চলন্ত বাসের হাওয়া এবং উন্মুক্ত প্রকৃতি- সে-ও উপরি লাভ।

রোদ অবশ্য কিছু রাস্তা জ্বালাতন করেছে, এখন সেই রোদ সরে গেছে জানালা থেকে।

মাধবদিতে এসে বাস প্রায় খালি হয়ে গেলো। বাবুর হাটের কাপড়ের পাইকাররা কলরব ক'রতে ক'রতে নেমে গেলো অশ্বত্থ তলার নীচের কাঁচা রাস্তা দিয়ে।

আর এখন মাঝ রাস্তায় এই বিপত্তি। বিরক্তির এক শেষ। তারাবো থেকে স্কুটারে না আসার জন্যে নিজেকেই গালাগালি করতে ইচ্ছা করছে তার।

বাসের ভেতর চোখ বুলোয়: দাঁড়িয়ে থাকা, বসে থাকা, বেঢপ, গ্রাম্য, আধাগ্রাম্য উজবুক প্রায় মানুষগুলোকে অকারণে তার থাপ্পড় লাগাতে ইচ্ছা করে।

তারপাশে বসা কেরানী টাইপ লোকটা খবরের কাগজের খেলার পাতায় চোখ রেখে সেই কখন থেকে কি যে পড়ছে, বাঞ্চোতটাই জানে।

ড্রাইভার কুত্তার বাচ্চাটাকে দেখো, নিজের সিটে গদিয়ান হ'য়ে হেলপার ছোকরাটিকে ধমকের সঙ্গে এন্তার গালাগালি ক'রে যাচ্ছে। মাগীখোর ফিল্ড ম্যানেজার হারামজাদার খালি আলগা ডাঁটঃ 'ইয়াংম্যান আপনারা, কাজ করবেন রাশ্‌লি।' -রাশ্‌লি কাজ করবেন। এসে দেখনা চুৎমারানী কেমন লাগে।

গোটা তিনেক কাটি খরচ ক'রে সে সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে জানালার বাইরে তাকায়: রাস্তার ধারে ছায়ায় দাঁড়িয়ে যাত্রীদের কেউ কেউ সিগারেট টানছে, কেউ কথাবার্তা বলছে অন্যের সঙ্গে, বনেট তোলা বাসের কলকব্জা দেখেছে কেউ কেউ। অদূরে, কোমরে ঘুন্সী বাঁধা একটা কালো ন্যাংটো ছেলে মুখের ভেতর আঙুল পুরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাস এবং লোকজন দেখছে। দূরে কাদের বন্ধ সদর দরজার সামনে লাউ মাচার নীচে একটা মুরগী কি যেনো খুঁটে খাচ্ছে, ঘেসো জমির আল ধ'রে লুঙ্গিপরা, কাঁধে গামছা ফেলা খালি ঘায়ে একজন লোক হেঁটে যাচ্ছে, বাঁ হাতে গোমটা টেনে একজন মহিলা দরজা ঠেলে দ্রুত ঢুকে গেলো বাড়ির ভেতরে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
এইসব দেখতে দেখতে তার মন যখন শান্ত হ'য়ে আসছে তখন হাসির শব্দ শুনলো।

ক্রীম রঙ-এর প্যান্ট পরা এক যুবক রাস্তার ঢালুতে প্রস্রাব করতে বসেছে। ব্রিফকেস হাতে সানগ্লাস পরা সঙ্গী কি কথায় এমন অনাবশ্যক জোরে হাসছে- ভাবটা-আশপাশের লোকজনের প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ নেই তার, আর কী সব ভঙ্গি-রকিব বোঝে নিজের এইসব আচরণ সম্পর্কে সে ভীষণভাবে সচেতন- গাধাটা আসলে লোকজনকে তার স্মার্টনেস দেখাচ্ছে।

সমস্ত শরীর রি-রি করে। ইচ্ছা হয়, মারি পাছায় এক লাথি।

বাসটা গোঁ গোঁ ক'রে কেঁপে উঠে ষ্টার্ট নিয়েছে আবার। নীচে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজন হৈ হৈ করে বাসে উঠলে দু'পাশের ডিটেল নড়ে ওঠে। এবং মুহূর্তের মধ্যে বাসটি কাস্তের মতো বাঁকানো মোড় অতিক্রম ক'রে যায়। পেছন ফিরে ব্রিফকেস ওয়ালাদের দেখতে গিয়ে ব্যর্থ হয় রকিব। এবার সে ঘড়ি দেখেঃ ইস, এখানেই সাড়ে দশটা বাজিয়ে দিলো!

ডাক্তার দত্ত ন্যাশনাল পাশ করা পুরোনো লোক। চুল উঠে যাওয়া চওড়া কপাল, মাথার প্রায় অর্ধেক পর্যন্ত চকচক করে, আর সব সময় ইল্‌শে গুঁড়ি বৃষ্টির মতো বিন্দু বিন্দু ঘাম থাকে সেখানে। চশমা পরা মোটাসোটা, তামাটে রঙের লোকটি কথা বলেন নীচু গলায়। চলাফেরা, হাত পার মুভমেন্ট সব কিছু তাঁর এমন ধীর এবং শান্ত যে, খানিকক্ষণ ভালো ক'রে লক্ষ্য করলে নিজেরই দম আটকে আসে।

রকিব তাকে ব্যাগ খুলে কিছু মেডিসিন লিটারেচার দিলে তিনি উল্টেপাল্টে দেখতে থাকেন।

এবার সে 'Antacid আপনারা এর আগেও নিয়েছেন, কোনটায় কনষ্টিপেশন, কোনটায় ল্যাগজেশন হয়, আমাদের কম্পানী নতুন একটা অ্যানটাসিড বার করেছে- ওয়েল বাউয়েলস ফর্মুলা-ইউজ ক'রে দেখুন এতে কনষ্টিপেশনও হবে না ল্যাগজেশনও হবে না, রাদার ইজি বাউয়েলস মুভমেন্ট'-ব'লে সে লিটারেচার পাঠরত চশমাপরা মুখের দিকে তাকালে আবার তার দৃষ্টি সেই চকচকে টাকের ওপর ঘামের বাহার দেখে।

এ্যান্টাসিডটা যেভাবেই হোক গছাতে হবে। এই এক ঝামেলা, নোতুন কোন ওষুধ বেরোলে অফিস থেকে তাদের ওপর বিশেষভাবে ইনষ্টাকশন থাকে, ওষুধটাকে বাজারে চালু করাতে হবে, আবার নোতুন ওষুধের ব্যাপারে পার্টির থাকে ঘোরতর দ্বিধা, মাঝখান থেকে সমস্যায় পড়ে রিপ্রেজেন্টেটিভরা।

ব্যাগের ভেতর থেকে দু'টি স্যাম্পল ফাইল বার ক'রে টেবিলের ওপর রাখলে তিনি লিটারেচার রেখে ওষুধের ফাইল দেখতে থাকেন।

দোকান এখন ফাঁকা। রকিব ঢোকার পর থেকে এ' পর্যন্ত একজন দুটো নোভালজিন, একজন একটা কফ সিরাপ নিয়ে গেছে, আর এক মহিলা কি একটা ইনজেকশন যেনো চাইলো, না পেয়ে ফিরে গেলে কাউন্টারে বসা সেলসম্যান ছোকরাটি এতক্ষণ একবার ডাক্তারের হাতের ওষুধের ফাইল, একবার রকিবকে, একবার রাস্তার দিকে, একবার ঘরের ভেতর আলমারিতে সাজানো ওষুধের ফাইল এবং স্যানিটারী টাওয়ালের প্যাকেট ইত্যাদি দেখতে থাকে।

রকিব ছেলেটির এই মুহূর্তেটিকে কাজে লাগায়-'আলমারি দেখছি একেবারে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ছবিগুলোকে থামিয়ে দেবে; কিন্তু ছবি চলতেই থাকে আগে পরে, ধারাবাহিকতাহীন খাপছাড়া; আর তার নীচে, খুব গভীরে কোথাও অস্থিরতা কাঁটার মতো খচখচ ক'রতে থাকলে–'ধ্যাত্‌তেরি' ব'লে রকিব উল্টোদিকে হাঁটতে শুরু করে; পেটের ভেতর একটু আগের হোটেলের ভাত, মাংস, লেবুর রস, পানি সব মিলেমিশে আরামে শুয়ে আছে।

আর বুক থেকে গলা বেয়ে জিভের মাঝামাঝি পর্যন্ত ভিজে নোনতা স্বাদ নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে রিক্সা খোঁজে।

ব্যাগের ভার কাঁধ এবং বাহুমূলে কিঞ্চিত ব্যথা আনে, হাতের তালুতে জ্বালা, এই সব নিয়ে যখন সে বিরক্ত হবে তখন পেছন থেকে যেনো তার মনের ভাব বুঝতে পেরেই ফাঁকা রিক্সা এগিয়ে আসে। রকিব রিক্সায় উঠে বসে। রিক্সা বাস ষ্ট্যাণ্ডের দিকে এগোতে থাকে। ফুট বোর্ডে ব্যাগ রেখে হুড তুলে দিলে মাথার ওপর জুন মাসের আকাশ ঢাকা পড়ে।

মা মাঝে মাঝেই বিয়ের কথা বলে। মুখে কোন পাত্তা না দিলেও ব্যাপারটাকে নাড়াচাড়া করে সে মনে মনে; কিন্তু স্ত্রী, সন্তান, সংসার ইত্যাকার বিষয়গুলো ভাবতে গেলেই কেনো যেনো তার বাবাকে মনে পড়ে: ভাঙাচোরা, ঘর্মাক্ত, চিন্তাক্লীষ্ট শৈশব কৈশোরের আব্বা, এবং এখন সারাদিন ঘরের ভেতর প'ড়ে প'ড়ে যে মানুষ থেকে থেকে ভাঙা ক্লান্ত গলায় হাঁকে, 'কৈ গো,কৈ গেলা'–তাকে দেখতে পায়।

জাফর বলে, 'আসলে বিয়ে করা উচিৎ। লোভ তো খুব খারাপ জিনিষ, গ্লানি আসে। লোভ হবে কেন?'

নারিন্দা ব্রীজের ওপর রিক্সা উঠেছে, চারপাশে সন্ধ্যার অন্ধকার আর অদূরে দোকান–পাটের ঝোলানো বাল্বের আলো!

কেমন নিবিড়, অন্তরঙ্গ, একটু পবিত্র পবিত্র আর অনেক দূর থেকে যেনো–কথাগুলো বলছে, এমন লাগছিলো তার!

রকিব পাল্টা প্রশ্ন না করলেও প্রশ্ন তৈরী হয়ে যায় মনে মনে, বিয়ে করলেই কি লোভ মরে যায়?

মিতালী সিনেমার সামনে এসে রিক্সা থামে তিন মাথার মোড়–জায়গাটা বেশ চওড়া, এলোমেলো ভাবে বাস দাঁড়িয়ে আছে; রিক্সা, স্কুটার, মানুষ ইত্যাকার ভিড়ে জমজমাট লাগে।

মিতালী হলের দেওয়ালে প্ল্যাকার্ড: 'আবার তোরা মানুষ হ'। ছবিটা ভালোই চলেছে মনে হয়, বেশ ভিড়, মেয়ে পুরুষ চোখে মুখে সুখ নিয়ে ঢুকে যাচ্ছে।

মিষ্টির দোকানের সামনে ক'জন মাস্তান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে টানতে মেয়ে দেখছে।

বাতাসে তার চুল এলোমেলো ক'রে দেয়, কপালে শির শির শির শির গরম–ঠাণ্ডা হাওয়ার সুড়সুড়ি। কখনও: মা তাকে লুকোলেও সে বোঝে নান্টু আজকাল মাঝে মাঝেই রাতে বাড়ী ফেরে না। কখনও: এক দুপুরে ঝুনুকে দেখেছিলো, কলেজে পালিয়ে উজ্জল একজন যুবকের সঙ্গে নাজ–এ ঢুকছে। –এইসব মনে আসতে থাকলে বাইরে অপসৃয়মান দৃশ্যাবলীতে মনোনিবেশ করে। পানা পুকুর, ডাঙাজমি, খোঁটায় বাঁধা মুখ নীচু ক'রে ঘাস খেতে থাকা গরু, কলাপেয়ারা গাছের আড়ালে বেড়ার ঘর, সন্তান কোলে মা, বেল গাছের নীচে বেঞ্চ–ফেলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
সস্তা চায়ের দোকানের সামনে জটলা, হু হু করা মাঠ, একটা তাল গাছ, দ্বীপের মতো দূরের গ্রাম, নীলচে ধূসর ভঙ্গিল দিগন্ত রেখা।
ঘুরে ফিরে এই সব একঘেয়ে দৃশ্য দেখতে দেখতে ক্লান্তি এলে স্কুটারের ভেতরে তার পাশে বসা লোক দু'টিকে লক্ষ্য করে। মাঝ বয়সী সহযাত্রী দু'জন নরসিংদীর আঞ্চলিক টানে বকর বকর করছে। এসব নিয়ে নমিতাকে খেপিয়েছে কতো দিন!
রোববার হলেই মোহিত ঢাকা থেকে নরসিংদী ছুটতো। তারপর বি, কম পড়বার সময় তো একটানা থাকবার সুযোগ এসে গিয়েছিলো। জায়গা- জমি সংক্রান্ত কি যেনো জটিলতা দেখা দিয়েছিলো ওদের। পৈতৃক বাড়ীতে ওর থাকার একান্ত প্রয়োজন। ফলে বি, কম সেকেণ্ড ইয়ারে উঠে নরসিংদী কলেজে এসে ভর্তি হয়েছিলো। বাজারে ওর কাকার তেলের কারবার। পৈর্তৃক বাড়ীতে থাকতো, খেতো পাশে কাকার বাড়ীতে।
বন্ধু বান্ধবরা জানতো, নরসিংদীতে থাকার ব্যাপারে পারিবারিক প্রয়োজনের চেয়ে মোহিতের ব্যক্তিগত প্রয়োজনটাই বেশী।ঐ সময় তারা ঢাকা থেকে দল বেঁধে নরসিংদীতে আসতো মোহিতের কাছে।
তারপর '৭১-এর গণ্ডগোলে নমিতারা কলকাতায় চ'লে গেলো, মোহিতরা গেলো আগরতলা। '৭২-এ মোহিতরা ফিরে এলো, আর নমিতা এখন মোহিতের ছ' বছরের প্রেম নিয়ে নৈহাটিতে স্বামীর ঘর করছে।
গোটা ব্যাপারটা হাস্যকর, ফালতু-সেন্টিমেন্ট মনে হ'লেও মনে মনে অবজ্ঞার হাসি হাসতে পারে না সে। কেননা তখন দেখতে পায়: বিরাট লেজার বুকের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে মোহিত হিসাব মেলাচ্ছে।
ছবিটা অতি সাধারণ, কিন্তু কোথা থেকে ভারী ভিজে একখণ্ড মেঘ এসে ঢুকে যাচ্ছে এখন রকিবের ভেতরে।
সাটের পাড়া, সাহেব প্রতাব, বাঘ হাটা, শিলমান্দি পেরিয়ে হাওয়া কেটে কেটে স্কুটার পাঁচদোনায় এসে প'ড়েছে। সকালবেলা এখানে বাস খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। ড্রাইভার যদি তখন বলতো: 'বাস আর যাইবো না, আপনারা সব নাইম্যা যান'-তাহলে মাঝ রাস্তায় কী যে ঝামেলায় পড়তো!
স্কুটারেই আসে সে বরাবর; অথচ তখন কোন পাগলামিতে পেয়েছিলো তাকে কে জানে।
বেলা প'ড়ে আসছে। ঘড়ি দেখতে দেখতে ভাবে, তারাবো'য় পৌঁছোতে পৌঁছোতে বেলা শেষ হয়ে যাবে। সিগারেট ধরায়, মুখ তুলে ধোঁয়া ছাড়তে গেলে দেখে, ট্রাক ছুটে আসছে। ফাঁকা রাস্তা আর সামনে বুনো শুয়োরের মতো ছুটে আসা ট্রাক, বুকের ভেতর শূন্য হয়ে আসে। মনে হয় এই বুঝি স্কুটার সমেত তাদের চিঁড়ে চ্যাপ্টা ক'রে দিয়ে যায়। রকিব প্রায় চোখ বুঁজে ফেলে ফেলে অবস্থা, ট্রাকটা বেরিয়ে গেলো।
লোক দু'টো এখন বৃষ্টি আর ফসলের গল্প করছে। সামনে, ড্রাইভারের দু'পাশে আরও দু' জন যুবক চুপচাপ ব'সে আছে সামনের দিকে চেয়ে।
স্কুটারের গোঁ গোঁ শব্দ, ঝাঁকুনি আর ক্রমাগত হাওয়ায় কিঞ্চিত তন্দ্রার মতো ভাব আসে। তন্দ্রা ঠিক নয়, ঝিমুনি। দুপুরে ঘুমোবার অভ্যাস তার নেই। সেই ছেলে বেলায় খাওয়া দাওয়া শেষে মা তাকে বাইরে রোদে না বেরিয়ে ঘুমোবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও

নির্দেশ দিতো, সে–ও শুতো ঠিকই চোখ বন্ধ ক'রে ঘুমোবার ভান করতো, তারপর এক সময় চোখ মেলে দেখতো, মা'র হাতের পাখা আর স্বাভাবিক ভাবে চলছে না, থেমে থেমে, কখনও বালিশের গায়ে ঠেকে ঠেকে এবং এক সময় শিথিল হাত শিথানের পাশে প'ড়ে গেলো; তখন সে উঠে পা টিপে টিপে আস্তে ক'রে বেরিয়ে যেতো।

শৈশবের কথা মনে হ'তেই তার বাপ চলে আসে–আজীবন ইউ ডি, ক্লার্ক। দু'টো ষ্ট্রোক কাটিয়ে উঠে এখন একেবারেই জড়িয়ে পড়েছে। ডান দিকের হাত এবং পা প্যারালাইজড। কথা জড়িয়ে যায়। একা একা প'ড়ে থাকে।

রকিব বোঝে তার সামনে গেলে, পাশে বসলে আব্বা খুশী হয়; কিন্তু পারতপক্ষে সে দেখাই করে না, খারাপ লাগে, দম আটকে আসে তার, আর কোনো যেনো রাগ ধরে।

এমনি ক'রে শৈশব–কৈশোর, কলেজ জীবন, বেকার জীবন, নমিতা মোহিতের প্রেম, এক লাখ টাকার সেল টার্গেট, নান্টু, ঝুনু, মা, সংসারে আর আব্বা এবং তার ফাঁকে ফাঁকে দু'পাশের অবিচ্ছিন্ন নিসর্গ এবং আকাশ–এইসব ভাবতে ভাবতে দেখতে দেখতে স্কুটার তারাবো পৌঁছে যায় এক সময়।

কিছুক্ষণ, আগে বেশ ভারী বৃষ্টি হয়ে গেছে এদিকে। কাদা পানি, আকাশ, সব মিলিয়ে তার পরিচয় রয়েছে চারপাশে।

আধ ঘন্টা কি পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর সন্ধ্যা নামবে। গাদাগাদি মানুষ, সাইকেল, হোণ্ডা, জিপ, প্রাইভেট কার নিয়ে ঘটঘট শব্দে ফেরী এগোতে থাকলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হঠাৎ তার চোখ উত্তর দিকে আকাশে আটকে যায়: প্রাচীন দুর্গ প্রাসাদে আগুন লেগেছে। যে যে দিক দিয়ে পারছে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে ঘরের ভেতর অন্ধ রাজা একা, সেই কোলাহল আর চীৎকার শুনে বেরোবার জন্যে দু'হাতে দেওয়াল হাঁতড়ে হাঁতড়ে দরজা খুঁজে বেড়াচ্ছে।

নদীর এপাড় থেকে ওপাড় পর্যন্ত প্রলম্বিত ভাঙা ভাঙা কালো মেঘশ্রেণী এবং তার পেছনে উজ্জ্বল লাল আভা দেখে অনেক দিন আগে দেখা কোন এক ইংরিজি ছবির সেই দৃশ্যের কথা মনে পড়লো হঠাৎ ক'রে।

চেয়ে থাকতে থাকতে ফেরীর ঘটঘট, মানুষ জনের কথাবার্তা, কাছে দূরের নানান শব্দ ইত্যাদি থেকে কখন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ছিলো, মানুষের ব্যস্ততায় এক সময় টের পায় ফেরী ড্যামরা ঘাটের জেটিতে এসে লেগেছে।

টিকাটুলির মোড়ে এসে স্কুটার থেকে নেমে রকিব একবার ভাবে, র‍্যাঙ্কিন ষ্ট্রিটে যাই, তারপর মনে হলো: এখন, এই সন্ধ্যায় শওকত নিশ্চয়ই বাড়ীতে নেই। অতএব রিক্সায় উঠে বলেঃ 'গুলিস্তান।'

কোণের টেবিল জোড়া ক'রে মাহবুর, সরোজ, হাবিব, আশরাফ, মিড্‌ল ইষ্ট ক্রাইসিস চালাচ্ছে। শওকত নেই। আর এক টেবিলে রোজকার মতো মদ খেয়ে কামরান সাহেব থম ধ'রে বসে আছে। লোকটার লিভার ড্যামেজড্‌, কিন্তু চব্বিশ ঘন্টা চুর হ'য়ে আছে।

–'কি দোস্ত ট্রিপ কেমন গেলো?'

মুখে একটু হাসি আনে: 'নট সো ব্যাড।' বলতে বলতে মেঝেতে ব্যাগ রাখতে রাখতে চেয়ারে হেলান দিয়ে গা এলিয়ে দেয়: 'চাকা ওয়া, মাথা একেবারে জাম মেরে গেছে।'

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
টেবিলে টেবিলে মানুষ। গোল গোল এক একটা দ্বীপ যেনো। এই রেষ্টুরেন্টটায় এলে কলকাতার কলেজ ষ্ট্রীটের কফি হাউসের কথা মনে পড়ে।
'৭২ এর মাঝামাঝিতে কলকাতায় বেড়াতে গিয়েছিলো, সে-ই রকিবের প্রথম কলকাতা দর্শন।
সুশান্তকে সে জিজ্ঞেস করেছিলো: 'আচ্ছা তোর কি মনে হয় কলকাতার মেয়েদের সেক্সেটিভিটি বলে কোন কিছু আছে?'
সুশান্ত একটু অবাক হ'য়ে ওর দিকে তাকিয়েছিলোঃ 'ক্যান।'
-'না' ভিড় ঠেলে যেভাবে ট্রেন কিংবা ট্রামে বাসে ওঠা নামা করে...' কথা শেষ না করতে দিয়েই সুশান্ত হো হো হে'সে উঠেছিলো।
সুশান্ত তার স্কুল জীবনের বন্ধু। ডালপট্টির মোড়ে থাকতো। ক্লাশ সেভেনে পড়তে পড়তেই ঢাকা থেকে কলকাতায় চলে গিয়েছিলো, তারপর যা হয়, দু'দিক থেকেই যোগাযোগ বন্ধ।
একাত্তরের গন্ডোগোলে সরোজরা সপরিবারে কলকাতা চ'লে যায়, পরে ঢাকায় ফিরলে শুনেছিলো, সুশান্ত বিয়ে করেছে, চশমার দোকান করেছে শিয়ালদার মোড়ে।
সুশান্তদের বাড়ির রাস্তার নামটা দারুণ: এ্যান্টনী বাগান লেন। নাইনটি নর্থ সেঞ্চুরির ঝাড় লণ্ঠনের আলো ঠিকরে পড়ে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা পুরোনো ঢাকার অনেক মহল্লাকে হার মানায়।
কলেজ স্টিটের কফি হাউসের সঙ্গে মিল থালেও একটা জিনিষ নেই এখানে-মেয়ে। বিবাহিতা মহিলা স্বামীর সঙ্গে সিনেমা দেখে এসে বসেছে জবু থবু হয়ে, এসব নয়, ওরকম-তো এখানে আসেই মাঝে মাঝে দু'একজন, চা কিংবা বাবার পরোটা খেতে। বোঝা যায় ওরা শখ ক'রে খেতে এসেছে, রেষ্টুরেন্টে আসেনি।
মেয়ে মানে অবিবাহিতা। কলেজে পড়ে। ছেলেদের সঙ্গে এক টেবিলে ব'সে হাসি, গল্প, কথায় সমান তাল দিয়ে যাচ্ছে এমন একটা পরিবেশ।
চায়ে চুমুক দিতে দিতে সে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলো। আড্ডার বিষয়বস্তু এখন মিডলঈষ্ট থেকে হোমো সেকসুয়েলিটিতে চ'লে এসেছে, একটু পরে হয়তো আসবে জ্যাকুলিন ওনাসিন কিংবা নূরা পাগলা।
রকিবের এখন কোন কথায় যোগ দিতে ভালো লাগছে না। ফেরীতে যেমন বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলো, তেমনি ধরনের অনুভূতি আসছে এখন তার ভেতরে। যেনো অনেক দূর থেকে সে এই সব-মানুষ, কথা হাসি শুনছে বা দেখছে।
আশরাফ অনেক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিলো তাকে, হাবিবের কি কথায় হেসে উঠতে গিয়ে ওর দিকে আবার তাকায়।
সরোজ বলে, 'তোর হলো কি?'
সে হাসে: কৈ না তো।'
বন্ধুরা সবাই লক্ষ্য করছে তাকে। মনে মনে বিব্রত হয় রকিব।
শওকত এলো না। হয়তো কাচ্ছু কি ক্লাসের বোর্ডে বসে গেছে।
ভীষণ অবসাদ লাগছে তার, দু'চোখের পাতায় ক্লান্তির ছাপ, পিঠ, কাঁধ কোমরে টাটানি।
এইসব নিয়ে সে ব'সে থাকে। সিগারেট টানে, কথার ফাঁকে ফাঁকে নিঃশব্দে হাসে একটু আধটু। বল-পয়েন্ট দিয়ে সিগারেটের খালি প্যাকেটের খালি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
খালি ক'রে রেখেছেন।'
ছেলেটি একটু হেসে বলে, 'কি রাখুম খদ্দেরই তো নাই।'
(রকিব লক্ষ্য করলো, রুগী শব্দটি ব্যবহার করতে গিয়েও করলো না)
সে-ও হেসে একবার ডাক্তারের দিকে একবার সেলসম্যানের দিকে তাকিয়ে বলে, 'খদ্দের হবে কোথা থেকে, আলমারি অমন খালি খেলে খদ্দের তো দরজার বাইরে থেকেই চলে যাবে।'
কথা ক'টা বলতে পেরে রকিব তৃপ্তি বোধ করে!
অর্ডার বই বার করতে করতে বলে, এবার ভরে দেবার বন্দোবস্ত করে দিয়ে যাচ্ছি, দেখবেন, খদ্দের কেমন না হয়।'
এবং তারপর, 'না, না, ওটা থাক, আচ্ছা ছয়টা দ্যান'-এই সবের মধ্যে সে চলে যায়।
নতুন এ্যান্টাসিডটা ডজন ছয়েক গছাতে চেয়েছিলো,হ'লো না, দু'ডজন নিলো।
যাহোক, তেরোশো টাকার অর্ডার ক'রতে পেরেছে সে। হাসি মুখে আদাব দিয়ে বেরিয়ে এলে প্রবল রোদ তার চোখের ওপর বাড়ি মারে। মোড়ের মাথা থেকে খালি একটা ট্রাক ছুটে আসছে ধুলো উড়িয়ে। তাড়াতাড়ি সে চোখে সানগ্লাশ আঁটে। নাকের ওপর রুমাল চেপে ধ'রে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ায়; আর তখন তার বাপকে দেখতে পায়ঃ ভীষণ ঘর্মাক্ত, এক হাতে বাজারের ব্যাগ অন্য হাতে জোলান লাউ, আর সে বারান্দায় পার্টির ওপর ব'সে দুলে দুলে, 'আমি হব সকাল বেলার পাখি, সবার আগে কুসুম বাগে উঠব আমি ডাকি'-তার স্বরে পড়ছে।
গোটা ছবিটা অল্প সময় থাকে। তারপর কখনও বাজারের ব্যাগ, কখনও আব্বার শাধা হাফ সার্ট, ঝুলন্ত কদুর সতেজ শরীর, ইত্যাদি দেখিয়ে মিলিয়ে গেলে সে মুখ ফিরিয়ে দেখে মেঘের আকৃতি নিয়ে হালকা ধূলোর আস্তরণ রাস্তা থেকে উঠে শূন্যে পাক খেতে খেতে ভেঙে-চুরে খোলা দোকান পাটের দরজা জানালার ভেতর দিয়ে ঢুকে গেলো, দল ছুট হ'য়ে খানিকটা টিনের চালের মাথায় গিয়ে বসে কিংবা আরও দূরে কোথাও চলে যায়।
আরও কয়েকজন ডাক্তার ভিজিট ক'রে রিটেলার এবং হোলসেলার দোকানাগুলো শেষ করে ভীষণ টায়ার্ড হয়ে পড়ে সে।
উফ্, বাঁচা গেলো! অবসাদ এবং তৃপ্তিতে নিঃশ্বাস ছাড়ে, তারপর সোজা আলমগীর হোটেলে ঢুকে যায়। পরিচিত মেসিয়ারটি হেসে বলে, 'আইছেন স্যার।'
জানালার ধারে টেবিলের ওপর ব্যাগ রাখতে রাখতে হাসি মুখে রকিব বলে, 'হ্যাঁ, এলাম; কেমন, ভালো?'
তরুণটি বিনয়ে মাথা কাত করে।
বেসিনের দিকে যেতে যেতে শুনতে পায়-'ভালো কইরা প্লেট ধুইয়া খানা দে এক প্লেট।'
রীতমতো ঝটিকা সফর। ঘাম এবং ধূলো হাত, মুখ, গলায় কাদার মতো লেপটে আছে। খিদেও লেগেছে তেমনি।
মুখ-হাত ধুতে ধুতে আয়নায় দেখতে থাকে নিজেকে-রোদে পোড়া কালচে লাল মুখ-শুকনো আর শীর্ণ দেখায়, মাথাময় ধুলো জমেছে, কেমন অনাথ অনাথ লাগে নিজেকে।
লম্বা চওড়া হোটেল ঘরটা এখন ফাঁকা, নরসিংদীতে এলে এই পরিষ্কার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পরিচ্ছন্ন খোলামেলা হোটেলটিতে রকিব খায়।

মুখ–হাত ধুয়ে তার বেশ ভালো লাগছে এখন, তাছাড়া আটাশ হাজার সাত শো টাকার অর্ডার করাতে পেরে অনেক হালকা মনে হচ্ছে নিজেকে।

তিরিশ হাজার টাকার টার্গেট করলেও মনে মনে সংশয় ছিলো, হয়ত বিশ হাজারের বেশী তুলতে পারবে না, বিশেষ করে ঢাকার রেজাল্ট গতকাল দমিয়ে দিয়েছিলো তাকে।

ফ্যান খুলে দেওয়ার হয়েছে, পরিষ্কার টেবিলের ওপর ঝকঝকে কাঁচের গ্লাসে পানি, তার পাশে খালি বোন প্লেট।

বসতে না বসতেই ভাত এসে গেলো।–'মুরগী দেই স্যার।'

–'দাও।'

লেবুর রস মাখিয়ে মুরগীর ঝোল দিয়ে বেশ আয়েশ ক'রে ধীরে ধীরে খেতে থাকে সে!

'বিষ্ণু প্রিয়া মেডিক্যাল ষ্টোর'–এর মুরারী ডাক্তার বলে: 'খাইবেন, বুঝলেন, শাক ডাইল যা–ই অয়, ঠাইস্যা খাইবেন, আনপার মত বয়সে আমরা

মড় মড় ক'রে হাড় চিবোর। নলীর ভেতর থেকে শাঁশ টেনে নেয় জিভ দিয়ে। ভাত, মাংস, ঢাল, গভীর তৃপ্তিতে চেটে পুঁটে খায়।

মেসিয়ার জিজ্ঞেস করে, 'দই খাইবেন?'

আর তখন, মাথার ভেতর হরিস পোদ্দারের মিষ্টির দোকান ঘুরে যায় এবং জানালার বাইরে বিধ্বস্ত বিবি টকীজের দিকে চোখ পড়ে।

আচ্ছাদনহীন ভবনটির মাথায় কাত হয়ে পড়ে থাকা, পোড়া দাগ লাগা খোপ খোপ ওলা বিশাল চালের ফ্রেম। পাল্লাহীন দরজা–জানালার হা হা করা রিক্ততা তাকে কিঞ্চিত গম্ভীর করে দেয়, বলে, 'না।'

হাত মুখ ধুয়ে বিল মিটিয়ে বেরিয়ে আসে।

যেনো: বাস থেকে নেমে এখন দল বেঁধে মোহিতের বাড়ীতে চলেছে। রেল লাইন টপকে কাঠের সাঁকো, সাপের জিভের মতো দু'ভাগ হয়ে যাওয়া রাস্তার মুখে এসে, কলেজে যাওয়ার পথ ডান দিকে রেখে, বাঁ দিকে অগভীর খাদের পাশ দিয়ে এবড়ো থেবড়ো উঁচু নীচু কাঁচা রাস্তা–বাঁশঝাড় এবং ধারাবাহিক গাছপালার জটলা, তারপর হঠাৎ মাথার ওপর উন্মুক্ত আকাশ। ডানদিকের রাস্তা ছেড়ে বাঁ দিকে রেল লাইনের গা পর্যন্ত ফাঁকা বিস্তৃত জমির মাঝখান দিয়ে আল বেয়ে কিঞ্চিত উঁচু আম কাঁঠালের বাগান, অতঃপর রোদে পোড়া ধূসর ঘাসময় নীচু জমি তারপর বাঁধের মতো উঁচু সড়ক–ঢালু বেয়ে ছোট্ট একটা বাঁক এবং ঝোপঝাড় গাছপালার মধ্যে মোহিতের বাড়ী।

অথবা: মোহিতের ফাঁকা বাড়িতে রেকর্ড প্লেয়ার বাজিয়ে সিগারেট টেনে, হাসি, হৈ চৈ, গল্পগুজব ক'রে এবং মোহিতের প্রেমের অগ্রগতির বিভিন্ন তথ্য, নানা রকম সমস্যা জটিলতা, নমিতার দেওয়া নতুন চিঠি পড়াএবং তার সম্ভাব্য উত্তর বিষয়ক গভীর উৎসাহী আলোচনা, অতঃপর মিতালী কিংবা বিবি টকীজে ম্যাটিনী শো দেখে হরিশ পোদ্দারের মিষ্টির দোকানে চলেছে এখন।

মোহিত বলবে: 'কাকা, দুইটা কইরা কাঁচা গোল্লা দ্যান।'

আর তারা গিয়ে, টেবিলে জোড়া করে বসবে।

সেই গভীর থমকে থাকা মুখ নিয়ে হঠাৎ ক'রে [illegible] পড়ে সে। যেনো

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
প্যাকেটে আঁক কাটে। বেয়ারাদের মন্থর ব্যস্ততা দেখে।
এ রেষ্টুরেন্টের বেয়ারাগুলো সব বুড়ো। 'তুমি' বলতে কেমন সঙ্কোচ হয়।
দোহারা, শাদা চাঁপ দাড়িওলা যে লোকটি এখন টে-ভর্তি পানির গ্লাস নিয়ে এ টেবিল থেকে ও টেবিলে যাচ্ছে তাকে দেখলে ছেলেবেলার কথা মনে হয়: গ্রামের বাড়ীতে গিয়েছিলো, বাজারে যাবার পথে শাদা চাঁপ দাড়ি লুঙ্গিপরা পরিষ্কার গেঞ্জি গায়ে কাঁধের ওপর গামছা ফেলা একটি লোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আব্বা বলেছিলো: 'চাচা হন।'
রকিব তার ছোট্ট হাত কপালে ঠেকিয়ে সালাম ক'রলে বৃদ্ধটি তাকে একেবারে কোলের কাছে টেনে গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন: 'বাইচ্যা থাকো বাবা, অনেক বড় অও।'
সেই একদা পরিচয় করিয়ে দেওয়া চাচা'র মুখটা ঠিক মনে নেই, তবু ওই লোকটিকে দেখলে তার সেই ছেলে বেলার গ্রামকে মনে পড়ে।
টেবিলের চারধারে ব'সে থাকা বন্ধুদের মধ্যে এক সরোজ ছাড়া কেউ-ই এখানে তার পুরোনো মানে স্কুল কিংবা কলেজ জীবনের বন্ধু নয়।
স্কুল-জীবনের এক সরোজ, শওকত, মোহিত, আলমগীর, মফিজ এবং আরো দু'একজনের সঙ্গে ছাড়া যোগাযোগই হয় না এখন। মাঝে মাঝে রাস্তায় কিংবা আর কোথাও হঠাৎ ক'রে দেখা হয়ে যায় কারো কারো সঙ্গে।
এইসব ভাবনার ভেতর আনমনা হ'য়ে যেতে থাকে সে, কোথাও চিন চিন করে ওঠে, আর তখন রেষ্টুরেন্টের বাতি নিভতে থাকে একে একে; তার মানে রেষ্টরেন্ট বন্ধ হয়ে যাবে, তার মানে তাদের উঠতে হবে এবার।
আবার কখন বৃষ্টি হয়ে গেছে এর মধ্যে। ফুটপাত, রাস্তা এখন ভিজে-মানুষের পায়ের, গাড়ির চাকার পাতলা কাদা তৈরী হয়েছে।
আকাশ পরিষ্কার। চাঁদ উঠেছে কোথাও, চারপাশে অন্ধকারের মধ্যে দোকানপাঠ, রাস্তার আলো এবং চাঁদের জ্যোৎস্না একসঙ্গে মিলেমিশে সব কিছুকে ছুঁয়ে আছে।
রাস্তার ওপর সকলের কাছে বিদায় নিয়ে রিকসায় উঠলে সরোজ চেঁচিয়ে বলে: 'কাল সন্ধ্যায়একবার বাসায় আহিস।' রকিব পেছন ফিরে বলেঃ ' আচ্ছা।'
সরোজ-হাবিবরা এখন গিয়ে ষ্টেডিয়ামের কোনো রেষ্টুরেন্টে আরো কিছুক্ষণ গ্যাঁজাবে।
গুলিস্তানের ভিড়-ভাট্টা পেরিয়ে রিক্সা নবাবপুরের দিকে এগোতে থাকলে তার বাড়ীর কথা মনে পড়ে।
নান্টু এখনও নিশ্চয়ই বাড়ি ফেরেনি। ঝুনু বই খুলে টেবিলের সামনে ব'সে হয়তো কারো ধ্যান করছে, সেই উজ্জ্বল যুবক হ'তে পারে অথবা আর কেউ। কিংবা ঘরকন্নায় টুকিটাকি কাজ করছে। মা নিশ্চয়ই এতোক্ষণ রান্নাঘরে। আব্বার খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়ে গেছে। ডিম-লাইট জ্বালানো স্বল্পালোকিত ঘরে শুয়ে আছে একা একা। পাশের বাড়ীর রেডিওতে গান বাজছে।
রায় সাহেব বাজারের সামনের দোকানে উজ্জ্বল আলো, রেষ্টুরেন্টগুলোতে চিকেন কাবাব ঝুলছে, বড়ো বড়ো খাঞ্চায় নানরুটি, পরোটা। বাইরে সিঁড়ির পাশে ডাম কাটা জ্বলন্ত চুলোর ওপর বিশাল কালো তাওয়া। পরোটা তাজা হচ্ছে। রেষ্টুরেন্টের ভেতর জমজমাট ভিড়। ঝাঁঝাঁ করে গান বাজছে। বাঁদিকের গলির মুখে মোরগ- পোলাওয়ের দোকানটা বন্ধ হ'য়ে গেছে, তার সামনে বেঞ্চ ফেলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
গল্প করছে ক'জন ব'সে ব'সে।
রিক্সা বাঁক নিলে বেকারীর দোকানের শো কেসে, কাউন্টারের ওপর রাখা বোয়ম এবং আলমারিতে থরে থরে সাজানা কেক, পেষ্ট্রি এবং হরেক চেহারার বিস্কুট একসঙ্গে ঝলমল করে ওঠে।
কোর্টের পাশ দিয়ে রিক্সা এখন ঝাঁকুনি খেতে খেতে এগোচ্ছে। অদূরে পানের দোকানের উজ্জ্বল আলোর সামনে কুঁচি দিয়ে শাড়ি পরা টুকটুকে ঠোঁটের এক যুবতী দু'তিনজন লোকের সঙ্গে হেসে হেসে চলিয়ে চলিয়ে কথা বলছে।
আশপাশে এখনো কিছু লোক কলা, ডাব, কাগজি লেবু, আগলিয়ে খদ্দেরের আশায় নির্বোধের মতো মুখ ক'রে বসে আছে। বাল্বহীন ল্যাম্পপোষ্ট নিয়ে ভাঙাচোরা অমসৃন বৃষ্টিকাদায় মাখামাখি গলিটা অন্ধকার। এখানে ওখানে ময়লা আবর্জনার ছোট ছোট স্তুপ। পুরোনো ভাঙা নর্দমা। নোনা ধরা শ্যাওলা পড়া, চটা ওঠা, ইট বেরিয়ে থাকা দু'পাশের লাগালাগি বাড়ী ঘর, পাঁচিল। জানালা গলে আলো এসে পড়ছে। বাড়ী ঘরের ছাদ, রেলিং, কার্নিশ ডিঙিয়ে আসা চাঁদের জ্যোৎস্না এবং জানালা গলে আসা আলো মিলেমিশে রাস্তার পানি-কাদায়, নর্দমায় আলকাতরার মতো কালো থিকথিকে ময়লা পানিতে ধূসর বাদামী রঙের এফেক্ট দিচ্ছে।
রিক্সা একটা বাঁক পেরোতে গেলে ঝাঁকুনি খায় আর তখন তার আব্বার কথা মনে হয়। এবং হঠাৎ করে চমকে উঠে দেখে, আগুন লাগা দুর্গ প্রাসাদের কক্ষে অন্ধরাজা দেওয়াল হাঁতড়াচ্ছেঃ 'হ্যেই ডোন্ট লীভ মি এলোন, হ্যেই!'
তার মাথা ঝিমঝিম করে আর ঝাঁকুনি খেতে খেতে রিক্সা এগোতে থাকে। এবার একসঙ্গে দেখতে পায়, উজ্জ্বল আলো নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া লণ্ডী, ইউনিক টেইলার্স, রিক্সা গ্যারেজ, মুদির দোকান, পানের দোকান এবং কাঠের গোলা। আর তার পাশে হিজড়েদের গলিটার মুখে ঝলমলে শাড়ী ব্লাউজ, মুখে পাউডার, চোখে কাজল, পান খাওয়া মোটা ঠোঁটের সিংহ-মুখো হিজড়েটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে।
এইসব পেরিয়ে রিক্সা আর একটু এগোলে চা-ডালপুরির দোকানের উল্টো দিকে ছোট্ট সরু গলির মুখে রিক্সাওয়ালাকে বলেঃ 'থামো।' রিক্সা থামে।
চাঁদ এখন গলি বরাবর সরাসরি ফোকাস মারছে।
ভাড়া মিটিয়ে ব্যাগ হাতে ভেঙে পড়া কাঁধ, মাতালের মতো শ্লথ পা, ভিজে বলের মতো ভার হয়ে থাকা মাথা, শরীরময় টনটনে ব্যথা আর তেতো, টক-টক, বিবমিষা নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গলির শেষ মাথায়, যেখানে দীর্ঘদিন চুনকাম না করা সরু একলা বাড়িটা পথ রোধ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে তার দরজায় গিয়ে নক করে, অনেকক্ষণ পরে দরজা খুলে গেলে আগুনে পোড়া দগদগে ঘা'র মতো চাঁদটাকে পিঠে নিয়ে রকিব সেই খোলা দরজা দিয়ে মাথা হেঁট ক'রে ঢুকে যায়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অন্ধ তীরন্দাজ

ক'দিনের পচানে বৃষ্টির পর আজকাল রোজ চাঁদ উঠছে। সারারাত ফিনফিনে জ্যোৎস্না, দিনের বেলা রোদ, হাওয়াও আছে–বেশ, ভারী চমৎকার সময় যাচ্ছে। রিঁ রিঁ রিঁ ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকছে, ক্রু ক্রু ক্রু উচ্ চিংড়ে, পুকুর পাড়ের গাছ–গাছালির ডাল–পাতার ফাঁক–ফোকর দিয়ে হাজার হাজার চাঁদ, পায়ের নীচে, পুকুর পাড়ের ঢালুটার পরেই জাম গাছ, তারপর বেবাহা মাঠ–খালি ধানগাছ আর ধান গাছ। সদ্য দুধ আসা, ঈষৎ নুয়ে থাকা ধানের ছড়ার ওপর, পাতার ডর চাঁদের আলো, তার ওপর, একটু একটু কুয়াশার ভেতর দিয়ে আশ্বিনের বাতাস–ছোট খাটো দলটা সবের কিছু দেখছিলো না।

'–পটলা শালা যে রেটে মালে পানি মেশাতে শুরু করেচে...' কথাটা শেষ না করেই পচা গ্লাসটা ঘাসের ওপর রাখতে রাখতে আ–উ ক'রে ঢেকুর তোলে।

সগু ঝালবড়া চিবুতে চিবুতে পচার দিকে তাকায়: 'পটলার বুনটাকে দেকিচিস? শালা জিনিস একখানা। মাগীর এক একটা চু'চি আধ সের তিন পো। আর পাছা! উ–হ'–চোখ বু'জে ঝাল বড়ায় কামড় দেয়।

এ কথায় সগু পটলার পানি মেশানোর অপরাধ মাফ ক'রে দিতে চায় কিনা বোঝা গেলো না। পচা বললো: তাই তো রে শালা, মাল তো খাস না, মনে মনে পটলার বুনের মুত গিলিস!

সগু কোন জবাব দেয় না।

নাড়ু অনেকক্ষণ ধ'রে পুকুরের পানির ওপর ভাসতে থাকা দলামোচা কাগজের টুকরোটার দিকে চেয়েছিলো। হাওয়া লেগে এক টুকরো জমাট জ্যোৎস্না যেনো একবার সামনে এগোয়, একবার পেছন হাঁটে। একবার বাঁ পাশ ফেরে, থির হয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকে কখনো, কখনো ডান পাশ ফিরে বোঁ বোঁ করে ক'পাক ঘুরে গিয়ে ফের সামনে এগিয়ে যায় হাঁসের মতো। তারপর পুকুরের তলা থেকে গুগলি তোলবার জন্যে ডুব দেয়।

না, তা–ও নয়; বহুদিন আগে মল্লিকদের পুকুর পাড়ে প্রকাণ্ড একটা চন্দ্রবোড়া সাপকে শাদা মুরগী ছানা গিলতে দেখেছিলো–সেই কথা মনে পড়লো।

নাড়ুর বয়স কম। মেয়েলী ধরনের দেখতে। হাফ প্যান্ট পরা নাড়ুর শাদা উরু চকচক করছে। সেদিকে চেয়ে সগু খুব জড়ানো গলায় ডাকে: 'নাড়ু।' নাড়ু উত্তর দেয় না।

সগু নাড়ুর গায়ের কাছে ঘেঁষে আসে। কাঁধে হাত রেখে মুখ বাড়িয়ে দেয় নাড়ুর গালের কাছে। নাড়ুর গালে নিঃশ্বাস লাগে। মদের গন্ধ আসে।

সগুর চোখ গোলা হয়ে এসেছে,গলায় ভাদ্রমাসের কুকুরের শব্দ। সগুর হাত সরিয়ে দেয় কাঁধ থেকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
–'রাগ করচিস?'
নাড়ু কোনো কথা বলে না। স'রে সে। তখন মনিরামপুর রেল–পোলের ওপর গাড়ি উঠে আসছে, গুম গুম শব্দ হচ্ছে।
মুরগীর মতো কান পাতলো নি তাই। চার জনেই শুনলো শব্দটা। পচা বলে: 'মালগাড়ি।'
এসব ব্যাপারে পচার কান খুব পরিষ্কার। ট্রেনের শব্দ শুনলে ঠিক ঠিক ব'লে দিতে পারে প্যাসেঞ্জার্স না গুড্স ট্রেন।
নিতাই বললে: 'কী চাঁদ মাইরি। সব কাজ গুবলেট হচ্ছে।'
তা বটে, ক'দিন দারুণ বৃষ্টি গেলো। বৃষ্টির ভেতর দু'দিনের চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। তারপর এখন রোজ এমন দুনিয়া আলো করে চাঁদ উঠেছে। এর ভেতর কাজ করা বড়ো অসুবিধে। সে দিন তো মরতে মরতে বেঁচেছে।
মনিরামপুর পোল পেরিয়ে গাড়ি চন্দ্রচিপের কাছে এসেছে, দোর ভেঙে চা–এর দুটো পেটি নামিয়ে দিয়েছে, এমন সময় সাঁই সাঁই গুলি। ভাগ্যিস অন্ধকার ছিলো, না হলে নিতাই পচা–দু'জনকেই জানটা দিতে হতো।
গত বছর শেপাইচণ্ডির নুর ইসলামটা গেলো। আহ্, শালা একেবারে ঝাঁঝরা ক'রে দিয়েছিলো।
–'নেতাই।'
পচা যেনো অনেক দূর থেকে ডাকলো।
–'হুঁ, বল।'
–'আচ্ছা, বলাই মাইতির ক'বিগে ধান জমি?'
শালাকে ধরেচে। পটলা মদে পানি মেশায় ব'লে গাল দিচ্ছিলো এতোক্ষণ, আর এখন দেখো, সবাইয়ের আগে মাতাল হয়েছে।
–'তা অনেক।'
–'হুঁ, দখিন জলা, কোচোর জলার ধান, শেরামপুরে কাপড়ের দোকান, বাড়ীতে রেশন দোকান, জানাই বাজারে গম কল, শালার অনেক পয়সা, নয়?'
–'তাতে তোর কি?' সগু বলে।
–'না, আমার কিছু নয়, আমার শালা আবার কি, আমার জমি নেই, বাঁদা চাকরি নেই, ঘরে মাগ–ছেলে আচে, পেটে ক্ষিদে আচে। বলাই মাইতি অঞ্চল প্রধান হবে। বিজয় ঘড়ুইকে মারাবার জন্যে আমাদের বসিয়ে রেখেচে এখানে। মেরে দিলে টাকা দেবে। আমার আর কি।'
কথা বলতে বলতে মাথা ঝুঁকে আসে পচার। নাড়ু, সগু, নিতাই তিনজনই পচাকে দেখে।
হিম হিম বাতাস আসছে মাঠের দিক থেকে। তার সঙ্গে নতুন ধানের ভিজে, মিষ্টি সোঁদা গন্ধ। 'হুঁ, বলাই মাইতির অনেক পয়সা, সেবার কী আকালটাই না গেলো, আ'র ইদিকে শোরের বাচ্চা, রাত দুপুরে লরি বোঝাই ক'রে ক'রে চাল পাচার ক'রে লাল হ'য়ে গেলো। আর এখন দেখো, অঞ্চল প্রধান হবে, পথের–কাঁটা বিজয় ঘড়ুইকে সরিয়ে দেবার জন্যে' ঘট ঘট ঘটাং ঘং ঘটাং ঘটাং কী –ঈ–ঈ–চ–চ ঘটাং ঘটাং– মাল পাড়ার গেট পেরিয়ে জ্যোৎস্নার ভেতর দিয়ে পেরুতেই থাকে, পেরুতেই থাকে।
সগু নাড়ুকে জড়িয়ে ধরতে গেলো। নিতাই সগুকে টেনে ধরে: 'হ্যেই শালা।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
কথাগুলো গাড়ির তলায় গুড়িয়ে যায়।
পচা চুপচাপ চেয়ে আছে সামনের দিকে বিরাট একটা ময়াল সাপ জ্যোৎস্নার গর্তের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে।
শির শির শির শির করে পুকুরের পানি কাঁপে। চাঁদ খান খান হয়ে যায়। গাছ, গাছালির ছায়া মাথা নাড়ায়-পাতা ঝম ঝম করে। হু-উ-উ হুক্কা হুয়া, হুয়া হুয়া-শিয়াল ডেকে ওঠে গোরস্তানের ভেতর থেকে। মাল গাড়ির পেছনের লাল আলো মিলিয়ে যায় এক সময়।
-'আর একটা পাঁট হ'লে জমতো।' বোতল তিনটের দিকে তাকিয়ে সগু বলে। নিতাই, পচা কিংবা নাড়ু কোন কথা বলে না। সগু শালাকে এ্যায়সা মার দোবো একদিন।
নাড়ু মনে মনে ভাবে।
নিতাই সিগারেট ধরিয়ে টানে। পচা বলে, 'বসে থাকতে থাকতে শালা একদম থাকে যাচ্ছি, দে তো একটা সিকরেট।'
পচা আর নিতাই সিগারেট টানতে থাকে। সগু নাড়ুকে আবার জ্বালাতন করতে গেলে পচা রেগে যায়: 'দ্যাক সগু' এ্যায়সা লাতি মারবো পোঁদে, শালার গাঁড়বাজারি ছুটিয়ে দেবো।' পচার মাথায় তখন নানান ব্যাপার চলছিলো নিজের কথা, ঘরের কথা, বিজয় ঘড়ুই কি বলাই মাইতি, তার ভেতর-পেটে ঘা হয়ে মাস কয়েক আগে মা'র মৃত্যুর কথাও চলে আসছিলো। আর বাঞ্চোতটা সেই কখন থেকে জ্বালাচ্ছে।
সগু একবার কটমট করে তাকালো।
সগুর ঘোড়ার মতো লম্বা মুখ, ঠোঁট দু'টো অস্বাভাবিক মোটা, নাকের ডগাটা ভয়ানক থ্যাবড়া, চোখ দু'টো ছোট উচু ঢিবির মতো কপালের কাছাকাছি প্রায়। ওকে দেখলেই কেমন রাগ ধরে।
বিজয় ঘড়ুই মাঝের গাঁয়ে গেছে মেয়ের বাড়ি, ডাউন লাষ্ট টেনে বাড়ি ফিরবে। টেন এলে জাম তলায় ময়না কাঁটার ঝোপের আড়ালে গিয়ে বসবে ওরা।
পচা পেছণ থেকে মাথায় রডের বাড়ি মারবে, বিজয় ঘড়ুই অক ক'রে পড়ে যাবে, তারপর.....
নিতাই যেনো দেখতে পাচ্ছে ময়না কাঁটার ঝোপের নীচে ঘড় ঘড় শব্দ ক'রতে ক'রতে শাদা ধুতি, মেটে রঙের ঘাস লাল হয়ে যাচ্ছে, তার ওপর জ্যোৎস্না পড়ে চকচকে ঝিলিক দিচ্ছে।
বুকের ভেতর থর থর করে।
-'নাড়ু?'
-'উ!'
-' তোদের কারখানা খুলবে বলে মনে হয়?'
-'কি জানি শালা।'
পচা দূরে রেল লাইনের ওপারে জমাট গাছ-পালার আকাশ ছোঁয়া কালচে-দেওয়াল, এক ফোঁটা স্টেশন, তার পাশে ডানা গুটিয়ে উবু হয়ে বসে থাকা শুকুনের মতো সিনেমা হল-এই সব দেখতে থাকে।
সেখান থেকে চোখ ফিরিয়ে আনে মাঠের ওপরে-সারা মাঠ জুড়ে সবুজ সোনালী ধান গাছ একটু নুয়ে জ্যোৎস্না পিঠে নিয়ে যেনো ছেলেকে দুধ দিচ্ছে। সগু এখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
সটান শুয়ে প'ড়ে হাঁটুর ওপর পা তুলে নাচাতে নাচাতে গুন গুন করছে: কে তুমি আমারে ডাকো, অলকে লুকায়ে থাকো....'
নাড়ু জগডুমুর গাছের নিচে ছর ছর ছর ছর পেচ্ছাব করছে।
পচা কান কাড়া করলো, 'গাড়ি আসচে।'
–'আরে না, নাড়ু শালার মুতের আওয়াজ।'
সগু গান থামিয়ে গুঙিয়ে ওঠে।
–'উঁহু, ডাউন লাষ্ট ট্রেন।'
কথাটা শোনবার সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসে সগু। নিতাই ড্যাগরাটা হাতে তুলে নিলো। নাড়ু পেচ্ছাব ক'রতে করতে ভাবছিলো, সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে শালা কোথাও যদি চলে যেতে পারতুম।
সে–ও তাড়াতাড়ি চলে এলো, 'আসচে'–প্রায় চাপা ফিস ফিস করে বলে।
দলটা জামতলায় নেমে গিয়ে ময়না কাঁটার ঝোপের আড়ালে ব'সে স্টেশনের দিকে চেয়ে থাকে।
পচা বিড় বিড় করে 'শালা বলাই মাইতি....
–'বিজয় ঘড়ুই লোক কিন্তু ভালো।' নাড়ু গুন গুন করে
–'লে লে, ভালো! ভালো মন্দ বুজি না, বলাই মাইতি টাকা দেবে, মেরে দোবো, ব্যাস। ভালো দুনিয়ায় কুন শালা নেই, বুজলি?'–সগু ঘড় ঘড় করে।
তুই শালাকেই খুন করতে ইচ্ছা করচে এখন–পচা মনে মনে ভাবে।
নিতাই কিভাবে বোঝা যায় না ড্যাগার দিয়ে মাটি খোঁচাচ্ছে।
ট্রেনের শব্দ এখন স্পষ্ট হয়েছে। বারুই পাড়া স্টেশন ছাড়িয়ে আসছে গাড়িটা। একটু পরেই চন্দ্রটিপ পেরিয়ে মাল পাড়ার রেলগেট, তারপরই ঝাঁঝাঁ করে একেবারে বেগমপুর স্টেশনে এসে দাঁড়াবে।
কী চান্নি। যেনো দুধে আলতা ঢেলে দিচ্ছে কেউ, আর ধান কি গো। সারা মাঠ জুড়ে যেনো বান ডেকেচে, খালি শোঁ শোঁ শোঁ শোঁ শব্দ আর মিষ্টি সোঁদা খোশবো পাক খেয়ে মাথার ভেতর ঢুকে যায়।
হুইসিল বাজাতে বাজাতে ট্রেনটা এগিয়ে যাচ্ছে। কামরায় কামারায় জোনাকির মতো আলো। নাড়ুর মনে হয়, বুকের ওপর দিয়ে চাকাগুলো ব'সে ব'সে যাচ্ছে।
সগু চোয়াল শক্ত করে চেয়ে আছে সামনের দিকে। ঘোড়ার মতো মুখটা আরো লম্বা দেখাচ্ছে।
পচা নিতাইকে কি যেনো বললো।
জ্যোৎস্নার ওপর দিয়ে হিম ঝরছে।
আল ঝাঁপিয়ে পড়া ধান গাছ পায়ে পায়ে জড়িয়ে যায়। ভেতরে ভেতরে কর্মী ইদুর খুট খুট সড় সড় আপন কাজ ক'রে যাচ্ছে। আকাশে অজস্র তারার খই ফুটে আছে। বাওনদের বিধবা মেয়ের মেচেতা–পড়া, ফর্সা মুখের মতো গোল চাঁদ আর আশ্বিনের বাতাস, পায়ের নীচে শিশির, বকুল ফুলের মতো নরম স্পর্শে ভিজিয়ে দিচ্ছে।
দূরে সিনেমা হল ঝক ঝক করছে। রিঁ রিঁ রিঁ রিঁ ঝিঁ ঝিঁ করছে, ক্রু ক্রু ক্রু উচ্চ চিংড়ে, দূরে হু–উ–উ শিয়ালের ডাক।
মাথা ঝুঁকিয়ে, কাঁধ ভেঙে তারা চারজন ফল ভরা মাঠের ভেতর দিয়ে ফিরে যাচ্ছে বিজয় ঘড়ুই মেয়ের বাড়ী থেকে ফেরেনি।
আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
নিতাই ভাবে, দুদিনের দুটো টিপই গুবলেট হ'লে। আর চাঁদটা শালা ক'দিন ধ'রে হারামীপনা করচে।

রাত্রিকাল দীর্ঘতর হতে থাকে। তাতি পাড়ার বারোয়ারী তলা থেকে জ্যোৎস্না কাঁপিয়ে ঢাকের আওয়াজ আসতে থাকে, হ্যাজাকের আলোয় অন্নপূর্ণার চোখ আঁকতে আঁকতে বুড়ো মহেশ্বর পাল নিজের চোখেই জল এনে ফেলে। জ্যোৎস্নায়, শিশিরে ধান পাকতে থাকে। মাটি থেকে, ধানের গুচ্ছ থেকে, জ্যোৎস্নার গা থেকে গন্ধ এসে চারজনকে জড়িয়ে জড়িয়ে ধরে, তবু সগু পা হড়কে পচার গায়ে প'ড়ে গেলে পচা ভীষণ রেগে চড়াৎ করে সগুর গালে চড়মারে। সগু ঘুরে আলোর ওপর পড়ে গিয়ে হঠাৎ হাউ হাউ করে উঠলো: আমাকে মেরে ফেল আল্লার কসম, তোরা আমাকে এখানে খুন ক'রে রেকে যা, আর বাঁচতে ভাল্লাগেনা, আমাকে মেরে ফেল্ পচা, তোর পায়ে পড়ি, আমায়...'

ওরা তিনজন থমকে দাঁড়িয়ে যায়, সগুকে দেখে। ভেউ ভেউ করে, কাঁদতে থাকা সগুকে ভারী বিশ্রী দেখাচ্ছে। চাঁদের দিকে মুখ তুলে অবিকল একটা ঘোড়া চেঁচাচ্ছে যেনো। তবু পচা, নিতাই কিংবা নাড়ু কেউ কোন কথা বলতে পারে না। সমস্ত মাঠটা ওদের বুকের ভেতর ঢুকে যেতে থাকে।

সম্পর্ক

দু'বন্ধু মুখোমুখি ব'সে গল্প করছিলো। একজন তামাটে ধরনের ফর্সা, স্বাস্থ্যাবান–স্বাস্থ্যবান মানে মাসল্ওলা কাঠ–কাঠ ধরনের নয়, মেদজ–ফলে ভরাট টানটান চকচকে চামড়ার গাল, গলা, হাত, হাতের আঙুল ইত্যাদিতে গোল গোল নিটোলতা।

কপালের ওপর থেকে মাথায়–যেন নদীর বিস্তীর্ণ জলরাশির ওপর ছুঁচলো হয়ে ক্রমে দুপাশে প্রসারিত করে চর জেগেছে আর সেই চরে হালফিল গজানো ঘাস–এমন ধরনের চুল। ফলে তার এই টাক তার বয়েস এবং স্বাস্থ্যের সঙ্গে সমন্বয় রেখে ভিন্নতর এক সৌন্দর্য দিয়েছে, সেই সৌন্দর্যের ভেতর আছে ডিগনিটি এবং গাম্ভীর্য।

অপরজন কালো। মাথার চুল কোঁকড়ানো। হীন স্বাস্থ্য। প্রথম জনের মতো গুফময় নয়। তার হাসি এবং কথা বলার ভঙ্গিতে এক ধরনের গ্রাম্যতা আছে।

দু'জনের বয়েসই ৩৬ ছুঁই ছুঁই।

প্রথম জনের নাম জাফর, মুহম্মদ আবু জাফর, দ্বিতীয় জনের নাম ইরফানুল হক।

এরা বাঙলাদেশের কোনো এক মফস্বল কলেজ থেকে পাস করেছে, সেই সুবাদে বন্ধুত্ব। তা সেও আজ ১৫/১৬ বছর আগে। এখন দু'জনই চাকরিজীবী। জাফর চাকরি করে চট্টগ্রামের কোনো এক কলেজে ইরফান ঢাকার এক ব্যাংকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
জুনিয়র অফিসার।
জাফর অর্থনীতি নিয়ে পাস করেছে। ইরফানের ইউনিভার্সিটিতে ঢোকার সুযোগ হয়নি। বি.কম.পাস করেই প্রথমে স্কুল মাষ্টারী পরে ব্যাংকের চাকুরে।
আকস্মিকভাবে দুজনের সাক্ষাৎ হয়ে গেলো তোপ খানা রোডের ওপর।
দীর্ঘ চার বছর পর ঘনিষ্ঠ দুজন বন্ধুর এমন হঠাৎ করে রাস্তায় দেখা হয়ে গেলে পরস্পরের অনুভূতি এবং বহিঃআচরণ যেমন হয়, জাফর ইরফানেরও তা-ই হয়েছে।
এবং অতঃপর তারা এই ছোট, পরিচ্ছন্ন, কাঁচ ঘেরা নির্জন রেস্টুরেন্টে এসে বসেছে। ফর্মিকা সাঁটা সুদৃশ্য টেবিল, চকচকে পালিশ করা স্নিগ্ধ চেয়ার-অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো। পর্দা লাগানো কাঁচের দরজা আঁটা এই রেস্টুরেন্টের ভেতর বাইরের তুমুল রোদের দুপুরেও ছায়াছন্ন শীতলতা থাকে। এখানে এসে বসলে মনে হয় মেঘ করেছে আকাশে। কিংবা বৃষ্টি হচ্ছে।
মাথার ওপর পারটেক্সের গোলাপী সিলিং, তার মাঝে মাঝে বাল্ব, বাল্বের চারপাশে ইঞ্চি দুয়েক চওড়া ওপরে নীচে দু'থাক গোলাকৃতি রঙিন পিচবোর্ডের ডোম। ডানে ব'য়ে এই ডোম লাগানো সারিবদ্ধ আলোয় মাঝখান দিয়ে লম্বালম্বি ছটি ফ্যান সমান দূরত্বে ঝুলে আছে।
কাঁচের দরজার পাশে ম্যানেজারের কাউন্টার। কাউন্টারের কোন গোপন থাক থেকে ঘরের ছায়াছন্ন নির্জন শীতলতার সঙ্গে আওয়াজের সমতা রেখে চেঞ্জারে সায়গল, হেমন্ত, সন্ধ্যা, চিন্ময় কিংবা আর কেউ গান গায়। কখনো 'নেভার অন সানডে' বাজে।
পাশে একদিকের দেওয়াল ঘেঁষে ফ্রিজ-ঘন দুধের বিশাল আইসক্রীমের মতো দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে।
এই সময়টা রেস্টুরেন্ট একদম ফাঁকা। একটু পরে বিকেল ফুরিয়ে গেলে, ঘরের ভেতর আলো জ্বলে উঠবে। আর একে একে সুবেশ নরনারী-বিশেষ ক'রে যুবক-যুবতীরা এসে মুখোমুখি বসবে। বন্ধু আসবে বন্ধুকে নিয়ে। যেমন ইরফান এসেছে জাফরকে নিয়ে।
ইরফান বিয়ে করেছে আজ বছর ছয়েক আগে। একটি ছেলে একটি মেয়ে, আর একটি কি তা জানা যাবে মাস সাতেক পরে।
ইরফান গড় গড় ক'রে তার সংসারের কথা ব'লে যাচ্ছিলো-সংসার যে কী ঝামেলার, তার ওপর যদি বাচ্চা কাচ্চা হয় তাহলে এই বাজারে, ঢাকা শহরে বাড়ি ভাড়া দিয়ে একজন চাকরিজীবীর যে কী দমসম অবস্থা হয়! দুটোর পর ইরফান খুব সাবধান হয়ে গিয়েছিলো, একদম ইচ্ছা ছিলো না, হেনার বোকামীর জন্যে বিপদটা হয়ে গেলো-এইসব কথা কখনো দারুন দুশ্চিন্তা এবং দুঃখিত হয়ে, কখনো হাসিহাসি মুখ ক'রে এন্তার বলে যাচ্ছিলো, ওর কথা বার্তায় মনে হয়, এতো দুর্ভাবনা, টানাপোড়েন, প্রতি মুহূর্তের একঘেয়ে টেনসনের মধ্যেও কোথাও মজা আছে।
জাফর চুপচাপ শুনছিলো ব'সে ব'সে। মুখে একটানা মৃদু হাসি টেনে রাখার ফলে এখন ঠোঁটের দুই প্রান্তে ব্যথা ব্যথা করছে।
ইরফান যখন বললো 'খুব বেঁচে গেছো দোস্ত, বিয়ে না করে দারুন বুদ্ধিমানের কাজ করেছো'-তখন, এই প্রথম এবং তা যেনো ইরফানের কথায় নয়, মুখের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ব্যথাকে ঝেড়ে ফেলবার একটা মোক্ষম সুযোগ পাওয়া গেছে ভেবে শব্দ করে হাসলো জাফর। হাসবার সঙ্গে সঙ্গে মুখের পেশী এবং চামড়ায় স্বাচ্ছন্দ্য এলো, সমস্ত শরীর আরামের নিঃশ্বাস ছাড়ে। টেবিলের ওপর থেকে সিগারেট তুলেনিয়ে ধরায়। ধোঁয়া ছাড়লে সামনে সেই ঘন হাল্কা মিশ্রিত ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে ইরফান মুহূর্তের জন্যে খুব, দ্রুত ছুটে যাওয়া কোন মোটর সাইকেল আরোহীর ফটোগ্রাফ হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে ধোঁয়া সরিয়ে দিয়ে স্বাভাবিক ইরফানকে ঠিকঠাক বসিয়ে দেয়, স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ে, হাসে জাফর।

আলো জ্বলে উঠেছে বেয়ারা বিল দিয়ে গেছে। রেষ্টুরেন্ট এখন আর একেবারে খালি নেই এক টেবিলে তিনজন, দুজন যুবক একজন যুবতী, যুবক দুটি মুখোমুখি ব'সে কথা বলছে, সবুজ শার্ট পরা যুবকটির পাশে নীলের ওপর সাদা বুটিদার শাড়ি পরা যুবতী নীরবে শুনছে, যুবক দু'টির হাসি হাসি মুখ, যুবতীটি সামনের ছেলেটির দিকে কপট রাগের ভঙ্গি করে আছে চোখ বড়ো বড়ো করে। অপর দুটি টেবিলের মধ্যে এক টেবিলে জাফর ইরফানের বয়সী একটি দম্পতি, সঙ্গে ৫/৬ বছরের একটি মেয়ে, ভেলপুরি খাচ্ছে।

আর এক টেবিলে চারজন যুবক সিগারেট টানতে টানতে খুব মজাদার কোন কথা বলছে। কোণের যুবক-যুবতীদের টেবিলে চট পটির প্লেট সাজাচ্ছে বেয়ারা। বাকি পাঁচটা টেবিল খালি।

কাউন্টার থেকে চাঁদওসমানী খুব ভিজে রুদ্ধশ্বাস জ্বরে প্রশ্ন করে, 'তারপর?' হেমন্ত উত্তর দেয়, 'তার আর পর নেই, নেই কোন ঠিকানা।'....

জাফর একটুক্ষণ সেই সঙ্গীত শোনে, মাথার ভেতর, করোটির সিলিংয়ে মগজ থেকে মেঘ উঠে আসে। সিগারেটে জোরে জোরে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে থাকে। সামনে রাখা বিলের দিকে তাকিয়ে পকেটে হাত দিতে গেলে, ইরফান হাত চেপে ধরে, 'মাথা খারাপ।' জাফর হাসে। কোণের টেবিলের যুবতীটি কি কাথায় হঠাৎ জোরে হেসে ফেলে ভারী অপ্রতিভ হয়ে যায়।

চার যুবকের টেবিল থেকে 'ইম্পসবল' -এই শব্দ কানে আসে।

ইরফানের সঙ্গে রেষ্টুরেন্টে ব'সে ব'সে খুব পেছনের ছবি মনে আসতে থাকে জাফরের। 'ইরফান, রাখালদার খবর কি'রে এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে গিয়েও থেমে যায়। 'রাখালদা আমার কাছ থেকে ৫ টাকা পেতো।' -এই ভাবনা চ'লে এলে হাসি পায়। সেই হাসির নীচে বিষন্নতা থিরথির করে। টিনের চালের ছোট্ট রেস্টুরেন্টের নীচে জাফর নিজেকে বন্ধুদের সঙ্গে দেখতে পায়। ছোট টেবিলের ওপর ক্যাশ বাক্স নিয়ে আমুদে রাখালদা ব'সে ব'সে ডাকে, 'হরেন, ও হরেন'

বাইরে বেরিয়ে এসে দেখে চার পাশের অন্ধকারের ভেতর আলো জ্বলছে।

হাঁটতে হাঁটতে তারা পুরানা পল্টনের মোড়ে এসে দাঁড়ায়-জাফর যাবে টিকাটুলি, ইরফান মালিবাগ। জাফরকে রিকশায় তুলে দিতে দিতে ইরফান বলে, 'কাল সকাল সকাল আসিস, ভুল না হয়। জাফর সিটে ব'সে হাসে, 'আসবো'।

রাতের বেলা খেতে ব'সে আলাপ হচ্ছিলো স্বামী-স্ত্রীতে-'ও যে কী ছিলো, সে তুমি কল্পনা করতে পারবে না।' চোখ জ্বল জ্বল করে ইরফানের, প্রথম যৌবনের তারুণ্য উজিয়ে আসে ভেতরে ভেতরে: 'সেই সিক্সটি টু-তে, যে বছর কলেজ ইউনিয়নের কেবিনেট পেলাম আমরা, সেই বছরের মাঝামাঝি থেকে শুরু হলো এডুকেশন মুভমেন্ট। সেপ্টেম্বরে এসে একেবারে ফেটে পড়লো। ঢাকার রাস্তায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
গুলি হয়েছে, তার প্রতিবাদে মিছিল বেরুবে। ছোট্ট মফস্বল শহর, সেই শহরের কলেজ, বুঝতেই পারছো–সকাল থেকেই কলেজের বাইরে পুলিশ কর্ডন ক'রে আছে। ভেতরে আমরা; একদল বলছে, মিছিল বের করলে ব্লাডশেড হবে, আর একদল বলছে, যে করেই হোক, এর প্রোটেস্ট করতেই হবে। দারুণ উত্তেজনা।'
এখানে এসে ভাতের প্লেট থেকে হাত তুলে নেয়। যেনো মুষ্টিবদ্ধ হাত পরে তুলে এখনই শ্লোগান দেবে। 'সত্যদা, মানে আমাদের কেবিনেটের ভি, পি সত্য ভট্টাচার্যের নামে হুলিয়া বেরিয়ে গেছে, সত্যদা এ্যাবসকনডেন্ট, কাজেই ইউনিয়নের সেক্রেটারী হিসাবে জাফরের দায়িত্ব অনেক। প্রিন্সিপ্যাল তার রুমে ডেকে পাঠিয়েছেন জাফরকে। আমরা বাইরে অপেক্ষা করতে করতে শ্লোগানের পর শ্লোগান দিচ্ছি। ভেতরে জোর তর্ক চলছে দু'জনের।
সাড়ে দশটা এগারোটার দিকে কলেজ ভরে গেলো।–চিৎকার, হৈ চৈ, শ্লোগান। তারপর সেই বেরিয়ে আসা। উহ্, সে এক সীন।'
ইরফান যেনো দেখতে পাচ্ছে, পুলিশ কর্ডন ভেঙে কয়েক হাজার ছেলের মিছিল লীড দিয়ে জাফর এগিয়ে আসছে। বালকের মতো উচ্ছ্বাসে গলা বুঁজে আসে। কোন কথা বলতে পাড়ে না কিছুক্ষণ। যেনো ঘোরের ভেতরই ভাত মাখিয়ে দ্রুত মুখে তুলতে থাকে। এমনকি ভাত, তরকারি, মাছকে আলাদা ক'রে টের পায় না। একটা ভিজে নরম অস্তিত্বের ঈষৎ নোনতা স্বাদ জিভ থেকে গলায় গলা থেকে বুক বেয়ে নেমে যাচ্ছে। খানিকটা অবাক, খানিকটা কৌতুক, খানিকটা অস্পষ্ট উত্তেজনা নিয়ে স্বামীর দিকে তাকিয়ে থাকে হেনা।
ইরফানের মাথা ঝুঁকে আসে। ষাট পাওয়ারের বাল্বের আলোতে তার চোখে–মুখে আবছা ধরনের বিমর্ষতার ছায়া পড়েছে।
'খুব খারাপ লাগলো ওকে দেখে'–অত্যন্ত গাঢ় কুয়াশায় ঢাকা কোন ফাঁকা মাঠের সুদূর প্রান্ত–সীমা থেকে ভেসে আসে তার স্বর: 'কী হয়ে গেছে। অমন টগবগে ছেলেটা কেমন ঝিমিয়ে পড়েছে এই ক' বছরে।'
সেই স্বর হেনাকেও–যে মানুষটিকে দেখেনি, তার ভেতররেও, কোন কারণ নেই। খুব পাতলা–পুকুরের জলে সর পড়ার মতো বেদনা সঞ্চারিত হতে থাকে।
ছেলেটা বালিশ থেকে নেমে গেছে। বালিশ ঠিক ক'রে দেয়। মেয়েটার কি যে স্বভাব, উপুড় হ'য়ে ঘুমোয়। কাত ক'রে দিতে গেলে ঘুমের ভেতরেই উঁ উঁ ক'রে ওঠে। ইরফান তার নাক এবং কপালের ওপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিতে দিতে জাফরের কথা ভাবে।
হেনা এখনো রান্না ঘরে জিনিসপত্র গুচোচ্ছে। আধা শোয়া হয়ে সিগারেট ধরিয়ে টানতে থাকে ইরফান। বস্তুত আজ সন্ধ্যা থেকে, জাফরকে বিদায় দেবার পর থেকে সে বন্ধুর কথা ভাবছে। ভাবতে ভাবতে রিকশা নেবার কথা ভুলে যায়, হাঁটতে হাঁটতে এক সময় দেখে কাঁকরাইলের মোড়ে এসে পড়েছে। দাঁড়িয়ে প'ড়ে অন্যমনস্ক হয়ে ভাবে খানিক। রিকশা ডাকতে গিয়েও থেমে যায়। তারপর ফের কি মনে ক'রে ডাকে 'এ্যাই রিকশা।'
বিয়ে, স্ত্রী, সন্তান ইত্যাকার বিষয়গুলো ভাবতে ভাবতে কোন দূর অতীতের সঙ্গে ক্রম–ক্ষয়িত বিচ্ছিন্নতা চিনচিন করতে থাকে সারা পথ। আবার এখন দেখো, এই ঘন গাঢ় গার্হস্থ্য পরিবেশে সন্তানের মাথায় হাত ভুলোতে ভুলোতে কোন গোপন ছিদ্রপথ দিয়ে উষ্ণ প্রস্রবণ হু হু করে শূন্যতা জলমগ্ন ক'রে দেয়, এবং সেই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
টলটলে জলের ওপর শীতের বাতাসের মতো জাফর মৃদু মৃদু কাঁপে।
ঢাকায় বদলী হবার জন্যে চেষ্টা চালাচ্ছে জাফর। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়তে পড়তে কিছুদিন জার্নালিজম করেছিলো। ঢাকার বিভিন্ন মহলে ওর প্রচুর জানা শোনা লোক। প্রেসক্লাবে পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে বেরুবার সময় ইরফানের সঙ্গে সঙ্গে ওর দেখা। চাকরিটা হয়ে যাবে। সম্ভবত।
চাকরিটা ওর হয়ে যাক ভালোয় ভালোয়-পিতৃস্নেহের মতো ক'রে ভাবে ইরফান-কাছে থাকবে, ধরে, বেঁধে বিয়েটা এবার করিয়ে দিতেই হবে। ভাইগুলো অমানুষ, যার যার নিজের গণ্ডা বুঝে নিয়েছে, বাপ মা হারিয়ে সত্যিকারের অনাথ এখন জাফরই।
সিগারেট পুড়ে আঙুলের গোড়ায় এসে ঠেকেছে। পাশে, টেবিলে রাখা এ্যাশট্রেতে সিগারেট গুঁজতে গুঁজতে দেখে হেনা আসছে আঁচলে হাত মুছতে। একটু স্থূল, ফর্সাটে ধরনের স্ত্রীকে ডিমওলা হাঁসের মতো মনে হয়।
-'আচ্ছা তোমার বন্ধু না বলছিলে ডাকায় বদলির চেষ্টা করছে?'
-'হুঁ।'
-'ভালোই হবে, ধরে বেঁধে একটা ব্যবস্থা করে দেওয়া যাবে।'
ইরফান উৎসাহে ব'সে পড়ে। স্ত্রী না জাফর, কার জন্যে বোঝা যায় না, তার গলার ভেতর আবেগের রসে ভিজে যায়: 'খুব ভাল হবে, খুব ভাল হবে তাহলে।' মাথা ঝাঁকিয়ে বার বার এই কথা ছাড়া আর কিছু বলতে পারে না সে।
প্রথম ঝাপ্টাটা সামলে নিয়ে তারপর থেমে থেমে বলে, এ দায়িত্বটা কিন্তু তোমার।'-ঘাড় বাঁকিয়ে দীর্ঘ কোমল দৃষ্টি ধরে রাখে স্ত্রীর দিকে। বুঝতেই পারছো, আমি বললে ধুস ব'লে উড়িয়ে দেবে, তোমার কথা'...
-'আচ্ছা ওনার বোন-দুলাভাই আছে বলছিলে আছে বলছিলে টিকাটুলিতে।'
-'আরে রাখো তোমার বোন দুলাভাই। তেমন হলে কি আর এতোদিন এমন ক'রে ভেসে বেড়ায় ও।' -ইরফানের কণ্ঠস্বরে বিরক্তি ক্ষোভ, স্নেহ জড়াজড়ি হ'য়ে লেপ্টে যায়।
হেনা আর কিছু বলে না। একটুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর পানের বাটার দিকে এগিয়ে যায়। নীচু হয়ে বাটা টানতে গেলে ভরাট চওড়া পেছনটা আরো বিস্তৃত হয়, আর তার ওপর আলো পড়ে বাতাস লাগা নৌকোর পালের মতো টানটান দেখায়। সেদিকে এক পলক তাকায় ইরফান, কিন্তু কোন কামবোধ করে না। জাফরের বোন-দুলাভাইয়ের কথায় বিরক্ত হলেও হেনা যে জাফরের ব্যাপারটা সিরিয়াসলি নিয়েছে, ও যে ভেবেছে এতোক্ষণ, এ কথা মনে করে খুব ভালো লাগে ইরফানের।
পা লম্বা করে হেনা পান সাজতে বসে। কিছুদিন ধরে এ অভ্যাস শুরু করেছে হেনা, খেয়ে উঠে পান খাওয়া।
একটু মুটিয়ে যাওয়া,ঢিলে ঢালা ক'রে কাপড় পড়া হেনা এই ক'বছরেই কেমন বয়স্ক গিন্নির ভাব এনে ফেলেছে। তারপর এই পান খাওয়া, বিশেষ করে এখন যে ভঙ্গিতে ও পান সাজতে বসেছে-কিঞ্চিৎ কৌতুক বোধ করে ইরফান,-পানে চুন মাখতে মাখতে কি যেনো বলবার জন্যে তার দিকে মুখ ঘোরালে দেখে, ইরফানের মুখে হাসি।
-'হাসছো যে?'
আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
–' তোমাকে ওই ভঙ্গিতে পান সাজতে দেখলে' ...
তার কথা শেষ হয় না, হেনা মুখ কোঁচকায়, বমি রোখবার ভঙ্গি করতে করতে উঠে বাইরে চলে যায়।
চুন মাখা পান পড়ে আছে পাটির ওপর। বাইরে, উঠোনধারে, রকের ওপর থেকে হেনার বমনোদ্যত ওয়াক ওয়াক শব্দ আসছে। খাটের ওপর ব'সে ইরফান এক ধরনের অসহায়তা নিয়ে কিঞ্চিত অপরাধ বোধ করতে থাকে।
রান্না ঘর থেকে কড়া নাড়ার শব্দ শুনতে পায় হেনা। এ শব্দ তাকে একটু অস্থির করে, সে অস্থিরতায় কৌতূহল এবং কম্পন মিশে আছে, কেননা হেনা নিশ্চিত যে, যে ব্যক্তি কড়া নাড়ছে সে তার স্বামীর বন্ধু জাফর।
রান্না ঘরে বসে বসেই দরজা খোলার শব্দ, স্বামীর উৎসাহী কণ্ঠের সঙ্গে আর একটি ভারী গলার স্বর শোনে।
সিমাইয়ের হাঁড়ি নামাতে নামাতে কাজের মেয়েটিকে তাড়া দেয়, 'জলদি কর, কখন কি হবে সব, মানুষ এসে গেলো।'
রান্নাঘরে যখন এই ধরনের মেয়েলী তৎপরতা চলছে, ইরফান তখন বন্ধুকে নিয়ে ঘরের ভেতর এসে বসেছে।
সেপ্টেম্বরের রোববারে, ১১টা ছুঁই ছুঁই বেলা ভারী উজ্জ্বল রঙ ধরেছে আজ। এর সঙ্গে, বন্ধু নিয়ে ইরফান ঘরে ব'সে আছে। বাচ্চা দুটোর সঙ্গে ভাব করছে জাফর। রান্না ঘরে ব্যস্ত স্ত্রী–এইসব মিলিয়ে পরিপূর্ণ গৃহকর্তার যে তৃপ্তি–ইরফানের ভেতর সেই অনুভূতি ভাতের ফ্যানের মতো ক্রমে গাঢ় হয়ে জমতে থাকে।
সিগারেট বার ক'রে জাফরকে দেয়, নিজে ধরায়।
কি করবে ভেবে পায় না। 'বোস' –বলে উঠে রান্না ঘরের দিকে যায়: হেনা চা ঢালছে। ট্রের ওপর চিনেমাটির দুটি বাটিতে সিমাই, তার ওপর নৌকোর দাঁড়ের মতো ক'রে রাখা চামচ। শীতের–সকালের নদীর ওপর কুয়াশার মতো ভাপ উঠছে বাটি থেকে। এক প্লেটে বিস্কুট আর এক প্লেটে চানাচুর।
হেনা আজ গোসল করে নিয়েছে সকাল সকাল। কলাপাতা রঙের তাঁতের শাড়িটা পরেছে। পিঠে এলোনো ভিজে চুল। মুখের একপাশ–থুতনি পর্যন্ত আপেলের ফালির মতো, তার ওপর কটা চুল এসে প'ড়ে আছে পত্রপল্লবসমেত ঝুঁকে থাকা লতার মতো।
পায়ের শব্দে কি ছায়ায় হেনা ফিরে তাকিয়ে দেখে স্বামী চেয়ে আছে। এ দৃষ্টির মানে বোঝে হেনা। সে একটু লজ্জা পায়, খুশিও হয়। তাড়াতাড়ি বলে, 'একটু দেরী হবে, ততক্ষণ চা–টা খাও, গল্প–গুজব করো।'
কাপ পিরিচ তুলে ট্রে–টা ইরফানের দিকে এগিয়ে দিতে গেলে ইরফান ভ্রু ভাঙে, 'এ আবার কি ধরনের ভদ্রতা? জাফর এসেছে, ওর সঙ্গে পরিচয় করতে হবে না? তুমি চলো।'
হেনা চোখে চোখ রেখে হাসে। ইরফান বোঝে স্ত্রীর লজ্জাটা কোথায়। বলে, আরে না, বোঝাই যায় না, পাগল আর কাকে বলে।
–'থাক হয়েছে'; হেনা মেয়েলী ধরনের ঘাড় বেঁকিয়ে হাসি এবং কপট রাগ দেখিয়ে ট্রে হাতে উঠে দাঁড়ায়, 'চলো। ইরফানকে আঁচলটা মাথায় তুলে দিতে বলে। স্বামী কাপড়টা তুলে দিয়ে মুখের কাছে মুখ এনে বলে, 'কনে বৌ!'
–' ধেৎ।'
আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
কাজের মেয়েটির দিকে ইঙ্গিত করে।
পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকতেই পাশে দাঁড়িয়ে ইরফান বেশ নাটকীয় ভঙ্গীতে পরিচয় করিয়ে দিলো।
উঠে দাঁড়াবে না ব'সে ব'সেই অভিবাদন সারবে সম্ভবত এমন একটা দ্বিধা ছিলো জাফরের ভেতরে, দেখা গেলো, লজ্জাটে ধরনের হাসি নিয়ে হেনার দিকে এক পলক তাকিয়ে ছোট্ট করে হাত তুললো, চেয়ারের ওপরেই স্থান পরিবর্তন করলো একটু।
হেনার দু'হাতই জোড়া, সে হেসে মাথা ঝোঁকালো তার আগেই। টী-পয়ের ওপর ট্রে রাখতে তার হাত মৃদু কেঁপে গেলো।
সোজা হয়ে দাঁড়াতেই সামনে চেয়ার দেখিয়ে জাফর তাকে বলে-'বসুন।'
কব্জীতে বাঁধা নীল ডায়েলের ঘড়ি, বাদামী রঙের গালে, জুলফীর নীচে থেকে খানিকটা অংশে ব্লেড্-ঘষা নীলচে আভা, বাঁ কানের লতির ওপর তারার মতো গোল লাল তিলটার ওপর চোখ পড়লো হেনার।
ততক্ষণে, হয়তো বা জাফরকে, যে জাফর এখন কপালে ঝুঁকে আসা চুল ঠিক করে দিচ্ছে মিতুর-তার ভেতরকার আড়ষ্টতাকে বুঝতে পেরে নিজেকে অনেকখানি স্বচ্ছন্দ বোধ করে, এমন কি তার কণ্ঠস্বরে অপরিচিত লজ্জাটে কোন বালক-যে প্রতিমুহূর্তে মাতৃসমা মহিলাটির প্রস্থান কামনা করছে, তার সামনে একটু কৌতুক নিয়ে যেমন নিজের গৃহিনী আত্মপ্রসাদ পায়, তেমনি ভাব চলে আসে। বলে, 'না, বসবো না, কাজ প'ড়ে আছে, আপনারা চা খান, গল্প করুন, আমি আসছি' - বলে হাসে।
যাবার সময় প্রায়-শাসনের ভঙ্গিতে ছেলেমেয়ের দিকে তাকিয়ে বলে, 'মিতু রিপন এখানে এসো।' -'না, না থাক না ওরা।' ব্যস্ত হয় জাফর।
মা'র আদেশ লঙ্ঘনে অনভ্যস্ত মিতু রিপন চলে যেতে উদ্যত হলে তাদের হাতে বিস্কুট তুলে দিতে গেলো জাফর।
দু'জনের কেউই কিছুতেই নেয় না, মাকে অনুসরণ করে।
জানালার বাইরে পাতাবাহার গাছের নীচে শালিকটা একটা আরশোলাকে ঠোঁটে তুলে বাড়ি মারছে, কী সুন্দর গায়ের রঙ পাখিটার, কিভাবে আরশোলাটাকে মারছে-চা খেতে খেতে জাফর দেখে ডোরাকাটা একটা বিড়াল ভারী ধীর গম্ভীর ভাবে হেঁটে এসে পাতাবাহারের ঠিক মাথার ওপর পাঁচিলে বসলো।
অবাকই হয়েছে হেনা।
কাজের মেয়েটিকে সিগারেট আনবার জন্যে ইরফান রান্না ঘরে এলে কাজ করতে করতেই হেনা স্বামীর দিকে তাকিয়ে হাসে, 'এই তোমাদের কাজের?'
-'কেন, কেন?'
মেয়েটি ততক্ষণ সিগারেট আনতে চলে গেছে।
-'এতো লাজুক। রাজনীতি করতো বললে, কলেজে ছেলেমেয়েদের পড়ায় কেমন করে?'
মিতু রিপন মুখ মুছে রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে দেখলো আব্বা জাফর চাচাকে নিয়ে বাড়ি দেখাচ্ছে।
নতুন মানুষটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। রান্না ঘর থেকে মুরগীর মাংসের গন্ধ, পরিচ্ছন্ন কাপড় পরা নতুন চাচা, আব্বা তার সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে, হাত

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
তুলে এটা-ওটা দেখাচ্ছে, সব মিলিয়ে খুব ভালো লাগছে আজ, একটু আগে মা যে জোর ক'রে ডেকে নিয়ে এসেছিলো তার জন্যে এখন আর একটুও খারাপ লাগছে না মিতুর।
ছোট ভাইটিকে সে বোঝায়, 'তারিখ জানবার জন্যে জাফর চাচাকে ক্যালেণ্ডার দেখতে হয় না, জাফর চাচার ঘড়িতেই ক্যালেণ্ডার।'
রিপন কি বুঝল কে জানে, বলে, 'আব্বারটাও ভালো'। মিতু বলে, 'ছাই ভাল।'
খেতে বসে জাফর সারাক্ষণ মুখ নীচু করে ধীরে ধীরে খেতে লাগলো, কথা বললো মুখ নীচু করেই।
হেনা তার পাতে এটা ওটা তুলে দিতে গেলে বাধা দিলো, তাতেও এতো সংকোচ যে, হেনা বলতে বাধ্য হয়, 'তুমি খাওয়াও, আমার জন্যে লজ্জায় উনি ভাল করে খাচ্ছেনই না।'
-'না না, খাচ্ছি তো।'
- 'কোথায় খাচ্ছেন?'
তারপর যেনো হঠাৎ করেই হেনা বলে, 'ঢাকায় বদলি হয়ে এবার একটা বিয়ে করুন।'
মুখ নীচু করে ভাত মাখতে থাকে জাফর। ইরফান স্ত্রীর দিকে চোখ ইশারা করে, 'হ্যাঁ, ঠিক আছে, চলিয়ে যাও',- এমন একটা ভঙ্গি ফোটে তাতে।
-'কি, মেয়ে দেখবো?'
জাফরের মুখে স্পষ্ট কষ্টের রেখা দেখতে পায় হেনা, বোঝে খুব অস্বস্তিবোধ করছে মানুষটা, তার কেমন মায়া হয়, রাগ ও ধরে।
আহারাদি শেষ হলেও ঘরে ব'সে সিগারেট টানতে টানতে দু'বন্ধু গল্প গুজব করতে লাগলো। আর হেনা রান্না ঘরে খাওয়া দাওয়া শেষ ক'রে যতবার এটা ওটার জন্যে এ ঘরে এলো ততবার পাশের ঘরে, পর্দার ফাঁক দিয়ে একটু লোমশ গোল গোল হাতের একাংশ, কব্জীতে বাঁধা নীল ডায়েলে চোখ গেলো, ধীরোদাত্ত কণ্ঠস্বর শুনলো।
শিরিষ গাছের নীচে, বেঞ্চে ব'সে লেকের পানিতে আকাশ এবং গাছের ছায়ার সরে যাওয়া দেখছিলো, সেখানে থেকে কখনো চোখ তুলে ওপারের গাছ-পালা, মানুষজন, ডান দিকে- লেক যেখানে ছাতার বাঁটের মতো বেঁকে গেছে, তার ঠিক ওপরে চুনকাম করা কোন মহাপুরুষের সমাধির একাংশ, রঙ জ্বলে যাওয়া কাপড়ের ছোট্ট সামিয়ানা, তার নীচে গঞ্জিকা সেবী মাস্তানদের কারো কারো হাত কিংবা মাথা, কলা ঝাড়ের পাশে, ঝোপের নীচে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা অধ্যবসায়ী একলা বক, সেখান থেকে আবার লেকের পানিতে চোখ রাখতে স্ত্রী, সন্তান, সংসার নিয়ে ইরফানকে তার মালিবাগের বাড়িতে দেখতে পেলোঃ
চা খেয়ে গল্প-গুজোব ক'রে বিদায় নেয় জাফর।
রিকশা শান্তিনগরের মোড়ে আসতেই রাখালদার রেষ্টুরেন্টে চলে যায়। রেষ্টুরেন্ট থেকে জুবিলী ট্যাংক, তার পাড়ে বসে পরামর্শ শেষে সত্য ভট্টাচার্যের বাড়ীতে যেতে যেতে সন্ধা হয়ে গেলো।
একতলা বাড়ীর উঠোনের এক কোণে তুলসী মঞ্চে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালিয়ে পাড়হীন ধুতি পরা বৃদ্ধা গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করছে।
প্রাচীন ইঁটের জমাট শীতলতা, সদ্যজাত সন্ধ্যার আবছায়া, তুলসীমঞ্চে প্রদীপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
শিখার কোমল লাবণ্য, শ্বেতবসনা প্রবীণার নুয়ে থাকা ভঙ্গীর পবিত্রতা–সব মিলিয়ে চোখ ভিজে আসা কষ্ট।

পদ্মা পেরিয়ে শিলাইদহ কুটির বাড়ীতে আর নামা হয় না, শ্লোগান মুখর, অজগরের মতো বিশাল মিছিল কলেজ গেট পেরিয়ে রাস্তার নামে। রাতের অন্ধকারে দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টারিং করে বাড়ী ফিরতে ফিরতে পত্রিকা অফিস থেকে নাইট শিফটের ডিউটি শেষে নবাবপুর রোড দিয়ে ফিরতে থাকে, হলে ফেরা হয় না, তার আগেই কলেজ ইউনিয়নের অফিসে মিটিং করতে বসে। মিটিং শুরু হতে না হতেই পুলিশের লাঠি চার্জে আহত মিহিরের মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধে। অনবরত বেঁধে যেতেই থাকে, একজন থেকে দু'জন, দু'জন থেকে তিনজন–মিহির থেকে আনোয়ার আনোয়ার থেকে মাহবুব মাহবুব থেকে আবার মিহির আনোয়ার মাহবুব আনোয়ার মিহির মাহবুব–বাঁধতে বাঁধতে ক্লান্ত হয়ে যেতে যেতে মাথা ঝিম ঝিম করে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে কালো হয়ে আসা রমনা লেকের পাড়ে, শিরিষ গাছের নীচে, আলো আঁধারিতে জাফর দুহাতে মাথা চেপে সামনে ঝুকে চোখ বন্ধ করে বসে থাকে।

এগারোটার দিকে ইরফান বাতি নেভালো। ঘর অন্ধকার হতেই মেঝেতে পায়ের খসখস শব্দ এবং সেই সঙ্গে দরোজার পর্দা দুলিয়ে একটি প্রসারিত হাত জেগে ওঠে, শুয়ে শুয়ে হেনা দেখতে পায়, কব্জীতে বাঁধা স্টিল–বডি ঘড়ি চক চক করছে, রেডিয়াম জ্বলছে তার নীল ডায়েলে।

পায়ের শব্দ আরো কাছে চলে আসে, একটা লম্বা গাঢ় ছায়া একেবারে খাটের ঘোড়ায় এসে থেমেছে। অন্ধকারের ভেতরেই হেনা হাসে। ছায়াটি এবার যেন প্লাট ফরমের উপর থেকে চলন্ত গাড়ীতে লাফিয়ে উঠে।

চুপচাপ শুয়ে থাকে সে। যেনো কোনো লোভী বালক অস্থির হাতে চকলেটের মোড়ক খুলছে এমনভাবে আবরণহীন করে হেনাকে।

দুটি ঠোঁট বেপরোয়া চরে বেড়ায় তার ওপর দিয়ে। চোখ বুজে আসে হেনার।

ইরফানের নিঃশ্বাসের গতি বাড়তে থাকে ধীরে ধীরে। বুকের ভেতর ধক ধক করে। বুনো গাছ–পালা এবং সোঁদা মাটির গন্ধ আসে নাকে। বিশ্বস্ত ঘোড়ায় চড়ে সে এখন প্রান্তর অতিক্রম ক'রে চলেছে।

প্রবল গতির তোড়ে হাতের লাগাম ছিন্ন হ'য়ে গেলে সে দু'হাতে ঘোড়ার কেশরময় গলা সাপটে ধ'রে সামনে ঝুঁকে মাথা নীচু করে গতির ভারসাম্য রাখতে থাকে।

–'আচ্ছা তোমার বন্ধু.....

হেনার আঠালো ধ্বনি ফুটে উঠতে না উঠতে ইরফান ভারী নিশ্বাসের সঙ্গে কাঁপা কাঁপা অস্থির কণ্ঠে ব'লে ওঠে, 'আহ্, এখন না, পরে, পরে।'

আর, একজোড়া নিটোল, ঈষৎ লোমশ হাতের পরুষ বেষ্টন হেনাকে বিপুল নীলাভ নক্ষত্র বীথির মধ্য দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে চলে এবং সেই অনন্ত শীতল নৈশব্দের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে সে অনুভব করতে থাকে একটি বাদামী রঙের শরীর মোমের মতো গলে গলে তার ভেতর লীন হয়ে যাচ্ছে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গন্তব্য

ফুলমনির কান্নার কথাগুলো এখন আর বোঝা যায় না। শুধু একটা সুর–ক্লান্ত বিলম্বিত–যেনো সাঁজবেলা পঞ্চু কলুর গোয়ালে মশা তাড়ানোর জন্যে ধোঁয়া দেওয়া হয়েছে, আর সেই ধোঁয়া গোয়াল ঘরের অন্ধকারকে গাঢ়তর ক'রে পুরোনো খড়ের চালের ওপর দিয়ে সন্ধ্যার আকাশে উঠে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

গুমটি ঘরের সান বাঁধানো রকে ব'সে কাগজের ফুল বানাতে বানাতে, অদূরে, – মালপাড়া থেকে ফুলমনির একঘেয়ে বেহালা শুনতে শুনতে ডান দিকে, গেট থেকেকিছু দূরে, রেল লাইনের ওপর থেকে থেকে চোখ যাচ্ছিলো সুখনলালের।

সবটা দেখা যায় না–আঙুল সমেত উর্ধ্বমুখী পায়ের পাতা, হারমোনিয়ামের রিডের মতো সাজানো শাদা শাদা পাঁজর, তার মাঝখান থেকে একটা পাঁজর– যেনো শ্রীলক্ষ্মী অপেরার অখিল নিয়োগী 'সখিরে.....' বলে চোখ বন্ধ করে রিডের ওপর তর্জনী চেপে ধরেছে আর ঘাট থেকে তার স'রে রিডের এক মাথা উঁচিয়ে উঠে আছে।

আজ সকালে ঘুম ভাঙতেই ছ্যাৎ করে উঠেছে বুকের ভেতর। দরজা খুলে চাইবে না চাইবে না করেও চোখ গেছে: লাল রঙের বিশাল কলজেটা অবিকল কাছিমের পিঠের মতো–রোদে, ধুলোয়, শিশিরে কালচে হয়েছে একটু, কিন্তু তেলতেলে মসৃণতা চকচক করছে ঠিকই। তার নীচে, আশপাশে প্লীহা, ফুসফুস ইত্যাদি – যেনো ট্রেন থেকে কারো প'ড়ে যাওয়া হাঁ হয়ে থাকা চটের ব্যাগের ভেতরে ঠাসা নানান আকৃতি আর রঙের জিনিসপত্র।

কাল বেলা তিনটে থেকে নেপাল পড়ে আছে ওখানে।

সুখনলাল তখন খেয়ে–দেয়ে তুলসী দাসের রামায়ণটা খুলে জটায়ু–রাবণের লড়াই দেখছে, এমন সময় উঠতে হলো তাকে। ছানার ট্রেন আসছে।

বাইরে এসেই দেখেছিলো, ঘেঁটুমালের ছেলেটা কঞ্চির মাথায় কাঁচকলা ঝুলিয়ে কয়লা ধরবার জন্যে ঘুর ঘুর করছে লাইন ধারে। সুখনলাল রকের ওপর থেকেই ধমক দিয়েছিলো, 'এখানে কি, যা ভাগ।'

কথাটা ছোকরা কানেই তোলে না।

একবার সুখনলালের দিকে তাকিয়ে, যেনো সে রাস্তার পড়ে থাকা ছেঁড়া কাগজ কি ওই ধরনের কিছু একটা, তারপর খুব মনোযোগের সঙ্গে কঞ্চির ডগার বাঁধনটা পরীক্ষা করতে থাকে।

গেট বন্ধ করে ফেরবার মুখে সুখন আবার বলেছিলো, 'কি রে, গেলি।'

বাঁশের ভারায় ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো গুড়িটার মাঝামাঝি দিয়ে বিশাল কালো করাত–যেনো একটা মানুষকে মাথা থেকে বুক পর্যন্ত দু'চির ক'রে রেখে গেছে কারা।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ছোটখাটো আগাছা ঘেরা জায়গাটার এখানে, জামরুল গাছের ছায়ার নীচে উদ্ভিদহীন, চারপাশে কেশ ময় মাথার মাঝখানে টাকের মতো চকচকে, আর সেখানে শালিক লাফিয়ে লাফিয়ে করাতে কাটা মিহিন গুঁড়োর ভেতর থেকে খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে কি সব।

করাতিরা খেতে চ'লে যাওয়া দুপুরে, ডিষ্টিক বোর্ডের রাস্তার ধারে বাবুরালির কাঠের গোলার পাশে, জামরুল গাছের প্রাণপণ হাত বাড়িয়ে তরফদারদের পোড়ো বাড়ির ভাঙা রক ছুঁতে চাওয়া ছায়ার নীচে বসে শামু সুখনলালের কথাগুলো ভাবছিলো–তার ভেতর: ঘেঁটুমালের ছেলের দু'টুকরো হয়ে প'ড়ে থাকা লাশ, রেললাইন, মালপাড়া, ঘেঁটুমালের বিধবা বউয়ের কান্না, ওপারের পঞ্চু কলুর দোকান, ফনী ডাক্তারের ডোঙা খোলার চালের ডিস্পেন্সারী, পিয়ার মুফতির দরজির দোকান, খাদের পাড়ের বনপালা, গুমটি ঘরের পাশে বাঁখালীর বেড়া দেওয়া সুখন লালের সবজী বাগান, রোদ–সব চলে আসছিলো।

হারাণ পালকে বোঝাচ্ছিলো সুখন, 'সালার কি বদলামিতে পোঢ়নু বাবু, পাঁচ বচ্ছর আচি ইখানে, আপনাদের আর্শীবাদে, রামজীর কিরিপায় কুন ঝুট–ঝামেলা হয়নি কখুনো,এখুন কি ঝামেলা কোরলো ছোকরা–সদর থেকে সায়েব আসবে, বোলবে, সালা সুখনলালের কসুর, তার গেটের সামনে এমন হলো মানা কোরলো না কেনো? আরে বাবা, মানা সোনে কুন সালা। আর বিচারটা দেখুন, কাল থেকে ম'রে পড়ে থাকলো ছেলেটা, এখুনো কুনো সালার টিকির দেখা নেই। সায়েব এসে ইনকয়রী কোরবে, তার আগে লাস ছুঁতে পারবে না কেউ, লেকিন বিচারটা দেখুন–বিটিশ জামনায় এমুন ছিলো বাবু, আপনিই বলুন, এমুন ছিলো দেসটা?'

কাগজের ফুল বানানোতে সুখন গেটম্যামে নাম–ডাকা আছে এ তল্লাটে।

বিয়ের গাড়ি সাজাবে, সুখনলালের কাগজের ফুল চাই: 'সুখন তাড়াতাড়ি করিস, আগাম দিয়ে যাচ্ছি।' –ট্যাক থেকে, তবিল কি পকেট থেকে টাকা বার করে দেয় মানুষ। ষ্টেশনের পানের দোকানগুলোতে সুখনলালের ফুলের তোড়া, ফুলের ঝাড়, ফুলের মালা–রঙ বেরঙের ফুল–যেমন খুশি সাজিয়ে নাও।

জনাই থেকে, চণ্ডিতলা থেকে পাইকাররা আসে, সুকনের কাগজের ফুল কাঁহা কাঁহা মুল্লুকে চলে যায়।

কিন্তু আজ সুখনের মন ভালো নেই–হারাণপাল: 'তাহলে ওই কথাই থাকলো, কাল ৪টের দিকে আসবো–বলে চলে যেতে শামুকে বলে, 'চোখের সামনে এমন এমন একটা কাটা পড়া লাশ আর দিন–রাত মড়া কান্না ভালো লাগে, তুই–ই বল্, ভালো লাগে?'

তাঁতিপাড়া থেকে দুশ্চিন্তা মাথায় বয়ে ফিরছিলো শামু। তাঁতের কাজে তাকে জবাব দিয়ে দিয়েছে সুশীল সাঁতরা, 'না বাপু, আমি আর পারবো না, তুই অন্য কোথাও দ্যাক, গরমেন্ট শালা সুতো নিয়ে মামদোবাজি শুরু করেচে, তাঁতের কারবার ডকে উঠলো এবার।'

শামু ক'দিন ধরেই শুনছিলো সুতোর টানাটানি চলছে, এর জন্যে সুশীল সাঁতরার পাঁচটা তাঁতের ভেতর দুটো তাঁত বন্ধ ক'রে দিতে হ'বে, তার চাকরি যাবে হুট বলতে–এতোটা ভাবেনি সে।

তা কাপড় না বুনলে মানুষ পিদবে কি, মানপাতা?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
পয়সা কড়ি তার পাওনা-দেনা ছিলো না। খালি হাতেই ফিরতে হয়েছে।
ইনুসের রঙের ভাঁটিতে গিয়েছিলো, সেখানেও এক কথা, সুতো নেই, তার কর্মচারীদেরই জবাব দিয়ে দিচ্ছে, শামু অন্য কিছু দেখুক।
কি দেখবে অন্য কিছু, কাজ কি লাফাচ্ছে।
জাহানের দোকান থেকে গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে মানুষের, মাটি লেপা চৌকো চুলোর ওপর ধোঁয়া আর আগুনের আঁচে কালচে পেটমোটা কেটলি দু'টো দেখা যাচ্ছে
জুয়া চলছে তাসের! কী যে পায় ওতে!
ওয়াগান ভাঙা সগু, যাত্রা পার্টির রাহাত, জাহান নিজে, বজলু ডাক্তারের আই, এ, ফেল করা ছেলে রকিব.... সকাল দুপুর বিকেল, সাঁঝ কিরাতের এগারোটা পর্যন্ত কেউ না কেউ ঠিকই আছে।
রাগ ধরে কালাম মাষ্টারটার ওপর, জোয়ান বয়েস, বি,এ, পাশ দিইচিস, জ্ঞানমান ছেলে, স্কুলে মাষ্টারী করিস, তুই কেনো ইসবের ভেতর থাকবি!
স্কুল ছুটি হলো তো এখানে এসে বসলি, রাত দশটাই কি এগারোটাই কি।
এই না হলে কি দেশের এমন অবস্থা।
তার ছেলে দু'টোর একটা থিরি একটা ওয়ান কেলাসে পড়ে। মাগীর খাঁই ছেলেদের ইশকুলে পাটাতে হবে। যেন ইশকুলে গেলেই জজ বালেষ্টর হবে। ল্যাওড়া হবে। বি, এ, পাশ ক'রে গ্রামের ইশকুলে একশো পঁচিশ টাকার মাষ্টারী আর জাহানের দোকানে জুয়া খেলা এই তো! কি বজলু ডাক্তারের আই, এ, ফেল-করা-ব্যাটার মতন বেকার হয়ে বাপের মাতার ওপর ব'সে ব'সে খাওয়া।
শামুর ছেলে কুনদিন বি, এ, পাশ দিতে পারবে না। আই, এ, ফেলও নয়। তাহলে আর কেনো মাস গেলে অতোগুনো টাকার মাইনে গো।
এইসব ভাবতে ভাবতে নাদু মাতালের মতো টলতে টলতে দেড়টার বাস এসে থামলো ছামদির দোকানের সামনে।
ফজলের মা নামলো বউকে নিয়ে। মরা ছেলে বিয়োবার পর থেকে ভুগছে বউটা। শামু ঠিক আন্দাজ করে, বড়া হাসপাতাল থেকে আসছে।
বাস ছেড়ে দিলো। ধূলো উড়িয়ে গজরাতে গজরাতে খোয়া ওঠা রাস্তায় ঘষ্টাতে ঘষ্টাতে বাসটার চলে যাওয়া দেখতে দেখতে মাছের শূন্য ডালা মাথায় তিনজন মেছুনিকে আসতে দেখলো। মেছুনিদের দেখতে দেখতে কৈ মাঝ ভাজা, ঘন ক'রে রাঁধা ডাল আর ভাপ ওঠা থালা ভর্তি জুঁই ফুলের মতো ভাতের কথা মনে হলো, আর মনে হ'তেই ক্ষিদে পেতে থাকে সঙ্গে সঙ্গে।
মাছ ভাজা, ডাল আর ভাতের কথা আগে মনে পড়লো, না ক্ষিদে তার আগে থেকেই পাচ্ছিলো ঠিক করতে পারে না।
তিন বয়সী তিনজন মেয়ে মানুষ হেঁটে যাচ্ছে। তিন জনের তিন রকম শরীর, তিন রকমের চলা ভঙ্গি।
কালচে হয়ে যাওয়া শাদা থান পরা কালো শুকটে বুড়িটার পাশের মেয়ে মানুষটার ওপর দৃষ্টি ধ'রে রাখে:
এক ছেলে মা, রকে ব'সে মাই দেয় বাচ্চাকে, রান্নাবাড়া করে, বাজারে হাজারো লোকের ভেতর বসে কখনো হেসে কখনো রেগে চিৎকার ক'রে রোজগার করে। রাতের বেলা বিছানায় শুয়ে মাতাল স্বামীর ঢেঁকির পাড় খায়। তাইতো মাগীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
গতরের অতো খোলতাই, চলনের অতো বাহার। পাশের ডুরে শাড়ি পরা বছর তেরোর মেয়েটা বোধ হয় বুড়ির নাতনী।
শামুর নিজের বউটার কথা মনে হয়: দাঁত উঁচু, কালো, নাক চ্যাপ্টা, ঠোঁট মোটা, প্যাঁকাটির মতন সরু মাগীটা তার বউ।
শালা দুনিয়ার যতো ভালো ভালো মেয়েমানুষ সব অন্য লোকের দখলে।–তার সঙ্গে চাকরিহীন ভবিষ্যৎ, রেল লাইনে কাটা পড়া ঘেঁটু মালের ছেলে, ওয়াগন ভাঙা সগুদের দলে ভিড়বে কিনা–এইসব মারমুখী ভাবনা পাওনাদার কাবলীর মতো 'সালে হারামখো'র বলে লাঠি উচিয়ে তেড়ে আসতে থাকলে উঠে পড়ে সে।
'মরে ছোকরা ভালোই করেচে, শালার বেঁচে থাকার শতেক জ্বালা।'–এই রকম একটা মতামত দিয়ে ফেলে সে মনে মনে।
জুলাই মাসের চিড়বিড়ে রোদে হাঁটতে হাঁটতে শামু নিজের ওপরই ক্ষেপে ওঠে, কী দরকার ছিলো তার জন্মাবার।
এই কথা ভাবতে গেলেই তার মাথার ভেতর দুমদাম বোমা ফাটতে থাকে: শালার ব্যাটা শালা মজা মেরে ড্যাঙ ড্যাঙ ক'রে চলে গেলো না এক ছটাক চাষের জমি না কিছু ইঁদুরের গত্তোর মতন মাটির একখানা ঘর, চালের পুরোনো খড় ঝুর ঝুর ক'রে ঝ'রে পড়ছে, সামনে বর্ষা, ঘর–বার সমান হয়ে যাবে, আর তার কাছে পয়সা নেই–ঘরে মাগ ছেলে, পেটে ক্ষিদে–কুকুরের মতন ফ্যা ফ্যা ক'রে ঘুরে ফেরা–এই তো।
তারপর ধরো বে করা–'আমি কুনদিন মরে যাই, বাপ মরা ছেলে কোতা কোতা ভাসবে, বৌ ঘরে এনে সংসার ক'রে দিয়ে মরলে, মরেও সুখ।'
মা মার মতন ভেবে বে দিয়ে গেচে, বউ বউয়ের মতন ভাবে, তার সংসার, তার সুখ–চাকরি নেই শুনলে শালীর মেজাজ যাবে খারাপ হয়ে, হাতে নেই পয়সা, খিটিমিটি লাগবে–সুখটা কুনখানে।
মল্লিকদের পাঁচিল ঘেরা গেটওলা বাগানের সামনে আসতে আসতে থেমে গেলো। এখানটায় উঁচু ডাঙার ওপর বাঁশ ঝাড় রাস্তার অনেকখানি ছায়া করে রেখেছে, বাগানের পাঁচিল ঘেঁষে গুঁড়ো দুধের মতন ধূলো–ওঠা কাঁচা রাস্তা সটান নেমে গেছে স্কুল মাঠের পাশ দিয়ে, ভাগাড়ে পাড়ার ধার দিয়ে সোজা তিষের দিকে।
শামু একবার সে দিকে তাকায়, গোরুর গাড়ির চাকর 'লিক'ওলা রাস্তা তার প্রায়–আবরুহীন–উঠোন পেরিয়ে খোড়ো চালের এখানে মাটির ঘরের ভেতর সেঁধিয়ে যায়।
শামু বাঁশ–ঝাড়ের ছায়ার নীচে দাঁড়িয়ে কোমরের গামছা খুলে বাতাস খায়, তার মাথার ভেতর এতক্ষণ পাক খেতে থাকা ধোঁয়া একটু একটু ক'রে হালকা হতে থাকে। ডিষ্টিক বোর্ডের রাস্তার ওপর যতোদূর দৃষ্টি যায় কী সুনসান। মল্লিকদের বাগানের গেট পেরিয়েই সান বাঁধানো চাতনওলা ঘাট,–বড়ো স্নানের ইচ্ছা হয় তার।
রাস্তা পেরিয়ে বাগানের ভেতর ঢোকে।
পুকুর ঘাটের সিঁড়ি ধাপে ধাপে নেমে গেছে পানির নীচে পর্যন্ত, নেয়াপাতি ডাবের মতন টলটলে পানি তাকে বাহু মেলে ডাকে।
পাড়ের চারপাশে ছোট ছোট বনপালা, ঘাস, কলাঝাড়, আম, লিচু, কুল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
পেয়ারা, কাঁঠাল, আর পাঁচিলের ধার ঘেঁষে সার সার নারকেল গাছ গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাগানের পেছন দিকের পাঁচিল খানিকটা পড়ে গেছে। গাছপালা, ঝোপঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে কাঁকড়াকুলের জলার খুব সামান্য খানিকটা অংশ– স্বপ্নে দেখা কোন সুদূর মাঠের মতন মনে হয়।
ঘাটের শেষ রানার ধারে কলমী শাকের একটা দঙ্গল–তর্জনীর নিষেধের মতন কলমী ডগার একটিতে গোঁয়ার ফড়িংটা হাইজাম্প দেয় বারবার।
পায়ে পায়ে সিড়ি দিয়ে নামে শামু, কাঁঠাল তলায় মটমট শব্দ শুনে মুখ তুললে দেখে: ঝাঁকড়া–মাথার চারা কাঁঠাল গাছটার ডালপাতা নড়ছে, চতুর্থ ধাপের ওপর বাঁ পা ঝুলে থাকে, তৃতীয় ধাপের ওপর ডানপায়ে দাঁড়িয়ে থমকে যায়: কোমরের নীচে শাদা শাড়িতে মোড়া স্ফীত শ্রোণীদেশের টান টান বাঁকানো রেখার খানিকটা অংশ বনপালার ফাঁক দিয়ে শুক্লা দ্বাদশীর চাঁদের মতো জেগে আছে।
মাথার ভেতর কোন গোপন ঝাঁপি থেকে কুণ্ডলী পাকানো সাপটা মুহূর্তে ফণা ধ'রে দাঁড়িয়ে যায় শামুর। নাক দিয়ে সাপের জিভের মতো নিঃশ্বাস আসা–যাওয়া করে।
ছোট ছোট আগাছা আর ঘাস মাটি মাড়িয়ে ভারী ধীর শান্ত–যেনো ছাগলের জন্যে কাঁঠাল পাতা ভাঙতে থাকা ওনো হাড়ির বিধবা মেয়েটাকে দেখেনি সে, যেনো এইমাত্র বাগানে ঢুকে আনমনে হেঁটে আসছে, হয়তো দাঁতন করার জন্যে নিমের চারা খুঁজতে, কি অমনই কিছু একটা।
খালি গায়ে দু'হাত তুলে ডাল ভাঙতে গিয়ে কামিনীর বুকের কাপড় ঢিলে হয়ে গেছে, আর তার বগলের ফাঁকে কালো শরীরের ভেতর কিঞ্চিত ফর্সাটে– ঠেসে হাওয়া ভরা বেলুনের মতো মাইয়ের একাংশ দেখে চোখ জ্বালা ক'রে ওঠে শামুর। মাথার ভেতর বনবন করে কুমোরের, ঢাকা ঘোরে, ছিপছিপে কাদাময় পানি ছিটকে ছিটকে পড়ে। বুকের ভেতর মাকু চলে খটা খট খটা খট।
পাতা ভাঙতে ভাঙতে কামিনী পায়ের শব্দে না কি কারণে যেনো ঘাড় ফেরালে শামুকে দেখতে পায়, লোকটা নারকেল গাছের কাঁদির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে এদিকে আসছে।
কামিনী গায়ের কাপড় ঠিকঠাক করে, ভোঁদড়ের মতো মুখ উঁচু করে ডাবের কাঁদি দেখতে থাকা খাঁ পাড়ার লোকটাকে দেখে হাসিপায় তার।
মাটিতে প'ড়ে থাকা পত্রময় ছোট ছোট ডাল পালা গুছোতে থাকে নীচু হয়ে।
কাগজের ওপর রবার ঘষলে পেন্সিলের লেখা মুছে গেলেও যেমন খুব আবছা ছাপ থেকে যায়, হাসিটিও ঠিক তেমনি থেকেই যায় তার ঠোঁটের দুই কোণে।
ঝাঁ ঝাঁ দুপুর, জুলাই মাসের রোদে নতুন টিনের পাতের মতো চকচকে শাদা থির হয়ে থাকা পুকুরের পানি, বনপালা, ঘাসমাটি থেকে ঝাঁঝালো, চাপা, সোঁদা, নোনা গন্ধ পাঁচ তরকারীর মতো মিলেমিশে একটা গন্ধ হয়ে আছে। গাছের মাথায় কাক ডাকছে কোথাও দূরে।
এই দুপুর, এই নির্জনতা, এই বনপালা আর গন্ধ শামুকে ভারী সাহসী ক'রে দেয়।
কাঁঠাল গাছ সমেত কামিনীকে মাঝখানে রেখে শামু বৃত্ত রচনা করে, শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার প্রস্তুতি নিতে থাকা বাঘের মতো তার পা, শরীর এখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
নির্ভার একটি সরল রেখা হয়ে মৃদু মৃদু কাঁপে।
পাতা গুছোতে গুছোতে কামিনী টেরপায় হাত কয়েক দূর দিয়ে ঘুরে যাচ্ছে লোকটা। গা শির শির করে তার।
শামু ভারী অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটতে হাঁটতে জাল গুটিয়ে আনার মতো ক'রে বৃত্তের পরিধি ক্রমে ছোট ক'রে আনতে থাকলে কামিনী সটান দাঁড়িয়ে পড়ে। চোখে মুখে তার হরিণীর বিহ্বলতা।
বাঘ হরিণী শিকার করে।
মুখের ভেতর ঠেসে ধরা গামছার খসখসে নোনা অস্তিত্ব বাকরোধ করে কামিনীর। তার সঙ্গে ভারী বিকট গন্ধ নাক এবং গলা দিয়ে ঢুকে গিয়ে বমনকে জাগাতে থাকে।
খুব অস্পষ্ট গোঁ গোঁ শব্দ নিয়ে কামিনী যতোই গা মোড়ামুড়ি করে বেরিয়ে যাবার জন্যে, শামুর শক্ত বাহু আর ঘেমো শরীর ততোই পাকে পাকে খাঁজে খাঁজে কামড়ে বসতে থাকে।
শামুর চোখের মনিতে তীরের মুখের ধার আর চারপাশে সেঁকো বিষের মতো লেপ্টে থাকা লোভ, গলানো সীসের মতো গরম নিঃশ্বাস, শরীরের পরুষ গন্ধ আর আখ মাড়াইয়ের কলের ভেতর পুরে দেওয়া আখের মতো কামিনী শামুর বাহু বেষ্টনের ক্রমাগত চাপে খুলে খুলে পড়ে, চোখের ওপর থেকে গাছের ডালপালা আর আকাশ হঠাৎ ঝাঁকুনি খেয়ে ওপরে উঠে যায়। তার পিঠ মাটি স্পর্শ করে।
খেতে শুরু করে শামু। খাবলে খাবলে মাংস খায়, রক্তপান করে চেঁটে-পুটে। তার ঘন গরম নিঃশ্বাস, কামিনীর রক্তের ক্রমসঞ্চারিত বাষ্প মিলেমিশে বায়ু স্তরে হাল্কা সরের মতো জমে।
নাভির নীচে বিদ্যুতের ফলা চলে যায়। চিড়িক ক'রে ওঠে মাথার ভেতর। মুখ থেকে গামছা টেনে বার করে নিয়ে শামু কামিনীর ঠোঁটের ওপর ঝুঁকে পড়তে গেলে সে থু থু ক'রে থুতু ছুঁড়ে দেয় তার মুখে।
মুহূর্তের মধ্যে কি যে হয়ে যায় শামুর-কামিনীর কাঁধ এবং পিঠের নীচে রাখা হাত দুটোকে খাপ থেকে তলোয়ার খোলার মতো স্যাঁ ক'রে বার ক'রে, নিয়ে কামিনীর ঠিক টুঁটির ওপর চেপে ধরে। চেপে ধরতেই সে হাত আর তুলতে পারে না। তার তিরিশ বছরে জমে।
থাকা হাজার হাজার মণ ভার এসে পড়ে তার ওপর।
নরম মাংস, নরম হাড় চ্যাপ্টা ক'রে ব'সে যেতে থাকে। কামিনীর চোখের ওপর আকাশের অনেক বেশী অংশ প্রতিফলিত হ'তে থাকে ক্রমে। সেই বিপুল আকাশের ভার সহ্য করতে না পেরে চোখ দুটো একসময়ে একেবারে মরে যায়।
কামিনীর মাথা একপাশে ঢলে পড়ে, গলাটা ভাঙা পুতুলের মতো লল্লড় করে, জিভটা বোকার মতো দুই ঠোঁটের মাঝখান দিয়ে মুখ বার করে চেয়ে থাকে। কি বলতে চায় কে জানে।
এইসব ব্যাপার-স্যাপার দেখে শামু খুব ভড়কে যায়। মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে যাচ্ছাবা।'
এমন ম্যাড়াকার্ত্তিকে চেহারা হয় তার চোখ-মুখের যে, বেঁটে কুলগাছটার ওপর বসে থাকা টুনটুনিটাও ফিক করে হেসে উড়ে যায়।
আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
পিঠের ঠিক শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে সরু সুতোর মতো একটা বরফ-হিম স্রোত ধীরে ধীরে ঘাড় থেকে পিঠ, পিঠ থেকে কোমর পেরিয়ে একেবারে শেষ মাথায় নেমে যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীর জুড়ে ম্যালেরিয়া জ্বরের মতো কাঁপুনি, মাথার ভেতর পুলিশের বুটের আওয়াজ চলে, হাঁটু, কোমর কাঁধের গ্রন্থিগুলো সব খুলে খুলে পড়ে-যেনো গোটা শামুকে হাত-পা, ধড়, মুণ্ডু সব আলাদা আলাদা ক'রে ছোট একখানা বাক্সের ভ'রে নিয়ে যাওয়া যাবে।

দাঁড়িয়ে থাকা শামুর পায়ের নীচে উদোম কামিনী চিৎ হয়ে পড়ে আছে। মাথা সমেত এক পাশে ফেরানো মুখের একাংশে বিশ্রস্ত চুলের ফাঁকে বিস্ফারিত চোখ, জলায়ু থেকে বেরিয়ে আসা নবজাতকের হাতে মতো দুই ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে প্রসারিত জিভ, বিশাল কালো কাঠামোর ওপর যুগল মৌচাক-যেনো, হাত নেড়ে মৌমাছিগুলোকে এখনই তার দিকে লেলিয়ে দেবে কামিনী।

শামুর দুই পা মাটিতে ব'সে যেতে থাকে। ডান পায়ের ওপর ভর দিয়ে বাঁপা তুলতে গেলে ডান পায়ের পাতা, গোড়ালি,গোড়ালী থেকে উর্ধ্বাংশ পেরিয়ে হাঁটু পর্যন্ত পুঁতে গেলে সে হাঁসফাস করতে করতে বাঁ পায়ের ওপর ভর দিয়ে ডান পা তুলতে যায়, জুলাই মাসের খটখটে মাটিতে তাঁর বাঁ পা ভসভস করে পুতে যেতে যেতে হাঁটু পর্যন্ত এসে ঠেকলে দম বন্ধ হয়ে আসে। চুলো থেকে নামিয়ে রাখা দুধের মতো রক্তে সর পড়তে থাকে ঠাণ্ডায়, তবু সারা শরীরে কুল কুল করে ঘাম চুঁইয়ে নামে। জিভ, গলা, বুকের ভেতর কেউ একখানা কড়কড়ে মাড় দেওয়া নতুন শুকনো গামছা বিছিয়ে রেখেছে। মাথার ভেতর বুটপরা পুলিশ মার্চ করে। গাছপালা, আকাশ, মাটি নিয়ে চারপাশ থরথর কেঁপে উঠে দপ ক'রে নিভে যায়। ভারী, কালো পর্দার ওপারে নাগরদোলা ঘোরে। শামু সেই নাগরদোলার পায়া ধরবার জন্যে উর্ধ্বমুখী লাফ দিলে তার দু'পা-ই মাটি থেকে উঁপড়ে উঠে আসে।

আবার গাছপালা, স্থির জল, মাথার উপর বিপুল শূন্য মহাকাশ পায়ের কাছে চিৎ হয়ে পড়ে থাকা বিকট কামিনী -যেনো অন্ধকার সিনেমা হলে ছবি শেষে আলো জ্বলে উঠেছে।

বাইরে কে যেনো কাকে ডাকে। গরুর গাড়ী যাওয়ার শব্দ আসে। আকাশ কাঁপিয়ে উড়োজাহাজ যেতে থাকে। তার ভারী, গম্ভীর, জমকালো শব্দের ভেতরও শামু বুকের ভেতরকার মাকু চলার আওয়াজ শুনতে পায় স্পষ্ট। মাথার ভেতর সবুট পদধ্বনি অবিরাম বাজে।

শামুর চুল সব শাদা হয়ে আসে। মাংস আর চামড়ার টানটান বাঁধন আলগা হয়ে আশি বছরের কোমর ভাঙা পথশ্রম ক্লান্ত বৃদ্ধ শামু হাঁপাতে হাঁপাতে ভাঙা পাঁচিলের ফোকরা গলে কাঁকড়াকুলের জলায় নামতে নামতে হাত পা ধড় মুণ্ডু সব তার খুলে পড়ে একেবারে।

সূর্য মধ্য আকাশ থেকে নামতে শুরু করেছে অল্পক্ষণ আগে, সেই দয়াহীন সূর্যরশ্মি এখন সরাসরি শামুর চোখে মুখে এসে পড়ছে। শামুর ছানি-পড়া চোখে মাঠ, দিগন্ত রেখা, দূরে-ডানে বাঁয়ে ছায়াঘন গ্রামের আউট লাইন ভারী ঝাপসা ঠেকে।

মাথা বুকে নেমে আসে তার। পা ভেঙে ফোল্ডিং চেয়ার তবু সে উঠে দাঁড়ায়। সমস্ত শরীরে মাঘ মাসের জাড়ের কম্পন নিয়ে শামু টলোমলো হাঁটে। ঘুমে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
চোখের পাতা জুড়ে আসতে চায়, নিজের পদশব্দে নিজেই চমকে ওঠে, আল ছেড়ে সে জমিতে নেমে পড়েছে–দেখে, ঐ দূরে তার গ্রামের একলা তাল গাছ দারোগার মতো সটান দাঁড়িয়ে আছে।
তিন দিক খোলা রান্নাঘর থেকে আয়াতন বেরিয়ে আসে,
–'কি হয়েচে?'
–'না কিছু নয়, এক গেলাস পানি দে তো।'
ভারী হয়ে থাকা জিভে কথাগুলো ডিগবাজি খেয়ে একে অপরের ওপর হুড়মুড়িয়ে পড়ে।
–'খাবেনে?'
–'না'।
টলতে টলতে রকে ওঠে কোনমতে। আয়তন ভ্রু কুঁচকে স্বামীকে লক্ষ্য করতে করতে উদ্বিগ্ন হয়ে এগিয়ে গিয়ে বাহুমূল ধরেঃ 'কি হয়েচে?'
শামু কোনো কথা বলে না।
ঘরের ভেতর এসে স্ত্রী পাটি বিছিয়ে বালিশ পেড়ে দিলে সে সটান শুয়ে পড়ে।
আয়াতন খানিক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে শেষে পানির জন্যে চলে যায়।
শামু ভাবে, সে যদি পিপঁড়ে হতো, ইঁদুর হতো, কিংবা সাপ। কী সহজেই না তাহলে লুকোনো যেতো নিজেকে! আর তার চোখের পাতা জড়িয়ে আসে। মোটা কাঁথার নীচেও শীত কাটে না। মাথার ভেতরকার বুটের শব্দ কখনো উঠোনে, কখনো পৈঠে বেয়ে মাটির রকে, কখনো, দরজায় এসে থামে। আর চড়াৎ চড়াৎ তার আচ্ছন্নতা কেটে যায়।
খটাখট মাকু চলে বুকের ভেতর। করকরে জ্বালা জ্বালা করা চোখে দেখে বাইরে শকুনের ডানার মতো ছায়া নামছে। আবার সে তন্দ্রার ভেতর চলে যায়।
একেবারে অবোধ শিশুর মতো মনে হয় এখন শামুকে। যেনো তার মা এই মাত্র ইনিয়ে–বিনিয়ে গান গেয়ে, গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে পুকুর ঘাটে গেছে।
আয়াতন ছেলে দু'টোকে খাইয়ে দাইয়ে ইস্কুলে পাঠিয়ে স্বামীর জন্যে অপেক্ষা ক'রতে ক'রতে শেষমেষ 'দুত্তেরি বাঁ–পা'র লোক কখন আসবে'–বলে কিছুক্ষণ আগে খেয়েদেয়ে হাঁড়ি থালা গুচোচ্ছে এমন সময় টলতে টলতে স্বামীকে আসতে দেখে।
জ্বর নেই, মদ–তাড়ি খায়নি, অমন করে এসে এখন এই গরমের দুপুরে কাঁথা মুড়ি দিয়ে সটান প'ড়ে আছে।
পুকুর ঘাটে এই সব ভাবতে ভাবতে আয়াতন বাসন মাজে।
ঘুম ভেঙে যায় শামুর।
ভোর হচ্ছে। ভোরের মিষ্টি তাজা হাওয়া এসে লাগছে তার গায়ে, চোখে বেশ টাটকা একটা ভাব নিয়ে আরামে হাই তুলতে গেলেই ধ্বস ক'রে বুকের ভেতর পাড় ভেঙে পড়ে, নির্ঝঞ্ঝাট টাটকা ভুল ভোরটা মুহূর্তের মধ্যে ফাঁসির কালো টুপি প'ড়ে দাঁড়িয়ে যায়।
কোনকালে ক্যালেণ্ডারে দেখা ক্ষুদিরামের ফাঁসির ছবি থেকে ফাঁস লাগানো দড়ি উঠে এসে বাঁশের আড় কাঠ থেকে ঝুলতে ঝুলতে তার দিকে নেমে আসতে থাকলে সে চকিতে উঠে ব'সে পড়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
আয়াতন হাঁড়ি-থালা ধুয়ে ফিরতে ফিরতে উঠোন থেকে ঘরের ভেতর স্বামীকে দেখে।

আয়াতনের হাতে ধোয়া থালা-বাসনের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কি যেনো মনে পড়ি পড়ি ক'রেও পড়ে না শামুর।

ঘর থেকে বেরিয়ে রকে এসে দাঁড়ায়। শামুর পা টলে। পেটের ভেতর ক্ষিদে খামচে থাকে। মাথার ভেতর যেনো অসংখ্য পেরেক পুঁতে রেখেছে। মুখের ভেতর তেতো কষটে স্বাদ।

বউ বলে 'কোতা যাচ্ছো, শরীর খারাপ বললে?' শামু কোন উত্তর দেয় না, বউয়ের দিকে ফিরে তাকায় না। বাড়ীর বাইরে বেরিয়ে এসে বিকেল শেষ হয়ে আসা আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেয় একবার। তারপর বড়ো ধীরে শান্ত পদক্ষেপে মালপাড়ার গেটের দিকে এগোতে থাকে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নির্বাসিত একজন

প্রকাশকাল: ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নির্বাসিত একজন

হাঁটতে হাঁটতে ডাক শুনতে পেলাম, খোকা শোন!
তাকিয়ে দেখি গৌরদা দোকান থেকে হাত নেড়ে ডাকছে। পায়ে পায়ে উঠে এলে চাপা গলায় বলে, শহরের হাওয়া বেশ গরম, কখন কি হয় বলা যায় না, তুই দেশে চলে যা।
গৌরদা এবং তার কর্মচারী ননী ছাড়া আর কেউ নেই, তবু এমন সতর্ক গলায় গৌরদা বোধহয় অবস্থার রূপটি ফুটিয়ে তুলতে চায়। আমি তার দিকে তাকালে গৌরদা বলে, রায়টের খবর শুনিসনি? এবার গলায় বিরক্তি। তুই আজই শহর ছেড়ে চলে যা। গৌরদা আবার চাপা গলায় বলে।
হাফপ্যান্ট পরে এই শহরে এসেছিলাম কাজ শিখতে। হীরা সিং এর ক্লীনার। ট্যাকসী ধোয়ামোছা করি, বালতি বালতি পানি ঢালি রেডিয়েটরের মুখে। প্যাসেঞ্জার জোটাই। শ্রীরামপুর ট্যাকসী স্ট্যান্ডে আমি হয়ে গেলাম 'খোকা'। বাবা মার দেওয়া নামটা চাপা পড়ে গেলো। 'গৌরাঙ্গ বস্ত্রালয়' তখনো এতো জমজমাট হয়নি। গৌরদার মাথায় এমন চকচকে টাক পড়েনি। তেল চিটচিটে ধুতি আর নীল রঙের ঢলঢলে হাফশার্ট পরে চরকির মতো ঘুরে বেড়াতো: শ্যাওড়াফুলি, ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, চন্দননগর, হাওড়ারহাট, বড় বাজার। মাঝে মাঝে মুষড়ে পড়তো। কার্তিকের দোকান থেকে বিড়ি কিনতে কিনতে বলতো: না, জীবন ভর শুধু দুঃখই করে গেলুম, সুখের মুখ আর ভগোবান দেখালো না।
–আরে ধুর, মদের গেলাস আর বাজারের মেয়েমানুষ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ আবার দুঃখ কিসের! ও শালা সব চিন্তার ফুলষ্টপ...হা হা,হা,.....হাসতে হাসতে পিয়ারুভাই বলতো।
গৌরদার কর্মচারী আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। রক থেকে নেমে এলাম।
ফেরবার পথে স্ট্যান্ড হয়ে এসেছিলাম। শঙ্কর গাড়ির বনেট তুলে রেঞ্জ হাতে ঝুঁকে রয়েছে ইঞ্জিনের ওপর আর থেকে থেকে গালাগালি করছে : সব শালা ছোট লোক,এক মাস হয়ে গেলো টাকা নিয়েচে, দেবার নাম নেই, ইদিকে মাগীবাড়ি যাবার টাকার অভাব হয়না, সব শালা খানকির..
–এই শঙ্কর। আমার গলার আওয়াজে কি যেনো ছিলো। শঙ্কর চমকে তাকালো। আরে খোকা যে... কেমন যেনো জোর করে হাসতে গিয়ে থমকে গেলো। আমি ওর চোখের ওপর চোখ রেখেছি। দৃষ্টি ক্রমশ: সরু হচ্ছে। জ্বালা করছে। স্পীডোমিটারের কাঁটার মতো রক্ত ওঠানামা করছে পা থেকে মাথায়।
–অমন করে সবাইকে গাল দিবিনে। আবার বললাম: সবাই তোর কাছ থেকে টাকা নেয়নি। নিজের গলার আওয়াজে নিজেই চমকালাম। কেমন সুরহীন,মোটা,কর্কশ আওয়াজ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মাধব আর ফণি চারমিনার টানছিলো একটু দূরে বসে। ওরাও চনমন করে উঠলো। শঙ্কর রেঞ্জ হাতে আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছে আমাকে। আমার চোখের সামনে এখন আর কিছু নেই-শুধু দেখছি শঙ্করের মুখে চারমিনার জ্বলছে, ঠোঁটের এক পাশে কামড়ে ধরা চারমিনার থেকে ধোঁয়া উঠছে। শঙ্করের মুখ কেমন চকচকে আর ধারালো হয়ে আসছে, দুচোখের খুব ভেতর থেকে সরু পাকানো সুতোর মুখে আগুন দিয়ে কেউ একবার সামনে এগিয়ে দিচ্ছে একবার পেছনে টেনে নিচ্ছে।

মাধব আর ফণি কাছে এসে পড়েছে ততক্ষণে। এক দৃষ্টে চেয়ে আছে আমার দিকে। অন্যদিনের মতো কোন রকম ঠাট্টা বা কৌতুক করলোনা। আমি আবছা ভাবে দেখতে পাচ্ছি আমার পাশে ওরা এসে দাড়িঁয়েছে।

-তুই কি বলতে চাস ? শঙ্করের গলা চিড় খেলো।

-সে তো তু-ই ভালো করে জানিস। আমার বুকের ভেতরে যেনো বাতাস পাক খাচ্ছে

-তার মানে?

-নৃপেনের সঙ্গে কথা পাকা হবার সময় তো আর আমি ছিলাম না! শঙ্করের দু'চোখ কেঁপে গেলে যেনো। এক মুহূর্তে থামলো। বুঝি বা সামলে নিলো নিজেকে।

-কি কথা বলচিসনি ক্যানো ? সুযোগ পেয়ে চেপে ধরলাম।

শঙ্কর তখন কি করবে ভেবে পাচ্ছিলো না। ঝট করে পাশে পড়ে থাকা ষ্টার্টারটা তুলে নিলো। ফণি হাঁ হাঁ করে উঠলো, এ্যাই শঙ্করদা, করিস কি? খুনোখুনি করবি নাকি তোরা?

-না ফণি, তুই ছেড়ে দে। ওর মেজাজ দেখানোটা একবার ছুটিয়ে দিই।

-এই বাঁদর কি হচ্ছে তোদের?

ধীরেনদা কখন উল্টো দিক থেকে এসে গেছে আমরা লক্ষ্য করিনি কেউ, শঙ্করের হাত থেকে স্টার্টার তখন ফণির হাতে। শঙ্কর হাঁপাচ্ছে, বুক ওঠানামা করছে। ধীরেনদা পান চিবোতে চিবোতে আমাদের দু'জনের সামনে এসে দাঁড়ালো। বয়েস প্রায় পঞ্চাশ, লম্বা পেটাই শরীর। কাঁচা পাকা জাকাঁলো এক জোড়া গোঁফ। দৃষ্টি দিয়েই যেনো হীরা কাটা যাবে এমন এক জোড়া চোখ দিয়ে আমাদের দু'জনকে দেখলো। আমি অন্য দিকে চোখ ফেরালাম। শঙ্কর হঠাৎ গাড়ীর ইঞ্জিনের ওপর ঝুঁকে পড়ে এটা ওটা নাড়াচাড়া করতে লাগলো। ধীরেনদা তখন চেয়ে ছিলো আমি বুঝতে পারছিলাম। ভারী অস্বস্তি লাগছে আমার।

খোকা!

আমি তার দিকে তাকালাম। শঙ্করের ঝুঁকে পড়া পিঠ এবং মাথার দিকে একবার তাকিয়ে সামনে হাঁটতে হাঁটতে বললো, শোন।

ধীরেনদার মুখ গম্ভীর। আমি তার পেছনে পেছনে হাঁটতে লাগলাম। কেউ কোন কথা বলছি না। হাঁটতে হাঁটতে নিবারণের সেলুনের কাছাকাছি ধীরেনদা প্রথম মুখ খুললো, তুই এতো বোকা। খবরটা দিলুম আর সঙ্গে সঙ্গে গেলি যোয়ানী দেখাতে?

ধীরেনদা বিরক্ত হয়েছে। কিন্তু আমি তখন অবাক। কেননা আমি শুনেছিলাম জ্যোতিষের মুখে। মালিকের বাড়ীতে চাবি দিয়ে ফিরছি-পথে দেখি জ্যোতিষ!

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
কোথা থাকিস। সকাল থেকে তোকে খুঁজে খুঁজে হয়রান। তারপর কানে কানে বলোছিলো কথাটা।

অথচ...আমি ধীরেনদার মুখের দিকে তাকালাম। হ্যাঁ, আমিই জ্যোতিষকে বলেছিলুম একটু যাতে সাবধানে থাকিস। ধীরেনদা আবার চুপ করে মাথা ঝুঁকিয়ে চলতে লাগলো। –তুই দেশে ফিরে যা। আবার এক মুহূর্ত থামলো। তোর মার বয়েসও হলো। বোনটার কোন ব্যবস্থা করতে পারলি না এখনো। এসময় তোর বাড়িতে থাকা দরকার। কখন কি হয় বলা যায় না। একলা ঘর, বিয়ের উপযুক্ত বোন রয়েছে ঘরে। এখানে থাকাটা তোর ঠিক হবে না, তুই দেশে ফিরে যা। বুঝলি?

মার মুখটা, নুরীর মুখটা মনে পড়লো, গ্রামের ছবিটা ভেসে উঠলো। চোদ্দ বছর বয়েসে এই শহরে এসেছি কাজের ধান্দায়। সেই যে বছর বড়ো ভাইমারা গেলো, বড়ো ভাই মরার মাস পাঁচেক আগে বাপ। হাঁপানী রুগি, চলতে ফিরতে পারতো না। পড়ে পড়ে কাশতো আর খিস্তি খেউড়ে বাড়ি মাথায় করতো। মা মাঝে মাঝে রেগে জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে মুখের কাছে গিয়ে বলতো: দোবো, সারা জনম আমাকে জ্বেলিয়ে হাড়মাস কালি করোচো, এখন পড়ে আচে ঘাটের মড়া,তাও এতো তেজ।

কাঠের আগুনে বাবাকে দেখাতো যেনো দুরন্ত একটা ট্যাক্সি এ্যাকসিডেন্ট করে দুমড়ে মুচড়ে পড়ে আছে।

মার মুখ সারা জীবনের জমে থাকা অতৃপ্তি আর ঘেন্না যেনো বিষ ঢেলে দিতো: আমার কাছে ক্যানো? তোমার সেই পিয়ারীদের কাচে যাওনা, তোমার সেই সোহাগের সেবাদাসীদের কাচে! তাদের গলা জড়িয়ে পড়ে থাকো গে, পেটও ভরবে মনও ভরবে। থু থু অমন জিন্দেগানিতে থু!

বাপ ছিলো চিরকালের উড়নচন্ডি। যুদ্ধের বাজারে কনট্রাক্টরী করতো। মিলিটারী কন্ট্রাকট। দেদার পয়সা। সেই পয়সা হাওয়াই বাজির মতো উড়ে যেতো রেসের মাঠে, জুয়ার বোর্ড, মদে। বেশ্যা বাড়ি পড়ে থাকতো। ন মাসে ছ'মাসে দেশে ফিরতো, তখন খুব শাহী হালে চলে যেতো ক'দিন। তারপর বাপ চলে যেতো । মদের তলানীর মতো যে টুকু থাকতো তা দিয়ে আরো কিছুদিন চলতো। তারপর আবার অভাব, টানাটানি। দমকা হাওয়ার মতো হলেও সেই রমরমে দিনগুলোকে দেখিনি আমি।

এ সবই আমার শোনা। আমি দেখেছি, মা পরের বাড়ি ধান ভানে,রশি কলের সুতো তোলে, তাঁতের নলি তোলে চরকায়। ফিতে বোনে,পটকা মোড়ে। একটানা অভাব, কষ্ট, আর টানাটানির চেহারা।

বাপ আসতো অনেক দিন পর পর।

রোগা পাতলা, ভাঙাচোরা চেহারার মানুষটাকে দেখতাম সব সময় মেজাজ দেখিয়ে কথা বলছে, কথায় কথায় গালাগালি, মার–ধোর।

আবার একদিন চলে যেতো। যেনো মানুষটা আমাদের কেউ নয়। আসা বা যাওয়ায় তার কিছু এসে যায় না,আর আমি নিজে, সেই বয়সেই সহ্য করতে পারতাম না, ঘেন্নাই হতো লোকটাকে। বড়ভাই, মেজোভাই ঘেন্না করতো কিনা জানিনা, তবে আমার মতোই এড়িয়ে থাকতো। এমনিতেই কথা কম বলতো বড়ভাই। বাপ এলে আরো। খাবার সময় হলে রান্না ঘরে বসে তিনভাই মুখ গুঁজে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
খেয়ে চুপচাপ উঠে যেতাম। লোকটা এলে মার সঙ্গেও আমাদের কথা কমে যেতো, কোন কোনদিন মার মুখের দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারতাম না।
নুরী তখন খুব ছোট। মেজো ভাইয়ের নিউমোনিয়া। ঘরে পয়সা নেই। বাপের কোন খবর নেই। মুদির দোকনে দেনা, মানুষের কাছে টাকা পয়সা থেকে চাল আটা এমনকি তেল নুনেরও দেনা। মা'র গয়নাগাটি যা দু'চারখানা ছিলো তাও পোদ্দার বাড়ি বন্ধক। কারুর কাছে ধার চাইবার মুখ নেই। আগের দিন থেকে একটানা উপোস চলছে।
সকালবেলা আমাকে দোকানে পাঠানো হয়েছিলো মেজো ভাইয়ের জন্যে সাবু ধার আনতে।
জানি দেবে না, তাই প্রথমে যেতেই চাইনি, কিন্তু মার বকাবকি, চিৎকার এবং মেজো ভাইয়ের চুপচাপ শুয়ে ফ্যাল করে চেয়ে থাকা –সব মিলিয়ে কি যেনো হলো, গেলাম।
দোকান থেকে ফেরার সময় যতই ঘরের কাছাকাছি আসছি, পা ততই জড়িয়ে আসছিলো,মেজো ভাইয়ের শুকনো মুখ আর ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকা চোখ দু'টোকে মনে পড়ছিলো।
উল্টো দিকে হাঁটতে হাঁটতে লস্করদের বাঁশতলায় এলাম। মস্ত বড়ো বাঁশবাগান। বাঁশ কাটা চলছে। কালো কালো চওড়া চ্যাটালো বুক,পিট, মোষের মত কাঁধ , সেই কাঁধ থেকে নেমে আসা হাত, আড়াইসেরী চকচকে কাটারী চালাচ্ছে হুমহাম করে ঘামে পিঠ আয়নার মত চকচক করছে। লোকগুলো কাজ শেষ করে পুকুর থেকে নেয়ে উঠে এক থেকে দেড় সের চালের ভাত নিয়ে বসবে। আমার বুকের ভেতর ধকধক করছে, অকারণে ঘামছি আমি। পেটের ভেতর খিদের এক রকম জ্বলুনী। মাথা শূন্য। তোতো মুখে থুতু উঠছে। রগের দু'পাশে খুব হালকা ধরনের একটা ব্যথা কপালের এমাথা থেকে ওমাথা যাওয়া আসা করছে। এদিকে ধবধবে ফর্শা লস্কর বুড়ো তার চেয়েও ধবধবে চুল দাড়ি নিয়ে নিশ্চিন্তে বসে বাঁশ কাটা দেখছে কি কথা বলছে, জোনগুলোর মজবুত শরীর, তাদের কাজ, গোরুগুলোর বাঁশপাতা খেতে থাকা, সব কিছু কেমন নিঢাল নিশ্চিন্ত শান্তি আর সুখের ছবি।
একটা কঞ্চি তুলে নিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করলাম। পেছনে বাঁশ কাটার খটাস খটাস শব্দ। ঝাড় থেকে বাঁশ টেনে আনার সড় সড় আওয়াজ। বাঁশের গা থেকে কঞ্চি, কঞ্চির গোড়ার শক্ত কি নরম গাঁটে কাটারির খটখট আওয়াজের সঙ্গে কখনো কখনো ঠন্ করে বেজে ওঠা শুনতে শুনতে আমি হাঁটতে থাকি। কাটারির ঘায়ে ছিটকে পড়া গাঁটগুলো এসে যেনো আমার পিঠ ছ্যাঁদা করে বুকের ভেতর বিঁধে যাচ্ছে।
বড়োভাই দরজার পাশে দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসেছিলো চুপচাপ। ঘরের ভেতর মা মেজোভাইয়ের মাথার কাছে মুখ নীচু করে নিঃশব্দে কাঁদছিলো। নুরী পিঠের ওপর ঝুঁকে মার নীচু হয়ে থাকা মুখটাকে তুলতে চাইছিলো
আমি সদর দরজা দিয়ে ঢুকে উঠোনের ওপর থেকে দেখতে পেলাম দৃশ্যটা।
উঠোনটাকে মনে হলো রোদে পোড়া বিশাল মাঠ, এখান থেকে রকের পৈঁঠেয় পৌঁছতে সারাদিনেও কুলোবে না।
বড়োভাই আমাকে দেখলো। হয়তো খালি হাত দু'টো হয়তো বা হাফপ্যান্টের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
পকেট দু'টোর একটা উঁচু হয়ে আছে কিনা। হয়তোবা এসবের কিছুই নয়,আমার চোখ–মুখ ,আমার পা ফেলে এগিয়ে আসা কিংবা আমার সমস্ত শরীরেই হয়তো হেরে যাওয়া মানুষের ভঙ্গি ছিলো।
এতক্ষণ ধরে চুপচাপ বসে থাকা বড়োভাই মুহূর্তের মধ্যে উঠে গিয়ে ঘরের ভেতর থেকে জামা গায়ে দিয়ে এলো। মুখটা থমথমে, কোনদিকে তাকালো না। নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলো বড়োভাই।

ধীরেনদা বিদায় নিয়েছিলো গলির মোড়ে। দাদু এ্যান্ড কোং বন্ধ। দোরে বড়ো বড়ো তালা ঝুলছে। জামসেদভাই দেশে চলে গেছে। দূরে, বড়ো রাস্তার মুখে কোর্টের মেন গেট টেনে দেওয়া। শিকের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় সামনের মাঠ। এলোমেলো ঘাস। এখানে এক খাবলা ওখানে এক খাবলা। অসুখের সময় মা কাঁচি দিয়ে মেজোভাইয়ের চুল কেটে দিয়েছিলো। মাঠটাকে মার সেই আনাড়ি হাতের চুল–কাটা মেজোভাইয়ের মাথার মতো মনে হয়।
বেলা পড়ে এসেছে। রাস্তার ওপর ঘর–বাড়ির ছায়া মিলিয়ে যাচ্ছে। নুরীটা এবার ষোলয় পা দিয়েছে। হঠাৎ করে কেমন বড়ো হয়ে উঠলো যেনো। চারিদিকে যা অবস্থা ভালো ছেলে পাওয়া দুষ্কর, পেলেও এগোনো দায়। মা বলে, নুরী যেনো আমার গলার ক'াটা, চলতে–ফিরতে খচ খচ করে বিদচে, মেয়ের মুকের দিকে চাই আর বুক আমার শুকিয়ে যায়, চোক আঁদার হয়ে আসে। রাতে ঘুম হয় না, কি করি খোদা...
সানার কাছে বাস আসতেই বুনো শুয়োরের মতো ছুটে আসা ট্রাকের জানলা থেকে ড্রাইভার হেঁকে বলেছিলো: সর্দারজী গাড়ি ওয়াপাস লে লো উধার লাগ গিয়া।
অল্প কয়েকজন প্যাসেঞ্জার। চুপ করে থাকা, টুকরো টুকরো আলাপ করতে থাকা মানুষগুলো মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। কে যেন জিজ্ঞেস করে উঠলো: কি দাদা, কি হলো, কি বলে গেলো?
বাস তখন থেমে গেছে। ড্রাইভার ভাঙা ভাঙা বাঙলায় বুঝিয়ে দিলে গুঞ্জন উঠলো বাসের ভেতর।
আমি ততক্ষণে বাস থেকে নেমে পড়েছি। অনেক দূরে, দক্ষিণপশ্চিম কোণে গাছ–পালার মাথার ওপর দিয়ে কালচে ধোঁয়া উঠছে দেখতে পেলাম।
বাঁশ ঝাড় নুয়ে এসে রাস্তার দু'পাশে খোলা ছাতার মতো ছায়া ছায়া অন্ধকার করে রেখেছে এখানটায়। সেই বাঁশ ঝাড়ের ফাঁক দিয়ে, শ্যাওড়া বনের ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে পায়ে পায়ে তৈরী যে সরু রাস্তাটা বেরিয়ে গিয়ে ওদিকে কাঁকড়াকুলের জলায় গিয়ে পড়েছে, সেখানে নেমে পড়লাম।
পা দু'টো থর থর করছে। মুখের ভেতর তেতো আর আঠা আঠা লাগছে।
ধীরেনদা সমস্ত অবস্থাটা বুঝিয়ে বলে বিদায় নিলে আমি যখন একা হলাম,তখন থেকেই গোটা ব্যাপারটা নতুন চেহারা নিয়েছে।
তারপর দোকানে এসে রশোন চাচাদের ব্যস্ততা, গোছগাছ, কথাবার্তা সব কিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
মিলিয়ে একটা বিশ্রি দমবন্ধ হয়ে আসতে থাকা চৌকোনো অন্ধকার ট্রাঙ্কের ভেতর কেউ ঠেসে ঠেসে আমায় ভরে দিয়েছে বলে মনে হতে লাগলো।
রশোন চাচা একগোছা কাগজের টাকা এবং খুচরো পয়সা একটা কাপড়ের ফ্যালিতে পেঁচিয়ে কোমরে জড়াতে জড়াতে শুধু একবার আমার দিকে তাকিয়ে বললে: কোতা ছেলি এতোক্ষণ,তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে লে। তারপর আবার ব্যস্ত হয়ে গেলো এটা ওটা নিয়ে।
ধীরেনদার সঙ্গে আসতে আসতে কথা হয়েছে আজ এখনই দেশে ফিরে যাবো, ধীরেনদা বাসস্ট্যান্ডে আমার জন্য অপেক্ষা করবে,কিন্তু এখন চন্দননগরের লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে আমার ভীষণ ক্লান্তিতে কেবল ঘুম আসতে চাইছে,যেনো এখনই হাঁটু ভেঙে পড়ে যাবো।
প্রথম যখন শ্রীরামপুরে এসেছিলাম কিছুই ভালো লাগতো না। রশোনচাচা বলতো: যা না বাবা,গঙ্গার ধার থেকে একটু ঘুরে আয় না, ভালো লাগবে।
নদীর ঘাট থেকে কেউ নেয়ে উঠে যাচ্ছে ভিজে কাপড়ে, কেউ শুধুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোভা দেখছে। চাতালের ওপর বসে বসে গল্প করছে কলেজে পড়া ছোকরারা দল বেঁধে, হাসছে, সিগারেট টানছে। নদীতে মানুষের পারাপার। ওপারে সবুজ ব্যারাকপুর। পাড়ে আছড়ে পড়া পানির শব্দ।
রাতের বেলা স্যাঁতসেতে ঘরে চারিদিক তুলো আর লেপ তোষকের ফাঁকে শুয়ে শুয়ে দেখি ইস্কুল ঘর। মাষ্টার।রোদে পোড়া ইস্কুল মাঠ। ক্লাশের পরিচিত মুখগুলো। সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে কোথাও চলে যেতে ইচ্ছা হতো।
বড়োভাই সেই বেরিয়ে গেলো সারা দিনেও ফিরলো না। তারপর খোঁজা খুঁজি।
উঠোনের ধারে পেয়ারা গাছের কচি কচি পাতা বৃষ্টিতে ভিজে আরো লক লকে তাজা সবুজ হয়ে উঠলো। বড়ো ভাইয়ের খোঁজ পাওয়া গেল না। মহেশের রথ থেকে বড়োভাই শখ করে কিনে এনে লাগিয়েছিলো! সেই গাছে প্রথম পেয়ারা ধরলো–মা রকের ওপর বসে বসে সেদিকে চেয়ে কাঁদতো।
মেজোভাই মরবার মাসখানেক পরে একদিন হঠাৎ করে মা'র নামে ২০ টাকার মনিঅর্ডার এলো সবাইকে অবাক এবং খুশী করে। বড়ো ভাই পাঠিয়েছে সেই সঙ্গে কুপনের ওপর লেখা: মা, আমি রাজগঞ্জ মিলে চাকরী পাইয়াছি, কোন চিন্তা করিও না। আমি ভালো আছি।
বাপ ফিরেছিলো এই সময় অসুখ নিয়ে। হাড়পাঁজর বার করা সংসার তখন অভাব আর দেনায় কুঁকড়ে আমসি হয়ে গেছে।
এতো কিছুর মধ্যে তবুও বড়োভাই চাকরী পেয়েছে। মা তার বন্ধক দেওয়া গয়নাপাতি ছাড়িয়ে আনবে, ছোট বড় যতো দেনা আছে সব শুধবে একে একে, ঘরের খুঁটি বদলাবে, চাল সারাবে। সবচেয়ে বড়ো কথা দু'বেলা পেট ভরে খেতে পাবো।
আমি ইস্কুলে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলাম। বড়োভাই জোর করে আবার ভর্তি করলো। আবার আমি ইস্কুলে যেতে শুরু করলাম। সকালে দলবল বেঁধে পুকুর ঝাঁপিয়ে গোসল করে উঠে খেয়ে-দেয়ে ইস্কুলে যাই। বিকেল হলে ফুটবল নিয়ে নামি মাঠে।
শনিবার হপ্তা পেয়ে বড়োভাই ঘরে আসে। রোববার সারা দিনটা থেকে আটটা বিশের ট্রেনে আবার চলে যায়। অক্ষম বাপের শুয়ে থাকা খেউড়, মার কাটা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
কাটা জবাব, নোংরা লাগতো। বাড়ি থেকে বাইরে চলে আসতাম তখন। এসব নোংরা মন খারাপ অবস্থা সত্বেও–বাপ শুয়ে শুয়েই ছোট্ট নূরীকে পাশে বসিয়ে নরম গলায় কথা বলছে, নূরী এন্তার বকর বকর করছে, মালসায় কুঁড়ো ছেনে মা উঠোনে দাঁড়িয়ে মুরগিদের ডাকছে, আ তি তি তি–ই; আমি রকে পাটির ওপর উপুড় হয়ে পড়ে হোমটাস্ক করছি, বড়োভাই ব্যাগ ঝুলিয়ে বাজার করে ফিরলো।–এধরনের মুহূর্ত ও তার মধ্যে ছিলো–মোট কথা ভালোয় মন্দয় সংসারটা মোটামুটি একটা নিয়মের ভেতর দিয়ে চলতে শুরু করেছিলো।

বছর দুয়েক। তারপর আস্তে আস্তে কোথায় যে কি সব হতে লাগলো। বাড়ি ফেরায় অনিয়ম করতে লাগলো বড়োভাই। টাকা পাঠাতো মনিঅর্ডার করে। এক সময় তা–ও বন্ধ হলো। লোকে নানান কথা বলতে শুরু করলো। বাপ তো রায় দিয়েই বসলো, উ শালার ছেলের গায়ে মেয়ে মানুষের আঁচলের বাতাস লেগেছে। মা ক্ষেপে গিয়ে বলতো,লজ্জা করে না তোমার, নিজে যেমন সবাইকে তাই ভাবা।

তারপর একদিন পুলিশ এলো বড়ো ভাইয়ের খোঁজে। বড়ভাই নাকি মজদূর খেপানো দলের একজন পান্ডা। পুলিশের ওয়ারেন্ট মাথায় নিয়ে ঘা ঢাকা দিয়েছে। না পেয়ে পুলিশের লোক ফিরে গেলো। মা বিছানা নিলো। বাপ বললে: একেই বলে এঁড়ে রোগ। তিন কড়ার মুরোদ নেই, ব্যাটা ইনকেলাব করে!

ভীষণ শীত পড়লো সেবার।

লোকটার চোখ মুখ ফুলে গেলো,হাত পায়ে পানি নেমেছে।

সকাল বেলা বললো, রোদে যাবো। মা রান্না ঘরে ছিল, সেখান থেকে জবাব দিলো, যাচ্ছি। মাকে সময় দিলো না, নিজেই বেরিয়ে আসবার জন্যে বিছানার ওপর ভর দিয়ে মাথা তুলেছে, তারপর অক করে গলা দিয়ে একটা শব্দ–মাথাটা বালিশের ওপর পড়ে গেলো। আমি তখন নিতাই জেলের মাছ ধরা দেখছিলাম। খবর পেয়ে বাড়িতে এসে দেখি ডাঙায় তোলা মাছের মতো আছাড়ি পিছাড়ি করছে মা। লোক দেখানো, বানানো নয়তো?–মাকে দেখে প্রথমে আমার এই কথাটা মনে হলো। আর কি জানি কেন, লজ্জা লাগছিলো আমার।

উঠোন, ওশরা, ঘর লোকে ভরে গেছে। কি করবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। মা'র প্রচন্ড চিৎকার আমাকে কেবলই দূরে ছিটকে ছিটকে ফেলে দিচ্ছিলো। আবার বাইরে চলে ও যেতে পারছিলাম না। উঠোন থেকে পা পা করে উঠে গিয়ে খুঁটি ধরে দাঁড়িয়েছিলাম মাথা নীচু করে। কে একজন আমার হাত ধরে টানলো, আয় বাবা, তোর মার কাচে আয়। আমি বাঁশের খুঁটিটা আরো জোরে আঁকড়ে ধরলাম, মতির মা চাচি আমার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললো, কি করবি বাবা, সবই আল্লাহর ইচ্ছা।

আরো কে কে সব আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, মেয়েলী গলায় নানান রকম আফশোসের কথা শুনতে পাচ্ছিলাম, সেই কথার ভেতর বার বার বড়োভাইয়ের প্রসঙ্গ আসছিলো।

আমার তখন আর একটা সকালের কথা মনে পড়ছে। সমস্ত দৃশ্যটা এক থেকে দেড় সেকেন্ডের মধ্যে ঘটে গেলো মনের ভেতর। মতির মা চাচি গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলো, ঘরের ভেতর মা টেনে টেনে কাঁদছিলো, আর তার ভেতর মেজোভ।ইয়ের সেই ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকা–কি যে হলো, সমস্ত শরীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
আমার ঝাঁকুনি খেলো, তারপর বাশের খুটিটা দু'হাতে সজোরে আঁকড়ে ধরে প্রচন্ড জোরে চিৎকার করে উঠলাম, ওহ হো হো!
আমার পা হাঁটু ভেঙে পড়ছে। নিজের ওপর কোন জোর খাটছেনা, হু হু করে দমকে দমকে কান্না বেরিয়ে আসতে লাগলো।

দুপুরবেলা আবার মন খারাপ হতে শুরু করলো। বাইরে চড়া রোদ, তবু বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে । গফুর হাজীর জামরুল গাছের তলায় বসে কাদের সিগারেট টানছে। আমাকে দেখতে পেয়ে হাত নেড়ে ডাকলো, শোন।
–কেন? দূর থেকেই জিজ্ঞেস করলাম।
ও আবার তেমনি হাত নেড়ে ডাকলো, শোন্ না । অনিচ্ছা এবং বিরক্তি নিয়ে কাছে গেলাম । বললো, চল, ভোলার আমতলার দিকে যাবি?
–না।
–কাজকম্মো পেলি?
–না।
–চল, কতা আছে।
ভালো লাগছিলোনা । তবু কাজকর্মের কথা জিজ্ঞেস করে তারপর 'কতা আছে' – কাজেই ইচ্ছা না থাকলেও ওর সঙ্গে চললাম।
পুরানো পাঁজার ধারে ছায়ায় বসলাম ঘাসের ওপর । পানের বোরজের গায়ে তরুলি ধরেছে। কাদের গোটা কয়েক ছিঁড়ে এনে চিবোতে লাগলো। আমার ভাল লাগছেনা, তবু বললে, খা।
মল্লিকরা পুকুরের মাটি কাটিয়েছে। কালো কালো শুকনো কাদা পুকুরের পাড়ে উঁচু দেওয়ালের মতন। কবরস্থানের ভেতর অনেক দূরে কে যেনো গরুর খোঁটা পুতছে, পাঁচিল ভেঙে গেছে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে । ছড়ানো ছিটোনো ইঁটগুলোর শ্যাওলা জমে হলদে –খয়েরি ভিজে ভিজে রঙ ধরেছে। ভেতরে লম্বা লম্বা ঘাস। বাবলা গাছে ঘু ঘু ডাকছে খুব কাহিল গলায়।
পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা মোটা কোমরের আমগাছ দুটোর ভেসে ওঠা ময়াল সাপের মতো শিকড়ে কালো কালো কাঠপিঁপড়ে । খেজুর গাছে, নারকেল গাছের গায়ে চিড়িক চিড়িক কাঠবিড়ালি উঠছে আর নামছে। ওপাশে বাঁশতলায় কারা যেন পাতা ঝাঁট দিচ্ছে,কথা বলছে। পাঁজার গায়ের ফোকরে একটা গিরগিটি চকচক করে উঠলো। একটা মাল গাড়ী চলে গেলো অনেকক্ষণ ককিয়ে কাকিয়ে । থিতনো পুকুরের মতো দুপুর এখন।
–তোর ভাইয়ের কোন খোঁজ পেলি?
না:।
পানামা সিগারেটের প্যাকেট বার করলো।
–খাবি? তুই তো আবার খাসনা।
(কি ব্যাপার–কাদের আজকাল পানামা সিগারেট খায়। লিলুয়ায় কি যেন কাজ করতো, সেখানে তো আজকাল আর যায় না দেখি, বোধহয় কাজ নেই, তবু

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
পানামা সিগারেট!)
আয়েশ করে ক'টা টান দিয়ে খুব ঘোরালো ধোঁয়া ছেড়ে আঙুলে চুটকি বাজিয়ে ছাই ঝেড়ে ফেললো ঘাসের ওপর । কি যেনো ভাবলো চোখ বুজে দু'মুহূর্ত!
–তোর মা তোর মামাদের বাড়িতে গেচে, নয়?
–হাঁ
আবার সিগারেট টানতে লাগলো । (কি বলতে চায় শালা। কালো কালো ছোপ ধরেছে দাঁতে । মুখটা কেমন চোয়াড়ে চোয়াড়ে , শালার মতলবখানা কি , ঠিক বুঝতে পারছি না।)
–ছবি দেখবি? চল উদয়নে খুব ভালো বই হচ্ছে । রাজকাপুর–নার্গিস, শালা তরুণ ছবি । চল দেকে আসি।
–না সিনামা দেকবার পয়সা নেই আমার।
–আরে আমি তোকে দেকাবো। টিকিটের পয়সা, যাওয়া –আসার ভাড়া সব আমার, চল না। কুনোদিন গেচিস শেরামপুর? খালি ঘর আর ইস্কুল,ইস্কুল আর ঘর করে কাটালি, আবে, দুনিয়াটাকে দেকচেন,না হলে ঠকবি।
–না: অতো দূর.....
–উসব তো হলো মেয়ে মানুষের কতা । তুই কি এখনো ছেলে মানুষ আচিস, নাকি?
একটু থেমে আবার বললো: তাছাড়া আমি তো তোর সঙ্গে আচি, ভয় কি, চল চল।
আমি চুপ করে শুনছিলাম ওর কথা । ভেতরটা শির শির করছিলো, তুই কি এখনো ছেলে মানুষ আচিস নাকি ?এঁদো ডোবায় পড়ে আচিস বলে নিজেকে ছোট মনে হয়, বাইরের দুনিয়ায় বেরিয়ে দেক, তুই অনেক বড়ো হয়ে গেচিস, বুঝলি?
আমার মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে কাদের । আমি আকাশে একটা উড়ন্ত চিলকে দেখছিলাম।
কাউকে কিছু না জানিয়ে সেদিনই কাদেরের সঙ্গে চলে গেলাম শ্রীরামপুরে।
কাদের খোলাখুলি বলেনি কিছু, শুধু বলেছিলো,চলনা শেরামপুরে, হয়তো তোর বরাত খুললেও খুলতে পারে।
বাস থেকে নেমে স্ট্যান্ডের পানের দোকানে কি যেনো জিজ্ঞেস করলো আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে, সেখান থেকে ফিরে এসে বললে,চল চা খাই।
চা'র দোকানে খদ্দের, দোকানদারের সঙ্গে নানান রকম গল্প জুড়লো। ওকে সত্যিই অনেক বড়ো মনে হচ্ছে।
চা খেয়ে বেরিয়ে কাকে যেনো খুঁজলো আবার। না পেয়ে বিড় বিড় করে গালাগালিই বোধহয় করলো কাউকে। তারপর বললো, চল্ গঙ্গার ধার থেকে ঘুরে আসি।
নতুন জায়গা, নতুন দৃশ্য,মানুষজন দেখায় সমস্ত মন আমার ব্যস্ত ছিলো। কোন কথা না বলে চললুম ওর সঙ্গে।
গঙ্গার ঘাটে বসে চিনাবাদাম খেতে খেতে কাদের প্রথম কথা ভাঙলো: দ্যাক, এমন করে বসে থাকলে কিছু হবেনে,কিছু না করতে পেরে একদম বরবাদ হয়ে যাবি। একটু থামলো, মনে হলো গুছিয়ে নিলো নিজেকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
–এই ধর না আমার কতা, বড়োভাই বে করে শ্বশুর বাড়ী বউ লিয়ে পড়ে আছে। ইদিকে মা ভাইদের যে কি অবস্থায় দিন কাটচে সিসব ভাববার সময় নেই তার। ওর জন্যে আমার পড়া–শোনাটা হলুনি। কিন্তু তাই বলে কি আমি ভেঙে পড়িচি? ককখোনো নয়।

সিগারেট ধরালো। চোখ বন্ধ করে লম্বা একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে আবার আরম্ভ করলো: তোর কতা আমি কিছুদিন থেকে ভাবছি,ব্যবস্থাও একটা করিচি তোর জন্যে।

গলার কাছে নিঃশ্বাস আমার আটকে গেলো। বুকের ভেতর ধক ধক শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম।

–কাজটা অবশ্য তোর মনের মতন হবে নে। কিন্তু লেগে থাকলে ভবিষ্যৎ আচে । হীরা সিং আমার দোস্ত মানুষ,...ট্যাক্সি চালায়। তার একজন ক্লীনারের দরকার।

নিঃশ্বাস তখন আমার অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে। যদিও বুকের ভেতর ধক ধক করা ভাবটা তখনো কাটেনি। আমি ক্লীনার মানে কি তাই ভাবছিলাম। ক্লীনারের মানেটা কি জিজ্ঞেস করতে পারছিলাম না ওকে। ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়ে কাদের লেখাপড়া ছেড়েছে। আমি ক্লাস এইট। কাদেরের দাঁতে কালো কালো ছোপ, মুখ চোয়াড়ে চোয়াড়ে, জিজ্ঞেস করতে কেমন লজ্জা হচ্ছিলো আমার।

কাদের আমার দিকে চেয়ে কি বুঝলো কে জানে। বললে: হীরা সিং দিল দরিয়া মানুষ, আর কাজও এমন কিছু নয়, গাড়ী দেখা–শোনা করবি,হীরা সিংকে সাহায্য করবি। এখানে ওখানে তোর গাড়ী চেপে ঘোরাও হবে ।লেগে যা বুঝলি, ড্রাইভার হতে কদ্দিন!

কাদেরকে আমার কোনদিনই ভালো লাগেনি। বয়েসে আমার চেয়ে বছর পাঁচেকের বড়। ক্লাস ফোরে পড়তে পড়তেই পড়া ছেড়ে দিলো। তারপর এর বাগানের ডাব ওর বাগানের কলা..

কতোদিন দেখেছি একটা শক্ত কঞ্চির মাথায় কলা মুলো অথবা বেগুনে কিংবা দড়ির জালে ডিম দিয়ে লাইন ধারে দাঁড়িয়ে চলন্ত গাড়ীতে ফায়ারম্যান কিংবা ড্রাইভারের হাতে তুলে দিতে। গাড়ীটা কয়েক গজ যেতেই দেখেছি কয়লার একটা কি দুটো চাঙ গড়িয়ে পড়লো রেললাইনের পাশের ঝোপে।

বাজারে যেতে যেতে দাঁড়িয়ে যেতাম। দেখতাম ওর সেই অদ্ভুত কৌশলে দেওয়ার ভঙ্গী। দিয়েই ছুটতো।

মাঝে মাঝে ফাঁকিও দিতো ইঞ্জিনের লোকগুলো। কাদের তখন গালাগালি দিতো মা–মাসী তুলে। রাগে পাথর ছুঁড়তো। শুধু কাদেরই নয়, এমন অনেকেই।

সেবার লেগেছিল মাল পাড়ার কানাইয়ের সঙ্গে। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে কানাই কাঁচকলা দিয়েছ ফায়ারম্যানকে, কিছু দূরে কতবেল তলায় দাঁড়িয়ে কাদের দিয়েছে শশা। কলা দিয়েই পেছন পেছন ছুটছে কানাই। তার কয়লা ফেলেনি। কাদের দেওয়ার পর একটা চাঙ ফেলেছে হাত কয়েক দূরেই–বেশ বড়োসড়ো। কাদের ছুটে গিয়ে কয়লা তুলতে গেলে কানাই ততক্ষণে এসে পড়েছে। তারপর কথা কাটাকটি,গালাগালি সব শেষে হাতাহাতি। কাদেরের পায়ের কাছে ছিলো ফায়ারম্যানের ফেলে দেওয়া কঞ্চিটা। তুলে নিয়ে সপাং করে এক ঘা। ভ্রুর ওপর কপাল কেটে কানাইয়ের দর দর রক্ত।

গত বছরের আগের বছর দায়েম বক্সর বোরোজ থেকে পান চুরি করে বেরিয়ে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

আসবার মুখে ধরা পড়ে কী কেলেঙ্কারী!
সেই কাদেরের সঙ্গে কথা নেই বার্তা নেই কাউকে না বলে হুট বলতে শ্রীরামপুরে চলে এলাম। নিজের কাছেই অবাক লাগে।
লিলিভাবী রশিকলে কাজ করবার কথা বলায় রাগ হয়েছিলো। তাঁতের কাজ যাতে না হয় তার জন্য ইচ্ছা করে গাফলতি করেছি। মাকে মিথ্যে বুঝিয়েছি।
একবার ভাবলাম বারণ করে দিই । বলি: না ভাই,এ চাকরী আমার পছন্দ নয়। অবশ্য গররাজী হলে কাদেরের বলবার কিছুই নেই। থাকতেও পারে না। কাদের আমাকে না বলে ব্যবস্থা করেছে সব। তবু আবার ভাবলাম, রাজী না হলে তো অন্য কোন পথও নেই আপাতত:। বাপের সম্পত্তি থেকে নিজের অংশ বিক্রি করে মা ফিরবে মুখ কালো করে।
বেকার নিষ্কর্মা ছেলে দুবেলা শুধু শুধু ভাত গিলবে। একটা মুরগীকে দু'বেলা,দুমুটো কুঁড়ো দিলে সে-ও আন্ডা দেয়। এমনি আরো কতো কি শুনতে হবে উঠতে বসতে খেতে শুতে।
ঘেন্না করবে । রশিকলে দড়ি টান ছাড়া উপায় থাকবে না। তার চেয়ে এই ভালো, দূরে-এখানে জুতো সেলাই করলেও কেউ দেখতে আসবে না।
তাছাড়া কাদেরের উৎসাহ, ব্যস্ততা সব মিলিয়ে এমন একটা অবস্থা হলো, ওর মুখের দিকে চেয়ে কোন কথা বলতে পারলাম না ।
বরং মনে হলো, কাদেরের চরিত্রের যতো দোষই থাকুক, মনটা ভালো। অপরের জন্যে দরদ আছে।
ফেরবার পথে কাদের বলেছিলো: কাজটা তোর মন মতন হয় নে, নয়? অমন চুপ করে আচিস ক্যানো ? আমি তো বলিইছি ই কাজ তো মন মতন হতে পারে না, কিন্তু আমাদের মতন ঘরের ছেলেদের অতো নাক থাকা ভালো নয়, তাতে ঠকতে হয়। তোর বড়ো ভাইকে তোরা যতো দোষই দে, আমি কিন্তু তার নাম না করে পারিনা। হাঁ, সত্যিকারের পুরুষ মানুষ , লড়ছে।
একদল লোক তোর আমার মতন মানুষের লউ চু'ষে জোঁকের মতন ফুলে ঢোল হচ্ছে, আর আর আমরা? শালা শেষ হয়ে যাচ্চি। এই দেকনা, আমি লিলুয়া ওয়ার্কশপে কাজ করতুন, বোনাসের দাবীতে ধর্মঘট হলো, একদল বেজন্মা,শালারা ইউনিয়নের পেসিডেন, সেক্রেটারী, হারামীর বাচ্চারা মালিকের কাচ থেকে মোটা টাকা খেয়ে সব বানচাল করে দিলে, মাঝখান থেকে মরলো কারা? না আমরা,সাধারণ লেবাররা, যারা ধর্মঘট করলে তারা, ঐ শুয়োরের বাচ্চারা ঠিকই রইলো, ঠিকই থাকবে, বাড়ী করবে, ব্যাঙ্কে টাকা জমাবে, বউয়ের গয়না করবে, লেবারদের লউ পানি করা ইউনিয়নের পয়সায় মদ আর মাগীবাজি করে ওড়াবে, সুযোগ পেলে মালিকের সঙ্গে হাত মেলাবে।
এন্তার বক বক করে যাচ্ছিলো হাঁটিতে হাঁটিতে। কোন কথা শোনা বা না শোনা আমার কাছে এখন দু-ই সমান।
ভেতরে ভেতরে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। নিজের ওপর ঘেন্না ধরে গিয়েছিলো। এখানে প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নেওয়া যাবে। এমনি সব মনে হয়েছিলো।
কিন্তু কাদের যখন হীরা সিংহের সঙ্গে কথা পাকা করলো, রশোন চাচার সংগে থাকা খাওয়ার কথা আলোচনা করছিলো, তখনই থেকেই ভেতরে ভেতরে সব ভাঙচুর হতে লাগলো। তার মানে আমি সত্যিই ক্লীনার হয়ে গেলাম । তার মানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ট্যাক্সী ধোয়া মোছা আর প্যাসেঞ্জার জোটানোর কাজটা আমাকে করতে হবে! মনে হলো আমার নিজের ফেলা থুতু মাটি থেকে জিভ দিয়ে চেটে তুলে নেওয়ার জন্যে কেউ জোর করে ঘাড় চেপে ধরে মাথা নীচু করে দিচ্ছে আমার ।

প্রথম প্রথম অবাক হতাম।
ধীরে ধীরে বুঝলাম বাইরের চেহারার আড়ালে শ্রীরামপুরের আরো রূপ আছে। সবাই এক সঙ্গে বসে গল্প করে, হাসে, বিড়ি সিগারেট টানে,চা খায় কিন্তু ভেতরে ভেতরে একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী। যেনো সে কথা মেনে নিয়েই এক সঙ্গে ওঠা বসা করে, কাঁধে হাত রেখে মদ খেতে যায়, বেশ্যা বাড়ীতে যায় ফূর্তি লুটতে।
মাঝে মাঝে কাদের আসতো । আড়ালে গিয়ে গুজ গুজ করতো হীরা সিংয়ের সঙ্গে । কোন কোন দিন দু'জনের মুখে হাসি হাসি ভাব। কখনো গম্ভীর, রাগ, কথা কাটাকাটি। ঠিক বুঝতাম না।
আস্তে আস্তে সব পরিস্কার হতে লাগলো।
গুড়ুপ থেকে বর্ধমান থেকে লুকিয়ে সুতোর বান্ডিল আনতো কাদের । সেই সুতো ব্ল্যাক করতো শ্যাওড়াফুলি, চন্দননগর, শ্রীরামপুর,তারকেশ্বর, ব্যান্ডেলে। টাকা হীরা সিংয়ের। কাদের তার পার্টনার । চার আনার ওয়ার্কিং পার্টনার।
তখন বুঝলাম আমাকে চাকরী দেবার জন্যে কাদেরের এতো দরদ কেনো।
তবে হাঁ, ওস্তাদ সত্যিই দীল দরিয়া মানুষ, বকাঝকা যাই করুক না কেনো, টাকা পয়সার ব্যাপারে এদিক ওদিক করেনি কখনো। জামা কাপড় কিনে দেওয়া, মাঝে মাঝে বখশিস দেওয়া, এটা সেটা কিনে খাওয়ানো–এসব তার ছিলো। এভাবে ক' বছর কেটে গেলো।
একটু পুরোনো হলে গাড়ি চালাবার কৌশলগুলো সে নিজে শেখাতো পাশে বসে–যা আর পাঁচটা ড্রাইভার সহজে করে না । কেউ কেউ বলতো– অতো দরদ ভালো নয়, সিংজী।
ওস্তাদ হাসতে হাসতে বলতো–আরে ভাই কিয়া বোলতে হো, বেচারা গরীর, জিন্দেগী ভর ক্লীনার রহ যায়েগা ইয়ে তো দস্তুর নেহী।
সেই হীরা সিং চলে গেলো। অমৃতসরের লোক, বললে–বাঙ্গাল মে আওর নেহী, মুঝে যানা হ্যায়।
তখন গাড়ি চালানোর বেশ সড়ো গড়ো হয়ে উঠেছি। ওস্তাদ কেমন ঝিমিয়ে আসছিলো। মাঝে মাঝেই বলতো আমি চললুম, এ দেশে আর নয়। কথা বলতে বলতে কেমন আনমনা হয়ে যেতো।
কাদের মরেছিলো । আমি যেদিন প্রথম স্টিয়ারিং ধরলাম। মানে শ্রীরামপুর থেকে চন্ডীতলা–এই বারো মাইল রাস্তায় প্যাসেঞ্জার নিয়ে নিজেই গাড়ী চালালাম। ওস্তাদ পাশে বসে বারে বারে বাহ্ বেটা, সাবাস, বাহ্ করতে লাগলো। ফেরার পথে ওস্তাদ নিজে চালিয়ে এনেছিলো।
পরের দিন কাদেরের আসবার কথা–এলো না । তার পরের দিনও নয়। তিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
দিনের দিন খবর পাওয়া গেলো বারুইপাড়া স্টেশনের কাছ বরাবর খাদের ধারে ওর লাশ পড়েছিলো।
সেই থেকে ওস্তাদ গম্ভীর হয়ে গেলো। অমন হাসিখুশী মানুষটা কেমন হারিয়ে যেতে লাগলো। মাঝে মাঝে বলতো–লালচ বহত বুরী চিজ, লালচ কো রোখ না, লালচ আদমী কো জানোয়োর বানাতা, লালচ করবি না, বুঝলি খোকা, লালচ করবি না। ভীষণভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে বলতা–কভী নেহী, হরগীজ নেহী। তারপর লোকটার মাথা ঝুঁকে আসতো। চোখের নিচেটা থির থির করে কাঁপতো । মনে হতো, আমাকে নয়, কথা গুলো হীরা সিং নিজেকেই শোনাচ্ছে।
স্ট্যান্ডের সবাই কতো বোঝালো, হীরা সিং শুধু তার পাগড়ী বাঁধা মাথা ঝাঁকিয়ে বলে নেহী।
পিয়ারুভাই বললে, তো ঠিক হ্যায়, দো চার মাহিনা কে লিয়ে ঘর সে ঘুমকে আ। গাড়ী কিঁউ বেচ রাহা।
–নেহী পিয়ারু, মেরা দীল টুট গ্যায়া,ম্যায়.....
হীরা সিংয়ের গলা ঝাপসা হয়ে এলো। পিয়ারুভাই হাত রাখলো পিঠে। হীরা সিংয়ের সঙ্গে খুব দোস্তী পিয়ারুভইয়ের–বললে, দেখ্ হীরা, হাম বিলকুল সামাঝ লিয়া, মাগার ইস লিয়ে তু গাড়ী বেচকে চলা যায়ে গা ইয়ে তু ঠিক নেহী কার রাহা, ফিন সোচকে দেখ্।
হীরা সিং মাথা নিচু করে থাকে। হঠাৎ পিয়ারু ভাইয়ের দু' হাত জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো, মুঝে মাফ কর্‌দেনা পিয়ারু, মুঝে....
পিয়ারুভাই আর কোন কথা বললো না, মাথা নিচু করে ফেললো। বিপিন লাহাকে গাড়ী বিক্রি করে হীরা সিং অমৃতসর চলে গেলো। যাবার আগের দিন আমায় একশোটা টাকা দিয়ে বললে, মাকে বহিনকে শাড়ী কিনে দিস্।
আমি বললাম, না, থাক ওস্তাদ।
ওস্তাদ বললে, বোঢ়ো ভাই দিচ্ছে, লিতে হয়।
এখুনো আদব শিখলিনি? হয়তো একটু হাসি আনতে চাইলো।
আমি মুখ তুলতে পারছিলাম না। তেমনি মাথা নিচু করেই হাত বাড়িয়ে নিলাম। বুক থেকে একরাশ বল বেয়ারিং গড়িয়ে এসে গলায় আটকে গেলো।
গাড়ী বেচবার আগে হীরা সিং বিপিনবাবুকে বলেছিলো বিপিন বাবু গাড়ী আপনাকে বিক্রি করছি, মাগার ই গাড়ীর ড্রাইভার থাকবে খোকা। আন্যো কোন লোক আপনি রাখতে পারবেনা না । আমি ওকে নিজের হাতে ধোরে ধোরে ড্রাইভিং শিখাইছি । ও আমার আপনা লোক আছে। ওকে ভি দেক বহাল করবেন।
বিপিন লাহা বললে, না না ও–ই থাকবে।
–হাঁ, ইষ্টান্ডের এতো লোকের সামনে কথা হইলো।
এসব কথা বিপিন লাহাকে ওস্তাদ আগেই বলে রাজি করিয়ে নিয়েছিলো, তবু স্ট্যান্ডের সকলের সামনে আবার বলে সাক্ষী রাখলো।
কাজেই গাড়ীর মালিক বদল হলো, আমি বহাল থেকে গেলাম।
বিপিন লাহা বাড়ির সামনের ফাঁকা জায়গার একপাশে গ্যারেজ বানালো। তাই নিয়ে হাসাহাসি করলো স্ট্যান্ডের সবাই।
আমি সকালবেলা গ্যারেজ থেকে গাড়ী বার করি, সারা দিন এখানে ওখানে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
কাছে দূরের ট্রিপ মেরে রাতের বেলা গ্যারেজে গাড়ী তুলে রেখে বিপিন লাহাকে টাকা পয়সা বুঝিয়ে দিয়ে রশোন চাচার ডেরায় ফিরি । মাঝে মাঝে ওস্তাদের কথা মনে হলেই মনটা খারাপ হয়ে যায়।
কিন্তু ঝামেলা বাধাতে লাগলো বিপিন লাহার মেয়ে। অমন জোয়ান বিধবা মেয়ে আছে বিপিন লাহার, জানতাম না । মেয়েটার নাম তাপসী।
গ্যারেজের চাবী আনতে গেলে প্রায়ই দেখা হতো। শ্যামলা, মাজা মাজা রঙ। লম্বা, সাঁওতলী ছাঁদের তাগড়াই শরীর। প্রথম দিন দেখেই আমার বুঝতে বাকী থাকেনি, এ মেয়ে ঝামেলা বাধাবার জন্যে হন্যে হয়ে আছে।
বিপিন লাহার গুড়ের কারবার। ভারী চশমখোর লোক। কাশী বলতো, শালা কারবার করে গুড়ের, কিন্তু নিজে একটা আস্ত নিম গাছ।
–নিম গাছ সেরে গেলে তার ভেতর চন্দন কাঠ হয় কিন্তু।
–বিপিন লাহার চন্দন কাঠ তো আছেই।
–খোকা আজকাল চন্দনের ফোঁটা লাগাচ্ছে নাকি কপালে?মহাবীরের দোকানে হাসির ধুম পড়ে।
কাশী, ফণি, শঙ্কর,মাধব, শাজাহান, জ্যোতিষ, কাউকে কিছু বলিনি। ওরা বানিয়ে রস পায়, মজা পায়।
কিন্তু ঘটতে থাকে।
বিপিন লাহার একতলা পাকা বাড়ী । বাইরের দরজা খুললেই ভেতরে একটা ঘর, সেই ঘরের ভেতরে আর একটা দরজা, সেই দরজার পরেই বাড়ির অন্দর মহলের রক, উঠোন দেখা যায়।
সদর রাস্তার পাশে সামনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা, একটা আম গাছ,একটা শিউলিগাছ রকের ধার ঘেঁষে। আমি সকালবেলা রকের ওপর উঠে বাইরের দরজার কড়া নাড়ি, দরজা খুলে বিপিন লাহার বছর দশকের ছেলে অঞ্জন গ্যারেজের চাবি দিয়ে যায়। মেয়েটার যে সেই সময় কি কাজ থাকতো! ভেতরের খোলা দরজা দিয়ে দেখা যতো, হয় সে উঠোন থেকে উঠে আসছে, নয়তো রকের ওপর দিয়ে এ ঘর থেকে ও ঘরে যাচ্ছে। ঠিক দরজা বরাবর এসেই এদিকে তাকাবে। রাতের বেলা সামনের ঘরে বসে বিপিন লাহাকে টাকা পয়সা বুঝিয়ে চলে আসতাম। তখন মেয়েটাকে আর দেখা যেতো না।
প্রথম প্রথম এমনি মাস খানেক চলে, তারপর দুর্গা পুজো এসে গেলো।
সপ্তমীর দিন রাতে বিপিন বাবু বললে, কাল ছেলে–মেয়েরা ঠাকুর দেখতে বেরুবে, চারটের দিকে গাড়ী নিয়ে এসো।
আচ্ছা–বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম রকে। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। সদ্য পাটভাঙা আশি আশি সুতোর শান্তিপুরি ধুতির মতো জ্যোৎস্না। রকের ধারে ফুলে ছাওয়া শিউলিগাছটিকে অনেকক্ষণ ধরে দেখলাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, তারপর রক থেমে নেমে এলাম।
অঞ্জন, চন্দন, তাপসী, তাপসীর মা শহর ঘুরে ঘুরে গাড়ী থামিয়ে থামিয়ে ঠাকুর দেখছিলো, আমি দেখছিলাম তাপসীকে।
দু'একটা কথাবার্তা হলো, হাসি হলো, গংগার ধার থেকে ঘুরেও আসা গেলো।
দশমীর দিন ভেতর বাড়ীর রকের ওপর আসন পেতে মিষ্টি, দই খাওয়ালো তাপসীর মা, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করলো আমার কথা, বাড়ীর কথা। তাপসী

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
অকারণে হাসলো, পানি দিতে এসে চোখের ওপর চোখ রাখলো। আমি লজ্জা করছি, খাচ্ছি না মোটেই, মাকে ও ডেকে নালিশ করলো।
সেই থেকে সকাল বেলা চাবীর জন্যে গেলে কোন কোনদিন অঞ্জন বা চন্দন না এসে তাপসীই দোর খুলে দিয়ে হাসে। আমিও হাসি। তাপসী চাবী আনতে চলে যায়। আমি তাপসীর চলে যাওয়া দেখি।
একদিন চাবী দিতে দিতে তাপসী বললে, তোমার গাড়ী কেমন আচে?
আমি অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকাই। তাপসীর চোখ–মুখ ভরে চাপা হাসি টানটান হয়ে আছে।
–অবাক হয়ে চেয়ে আচো কেন? গাড়ীর কথা জিগেস করবো না তো তোমার আর কে আচে, কার কথা জিগেস করবো?
আমার বুকের ভেতর খালি গাড়ী হরদম বাম্প করতে লাগলো।
তবু সহজ হওয়ার জন্যে বললাম,গাড়ীর মন–মরজী বোঝা অতো সোজা ! এই ভালো এই মন্দ।
তাপসী বললে, তাহলে আর কিসের ড্রাইভার তুমি?
আমি আর কথা বাড়াতে চাই না। হাসতে হাসতে বললাম, নাও, চাবী দাও, বেলা হয়ে যাচ্ছে।
–রাগ করলে?
না,না, রাগ করবো কেনো, চলি।
চাবী নিয়ে পালিয়ে আসি । পেছন না ফিরেও বুঝি তাপসী চেয়ে আছে।
আরো মাস দুয়েক কাটলো।
দুপুরে চন্দননগর থেকে ফিরছি সারা শরীরে ভেঙে পড়া ব্যথা নিয়ে। মাথাটা ভিজে ফুটবলের মতো। কপালের দু'পাশের রগের ভেতর দিয়ে ঘোড়া দৌড়চ্ছে। মুখে তেতো বমি বমি ভাব।
কড়া নাড়তে তাপসীর গলা পেলাম,কে?
–আমি।
তাপসী এসে দরজা খুলে উদ্বিগ্ন হয়ে তাকালো আমার দিকে । দুপুর বেলা অসময়ে এসেছি।
আমি চাবী বাড়িয়ে দিলাম।
–কি হয়েচে,তোমাকে অমন দেখাচ্ছে কেন?
শরীর খারাপ,জ্বর আসচে।
তাপসী হাত ধরে ফেললো,ওমা, গা যে পুড়ে যাচ্ছে, ভেতরে এসো। হাত ধরে টানলো।
--না দাঁড়াতে পারচি না, ঘরে যাই।
তাপসী জোর করে ভেতরে নিয়ে গেলো, রোদ থেকে এসেচো গাড়ী চালিয়ে,একটু বসে যাও।
রকের ওপর চেয়ার টেনে বললে, বসো।
বাড়ী ফাঁকা। পেয়ারা গাছে কাক ডাকছিলো,পাঁচিলের ওপর দিয়ে ডোরাকাটা একটা বিড়াল হাঁটছিলো।
আমি বললাম ,না থাক, তোমার মা কোথায়?
বাড়ীতে কেউ নেই, অসীম কাকার ছেলে হয়েছে দেখতে গেচে, তুমি বসো।–
আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
বলে রান্না ঘরের দিকে গেলো। তাপসী বোধহয় নাইতো তখন। গায়ে কোন ব্লাউজ নেই, গাছ, কোমর করে আঁচল বাঁধা, একদিকের উদোম ভরাট পিট এবং কাঁধ, গোল গোল হাত, পুরুষ্ট পায়ের গোছ, সরু গভীর খাঁজওয়ালা কোমরের নিচে ভারী, ভয়ানক চওড়া, চ্যাটালো পাছা আর মারাত্মক বুক–তাপসী আজ ফ্যাসাদ না বাধিয়ে ছাড়বেনা মনে হচ্ছে?
কাঁসার একটা রেকাবিতে কটা নারকেলের নাড়ু আর কাঁচের গ্লাসে এক গ্লাস পানি এনে জলচৌকির ওপর গ্লাসটা রাখলো, রেকাবিটা আমার হাতে তুলে দিতে দিতে বললে, খাও।
আমি বললাম, না, উঠি।
–ভালো হবে না বললাম, খাও–বলে আমার হাত চেপে ধরলো।
কোন রকমে একটা নাড়ু খেলাম। জোরাজুরি করতে লাগলো, আর একটা আর একটা।
জ্বোরো মুখে মিষ্টি খেতে ভালো লাগছিলো না। আমি বললাম, আর নয়, তাহলে বমি হয়ে যাবে।
ঢক ঢক করে পানি খেলাম। তাপসী সামনে এগিয়ে এসে কপালে হাত রাখলো। ঠান্ডা নরম হাত। মনে হতে লাগলো, তাপসী এমনি করে হাতটা কপালে আরো খানিকক্ষণ রাখুক। চোখ এমনিতেই জ্বালা করছিলো। এখন ইচ্ছা করেই চোখ বুঁজলাম। নরম ঠান্ডা হাতের সেই ছোঁয়াটুকু সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে যাচ্ছিলো।
তাপসী আরো ঝুঁকে এলো। চোখ বন্ধ করেও আমি টের পাচ্ছিলাম। ওর শাড়ীর আচঁলের স্পর্শ লাগছিলো হাতে, মুখে, ওর চুলেরও। তাপসীর শরীরের খুব চাপা এক ধরনের গন্ধ পাচ্ছিলাম নাকে।
চোখ মেলি। কাক ডাকছিলো। থির হয়ে থাকা আকাশে চিল কেঁদে উঠলো। পাকা ধানের মতো অঘ্রানের দুপুর আলো করে আছে চারপাশ। পেয়ারা গাছের পাতার ওপর সেই আলো ঝিলমিল করছিলো। একটা রঙিন প্রজাপতি রান্না ঘরের চালের ওপর লতানো লাউগাছের ডগায় গিয়ে বসলো। তাপসী কোন কথা বলছিলো না। একটু বেঁকে আমার দিকে ঝুঁকে আছে। ওর নিঃশ্বাস লাগছিলো আমার মুখে। তাপসীর মুখে হাসি নেই, বেদনাও নেই। কোন বড়ো গাছকে জড়িয়ে বেয়ে ওঠার জন্যে লতার ডগা যেমন নিজেকে পাতা সমেত বাড়িয়ে দেয়,তাপসীর মুখে তখন অবিকল সেই ভাব।
পা থেকে মাথা পর্যন্ত আমার কেঁপে উঠলো, তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম, না, চলি।
তাপসী কোন কথা বললো না, সরে গেলো দু'পা। আমি আর ওর মুখের দিকে তাকালাম না, দ্রুত পায়ে রক থেকে সামনের ঘরে চলে এসে বাইরে বেরুবার দরজা খুলে ফেললাম।
গা দিয়ে কুলকুল ঘাম বেরুচ্ছে। তার ওপর বাতাস লেগে জ্বরের সময় কপালে জলপটি দেওয়ার আরাম। তখনো আমার পা কাঁপছিলো। বুক ধক্ ধক্ করছিলো। মাথার ভেতর বোঁ বোঁ করে নাগরদোলা ঘুরছিলো। এর কতোটুকু জ্বরের জন্যে বুঝতে পারছিলাম না । সদর রাস্তায় আড়চোখে দেখলাম তাপসী দরজা বন্ধ করলো ।
ক' দিন ধুম জ্বর গেলো। বিপিন বাবু এসে খোঁজ নিয়ে যায়। পাঁচখানেক পর প্রথম ভাত খেলাম। বিপিনবাবু বললে, দেশে যাবে নাকি?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
বিপিনবাবুর মুখের দিকে না তাকিয়েই বুঝলাম এ ক'দিন গাড়ী বার করিনি, অনেক লস হয়েছে, জ্বর থেকে উঠে শরীর দুর্বল–এই অজুহাতে বাড়িতে গিয়ে আরো ক'দিন লস করবো নাকি বিপিন লাহার এই ভয়।
হেসে বললাম, না, আজ মঙ্গলবার কাল বুধবার, বৃহস্পতিবার দিনটা বাদ দিয়ে শুক্রবার থেকে গাড়ী বার করবো।
বিপিন লাহা গম্ভীর মুখে উঠে গেলো।
তাপসী আর একদিনও চাবী দিতে এলো না। আড়াল আবডাল থেকে কোনদিন উঁকি দিতেও দেখেনি।
ফালগুনের মাঝামাঝি মদনপালের ছেলে কানুর সঙ্গে পালিয়ে গেলো একদিন।
বিপিনবাবু শুকনো মুখে ক'দিন খুব দৌড়ঝাঁপ করলো এখানে সেখানে। বৈদ্যবাটির কোন গুণীনের কাছে গিয়েও কোন হদিস মিললো না। গুনিন নাকি আঁকটাঁক কেটে গুনেটুনে বলেছে, তারা দুজনে পশ্চিম দিকে গেছে, ভালো আছে, তা থাকবারই কথা,তাপসী হাজার কয়েক টাকা নিয়ে গেছে,ভালো না থাকার কোন কারণ নেই।
কাশী বললে, শালা একেই বলে কপাল, কে ছেঁচে বিল আর কে খায় কৈ।
আমি চুপ করে থাকি। ফনি বলে, আরে বাওয়া দ্যাক আগে, কানু আবার হাত বদল করে নাকি, টাকা পয়সা নিয়ে গেচে,ক'দিন ফূর্তিটুর্তি করে কোন পটিতে নাম লিখিয়ে দিয়ে কানু শালা কেটে পড়বে।
–ঐ একই হলো, আমাদের খোকাকে তো বিধবা করে রেখে গেলো। আর খোকাও এক হুব্বা, অমন কানা ওপচানো তাড়াতাড়ির ভাঁড়, এক আধ চুমুক চেকেও দেকলো না।
–কি করে জানলি চাকেনি?
–আরে রাক, দ্যাকা আচে। এই সব ইয়ার্কি ঠাট্টার ভেতর দিয়ে ক'দিন চুপচাপ কাটলো আমার।
আস্তে আস্তে কানু তাপসীর ব্যাপারটা চাপা পড়ে গেলো।
বিপিন লাহা 'মরুকগে হারামজাদী' বলে গুড়ের কারবারে আবার মুখ গুজেছিলো। বিপিনবাবুর বউয়ের মুখের দিকে তাকানো যায় না। একদিন ডেকে বললে, পশ্চিম দিকে আচে ওরা, একটা খোঁজ নেওয়া যায়না?
আমি বললাম,পশ্চিম দিকের কোন জায়গায় নাম তো বলেনি, আন্দাজে কোথা খোঁজ নেওয়া যায়।
–তা–ও বটে, কি করি বলো দিকিন?
–বিপিনবাবু.....
–ওর কতা রাকো, খালি টাকা আর টাকা, মেয়ে গেচে দুঃখ নেই, টাকা নিয়ে গেচে, সেই শোকেই পাগোল।
কাজেই ধীরে ধীরে ব্যাপারটা থিতিয়ে গেলো। তাছাড়া মানুষের কতো ধান্দা আছে, আর ইসব ঘটনা তো নোতুন কুন ব্যপার নয়, আজকাল আকসারই ঘটচে, শহরে বাজারে তো বটেই, গ্রামে গঞ্জেও।
প্রথম প্রথম সকালে রাতে বিপিন বাবুর বাড়ীতে গেলেই ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ করে উঠতো ভেতরটা।
তারপর দিন, মাস, বছর, তিন বছর কেটে গেলো, শাহরানপুরে কানুর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
মনোহারির দোকান দিনে দিনে লাভের মৈ টপকাচ্ছে, কানু তাপসীর ছেলে হামা দেওয়া থেকে হাঁটতে শিখেছে, ভালো আছে, খুব সুখে আছে তাপসী।
বিপিনবাবু মাঝে মাঝে সামনের ঘরের তক্তপোষের ওপর আয়েশ করে বসে চা খেতে খেতে বলে, নাতিটা, বুঝলে, শালা নাকি ভারী দুষ্টু হয়েচে। আমি বিপিন লাহার মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকি।

সাঁঝ হচ্ছিলো।
চোখে ছানি পড়ার মতো কুয়াশা নামছিলো। অন্ধকার আর কুয়াশার ভেতর দিয়ে, ধান কেটে নেওয়া ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে শির শির শির শির বাতাস আসছিলো শীতের।
ধীরেনদা শ্রীরামপুর পার করে এগিয়ে দিতে এসেছিলো নগারমোড় পর্যন্ত।
বাস থেকে নামবার সময় কানের কাছে ফিসফিস করে বলেছিলো, ঠান্ডা-টান্ডা না হওয়া পর্যন্ত আসিসনি।
আমি কোন কথা বলতে পারিনি । মাথা নেড়েছিলাম শুধু।
বাস ছেড়ে দিলো। রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে হাত তুলেছিলো ধীরেনদা, বাসের ভেতর থেকে আমি হাত তুলে বিদায় নিলাম।
ধীরেনদা অনেকটা পেছনে পড়ে গেলে হঠাৎ আমার মন হলো, আবার দেখা হবে তো?
গতকাল থেকে পিয়ারুভাইকে পাওয়া যাচ্ছে না। ধীরেনদা বলছিলো, কোথায় যে গেলো মাতালটা এ সময়।
যতক্ষণ দেখা যায় বাসের জানালা থেকে ধীরেনদা দেখতে থাকলাম।
কাঁকড়াকুলের জলার চারপাশ ঘিরে, বহু দূরে ঘন কিংবা ফাঁকা ফাঁকা গাছপালার জমাট কালচে গোল গন্ডিটা এখন প্রায় চোখে পড়ে না, মানে গাছপালা মনে হয় না, আকাশ ছোঁয়া একটা কালো, প্রকান্ড ঝাপসা দেওয়াল দাঁড়িয়ে আছে। এই পোষ মাসে, এই ফাঁকা মাঠে, তেড়ে আসা বাতাসের ভেতর, কুয়াশার ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমার বুকের ভেতর মেঘ ডেকে ওঠে। পা কাঁপে। কানের ওপর বাতাস, নাকের ডগায় হিম, সোয়েটার ফুঁড়ে, শার্ট ফুঁড়ে, চামড়া ছ্যাঁদা করে হাজার হাজার বরফের তীর হাড়ে গিয়ে বিধঁছে। কিন্তু মাথার ভেতরে, রগের দু'পাশ থেকে উঠে আসা আগুনের আঁচে ভাত ফোটার মতো টগবগ করে ফুটছে:
নৃপেনের সঙ্গে মাস চারেক আগে ঝগড়া হয়েছিলো, বলেছিলো দেখে নেবো। আমি বলেছিলাম, ঠিক আছে।
আমি চাকরীতে ঢোকার ঠিক একমাস সতেরোদিন পর খবর এলো বড়োভাই নেই। মিলের পেছনের যে ড্রেনটা গঙ্গায় গিয়ে পড়েছে সেখানে বড়োভাইয়ের ছুরি খাওয়া লাশ পাওয়া গেছে।
বড়োভাই মরার দিন-পনেরো পরে একটা চিঠি এসেছিলো। ইউনিয়নের সেক্রেটারী লিখেছে মাকে: 'আপনার ছেলের মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে মর্মাহত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আপনি হারিয়েছেন আপনার সন্তানকে, আমরা হাজার হাজার মজদুর হারিয়েছি একজন নিবেদিত–প্রাণ কর্মী, সহযোদ্ধা, আপোষহীন কমরেডকে।

আমরা এর বদলা নেবো। কমরেড মনিরের রক্ত বৃথা যেতে দেবো না। মেহনতি মজদুর জনতার সংগ্রামের মধ্যে আমাদের কমরেড, আপনার সন্তান, চিরদিন বেঁচে থাকবে।

আমরা আমাদের গভীর সহানুভূতি এবং সমবেদনা জানাই। শ্রমিক ঐক্য জিন্দাবাদ।'

তারপর আর কিছু জানিনা। বড়োভাইয়ের লাশও পাইনি আমরা। মালিকপক্ষ নাকি লাশ গুম করে ফেলেছিলো। রাজগঞ্জে গিয়ে শুনেছিলাম নেতারা সব গা ঢাকা দিয়েছে, শ্রমিকরা খবর পেয়ে লাশ আনতে গিয়েও পারিনি। সারা মিল এলাকায় ১৪৪ ধারা। চারদিকে ধরপাকড়। থমথমে অবস্থা।

চিঠি খানা আমি পড়েছিলাম। মা শুনতে চায়নি। বলছিলো, ঝ্যাঁটা মার চিটির মুকে, ডাইনরা আমার বাচ্চাকে খেয়ে এখোন চিটি!

মা আবার কান্না শুরু করেছিলো।

বিহারের মুঙ্গের জেলার কোন গন্ডগ্রামে পিয়ারুভাইয়ের বাড়ীতে মহাজনের লোক আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলো, সেই আগুনে মা পুড়েছিলো, বোন পুড়েছিলো, ভাই পুড়েছিলো।

'আমার তখন দশ বছর বয়েস' বুঝলি তো; শালা সূদখোর মহাজন সব জমি লিখিয়ে নিলে, বললে কি, আরো সওয়াশো টাকা পাওনা। দিতে না পারলে ভিটে লিখে দাও। বাপ মহাজনের পা জড়িয়ে ধরলো, হুজুর আপ গরীব কা মা বাপ। বিবি বালবাচ্চা লেকে কাঁহা যায়েগা। মজবুর কো রহম করনা। আল্লা আপকো দেগা।'

মহাজন মাথা নেড়ে বললে, রহম কা বাত নেহী হিসাব কা সওয়াল হ্যায়।

ঘরে এসে বাপ ফেটে পড়লো, জুলুম! পানি হয়নি, খরা গেছে, ফসল ফলেনি, চাষী দেনা শুধবে কোথেকে? ঘরের ঘটিবাটি গেছে, ক্ষেতখামার গিলেছো, তা –ও খিদে মেটে না, এখন বাপ–দাদার ভিটেও খাবে! কভী নেহী, ইয়ে ঘর, ইয়ে মিট্টি হামারা হ্যায়!

বাপ টাউনে গেলো কাজ খুঁজতে । মহাজন ঘরে আগুন দিলো। তারপর আর জানিনা।

এই সবের ফাঁকে ফাঁকে ওস্তাদ, কাদের, তাপসী, ফনি, শঙ্কর,ধীরেনদা, বিপিনবাবু, গঙ্গার ঘাট, প্রথম শ্রীরামপুরে যাওয়া,চুঁচূড়ার ক্লক টাওয়ার, কখনো কালো দৈত্যের মতো মেঘ করে আসা আকাশ, কখনো নীল সামিয়ানার ওপর হাজার হাজার তারার চুমকি । বাঁশ গাছের মাতার ওপর দিয়ে তে'তুলে মাজা কাঁসরি থালার মতো চাঁদ উঠে আসছে। মোট মাথায় থমকে দাঁড়িয়ে যাওয়া স্টেশনের কুলির মতো গাবগাছটার নিচে জোনাকী, পুকুর পাড় থেকে ডাহুক ডাকছে, রান্না ঘর থেকে মা বলছে, 'দূর বাঁপার নম্পোটাও ভুতিয়ে গেলে......আটার টিনটা আনতো র‍্যা'–ফুটন্ত ভাতের মতো এলোমেলোভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছিলো।

তার মানে কিছুই ভাবছিলাম না , মাথার ভেতর যা ঘুরছিলো, যা ভাবছিলাম তার মধ্যে থাকা যাচ্ছিলো না। তার মানে একটা কথাই ভাবছিলাম সারাক্ষণ ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
উঠোনের ওপর মাথা থেকে পা পর্যন্ত মাকে ঢেকে রাখা ছিলো। বুক আর পেটের মাঝ বরাবর গোল হয়ে কাপড় ভিজে লাল হয়েছিলো। যেনো জবাফুলের একটা তোড়া কেউ ভারী যত্নের সঙ্গে রেখে দিয়েছে।
ঘরের ভেতর থেকে বাক্স প্যাটিরা সব উঠোনে ছড়ানো, নূরী নেই,, নূরীকে... ভাঙা ভাঙা কথা, বিলাপ দিয়ে বোঝানো হলো, গ্রামের কার কার সর্বনাশ হয়েছে, কে কিভাবে মরলো, কে জখম হলো, সেই সঙ্গে মার কথা, নূরীর কথা বলতে গিয়ে হায় হায় করে উঠলো, মাবুদ তুই এতো খেলাও জানিস।
উঠোন ভরে মেয়ে -পুরষ, বাচ্চা-কাচ্চা , কান্না-কাটি , এবাড়ি ওবাড়ি সারা গ্রাম জুড়ে মহা শোরগোল। কেউ চালের বাতায় আগুন নেভাচ্ছে। কেউ কাতরাতে কাতরাতে গালাগালি করছে। চিৎকার করে, গুন গুন করে টেনে টেনে কাঁদছে কোন কোন বাড়ি থেকে।
কাপড় ঢাকা মাকে দেখলাম, নূরী নেই....নূরীকে....কিন্তু কতক্ষণ আগে? কাঁকড়াকুলের জলা থেকে কি আমি কোন আওয়াজ পেয়েছিলাম? কই মনে তো পড়ে না। এতো সব মানুষ হাঁড়ি উপুড় করে পানা পুকুরে গলা ডুবিয়ে থেকে গাছের ওপর উঠে, বাঁশ বাগানের ভেতর লুকিয়ে প্রাণ বাঁচালো-এতো মানুষ খুন হলো, জখম হলো, টেনে নিয়ে গেলো, আগুন জ্বালালো-এখনো ঘরে ঘরে জ্বালিয়ে যাওয়া আগুনের ধোঁয়া উঠছে-মাত্র কিছুক্ষণ আগে এতো বড় লন্ডভন্ড কান্ড ঘটে গেলো, তখন আমি কোথায় ছিলাম, কাঁকড়াকুলের জলায়? কাঁকড়াকুলের জলা কতো দূর?
কতো দূরে ছিলাম আমি ? সানার কাছে, সেই যখন বাস থেকে নেমে ধোঁয়া দেখেছিলাম?
কোন কতা বলালাম না।কারুর মুখের দিকে তাকালাম না। মাথার ভেতর বুকের ভেতর অনায়াসে কয়েক হাজার মানুষের কবর দেওয়া যাবে।
পেছন থেকে কেউ কেউ ডেকে ছিলো, হাত ধরে টেনে ছিলো। সামনে এসে পথ আগলেছিলো, কেঁদে কেঁদে কিছু বলেও ছিলো বোধহয়।
বাগান পেরিয়ে, পুকুর পাড় দিয়ে, বাঁশঝাড়ের নিচে দিয়ে কবরস্থানের পাশ দিয়ে, বোরজের ধার ঘেঁষে দখিন জলায় নেমে হাঁটতে হাঁটতে বড়ো আলে উঠে দেখেছিলাম সামনে, কিছু দূরে, ভারী, চওড়া উঁচু রেল লাইন একটু বেঁকে ময়াল সাপের মতো শুয়ে আছে, তার পাশে একা একা দাঁড়িয়ে থাকা কতবেলগাছটা-ওখানে দাঁড়িয়ে কাদের ফায়ারম্যানকে কঞ্চি বাড়িয়ে দিতো। ওখানে, নীলমনি ডাক্তারের ছেলে রেলে জান দিয়েছিলো! আমি কতবেলতালার দিকে এগুতে লাগলাম।
রেলরাস্তার ওপর উঠতেই টর্চের আলো এসে পড়লো গায়ে। র‍্যাপার জড়ানো মানুষটা এগিয়ে আসতে আসতে ভারী অহংকারী গলায় বললো, কিরে এখানো তুই আচিস দেখচি, যাচ্ছিস কোতা।
আমি ট্রেন ছুটে আসার শব্দ পেলাম।
-তোর বোনের কাচে।
-দ্যাকগে শালা তোর বোনকে নিয়ে কারা মজা লুটছে।
পায়ের নিচে থেকে ঝাঁ ঝাঁ করে মেল ট্রেন ছুটে এসে লাফিয়ে মাথার ভেতর ঢুকে গেলো।
আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
–তবে রে শুয়ারের বাচ্চা !
হাতের মুঠো শুদ্দু ওর পেটের ভেতর ঢুকে গেলো বোধহয়।
আর সঙ্গে সঙ্গে নির্বোধ কোন জানোয়ারের মতো ভাঙা–ফাটা গলায় প্রচন্ড জোরে চিৎকার করে টাল খেয়ে দু'পা পিছিয়ে গেলো। তারপর তলপেটের ওপর দু'হাত চেপে আঃ আঃ আঃ করতে করতে মাথা নিচু করে শরীরের ওপরের অংশকে সামনে দিকে ঝুঁকিয়ে কোমর ভাঙলো, তারপর তেমনি আঃ আঃ আঃ করতে করতে হাঁটু ভাঙতে ভাঙতে বসে পড়তে থাকে। যেনো কবজা লাগানো ফোল্ডিং পাল্লা ভাঁজে ভাঁজে মুড়ে দিচ্ছে।
এখন অবিকল সেজদায় যাবার ভঙ্গি। সেই অবস্থায় অজিত একবার আমার দিকে মুখ তুলে তাকালো।
আহ্! কখন যে চাঁদ উঠছে আকাশে!
চাঁদের আলো ওর হাঁ করে থাকা মুখের গর্তের ভেতর, চকচকে কপাল, নীল হয়ে আসা গালে আর কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে থাকা আমড়ার মতো বড়ো বড়ো চোখদুটোতে।
সেকেন্ডখানেক, তারপরই কাত হয়ে পড়ে গেলো রেল লাইনের খোয়ার ওপর। খানিকক্ষণ গোঙানি., পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঝাঁকুনি খেলো কবার, একটা পা খানিকটা ওপরে উঠে মাটিতে আছড়ে পড়লো, কেঁপে কেঁপে উঠলো বার কয়েক, মাথা মুখ খোয়ার ওপর ঘষা খেলো। মুখ দিয়ে অক করে একটা শব্দ হয়ে একেবারে থির হয়ে গেলো।
র‍্যাপার, শার্ট, ধুতি ভিজিয়ে ঝলকে ঝলকে বেরিয়ে আসা রক্ত দেখতে দেখতে এতোক্ষণে আমার হাতের দিকে খেয়াল হলো।
ড্যাগারটা চোখের সামনে তুলে ধরলাম, শাদা চকচকে ফলার ওপর চটচটে লাল, তার ওপর একটু নীলচে চাঁদের আলো।
পরকলা কাচের মতো ফলাটাকে চাঁদের দিকে চিৎ করলাম, কাত করলাম– শাদা,লালের চকমকি জ্বলে জ্বলে উঠতে লাগলো। গত বছর মহেশের রথের মেলা থেকে ড্যাগারটা কিনেছিলাম শখ করে। কারুকাজ করা বাঁট, একটু বাঁকানো, জিনিসটা ভারী পছন্দ হয়ে গিয়েছিলো আমার। শ্রীরামপুর থেকে আজ ফেরবার সময় পকেটে ভরে নিয়েছিলাম, আর এখন সেই ড্যাগার.....
বারুইপাড়া স্টেশন ছেড়ে মনিরামপুর সিগনালের কাছে ট্রেনের হুইসিল বেজে উঠলো।
শীতের রাতে চাদর গায়ে গুটি–সুটি মেরে পড়ে ঘুমিয়ে থাকা কোন বেচারা মানুষের মতো লাগছে এখন অজিতকে।
শুনলাম রেল লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে হঠাৎ আমার ভীষণ কাঁপুনী এলো। পা দুটোকে কোন মতেই বশে রাখা যাচ্ছেনা। দাঁতে দাঁতে যেনো সেলাই মেশিন চলছে। বুকের ভেতর তাঁতের মাকু চলছে খটাখট খটাখট। মাথার ভেতরটা ঝুল আর মাকড়শার জালে ঝাপসা হয়ে গেলো। আমি খুলে আসতে থাকা কাঁধ, পা, হাত সব সামলাতে সামলাতে জলায় নেমে এলাম।
কুল কুল কুল কুল করে জ্যোৎস্না ঢুকছিলো কবরের ভেতর, কাফনে মোড়া মাকে তার ভেতর শুইয়ে দেওয়া হলো। জ্যোৎস্নায় শাদা ধবধবে কাফন আরো শাদা দেখাচ্ছে, পেটের কাছে একটু ফ্যাকাশে ধরনের লাল ছোপটার ওপর আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দৃষ্টি আটকে ছিলো।

অজিতের পেট থেকে এখনো কি রক্ত বেরুচ্ছে?–এই চিন্তা মাথার ভেতর পাক খেয়ে উঠতে না উঠতে কবরের নিচে দাঁড়িয়ে গফুরভাই মার মুখ থেকে কাফন সরিয়ে ওপরে দাঁড়িয়ে থাকা আমাকে বললে,শেষবারের মতন দেকে লে। টর্চের আলো ফেললো।

আমি মার মুখের দিকে তাকালাম। মাকে দেখতে পেলাম না, হাঁ–করা মুখ, কোটর থেকে ঠেলে আসা চোখ নিয়ে শুয়ে থাকা অজিতকে দেখে দুহাতে মুখ ঢেকে বসে পড়লাম।

কে যেনো মাথায় হাত রাখলো, কাঁদিসনি, কবরের সামনে চোকের পানি ফেলতে নেই।

সবাই বললো তোর জেগে কাজ নেই। ঘরে যেয়ে শুয়ে থাক। আমি বললাম, না।

ভোলার আমতলায় বল্লম হাতে বসে থাকলাম অন্যান্যদের সঙ্গে। ওরা কথা বলছিলো । আমি চুপ–চাপ বসে বসে ভাবছিলাম। ভাবছিলাম, মা খুন হয়েছে, নূরী লুট হয়ে গেছে, এখানে, এই আম গাছের নিচে বসে একদিন কাদেরের সঙ্গে কথা হয়েছিলো। তখন দুপুর ছিলো, আকাশের খুব ওপরে চিল উড়ছিলো একটা। ভাবছিলাম,কয়েক ঘন্টা আগে আমি আত্মহত্যা কবরাব জন্যে কতবেল তলায় গিয়েছিলাম, অথচ সেখানে এখন অজিত পড়ে আছে আমার হাতে খুন হয়ে,আর একটু আগে মাকে কবর দিয়ে এখন আমি ভোলার আমতলায় রাত জেগে বল্লম হাতে বসে বসে গ্রাম পাহারা দিচ্ছি।

ভাবতে ভাবতে থ হয়ে গেলাম, গোটা ব্যাপারটাকে স্রেফ একটা ফালতু হেঁয়ালি মনে হলো, মনে হলো, তাহলে বেঁচে থাকা আর মরে যাওয়া, ভালোবাসা কিংবা দুঃখ এ সবের মানেটা কি? বল্লম হাতে আমি কাকে পাহারা দিচ্ছি।

উঠে দাঁড়ালাম, বললাম ভাল্লাগছেনা, চলি। বল্লমটা একজনের হাতে তুলে দিয়ে ঘরের দিকে পা বাড়ালাম।

খুলনা লঞ্চ ঘাটে জ্বরের ঘোরে পড়ে থাকলাম দু'দিন।

সকালবেলা, সারা গায়ে ব্যথা। মাথা তুলতে গেলে ছিঁড়ে আসতে চায়, চিৎকার, হৈ চৈ, ভিড়, ব্যস্ততার ভেতর কে যেনো ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করছে, তুমি কিডা গো, কোওন থে আসতিসো?

চোখ মেলে দেখলাম বছর ১২/১৩ এর একটা ছেলে।

–কতা কোসসো না ক্যা? রিফ্যুজি? রিফ্যুজি হলি হু–ই উদিকি যাও, ওহানের স্কুলের মদ্যি তোমাগো জন্যি ক্যাম্প খুলিছে। এহানে এরাম পড়ে থাকলি না খাতি পায়ে মরে যাবানে।

আমি বললাম, ঢাকার লঞ্চ কটায় ছাড়বে?

–রাত নয়ডায়।

ছেলেটা আমার দিকে ফিরে দেখতে দেখতে মাথায় টুকরি নিয়ে চলে গেলো। আমি উঠে টলতে টলতে টিউবওয়েলের দিকে এগোতে লাগলাম।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
রিফ্যুজি মানে কি? উদ্বাস্তু? তার মানে যার বাড়িঘর নেই? কিন্তু আমার তো বাড়িঘর আছে। তবু আমি রিফ্যুজি, কেননা আমি দেশহারা। এই তো?
তাহলে সেই যে ইংরেজ তাড়িয়ে স্বাধীনতা–হিন্দুস্তান পাকিস্তান–সে কি মানুষকে রিফ্যুজি বানাবার জন্যেই? না হলে হিন্দুস্তান থেকে হাজারে হাজারে মানুষ বাপ দাদা চোদ্দ পুরুষের ভিটে– মাটি ছেড়ে পাকিস্তানে আসছে কেন? কিংবা হাজারে হাজারে মানুষ একইভাবে কেন পাকিস্তান থেকে চলে যাচ্ছে হিন্দুস্তানে!
এর নামই কি স্বাধীনতা? রিফ্যুজি হবার স্বাধীনতা?এতো বছর পরেও মানুষকে রিফ্যুজি বানাবার জন্যে এপারে ওপারে কারা কলকাঠি নাড়ে?
রাস্তার ধারে দেড় টাকা রোজে খোয়া ভেঙে, পার্কের বেঞ্চে, দোকানের বারান্দায় শুয়ে রাত কাটিয়ে, পুরনো ঢাকায় ঘুপচি গলির ভেতর হুমড়িখেয়ে পড়া টিনের বেড়া দেওয়া 'ভাই ভাই লজেন্স ফ্যাকরীতে, কাজ করে, খেয়ে না খেয়ে, ঘুমিয়ে না ঘুমিয়ে আমি মরলাম না।
মিছিলে শ্লোগানে ডগোমগো হয়ে কতোবার শহর নেমে এলো রাস্তায়। কারফ্যু, গুলি আর রক্তের ভেতর দিয়ে আমি হাজার মানুষের মধ্যে শেষ পর্যন্ত টিকে গেলাম। ঢাকা নারায়ণগঞ্জ রুটের ট্যাক্সি ড্রাইভার হলাম।
আমানত আলী বললে, এইভাবে না বিয়া কর। সবাই বললে, এইবার বিয়া কইরা ফালাও মিয়া, জুয়ান বয়সে পোলাপান ওইলে আখেরে কাম দিব।
আমানত আলী তার এতিম শালীর সঙ্গে আমার বিয়ে দিলো।
আমি রাবেয়াকে আমার ভাড়া করা টিনের ঘরে এনে তুললাম।
প্রথম রাতে হারিকেনের আলোয় ঘোমটা সরিয়ে থুতনিতে হাত দিয়ে মুখ তুলে ধরতেই চোখ বুঁজে ফেললো রাবেয়া। আমি ওর মুখের দিকে চেয়েছিলাম। কী যে হচ্ছিলো! বড়ো বিস্ময় লাগছিলো আমার।
আমি চুমু খাওয়ার জন্যে মুখ বাড়ালাম, আর তখন হঠাৎ করে চাঁদের আলোয় কতবেলতলায় দেখা অজিতের সেই ভয়ানক মুখ ভেসে উঠলো।
'উফ' বলে আমি কপালের দু'পাশের রগ চেপে ধরে মাথা নিচু করে ফেলেছিলাম। রাবেয়া কেঁপে উঠে শাঙ্কিত, প্রায়– শুকনো গলায় অস্ফুটে বলেছিলো–কি ওইলো?
আমি তেমনি মাথা নিচু করে বলেছিলাম, না কিছু নয়, মাথাটা হঠাৎ....
আমানত আলীকে পেলাম না। চিটাগাং গেছে।
খুব সকালে গেছি, তার ওপর আমার চোখ–মুখে কি ছিলো কে জানে, রাবেয়ার বোন হকচকিয়ে গেলো।
কথা না বলেও মানুষ চোখ মুখের ভঙ্গিতে যেমন করে উদ্বিগ্ন হয়ে বলতে চায়, 'কি? কি হয়েছে?' –রাবেয়ার বোনের মুখে তেমনি ভাব ছিলো।
আমি বললাম, না, দরকার ছিলো।
–রাবেয়া কেমন আছে?
আমার মনে হলো, এই কথাটাই প্রথম থেকে জানতে চাইছিলো। বললাম, ভালো। চলি।
মাত্র পনেরো দিন বিয়ে হয়েছে। নতুন জামাই, এসেই চলে যাচ্ছে এভাবে, তার ওপর সকালবেলা, এমন ঝড়ের মতো এসেছি–রাবেয়ার বোন ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
দরজার পাশ থেকে ছেলেকে বললো, ঘরে আইতে ক।
আমি উঠানের ওপর দাঁড়িয়েই বললাম, না, বসবো না, কাজ আছে; পরে আসবো।
আমানত আলীর বছর আটেকের ছেলেটা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।
আমি উঠোন থেকেই চলে এলাম। বুঝতে পারছিলাম, দারুন উদ্বিগ্ন হয়ে চেয়ে আছে রাবেয়ার বোন ।
দুঃখ নয়,অভিমান নয়, নিদারুণ অপমানের লাথি ঝাঁটা পড়ছিলো আমার চব্বিশ বছরের গায়ে।
অনেক আগে, ভোলার আমতলায় বল্লম হাতে গ্রাম পাহারা দিতে দিতে মনে হয়েছিলো, কাকে পাহারা দিচ্ছি?
এখন মনে হচ্ছে সারা জীবন আমি নিজেকেই পাহারা দিয়ে এসেছি।
আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম নিজের জন্যেই, খুনও করেছিলাম নিজের জন্যেই। শ্রীরামপুরে না গিয়ে খুলনা চলে আসা–তাও নিজের জন্যে–খুলনাতেই থেকে যেতাম, কিন্তু সেই যে খুলনা লঞ্চঘাটে ছেলেটি জিজ্ঞেস করেছিলো, তুমি কিডা গো? রিফ্যুজি ? তারপর রিফ্যুজিদের জন্যে খোলা ক্যাম্পে যেতে বললো!
সঙ্গে সঙ্গে আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম,না, এখানে নয়। বলেছিলাম, ঢাকার লঞ্চ ক'টায় ছাড়বে?
স্টান্ডে গেলাম না, গাড়ী বার করলাম না।
সারা সকাল ঘোর লাগা মানুষের মতো হেঁটে বেড়ালাম শহরের এখানে ওখানে, তারপর সেই কোন দুপুর থেকে বসে আছি এখানে, শহরের শেষ প্রান্তে প্রায়, এই নদীর ধারে।
একটু আগে হঠাৎ নূরীর মুখটা ভেসে উঠেছিলো অনেকদিন পর। অল্পক্ষণ। তারপর চোখভরা পানি নিয়ে রাবেয়া।
সন্ধ্যা নামছে । ওপারে নীলচে–কালো জমাট গাছপালা। পাখিরা ঘরে ফিরছে। তিরতির করে নদী বয়ে যাচ্ছে। ধার ঘেঁষে বাঁধা নৌকোয় নৌকোয় রান্নার ব্যস্ততা। ইঁটের ভাঁটির চিমনির আকাশ–মুখী ধোঁয়া অন্ধকারে মিশে যাচ্ছে।
আমানত আলীর সন্তান পেটে নিয়ে রাবেয়া চোখের পানিতে আমার পথ চেয়ে বসে আছে।
আমি স্থির গাছপালা, বয়ে যাওয়া নদী , ঘরে ফেরা পাখিদের পেছন করে পাড় বেয়ে উঠতে লাগলাম –সামনে, একটু দূরেই, শহরের আলো জ্বলে উঠেছে, তার ভেতর গাড়ী–ঘোড়া আর পোকার মতো হাজার হাজার মানুষ।
মাস কয়েক পর রাবেয়া একটি সন্তান জন্ম দেবে। সে যেমন– ছেলে বা মেয়ে– আমার পরিচয় নিয়ে ভূমিষ্ট হবে, বড়ো হবে, বেচেঁ থাকবে, আমিও তেমনি ভুল পরিচয় নিয়ে এই হাজার হাজার মানুষের মধ্যে বেঁচে থাকবো ভুল পরিচয় নিয়ে একদিন মরে যাবো।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জগদ্দল

এখান থেকে জল দেখা যায় না। অন্ধকারের ভেতর শুধু ভাঙা জাহাজের কাঠামোটা উচুঁ দেওয়ালের মতো নজরে আসে।
রেললাইনের ওপারে বামদিকে নদী ঘেঁষা শ্মশান, এপারে ডান-হাতি ঢাকা কটন মিলের পেছন দিক, তার পাশে আর সিম জুট বেলিং মিল।
কটন মিলের গা ঘেঁষে পুকুর পাড়ে ছিলো কয়লার ডিপো। ওয়াগন বোঝাই করে কয়লা আর পাট আসতো । শহরে কয়লা সাপ্লাই হতো এখান থেকেই। অসম্বৃত পাট যেতো আর সিম মিলে, সেই পাট বেলিং হয়ে আবার ওয়াগন বোঝাই করে চলে যেতো কোন-কোন মুল্লুকে।
জুট বেলিংয়ে আর সিম-এর নাম ছড়িয়েছিলো ডান্ডি পর্যন্ত। মিলটি এখনও আছে, জুট বেলিংও হয়, কিন্তু আজ সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই।
শ্মশান ঘেঁষা নদীর পাড়ে এখন পুরোনো জাহাজ ভেঙে বিক্রি করার জমজমাট ব্যবসা। পাড়ের বিস্তীর্ণ ঢালুতে ঘাঁসের বদলে নাট বল্টু থেকে শুরু করে বিপুল-ভার যন্ত্রাংশের মোটা আস্তরণ।
পাঁচিল-ঘেরা শ্মশানের বাইরে লোকজন , চাকা লাগানো গাড়িতে ফুচকা চটপটি, ঝালমুড়ি, পান সিগারেট, তেলে ভাজা-লম্বা লম্বা ডিবেয় মোটা সলতে লাগানো কুপি জ্বলছে দোকানদারের পশরার সামনে।
জায়গাটা ফাঁকা । পোস্তগোলার মোড় থেকে একটা আধ-পাকা রাস্তা সোজা এসে মিশেছে রেললাইন পাতা গাছপালাহীন এই ফাঁকা জায়গাটার মুখে।সেখানে রিকসা থামতেই নদী থেকে উঠে-আসা ঠান্ডা বাতাসের স্পর্শ লাগলো চোখে মুখে। ঢাকের আওয়াজ পোস্তগোলার মুখ থেকেই পাওয়া গেছে, এখন সীমানা বেষ্টিত শ্মশানের ভেতরকার আলোর আভা চোখে পড়লো। শেষ অক্টোবরের অন্ধকার এবং কুয়াশায় সে আলো ফ্যাকাশে রিকসা থেকে নেমেই পার্থ বমি করতে শুরু করেছে আবার। ওর জন্যেই রিকশা নেওয়া, না হলে তারা হেঁটেই আসছিলো। গেন্ডারিয়া ফাঁড়ির পাশ দিয়ে সোজা এসে নবীনচাঁদ গোস্বামী রোড দিয়ে আসতে পারতো, লালমোহন পোদ্দার লেন দিয়েও আসা যেতো হাঁটতে-হাঁটতে । গেন্ডারিয়া ফাঁড়ির সামনে বুদ্ধুর দোকান থেকে একপ্লেট করে বিরিয়ানী মেরে দেওয়া যেতো। কিন্তু সুত্রাপুরের মোড়ে এসেই বমি শুরু করলো, রিকসা না নিয়ে উপায় কি? শ্মশানে ঢুকেই ভূপেন বলে, ইস ঠোলার বহর দেখছস ? পরিসর বেশী বড় নয় শ্মশানের , তার মধ্যে একদিকে বারান্দওয়ালা ইটের এক কামড়া ঘর , বৃষ্টি বাদলে শ্মশান বন্ধুরা এখানে আশ্রয় নিয়ে থাকে। এই ঘরের পাশেই একটু ঘেরা জায়গা,ওখানে শবের স্নান এবং কাপড় পরানোর ব্যবস্থা। সামনের ফাঁকা জায়গাটার মধ্যে বাঁ পাশে একটা, ডান পাশে দুটো চিতা ,চিতা

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
তিনটির প্রত্যেকটির মাথার দিকে দুটো, পায়ের দিকে দুটো করে চারটে সমান্তরাল লোহার পাতের খুঁটি পোঁতা, এই খুঁটির ভেতর কাঠের লম্বা লম্বা টুকরো দিয়ে শক্ত করে চিতা সাজানো হয়।

এই বারান্দা,এই ঘর, এই স্নানের জায়গা বাদ দিয়ে যেটুকু জায়গা তার মধ্যেই আবার কালীপূজা । প্রতিমার জন্যে গেটের পাশে পাঁচিল ঘেঁষে হাতকয়েক চওড়া বাঁশের ফ্রেমের নদী-মুখী তিনদিক ঘেরা মন্ডপ ।

এ-সবের পর আর কতোটুকু জায়গাই বা অবশিষ্ট থাকে!

সেই তুলনায় লোক যথেষ্টই হয়েছে বলতে হবে।

মূর্তির সামনে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটায় আরতি চলছে। একজন ঢাকী, একজন ঢুলী, একজন কাঁসি বাদক। সাবানে ফাঁপানো ঘাড় পর্যন্ত নেমে আসা চুল, ১৮/১৯ বছরের শাদা প্যান্ট, স্যান্ডো গেঞ্জি-পরা একটি যুবক দুই হাতে ধুনচি নিয়ে সেই ঢাক-ঢোল আর কাঁসির তালে নাচছে।

ডান দিকে দু'টি চিতার একটিতে এক বৃদ্ধ। মাত্র কিছুক্ষণ আগে তোলা হয়েছে চিতায়। শোঁ শোঁ আওয়াজের সঙ্গে সবেমাত্র রস ঝরে পড়বো পড়বো করছে। অর্ধচন্দ্রাকারে দাঁড়িয়ে থাকা শ্মশান-বন্ধুদের পাশে চিতা থেকে হাত কয়েক দূরে শতরঞ্চি বিছিয়ে বসে বসে মদ খাচ্ছে হারাধন বাবুদের দলটি। মাঝবয়সী লোকগুলো সন্ধ্যা হলেই একে একে গোবিন্দ পালের দোকানে এসে জোটে, ভেজিটেবল চপ খায়, ডিম খায়, চা খায়, পরচর্চা করে, রাজা-উজির মারে, একটু রাত হলে বগলদাবায় কাগজে জড়ানো বোতল নিয়ে কুজোঁ হাত-ব্যাঁকা শিবনাথ আসে, তখন সব একে একে দোকানের পেছন দিকের খুপরিটায় চলে যায়, সেখানে বসে মধ্যপানের নিয়মিত আসর । এরমধ্যে ডাক্তার আছে, সাংবাদিক আছে,কন্ট্রাক্টর আছে, ব্যবসায়ী আছে, বাড়ী-কাম পাসপোর্টের দালাল আছে, বাপ-দাদার রেখে যাওয়া বাড়ী ভাড়ায় সংসার চালানো নিষ্কর্মা আছে, এরা আজ আসর উঠিয়ে এনেছে শ্মশানে।

আর আছে ঘোর -লাগা চোখ, চকচকে মুখ , অবিন্যস্ত চুল, পানের রসে ভেজা ঠোঁট-১৬ থেকে ২০/২২ বছরের কিছু তরুণ-একবার বাইরে যায়, একবার ভেতরে আসে, এ-ডাকে ওকে ও গাল দেয় তাকে, দ্যাখ শোম্বা ভালো ওইবো না কইলাম। শম্ভু নামের ছেলেটি হাসে, বিশ্বাস কর মাইরি...

-কিয়ের চ্যাটের ফাজলামি করস ব্যাটা...

এই সব খিস্তি এবং কথাবার্তার ভেতর হেলমেট মাথায় রাইফেলধারী পুলিশরা ঘুরে বেড়ায়। আরতির আসর থেকে সম্মিলিত কণ্ঠে ভেসে আসে, কালী মা ঈ কী জয়; কে যেন শিসও দিলো। এই জয়ধ্বনি এবং শিসে ঢাকের তাল কাটে না। ঢাকের বোলে ঢোল কাঁসির জবাবটিও হয় নিখুঁত।

বাঁদিকের শূন্য চিতাটি ঘিরে মলিনবেশ জনকয়েক মাঝবয়সী ডাইনীর মতো মহিলা বসে আছে, চিতার কালচে মাটিতে গোছা-গোছা আগরবাতি, লাইনবন্দী ছোট ছোট মোমবাতি জ্বালিয়ে মেয়েমানুষগুলো কি যে পেতে চায় তারাই জানে। নদী এবং নদীর ওপারের সলিড অন্ধকার থেকে কুয়াশা মাখা ঠান্ডা বাতাস আসছে। মাথার ওপর বিশাল শূন্য কালো আকাশের নিচে খান দুয়েক হ্যাজাকের আলোয় মধ্যরাত্রির নির্জন শ্মশানে এই মানুষজন, মদ্যপান, জলন্ত চিতা, ঢাকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
আওয়াজ, আরতিমগ্ন তরুণের নৃত্য,বিকট দর্শন ডাকিনী-যোগিনী নিয়ে নৃমুন্ড-মালিনী কালীমুর্তি, রোগা লিকলিকে তামাটে পুরোহিত, তার সিদ্ধি খাওয়া লালচে চোখ-যেন এখনই কোনো অনার্যকে পিঠ-মোড়া করে বেঁধে এনে তেল সিঁদুরে চর্চিত করা হবে, তারপর এই কুলগর্বী পুরোহিতটি দেবীর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে থাকা সেই ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ষন্ডের মতো নির্বোধ যুবকটির উদভ্রান্ত দৃষ্টির সামনে খাঁড়া হাতে এসে দাঁড়াবে, সেই খাঁড়ার চাঁদের মতো বাঁকানো চওড়া চকচকে পাতের ওপর অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা একটি চোখ আঁকা।
ঢাকের শব্দ প্রবল হবে তখন, আর খাঁড়া শূন্যে দুলে উঠলে একটি ভাঙা-ফাটা প্রচন্ড মরিরা চিৎকার ঢাকের আওয়াজ ছাপিয়ে চারপাশ কাঁপিয়ে দেরে।
ভূপেন ঠিকই বলেছে,এবারে পুলিশের সংখ্যা আগের বারের চেয়ে অনেক বেশী। তবে ওর কথার ভেতর ঝাঁঝ আছে-এবছর দূর্গা পূজোয় একই দিনে বিভিন্ন জায়গায় হামলা হয়েছে প্রতিমার ওপর। তখন কৈ আছিলো এ্যারা? এই কথাটিকেই ভূপেন সংক্ষেপে আরো তেতো করে আরো শানিয়ে বলেছে 'বহর'
পার্থর বাবা বলে, এ্যার ভিতরে পলিটিকস আছে।
-রাজাকাররা.....
দীপকের কথা শেষ হতে পারে না, পার্থর বাপ হাত নেড়ে বলে উঁহুঁহুঁ...
দীপক এবং বাসু তার দিকে তাকিয়ে থাকে। অবাক হওয়া মুখগুলো দেখে বিষ্ণুপদ প্রাণে ভারী আরাম পায়ঃ পোলাপান এ্যারা, দেখছেই বা কি, বোঝেই বা কি!
এই অবোধদেরকে জ্ঞানদান করার জন্যে সে নড়ে-চড়ে বসে, আমরা বৃটিশআমলের লোক তো..বিষ্ণুপদ যেন বহ্ আগে খাওয়া সু-স্বাদু কোনো খাবারের ঘ্রাণ এবং স্বাদকে শরীর দিয়ে অনুভব করছে।
এইবার শুরু ওইলো প্যাচাল-দীপক এই কথাকে বাসুর গায়ে আঙুলের খোঁচায় চালান করে দেয়। কি কুক্ষণেই যে এসেছিলো পার্থর কাছে, বুইড়া আইজ এক ঘন্টার আগে ছাড়বে বইলা মনে হয় না। আর বাসু চুৎমারানিরে দ্যাখো, হালায় কেমুন গুড বয় ওইয়া শুনতাছে।
আরে ইন্ডিয়ান পলিটিকসে সাকরিফাইস তো করছে বাঙ্গালীরাই,সোনার টুকরা সব ছেলে, জেল কাটছে, গুলি খাইছে, ফাঁসিতে ঝুলছে, দ্বীপান্তরে গেছে...বিষ্ণুপদ'র ৬৫ বছরের ঠান্ডা রক্তের ভেতর উজান ঠেলে কি বোমা নিয়ে, উবুতে পিস্তল বেঁধে সেই সব তরুণেরা সাঁতরে আসছে?
.....মাউড়া হালারা তো খালি টাকা গুণছে। কিন্তু এতো কইরাও বাঙ্গালী গো জাগা হয় নাই, ঐ যে মতিলাল নেহরু, গান্ধী আর জহরলাল, হ্যারা কি কম হারামিপনাটা করছে! সি আর দাশ টিকতে পারে নাই। আর সুভাষ বোস?ওই হালার গান্ধা আর জহইরা খালি তার পিছে লাগছে। ক্যান? না বাঙ্গালী। বাঙালী কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট ওইবো?কভী নেহী?
সুভাষ বোসের বিরুদ্ধে গান্ধী সীতারামিয়ারে খাড়া করাইলো, মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী-অর মাউড়ারগুষ্টি কিলাই-তিনি কইলেন, সীতারামিয়া'স ডিফিট ইজ মাই ডিফিট।...তারপরও ঠেকাইতে পারে নাই, সুভাষ বোস প্রেসিডেন্ট ওইছে; কিন্তু তারে থাকতে দিবো ক্যান। জহরলালের লগে গান্ধী পরামর্শ করলো। শেষে বলা ওইলো, সুভাষ বোস প্রেসিডেন্ট ওইছে ভাল কথা, কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
কমিটিতে যে লোক নিবো তা গান্ধী পছন্দ কইরা দিবো।
সুভাষ বোস, বাপের ব্যাটা একখান, মাইন্যা নিবো ক্যান?হ্যায় কি ছাতু খাওয়া মাউড়া না লাউয়ের ডোগা আর পচা ইচামাছ খাওয়া ঘটি? আরে পদ্মায় ইলিশের ত্যাজই আলাদা..
বিষ্ণুপদ'র কথা সোজা রাস্তা ছেড়ে কোন অলি-গলির ভেতর যে ঢুকে যাচ্ছে, বাসুর ধন্দ লেগে যায়। এ সবের সঙ্গে স্বাধীন বাংলাদেশের দূর্গপ্রতিমা ভাঙার সম্পর্ক কি? কিন্তু এই বুড়োকে এখন থামাবে কে?
বাসু বোঝে দীপক পার্থর বাপের সঙ্গে তারও মুন্ডপাত করছে কিন্তু সে কি করবে? না পারে উঠতে না পারে থামাতে।
কি নিয়ে শুরু করেছিল বুড়ো বোধহায় এখন ভুলেই গেছে।
সুভাষ বোসের বাড়ী কৈ জানস? প্রশ্ন করে নিজেই উত্তর দেয়, জানস না। সুভাষ বোসের বাড়ী ওইলো গিয়া আমাগো ঢাকার বিক্রমপুরে, আরে সবই তো এই দিক্কার; দেশ বন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বাড়ী কৈ? বিক্রমপুর। সরোজিনী নাইডুর বাড়ী কৈ? বিক্রমপুর । জগদীশ বসুর বাড়ী কৈ ? বিক্রমপুর। কতো কমু, এই যে কইলকাতার ডালহৌসি স্কোয়ারের নাম অখন রাখছে বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ। এ্যারা কারা জানস? এ্যারা হেই বোমা-পিস্তলের যুগের বিপ্লবী, রাইটার্স বিল্ডিংয়ে ইংরাজ সায়েবগো এ্যাটাক করছিলো। দ্যাশ কৈ? না বিক্রমপুর।
বিনয় বসু তো আমার মেজদার বন্ধু আছিলো, মিটফোর্ড মেডিকেল স্কুলে পড়তো। আমাগো বাড়ী কত্তো আইছে, সেই বিনয় বসু মিটফোর্ড হাসপাতালে ইংরাজ সাহেব , কি জানি নামটা ভুইলা গেলাম, তারে মাইরা উধাও; সারা শহর তোলপাড়, বিনয় কৈ, বিনয় কৈ? আর বিনয়! হ্যায় তখন পগার পার, এককেরে কইলকাতা, তারপর তিনজনে রাইটার্স বিল্ডিং এ্যাটাক করলো।
বিষ্ণুপদ হাসে, ভারী গর্বের হাসি, কইলাম না পদ্মার ইলিশের ত্যাজই আলাদা।
বাসু ভাবে, যাক এবার বুঝি থামলো। প্রতিমা ভাঙার পেছনের 'পলিটিকস' এখন পদ্মার ইলিশের তেজে একশো হাত জলের নিচে।
বাসু উঠতে যাচ্ছিলো। আরে বয়, আসল কথাটাই তো শুনলি না
না বিষ্ণুপদ ভোলেনি । বাসুর রাগও হয়, বিরক্তিও ধরে, আবার হাসিও পায় , তবে দীপকের দিকে আর তাকাতে পারে না, ভেতরে -ভেতরে ভয় হতে থাকে , এই বুঝি দীপক কি একটা বলে বসে।
দীপক কিছু বলে না, ঘাড় গোঁজ করে বসে থাকে ।
বিষ্ণুপদ'র অসামাপ্ত সংলাপ আবার শুরু হয়ঃ মাউড়া, বুঝলি? তা তর গিয়া পাকিস্তানই ক আর ইন্ডিয়াই ক, সব এক, এ্যাগো মইদ্যে হিন্দু-মুসলমান নাই, বাঙ্গালী এ্যাগো দুই চক্ষের বিষ। আরে সুভাষ বোস থাকলে কি পাকিস্তান ওইতে পারতো? জিন্না-লিয়াকত-নেহরু কৈ ভাইস্যা যাইতো। আজাদ হিন্দ ফৌজ তো আইয়া পড়ছিলোই প্রায়।
দীপক অতিষ্ঠ হয়ে যায় এবারঃ কিন্তু প্রতিমা ভাঙ্গার লগে এই সবের কি সম্পর্ক?
বিষ্ণুপদ আকর্ণ হাসেঃ এই তো, বুঝলি না, এতোক্ষণ কি কইলাম, আরে বাঙ্গালী গো যেমুন ডরাইছে ইংরাজরা তেমনি ডরাইছে মাউড়ারা, অহনও ডরায়! কথা ক'টি হেসে বলে বটে, কিন্তু বলতে -বলতে বিষ্ণুপদ'র ভেতর রাগ হতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
থাকে। দীপকের কথা, তার কণ্ঠস্বর, বিষ্ণুপদ'র কানে লেগেছে, বুঝতে পারে এতোক্ষণ সে যে এতোগুলো কথা বললো, এগুলা এ্যাগো ভালো লাগে নাই; মূর্খ, মূর্খ আকাট মূর্খ সব। শিক্ষা নাই, আদর্শ নাই, ছোট-বড়ো মাইন্য নাই; বোঝে না কিছুই, বোঝনের ইচ্ছাও নাই,খালি ফাল পাড়বো। নাইলে কি দ্যাশের এমুন দশা অয়। বাপের হোটেলে খাইবো, মাইয়া গো পিছে ঘুরবো, সিগারেট ফুঁকবো, মদ-গাঞ্জা খাইবো, চুরি-ডাকাতি ,হাইজ্যাক, ব্যাঙ্ক লুট...আর আমাগো টাইমে...না এ্যাগো কইযা লাভ নাই।

ভূপেন বাসুর হাত ধরে টানে, চল বুইড়া হালায় মরণের আর টাইম পাইলো না।' পা ফেলতে গিয়ে বাসু টের পায়, পা তার বশে থাকছে না, ভূপেনের কথা ও জড়ানো-জড়ানো।

বাসু বলে, কৈ যাবি?

চিতার উচ্ছ্বসিত আগুনের ভেতর ঘাড় টান করে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা বৃদ্ধের নাম নক্সা এখন লুপ্ত।

-দূর , বুইড়া চুৎমারানি যে গন্ধ ছাড়ছে! আর এই দুই হালায় গেলো কৈ পার্থ দীপইকা?

তাই তো , মুখে মাথায় জল দেবার জন্য দীপকের সঙ্গে পার্থ গেছে সেই কখন!বাসুর একটু অবাকই লাগে ,এতোক্ষণ তার মনেই ছিলো না, আশ্চর্য!

হাঁটিতে গিয়ে পার্থ একবার টাল খায়; কিন্তু দীপককে দেখো, দিব্যি ভদ্রলোকের মতো সোজা হয়ে হাঁটছে। অথচ ও-ই সব চাইতে বেশী টানছে হালার পুতে খাইতেও পারে।

খেতে -খেতে বলেছিলো, ভূপেন আর একখান বোতল আন, শ্মশানে গিয়া খাওন যাইবো।

পার্থই বারণ করেছিলো, না থাউক গা, পরে হালায় গোয়া উল্টায়া পইড়া থাকবা।

ভূপেন বলে পইড়া থাকবো না। যে হালায় আউট ওইবো তারে আর আনন্তি নাই,যে চিতাখান জ্বলতাছে দেখুম তার উপরেই উঠায়া দিমু।

দীপক হাসে,মুখে আগুন দিবো কে?

-ইস্, যে-না চ্যাটের বাল আব্দুল্লা আবার মুখে আগুন!

বাসু আর ভূপেনকে এদিকে আসতে দেখা গেলো। দীপক বলে, দুই হালারেই পাইছে। কাছাকাছি এলে হাসে, ভূপেন, অখন কারে চিতায় তুলুম ক, তরে না বাসুরে?

ভূপেন বোধহয় ভুলে গেছে, সে দীপকের মুখের দিকে তাকায়। দীপক আবার বলে, জিগাইতাছি চিতায় কি দুইজন এক লগেই উঠবি?না.....

ভূপেন এবার বোঝে,'ও'-হাসে, পাও টলে, না? কিন্তু আউট হই নাই। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টলে, তার মুখে আর হাসি নেই, ভূপেন এখন বেশ সিরিয়াস, বাসু, আমরা আউট ওইছি? বাসুর কাঁধে দুই হাত রেখে স্থির চোখে ঘাড় টান করে ভূপেন জিজ্ঞেস করে, ক, আউট ওইছি আমরা?

পার্থ দীপক দু'জনেই হাসে। পার্থ বলে, না,না, কিয়ের আউট । চল।

দীপকের সঙ্গে পার্থ যখন পুকুর ঘাটে বসেছিলো চোখে মুখে জল দিয়ে, তখন তার মাথা বেশ হালকা, মগজের ওপর দিয়ে পিপারমেন্ট মেশানো বাতাস বইতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
শুরু করেছিলো, তারপর কি হলো কে জানে, আস্তে আস্তে সেখানে ঘন কালো মেঘ জমতে থাকে। নদীর প্রবাহ দূরে সরে যায়, শ্মশান দুরে সরে যায়, ঢাকের আওয়াজ দূর থেকে আসে,ফুচকা–চটপটি–ঝালমুড়ি–তেলেভাজা দূরে, ঢাকা কটনমিল, আর সিম মিল দূরে কুয়াশার ঝুলে থাকে, পোস্তগোলা থেকে চলে আসা রাস্তাটা টলতে টলতে আবার পোস্তগোলার দিকে ফিরে যেতে থাকে।
তারপর চোখের সামনে থেকে ঘষা কাঁচটা সরে গেলে এখন সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে দাঁড়ায় আবার। মেঘ কি কেটে যাচ্ছে তাহলে?
আলোহীন মালবাহী নৌকোর সারি অন্ধকারে গুটানো ডানার ভেতর ঠোঁট গুঁজে বসে আছে দূরে। অথচ এই যে তারা হাত চারেক জায়গা জুড়ে মোটা শিকলের স্তূপটার ওপর বসে আছে পা ঝুলিয়ে, বর্ষায় এই পায়ের নিচে দিয়েই জলের প্রবাহ ছোটে, তখন আর জাহাজ– ভাঙা মালামালের এমন হাত–পা ছড়িয়ে দোকান সাজানো যায় না।
বাসু বলে, অখন কি করবি?
শ্মশানের ভেতর চিতার আগুন চমকে চমকে উঠছে, সেই আগুনের আভা যেন ছুটে ছুটে গিয়ে ছোবল মারছে ছাদের কার্ণিশে, কার্ণিশের ঠিক মাঝ বরাবর হাতখানেক উচুঁ হাত দেড়েক চওড়া একটি আয়তক্ষেত্র, সমস্তটায় শাদা চীনে মাটির প্লেটের টুকরো বসানো, তার ওপর বড়ো হরফে গৌর কুটির এবং নিচে হরফে ছোট ১৩২৩ সন ঝকঝক করে উঠেছে বারবার । বাসুর কথায় কেউ জবাব দেয় না। শ্মশানের ভেতর থেকে বাজনার শব্দ আসছে, বাইরে গেটের সামনে আলো, মানুষজন আর গুঞ্জন।
দীপক ভাবে, নদীর ধারে এই ঠান্ডা বাতাসে থাকতে–থাকতে সব কয়টিরেই ভালো মতন ধরতাছে মনে নয়, ভূপেনেরে দ্যাখো, হালায় ঝুঁকতে ঝুঁকতে লাগে যেমুন পইড়া যাইবো। মজা করার জন্যে করার জন্যে ভূপেনের দিকে দীপক পা বাড়িয়ে দেয়, প্রণাম করবা বৎস, লও ! ভূপেন সোজা হয়ে বসে কটমট করে দীপকের দিকে তাকায়। দীপক তার দিকে সিগারেট এগিয়েদিয়ে বলে, টান।
বাসুর কাঁধে চাপড় দিয়ে বলে, বাসু –উ–হ্, খবর কি?
বাসু গোঙায়, কি করবি অখন, কইলি না–তার মাথা আবার ঝুঁকে আসে।
–কি করতে চাস, তুই–ই ক
–তরা যা করবি।
দীপক উঠে দাঁড়ায় এবার । বাসুর সামনে একটু নুয়ে জিজ্ঞেস করে ঠিক?
বাসু তেমনি মাথা ঝুঁকিয়ে রেখেই বলে, ঠিক।
–আমরা গাড়ি হাইজ্যাক করুম
–পারবি না।
–ব্যাংক লুট করুম।
–পারবি না।
–মাইয়া হাইজ্যাক করুম।
–পারবি না
দীপকের গলা চেড়ে যায়: চিতার আগুনে ঝাঁপ দিয়া মরুম।
–পারবি না।
ভূপেন ঢুলতে–ঢুলতেই হাসে, বলে, হাত মারুম।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
–পারবি, কিন্তু এইখানে না, লোকজনে দেখবো।
দীপকের কি হয় কে জানে, সে প্রচন্ড জোরে চেঁচিয়ে ওঠে, চো–ও–প।
তার হঠাৎ চিৎকারে পার্থ এবং ভূপেন থতমত খেয়ে তাকায় তার দিকে। এই অন্ধকারে তার চোখদুটো ঠিক দেখা যায় না। ঘন নিঃশ্বাসের শব্দ আসে।
–কি হোইলো ভাই?
দুই মাতালকে দেখা যায়, খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে টলছে।
পার্থ বলে, কিছু না, আপোসে....
–ও হো, হাঁ–হাঁ–হাঁ আপোস, বহুৎ আচ্ছা, বান্ধু, আঁ? আমরা দুইজন ভি বান্ধু আছে। সঙ্গীর গলা জড়িয়ে লোকটি টলে,কা রে লছমনিয়া, তু হামার বান্ধু.....
সঙ্গী উত্তর দে, হাঁ,বা। সেও টলে।
প্রথমজন টলতে–টলতেই বলে, মগর বাবূ,–ই শালা যো আছে না, শালা রোজ দারু পীতা, রোজ মোদ খায় রোজ।
–অ্যাই!
–কায়, তু দারূ নাই পীতা, সাচ বোল?
ঘন কুয়াশা কালো পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকা জাহাজটিকে আরো কালো করে দিয়েছে। নদীর ওপারে হাসনাবাদ, মীরেরবাগ এখন একেবারেই কালো। এপাশে লাইনের ওপারে পোস্তগোলার মোড়ে যাবার রাস্তায় তিনজন মাতাল টলতে–টলতে চলে যাচ্ছে, শ্মশানের গেটের দিকে ফুচকা, পান–সিগারেট ঝালমুড়ি, তেলেভাজার আলোকিত মেলা অন্ধকারকে ঠেকিয়ে রেখেছে বেশ খানিকটা দূর পর্যন্ত । সেই আলোর ওপর গোলাপী রঙের কুয়াশা ঝুলে আছে।
সাচ বোল! না, তু বোল । মাতাল হাত নাড়ে আর টলে, ই বাবূলোগ কা সামনে তু ঝুট না বলবি শালা...
–এ্যাই হরিয়া গালি মাৎ দে, তুহার মূ হাম তোড়..
–ইহ,মু তোড়নেওয়ালা, তোড় ,তোড়! হরিয়া তার মুখটা সামনের দিকে তুলে টলতে টলতে এগিয়ে যায়।
দীপক ধমক দেয়, এ্যাই,যা!
হরিয়া এবার দীপকের দিকে তাকায়,দ্যাখেন বাবূ; তার পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ছে, তবু সে কখনো নুয়ে, কখনো সোজা হয়ে, একবার ডানে টলে একবার বাঁয়ে টলে বলে, ই শালাকে আমি নিজের পসায় মোদ খিলাইলোম , হাঁ সাচ,কালী মাঈ কি কিরিয়া, নিজের পসায়...
তার কথা শেষ হয় না, নদীর ওপারের অন্ধকার মার্ মার্ কাট্ কাট্ ওঠে।
হরিয়া মুহূর্তে স্থির হয়ে যায়, সঙ্গী তার পাশে এসে দাঁড়ায়। দীপকের পাশে ভূপেন পার্থও দাঁড়িয়ে যায়,বাসু বসে বসেই বলে, থাকবো না, কিচ্ছু থাকবো না।
ভূপেন দীপককে জিজ্ঞেস করে, কোনদিকে ক'তো? দীপক অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বলে, বুঝতাছি না। হাসনাবাদে ওইতে পারে, মীরের বাগেও ওইতে পারে।
একবারই ব্রাশ ফায়ার হয়ে থেমে গেছে। তবু তিনজনেই কান খাড়া করে থাকে । গুলীর শব্দে না হোক মানুষের কোলাহলেও তো কিছু আন্দাজ করা যেতে পারে। না; আর কোন শব্দ শোনা যায় না তাছাড়া ঢাকের আওয়াজ, ঢোলের বাড়ি কাঁসির ঠনঠনে কিছু শোনবার যো আছে!
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ফুচকা, ঝালমুড়ি , পান –সিগারেটের সামনে থেকে ক'জন দৌড়ে আসে এদিকে, ব্যাপারটা কি, আঁ?
পার্থদের দিকে তাকিয়ে বলে, আওয়াজ কি একবারই ওইলো?
দীপক বলে, একবারই।
লোকজন এখানে দাঁড়িয়েই উঁকিঝুঁকি মারে,যেনো সামনে একটা বেড়া,বেড়ার ওপাশটা কোনভাবে দেখতে পেলেই বোঝা যাবে ব্যাপারটা কি।
আরে মরো,কোন জাতের মানু , কান্ধের উপরে দিয়া ফুচকি দাও, জিনালা পাইছো আমারে ? গুল্লী ওইছে হ্যা পার, এইখান থেইকা তুমি কি দেখবা, আঁ?
–আর কোনো শব্দ পাওয়া যায়?
–নাঃ আর ঢাকের আওয়াজের মইদ্যে...
–আওয়াজ না পাওয়া গেলেই কি, গুলীর আওয়াজ তো পাওয়া গেছে, দুই একটা কি না মরছে মনে করেন!
–মনে করলেই কি আর না করলেই কি?বাঙলাদ্যাশে অখন সস্তা যুদি কিছু থাকে তো মানুষ।
–ঠিকই কইছেন ভাই।
সমাবেশের এইসব কথাবার্তার মধ্যে একজনের চড়া গলা শোনা যায়: কইবেন কি, দ্যাশটা দ্যাশ আছে, হালারে ভূতে পাইছে, গেরামের কথা তো কইলামই না, ঢাকা শহরের মেইন রোড়ের উপরে থেইকা দিনে–দুফুরে মানুষের জামাকাপড় তক খুইলা লয়া ছাইড়া দ্যায়,ভাবতে পারেন?
চলেন চলেন–একজন থুতু ফেলে, এইখানে খাড়ায়া কি ওইবো।
তার এই আহব্বানে সমাবেশ নড়ে ওঠে, আইন নাই, বিচার নাই.....
–আরে ভাই আইন বিচারে কি করবো,আইন বিচারের হাত পাও বান্ধা, কইবেন কারে, মানলে তালগাছ না মানলে বালগাছ, বুঝলেন না!
লোকজন চলে যেতে যেতে বক্তার কথায় হেসে ওঠে
–আরে মিয়া হাসতাছেন, চোর ডাকাইত কন, হাইজ্যাকার কন, খুনী কন, পুলিশে ধরবো, লগে লগে অমুক ভাইয়ের,তমুক বাপের ফোন আইবো থানায়ঃ ছাইড়া দাও। আইন বিচারে করবোটা কি?
ধীরে ধীরে লোকজনের কথার অর্থ আর থাকে না, শুধু কলরব শোনা যায়, একসময় সেই কলরবও ঝাপসা হতে হতে একেবারে মিলিয়ে গেলে মধ্যরাত ছুঁই–ছুঁই আলো আধাঁরে দূর থেকে শুধু তাদের হেঁটে যাওয়া আর হাত নাড়া দেখা যায়।
দীপক বসতে বসতে বাসুর দিকে তাকায়, উঁহ, বোয় আ রইচে হালায় যেমুন বুদ্ধিজীবীটা!
বুদ্ধিজীবী শব্দটির অর্থ দীপকের কাছে পরিষ্কার নয়। (খবরের কাগজের কল্যাণে শব্দটা বেশ চালূ হয়েছে ইদানীং) মোটামুটি তার ধারনাটা এইরকম: ঢোলা ঢোলা পায়জামা–পাঞ্জাবী পরে, (শার্ট প্যান্ট ও পরে) রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম, মস্কো, পিকিং–বাঙালী জাতীয়তাবাদ ,সংস্কৃতি, সমাজতন্ত্র–এইসব ভারী–ভারী ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করে, তর্ক করে, সভা–সমিতিতে বক্তৃতা করে, খবরের কাগজে ছবি ছাপা হয়।
এরমধ্যে আবার ছোট–বড়ো আছে, ছোটগুলো একটু ভাতে মরা ভাতে মরা,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
রেষ্টুরেন্ট এসে বসে , দু'কাপ চা তিনজনে ভাগ করে খেয়ে ঘন্টার পর-ঘন্টা আড্ডা দেয়, চেচাঁয়, তর্ক করে, সিগারেট ফোঁকে । মাঠে ময়দানে রাজনীতি করা লোকজন থেকে ছোট-বড়ো এদের সকলেই আলাদা হালাগো আছে খালি কথা! শ্মশানের ভেতর খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। হারাধন বাবুদের দলটি এখনো সমান তালে চালাচ্ছে। চিতা আগলে থাকা মহিলারা আছে এখনও, তবে সংখ্যা কমে গেছে বেশ। সংখ্যা বেড়েছে তরুণদের-সেই চাঞ্চল্য, সেই জোরে জোরে কথা বলা, সেই খিস্তি।

হ্যাজাকের আলো ম্লান হয়ে এসেছে। চিতার আগুনও নিভে গেছে। বৃদ্ধটি এখন ছাইয়ের সমষ্টি। ওই ছাইয়ের ভেতর থেকে শ্মশান বন্ধুরা নাভি কুন্ডলটী খুঁজে বার করে নদীর চড়ায় পুঁতে দিয়ে আসবে, তারপর কলসী কলসী জল এনে চিতা-শান্তি ক'রে ভরা কলসী ভেঙে পেছনে না তাকিয়ে সোজা শ্মশান ছেড়ে চলে যাবে তারা ।

পূজোর লগ্ন ঘনিয়ে এলো আবার। পুরোহিত কোষাকুষি নৈবেদ্য গোছগাছ করে তৈরী হচ্ছে। এই ফাঁকে ঢাকীরা সিগারেট টেনে নিচ্ছে একপাশে বসে।

বাজনাহীন শ্মশানের কোলাহলে পার্থর তাল কাটে না। মৃত্তিকার তলদেশ থেকে অদৃশ্য বাজনাটা ঠিকই উঠে আসছে। ব্যাপারটা সে প্রথম টের পায় বন্ধুদের কাছ থেকে খানিকটা দূরে বসে প্রস্রাব করতে গিয়ে। পায়ের নিচের মাটি থেকে উঠে এসে তার শরীরে নৃত্যছন্দ সঞ্চারিত করে দিতে থাকলে লক্ষ্য করে তার প্রস্রাবের গতির মধ্যেও সেই ছন্দ বাঁধা পড়েছে । ধীরে-ধীরে সেই গতি মন্দীভূত হয়ে এলে পার্থ ভয় পেতে থাকেঃ যদি এই তাল, এই ছন্দ থেমে যায়? কিন্তু থামে না। সমস্ত শরীর দিয়ে সে তালটিকে ধরে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

সঙ্গীদের কাছে ফিরে এলে ভূপেন বলে, কি পার্থ, কাঁপতাছস? শীত করে?

পাছে তাল কেটে যায় পার্থ তাই কোন জবাব দেয় না।

-যে বমি করছে, মালের গরম আর থাকবো কেমনে?

দীপকের মন্তব্যে কান না দিয়ে সেই অদৃশ্য বাজনার সঙ্গে তাল ঠিক রেখে নাচতে-নাচতেই চাপা স্বরে বলে, চল, শ্মশানে যাই।

-ক্যান?

-নাচুম।

ভূপেন উঠে আসে, তুই কাঁপতাছস না নাচতাছস? এ-কথা কটিতে ভূপেনের স্বরেই কম্পন জাগে । দীপক ও বাসু পরস্পরের মুখ চাওয়া -চাওয়ি করে উঠে দাঁড়ায়। পার্থ দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে প্রাণপণ তাল ঠিক রাখতে থাকে, হালারপুতেরা সব নষ্ট করবো অখন!

ঢাকীরা উঠে দাঁড়িয়েছে আবার। ষোলো-সতেরো বছরের দু'টি তরুণ ধুনচিতে নারকেলের ছোবড়া সাজিয়ে আরতির উপযুক্ত করে তুলেছে ইতিমধ্যে, তাদেরই একজন নাচের প্রস্তুতি নিচ্ছে। পার্থ তাদের দিকে এগিয়ে গিয়ে কি যেনো বলে। ভূপেন বাসুকে বলে, নাচতে দেওনটা কি ঠিক ওইবো? বাধা দেবে কি দেবে না ভাবতে ভাবতেই পার্থ ফাঁকা জায়গাটায় গিয়ে দাঁড়িয়ে যায়।

'তার সামনে নীলাভ-কালো দেহের রক্ত-রসনা বিকট কালীমূর্তি, দু'পাশে নরমাংস ভক্ষণরত রুক্ষকেশী ভয়াল পিশাচদ্বয়ের কষ বেয়ে লালার মতো বেয়ে পড়ছে রক্তধারা।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
এই কালীমূর্তি, তার পদতলে মহাদেব আর পিশাচকে ধরে আছে শক্ত কাঠামোর চালচিত্র। সে চালচিত্র নীল শাদায় অঙ্কিত ফুল পাতায় অলঙ্কৃত।
পার্থ দেবীমূর্তির দিকে ঘুমেল চোখে তাকিয়ে মৃদু হাসে। তার হাসি এবং মুখভাব দেকে ভূপেন দীপক এবং বাসুর বুকের ভেতর হিমেল কুয়াশা জমাট হয়ে আসে। ধূপের মতো খুব মৃদু ধোঁয়ার শিখা উঠে আসছে ধুনচির ভেতর থেকে । পার্থ প্রথমে দূর থেকে দেবীকে গড় করে , অতঃপর শক্ত করে সাজানো ধুনচি দুটো দু'হাতে তুলে নিয়ে নমস্কারের ভঙ্গিতে কপালের কাছে তুলে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। ঢাকের গায়ে কাটা-কাটা বিলম্বিত লয়ে কাঠি পড়লে পার্থর পা দু'খানিতে ছোট ছোট ঢেউ ভেঙে পড়তে থাকে। ঢাক-ঢোল এবং কাঁসির সঙ্গে শরীরে নাচের রূপটি ক্রমেই মূর্তি লাভ করতে থাকলে চারপাশে দন্ডায়মান দর্শককূলের ভেতর থেকে ধ্বনি ওঠে: কালী মা ঈকী। জ..য়..
দেবীর চার হাতের এক হাতে ঝকঝকে খাঁড়া আর এক হাতে রক্তবীজের কর্তিত মুন্ড ঝুলানো। গলায় নৃমুন্ডের মালা, কোমর থেকে লম্বমান কাটা হাতের সারি। কাত করে রাখা নৌকোর মতো দেবীর চোখ দুটিতে পার্থ একটু ছায়া খোঁজে।
স্বামীর বুকে পা তুলে দেবার জন্যে লজ্জায় দেবী জিভ কেটেছে, কিন্তু চোখে তার আভাস নেই, সেখানে শুধুই ক্রোধ। তার হাতের খাঁড়া নড়ে ওঠে , পাখানি মহাদেবের বুকের ওপর থেকে উঠে তাকে ডিঙিয়ে এপারে চলে আসে, তারপর পেছনের পা-ও তেমনি ডিঙিয়ে এলে মহাদেব এখন তার পশ্চাতে হাতের ওপর মাথার ভর দিয়ে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।
সামনের দিকে চোখ রেখে নৃত্যরত পার্থ পেছন হটতে থাকলে শুনতে পায়ঃ পলাস ক্যান , কৈ পলাবি!
মার হাতে বাবার ছিন্ন-মস্তক, সেই মস্তক থেকে রক্ত ঝরছে টপ টপ করে, পুরোহিতকে অতিক্রম করে মা এগিয়ে আসেঃ সব শ্যাষ করুম, কিচ্ছু থুমু না ! মার গলায় ভাইবোনের ছিন্ন-মস্তকের মালা, টাটকা রক্ত ঝরছে খাঁড়া থেকে। ঘিন্না করি , এই লোকটারে ঘিন্না করি । চুলের মুঠিতে ধরা বাবার ঝুলন্ত মুন্ডটা নাড়িয়ে মা বলে, তুই থাকলে এই লোকটাও থাকবো, আয় তরেও শ্যাষ করি!
মন্ডপের উঁচু কাঠামো থেকে নিচে নেমে আসার জন্যে পা বাড়াতেই আতঙ্কিত পার্থ ডান হাতের ধুনচিটা ছুঁড়ে মারে, সে ধুনচি মন্ডপ পর্যন্ত যায় না, হৈ -চৈ পড়ে যায় চারিদিকে, তার মধ্যে পার্থ দেখে মা'র চোখ দুটো ঘুর চরকির মতোঃ খাড়া,পলাইস না, কৈ পলাবি...তার দাঁত ঘষা কথা শেষ হয় না; পার্থ বাঁ হাতের ধুনচিটাও ছুঁড়ে মারলে নৈবেদ্যের থালা ঝনঝন করে ওঠে। ত্যাজ দ্যাখাও ,আঁ, ত্যাজ...মা'র চোখের আগুন থেকে ফুলকি ছোটে, জিভ আরো ঝুলে আসে। কোপ মারার জন্যে খাঁড়া তুলতেই পার্থ আর্তনাদ করে পড়ে যায়, তার মুখ থেকে গোঁ গোঁ শব্দ হতে থাকে । ঘিরেধরা লোকজনের আবেষ্টনীর মধ্যে ভূমিলগ্ন গোঙানিরত পার্থর দু'কষে ফ্যানা জমে, যেনো দু'টি শ্বেত জবা।
শক্ত কাঠামোয় বাঁধা অক্ষত চালচিত্রকে পেছনে রেখে উদ্যত খাঁড়া হাতে দাঁড়িয়ে থাকা ভীষণ-দর্শনা কালীমূর্তির পদতলে পুরোহিতটি সটান লুটিয়ে পড়ে কাঁদে, ক্ষমা করো মা, ক্ষমা করো!

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

লা শ কা টা ঘ র

প্রকাশকাল: জুলাই ১৯৮৭

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পরাণ

মেঘলাল রাজবংশীর বাড়িটি জেলে পল্লীর শেষ মাথায়। গোটা চল্লিশেক পরিবারের গ্রামটির পেছনে ডাঙা জমি সামনে খাল। খালটি বুড়িগঙ্গা থেকে বেরিয়ে গ্রাম বাজার বিল মাঠ পেরিয়ে ধলেশ্বরীতে গিয়ে থেমেছে।

যাদের অবস্থা ভালো তারা নৌকা নিয়ে এই খাল বেয়ে মাছ মারতে চলে যায় ধলেশ্বরীতে কি মেঘনায়। যাদের জাল নৌকো কেনার সঙ্গতি নেই তারা এদের মজুর খাটে, খালে ধর্মজাল ডুবিয়ে ছোট মাছ ধরে। উত্তর দক্ষিণে লম্বা গ্রামটির খাল–ঘেঁঘা গাছপালার আবেষ্টনী একাধারে ভিটের স্থায়িত্ব এবং আবরু রক্ষা করে। বাড়িগুলোর নির্দিষ্ট সীমানা আছে, সীমান্ত নির্ধারক কৃত্রিম বেড়া নেই, মেঘলালের বাড়ির উঠোন থেকে তাই বাঁ দিকে তাকালে হরেন্দ্র মাঝি, তরণী মাঝি থেকে শুরু করে এর উঠোন তার রান্নাঘরের ফাঁক দিয়ে, ওর ঢেঁকিশালের পাশ দিয়ে পরমেশ হালদারের বাড়ির উঠোনটি পর্যন্ত দেখা যায়।

বাড়িগুলো একই ধাঁচের, যে তরণী মাঝি গত মৌসুমে ৭০ হাজার টাকা লাভ করেছিলো, কিংবা যে পরমেশ হালদার এক ছেলেকে জগন্নাথ হলে রেখে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ইকনমিক্সে অনার্স পড়াচ্ছে তার সঙ্গে তার নৌকোয় মজুর খাটা কানাই, শিবু, হাবলুদের বাড়ির চেহারাগত তেমন পার্থক্য নেই।

মেঘলালের দরমার বেড়া দেওয়া দু'কামরা ঘর, মাটি–ল্যাপা রক, তার নীচে ছোট্ট নিকোনো উঠোন। উঠোনের একধারে রান্নাঘর, ঢেকিশাল, অন্যধারে মাটির দু'টি বড় জালা। ঢেঁকিতে গাব কোটা হয়, জালায় গাব হয় ভিজোনা, সেই ভিজোনো গাবের রস মাখানো হয় জালে।

ছোট উঠোনটিতে মেঘলালের বিধবা পিসী শীতের সকালে পাটি বিছিয়ে ম্যাঘার সাত মাসের ছেলেকে কষে তেল মাখায়, এক একদিন মাছ ধরতে না গেলে মেঘলাল এই উঠোনে বসে জাল মেরামত করে; জালে ফোঁড় দিতে দিতে ফণি কি নিতাইয়ের সঙ্গে গল্প করে, তামাক খায়। মেঘলালের বউ ভাবলেশহীন মুখে ঢেঁকিতে গাব কোটে কি রান্নাঘরে মুশুরের ডালে সম্ভার দেয়।

শীতের সময় জল নেমে গিয়ে খাল হয়ে যায় নালা। খালের ওপর থেকে গ্রামটিকে উঁচু টিলার মতো মনে হয় তখন। বর্ষাকালে যেখানে তিন মানুষ জল ছিলো সেখানে ঘুঁটে শুকোয়, জেলেদের লম্বা লম্বা বেড়াজাল শুকোয়, লক্ষ্মণ দাস বাজারে যেতে যেতে সেখানে দাঁড়িয়ে ডাকে, ম্যাঘা বারীত আছস নি?'

মেঘলাল জবাব দেয়, 'কে, খুড়া নি গো, আহেন'–বলতে বলতে উঠে পড়ে। ঢেঁকিঘর থেকে মেঘলালের বউ মাথার ঘোমটা আর একটু টেনে টুনে রান্নাঘরে যাওয়ার উদ্যোগ করে, বৃদ্ধা পিসী গায়ের কাপড় অনাবশ্যক টানা–টুনি করে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
নীচে থেকে উত্তর আসে, 'না, অহন আর যামুনা, খাওয়া লওয়া কইরা দুফরে আহিস একবার।'

মেঘলাল ফিরে আসে। পিসী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ভাইপোর দিকে তাকায়। মেঘলাল চেয়েও দেখে না। জাল নিয়ে বসে আবার।

তিনজন মানুষের মধ্যে কোন কথা হয় না; নিতাই হুঁকো টানে, মাথা নীচু করে মেঘলাল জালে ফোঁড় দেয়, খালে খড়ের নৌকো ভেসে যায়, কানাইয়ের বউ, রবীন্দ্রের বোন কাঁখে কলসী নিয়ে খালের উরুজল ভেঙে ওপারে যাচ্ছে জগবন্ধু বর্মণের চাপ কল থেকে জল আনতে, তাদের ছপ্ ছপ্ করে জল ঠেলে যাওয়া ঘোলা জল কিনারা ঘেঁষে ফেলে রাখা খড়ি ওঠা শূন্য জেলে নৌকো দু'টোকে মৃদু মৃদু চাপড়ায়, নকুলের লাল-শাদা কুকুরটা খাল পেরিয়ে এপারে আসবে কিনা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবে, স্নান সেরে তেঁতুল গাছের নীচে দিয়ে ভিজে কাপড়ে যেতে যেতে শ্রীমন্ত'র ঠাকুরমা তিনদিক দরমার বেড়া দেওয়া খড়ের ছাউনীর নীচে বসিয়ে রাখা লক্ষ্মী ঠাকরুণকে প্রণাম করে বাঁকা কোমরে নিজের ছায়া দেখতে দেখতে চলে-খাল এবং খালের ওপারের এইসব স্থির এবং চলমান ছবির দিকে দেখে না দেখে তাকিয়ে থাকে ফণি।

পিসী তেল মাখাতে মাখাতে তিনজনের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কৌতূহল আর চাপতে পারে না; 'লখা যাইতে কইলো ক্যান রে?'

-'তোমার তা দিয়া কি কাম? মাইয়া মানষের শুনোনের অতো আউস কিয়ের, আঁ?'

ভাইপোর এই ঝাঁঝের কথায় পিসী একেবারে চুপসে যান। মেঘলালের বছর ছয়েকের দিগম্বর ছেলেটি কাঁসার বাটিতে মুড়ি নিয়ে বুড়ির পাশে বসে খেতে খেতে তার ছোট ভাইটির গায়ে তেল মাখানো দেখছিলো, বেচারার বড় অসুবিধে, মুড়ি তুলে মুখে দিতে গেলেই নাকের নীচে সিকনীতেই অধিকাংশ জড়িয়ে যাচ্ছে, ফলে একেক সময় সিকনীর আস্তর-পড়া ওষ্ঠ থেকে মুড়িগুলো ছাড়িয়ে নিয়ে নিয়ে মুখে পুরতে গেলে ভাইটির হাত পা নাড়া কিংবা চোখ মুখের ক্ষণে ক্ষণে বদলানো ভঙ্গির দিকে একাগ্রভাবে মনোযোগ দেওয়া যাচ্ছিলো না। শেষে কি মনে করে একসময় উঠতে গেলে পায়ের ধাক্কায় তেলের বাটিটা কেমন করে যেনো উল্টে গিয়ে সমস্ত তেলটা পড়ে গেলো মাটিতে, ভাইপোর কাছে ধমক খেয়ে যে জ্বলুনীটা শুরু হয়েছিলো তাকে ঠান্ডা করার একখানা মোক্ষম সুযোগের মতো পিসী ম্যাঘার হতচ্ছাড়া ছেলেটির পিঠে দুম দুম করে ক'টা কিল দিয়ে গজ গজ করতে করতে খুব দ্রুত মাটিতে তালু চুবিয়ে চুবিয়ে বাটির কিনারাতে তালু কুরে কুরে তেল সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

মেঘলালের ছেলেটি কাঁদতে গিয়েও জাল মেরামতরত বাপের দিকে তাকিয়ে আর কাঁদে না, সরে যায় সেখান থেকে।

নিতাই হুঁকোটা মুখ থেকে নামাতে নামাতে বলে, 'আমাগো কপালে অনেক দুঃখ আছে। বাইরের মানুষের চোখ পড়ছে নদীতে তার কি ওইবো ঠিক নাই, খালি হালায় নিজেগো মইদ্যে দলাদলি, খালি নিজেগ্যে মইদ্যে দলাদলি।'

-'ছারান দে,' ফণি চরাৎ ক'রে নোনতা জলের মতো থুতু ফেলে, 'সাত'শ জাউল্যার একখান সমিত্তি, তার আবার হাজার গন্ডা মাতব্বর, বুজাইবো নে, জাল বাওন জন্মের মতন ভুলাইয়া দিবো, জালই নামাইতে দিবো না!' ফণি তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
বেঢপ বুড়ো আঙুলটা শূন্যে দুলিয়ে বলে, 'তহন এই কলাটা মুখে দিয়া মরণ লাগবো।'
–অগো কি, টাকা পয়সা আছে.....
–হ, টাকা পয়সা আহে কোইথে ইকা? দ্যাশ স্বাদীনের পর পরমেশ হালদার তো গেছিলো ইন্ডিয়া? কী? না, এই দ্যাশে আর থাকুম না। ওইলোটা কি? হাজার কয় টাকা নষ্ট কইরা ফির‍্যা আইয়া কইলো, 'না রে, ওইখানে গিয়া সুবিদা করন যাইবো না, দ্যাশটাতেই হালায় মন টিকে না।' কী, কয় নাই?'
মাস তিনেক ছিলো পরমেশ হালদার। একাত্তুরের গন্ডগোলের পর জেলে পাড়ার মানুষগুলোর কারো কারো ভেতর এ ধরনের খেয়াল চেপেছিলো, নাড়া খেয়ে গোড়া কেমন আলগা হয়ে গিয়েছিলো মানুষগুলোর। হরেন্দ্র মাঝি ক্ষেপে গিয়ে বলে, 'না, এই দ্যাশে আর থাকন যাইবো না। শ্যাক সাব্‌রে ভোট দিলাম সুখে থাকনের লেইগ্যা। নয়টা মাস কুত্তা বিলাইয়ের মতন পরাণ লইয়া পলাইয়া পলাইয়া কাটাইলাম। দ্যাশ স্বাদীন ওইলো। অহন দ্যাখতাছি চোর দাউরের রাজত্ব। খাইয়া সুখ নাই, পিন্দা সুখ নাই, ঘুইরা ফিইরা সুখ নাই, মানুষের চোখগুলাও কেমুন ব্যাকা ওইয়া গেছে। রাইতে জাউল্যা মাছ মারতে যাইবো নদীতে, মন পইরা থাকবো গরে, কি জানি গরের বউ মাইয়া পোলারে ডাকাইতে মাইরা থুইয়া গেলো কি না। আর নদীতে কি নিশ্চিন্তি আছে!'
এই সময় পরমেশ হালদার বউ ছেলেমেয়ে দেশে রেখে হিন্দুস্তান গিয়েছিলো সুযোগ-সুবিধার সন্ধানে। তিন মাস পর যখন হতাশ হয়ে ফিরে এলো, কেউ কেউ তখন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'না:, পরমেশ হালদারের মতন মানুষ যহন সুবিদা করতে না পাইরা ফির‍্যা আইছে তহন আর দ্যাশ ছাড়নের আশা করি না, ভগবান কপালে যা রাখছে ওইবো।'
সেই থেকে, দেশ স্বাধীন হওয়ার দু'বছরের মধ্যে বারদশেক ডাকাতি হওয়ার পরও, জেলেপাড়ার মানুষগুলো রাত পাহারা দিয়ে, ডাকাত পড়লে ঘর-বাড়ি ফেলে রেখে ছুটে পালিয়ে জীবন রক্ষা ক'রে, তাদের ভগবানের ওপর সব ভার দিয়ে মাটি কামড়ে পড়ে আছে।
এর মধ্যে পূজো-পার্বণ আছে, যাত্রাগান, কীর্তনের আসর আছে, দীননাথ তলার চৈত্র সংক্রান্তির মেলা আছে, জেলের ঘরে ঘরে লাভ লোকসান, অভাব দারিদ্র, জন্ম মৃত্যু বিবাহ আছে, উৎসব আনন্দ প্রেম ভালোবাসা আছে; মোহনগঞ্জ, গোবিন্দপুর ভৈরবনগর, কানাইপুরের সাতশো জেলের একখানা সমিতি নিয়ে একদিকে পরমেশ হালদার, লক্ষ্মণ দাস, রামপ্রসাদ অন্যদিকে ভৈরবনগরের হরেকেষ্ট বর্মণ, ঠাকুর দাস এর কোন্দল দলাদলি তা-ও আছে। সব আছে, তবু ভেতরে ভেতরে কেমন আলগা হয়ে গেছে মানুষ গুলো।
মেঘলাল কোন্দল দলাদলির মধ্যে থাকতে চায় না, বোঝে কিনা তা-ও সন্দেহ, তা বুঝুক আর না-ই বুঝুক সমিতির সেও একজন, ডাকলে বসতে হয় পাঁচ জনের সঙ্গে, এদলের ওদলের কেউ এসে কানে কানে ফিস ফিস করে বোঝালেও শুনতে হয়, হুঁ হাঁ দিতে হয়। কিন্তু কীর্তন-গাওয়া মামলাবাজ রামপ্রসাদ কি কথায় কথায় রসের ফোড়ন দেওয়া ঠাকুর দাস মাঝির জটিল প্যাঁচ-ঘোঁচের অতশত বোঝে না সে।
মেঘলালের বাবা গোবর্ধন বলতো, জাউল্যার গতর ঠিক আছে, জাল নৌকা ঠিক

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
আছে তো সব ঠিক আছে; ভগবান শরীলটা দিছে, জলে মীন দিছে, জাউল্যার দুঃখু কিয়ের।

নির্বোধ গোবর্ধনটা এই বিশ্বাস নিয়ে তিন কুড়ি ৭ বছর কাটিয়ে দিয়ে গেছে। মেঘলালের কালে মেঘলাল যতোই সরল সিধে হোক, এইটুকু বোঝে, জাউল্যার সাধ ইচ্ছার নিয়মের সঙ্গে জগতের নিয়মের গরমিলটা মোটেই সরল নয়।

সারাদিন বড় মৌতাতের মধ্যে আছে বুড়ি। নদীতে মৌসুমের নতুন জাল নামবে ভাইপোর, তার জন্যে রাতে কীর্তনের আসর বসাবে বাড়িতে; পিসী যেনো অনেকদিন পর মনের মতো কাজ পেয়েছে আজ। চন্দন ঘষতে ঘষতে গুনগুন করা কীর্তনের গুঞ্জন থামিয়ে বেলার দিকে চোখ তুলে বউকে ডেকে বলেছে, 'বেলা শ্যাষ ওইয়া আইলো রে বউ, মানুষজন আইয়া পড়লে আর দিশ করন যাইব না, চালাক কইরা হাত চালাইয়া ল।'

বউ রান্নাঘরে তরকারি কুটতে কুটতে মুখ টিপে হাসে, মনে মনে ভাবে 'গান শ্যাষ ওইলে পর হেই দুফর রাইতে খাওন, অহনও দিনের আলোই নিবলো না, বুড়িরে ভাবে পাইছে।'

বাজার করা, লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলা, বাঁশ পুঁতে শামিয়ানা টাঙানো– এইসব করে আজ সারাটা দিন কেটেছে মেঘলালের। শীতের রাতে ঠাণ্ডা লাগবে বলে খালের দিকে এবং ঢেঁকিশাল ঘেঁষে শামিয়ানার কাপড় মাটি পর্যন্ত ঝুলিয়ে দিয়েছে। খড়ের ওপর হোগলা বিছিয়ে বসার জায়গাটি আরামদায়ক করেছে যথাসম্ভব। শামিয়ানার নীচে বসলে এক দিকে –সামনে অল্প একটু ফাঁকা জায়গা, তারপরই মেঘলালের মাটির রক এবং দরমার বেড়ার দু'কামরা ঘর। আর একদিকে গোটা জেলে পল্লীটি উন্মুক্ত। মেঘলালের ঘরের দিকে, শামিয়ানার ধার ঘেঁষে ছোট্ট নীচু একখানা জল চৌকি, চৌকিটি এক টুকরো ধবধবে শাদা কাপড়ে ঢাকা, তার ওপর চার পাশে লাইন বন্দী কাঠমল্লিকা ফুল সাজানো। এই শাদা কাপড় শাদা কাঠমল্লিকা ফুলের মাঝখানে তেঁতুল মাজা পিতলের প্রদীপের উজ্জ্বল শিখা বড় পবিত্র মনে হয়। জলচৌকির বাঁপাশে মাটির ওপর একটি হারিকেন জ্বলছে, চৌকিটির নীচে প্রদীপের মুখ বরাবর শাদা টিনের থালায় শাঁক আলু আর শসার টুকরো সাজানো।

'ভাবের পাগল এলো নদীয়া আ আ আয়'–প্রবল চিৎকারে আসর ফাটিয়ে চোখ বন্ধ করে মাথা নেড়ে নেড়ে গান গায় নীলকদম। তার মাথা ভর্তি কাঁচা পাকা কিঞ্চিৎ কোঁকড়ানো চুল খাপছাড়া ভাবে কানের অর্ধেক পর্যন্ত ঢেকে আছে, মুখে খোঁচা খোঁচা শাদা দাড়ি, থ্যাবড়া নাক, সেই নাকের দুই ছিদ্রের মুখে সব সময় ভিজে ভিজে আঠা আঠা হয়ে থাকে। কালো রঙের ওপর ভ্রূ দেখা যায় না প্রায়। সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য তার বিশাল মুখ গহবর।.... 'নদীয়া আ আ আয়' বলে যখন টান দেয় সমস্ত মুখমণ্ডলের মধ্যে তার মারাত্মক হাঁ–টি তখন বিকট হয়ে ওঠে। পদটি শেষ হলে ওপরের ঠোঁটটি নীচের ঠোঁটের ওপর পড়ে মুখটি বন্ধ হয়ে গেলে মনে হয় নীলকদম ভাতের একটি প্রকাণ্ড গ্রাস চালান করে দিলো। পাশে বসে কান পেতে খেয়াল করলে তার মুখ বন্ধের 'হাপ' করে ওঠা আওয়াজটিও শোনা যাবে। মোষের মতো কাঁধের ওপর খাটো গলার দু'পাশের মোটা শিরা দু'টি তার চিৎকারের সঙ্গে ফুলে ওঠে, মনে হয় দু'টি ক্রুদ্ধ সাপ ফুলে ফুলে উঠছে, গলায় জড়ানো কণ্ঠিটি টানটান হয়ে ছিঁড়ে পড়বার উপক্রম

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
হয়। নীলকদমের সঙ্গে গলা মিলিয়ে আসরের আরো দশ বারোজন মানুষের সম্মিলিত আওয়াজ, খোল করতাল এবং হারমোনিয়াম ছাপিয়ে বীভৎস হাহাকারের মতো মেঘলালের উঠোন, নিথর কালো জেলে পল্লী, খাল সমস্ত কিছুকে গেঁথে ফেলতে থাকে।

নীলকদমের গান এক সময় থামে। গোঁসাই দাস বলে 'রামপ্রসাদ ভাইয়ের খোলখানা বর জবর ওইছে।'

বলা কথা নতুন করে আর কি বলবে, দিন পনেরো আগে খোলটি রামপ্রসাদ সাভারে গিয়ে তার গুরুর কাছ থেকে বানিয়ে এনেছে ৮০ টাকা দিয়ে। গোঁসাই দাসের কথায় রামপ্রসাদ তার দিকে হাসি মুখে তাকিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে খোলে গমক তুলে বলে, 'হ, গুরুর আমার হাতখান বর পরিষ্কার।'

শাশুড়ি বউয়ের ওপর ধকলটা কম যায়নি– গোবরজলে উঠোন ল্যাপা, চালের পিটুলি গুলে আলপনা কাটা, অতোগুলো মানুষ খাবে তার প্রস্তুতি নেওয়া বড় চাট্টিখানি কথা নয়, তার ওপর নিজেদের জন্যে দুপুরের রান্না বাড়া–এইসব করে স্নান খাওয়া–দাওয়া করতে করতে শীতের বেলা আর কতোক্ষণ থাকে। এর মধ্যেই পিসী চন্দন ঘষেছে, ফুল তুলে এনেছে; সংসারের টুকিটাকি কাজ করতে করতে বউ শুনেছে পিস্–শাশুড়ি চন্দন ঘষতে ঘষতে অনুচ্চ স্বরে গান করছে।

সেই পিসী এখন আসরের মানুষগুলোকে চন্দন চর্চিত করছে একে একে। বাঁহাতে কাঁসার বাটি, সেই বাটি থেকে আঙুল ডুবিয়ে চন্দন নিয়ে এক একজনের সামনে এসে চন্দন মাখা অঙ্গুলীমঞ্জরীর নৃত্য শেষে নাক থেকে কপাল পর্যন্ত চন্দন লেপে দিয়ে বসে থাকা মানুষটির হাঁটুর সামনে লুটিয়ে পড়ে গড় করে, মানুষটিও জোড়–হাত বুকে রেখে বন্ধ চোখে ঘাড় পিঠ মাথা নুইয়ের বৃদ্ধার মাথার পাশে মস্তক স্থাপন করে প্রত্যুত্তর দেয়।

রান্নাঘরে মেঘলালের বউকে সাহায্য করতে এসেছে নিতাইয়ের বউ এবং রবীন্দ্রের বোন। নারায়ণের বোন আলোরাণী ছিলো এতক্ষণ, কিন্তু ঘরে তার অসুস্থ বাপ, তাকে খাওয়ানো, বেতো মানুষটা শীতে বড় কষ্ট পায়– তার পায়ে শেঁক দেয়া, ঘর সংসার সামলে এইসব সেবাযত্ন বৃদ্ধ মা একা পেরে ওঠে না, তাছাড়া মেয়েকে না হলে পদ্মচরণের এক মুহূর্ত চলে না, একটু চোখের আড়াল হলেই ডাকাডাকি শুরু করে। কাজেই ইচ্ছা থাকলেও এই উদ্যোগ–আয়োজন এবং গানের আসর ফেলে চলে যেতে হয় তাকে।

রকের ওপর কিছু বয়স্কা মহিলা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছে। গান শুনতে আসা মহিলাকুল গান শোনার চেয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলে বেশি। কেউ বলে, 'কি তোমাগো এত কথা? গান হুনতে আইছো গান হুন।' গল্পরত মহিলাবৃন্দ কথা থামিয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি ক'রে আসরের দিকে মনোযোগী হয়।

গোঁসাই দাসের হারমোনিয়াম আবার বেজে ওঠে, রামপ্রসাদের জোরালো হাতের খোল আর শ্রীমন্তের করতালের সঙ্গে গোঁসাই দাসের ঠাণ্ডা লাগা গলায় কুয়াশা মেখে কাঁপা কাঁপা সুর বেরিয়ে আসে: 'আমি নইদের ধুলিতে লুটিয়ে রব' ...।

ভক্তের এই ব্যাকুলতা সমস্ত আসরের কণ্ঠে কণ্ঠে বেজে উঠলে পিসীর চোখ ভিজে আসে, গড় করতে গিয়ে হোগলার ওপর ঠেকানো মাথা আর তুলতে ইচ্ছা করে না, বুকের ভেতর থেকে দমকে দমকে কান্না উঠে আসতে চায়।

গোঁসাই দাসের রঙটি কালো, ৪২/৪৩ বছর বয়সের ছিপছিপে শরীর, মাথার

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
চুল কোঁকড়ানো, নাকটি লম্বা উচুঁ এবং ধারালো, চওড়া কপালের সীমান্তে ঘন করে ছাওয়া খড়ের চালের মতো দুই ভ্রূর নীচে চোখ জোড়া বড় শান্ত।
নীল রঙের লুঙি, লম্বা ঝুলের সাদা ফুল শার্ট, তার ওপর ছাই রঙের এণ্ডির চাদর, মাফলারটি মাথা কান ঢেকে সমস্ত গলাটি পেঁচিয়ে আছে; হারমোনিয়াম সামনে নিয়ে আসরের মধ্যমণির মতো গোঁসাই দাসকে এখন যাত্রাদলের গানের মাস্টার মনে হয়। তা গোঁসাই দাস গায় ভালো। গলার কাজটাজ গুলো বেশ।
গোঁসাই দাসের গান শেষ হলে মানুষগুলো আবার নিজেদের মধ্যে ফিরে আসে। রামপ্রসাদ বলে, 'বর পুরানা গান গাইলা গোঁসাই?' গোঁসাই দাস একটু লাজুক ধরনের হাসি হাসে, 'হ, বাবায় গাইতো, অনেক দিন পর গাইলাম, তারপর ঠাণ্ডা লেগে গলা বসে যাওয়া, অনেকদিনের অনভ্যাস–এইসব কথা বলতে চায়, কিন্তু তার কথার মাঝখানে নীলকদম বলে, 'তাই তো কই, মনে করতে পারতাছিলাম না, হ, সনাতন খুড়া গাইতো, হে কি আইজকার কথা।' নীলকদমের দৃষ্টি স্মৃতির ভেতর চলে যায় ক্ষণিকের জন্য।
রামপ্রসাদের খোলের সামনে, আসরের মাঝখানে আর একটি হারিকেন, শ্রীমন্ত করতাল দু'টি রেখে হারিকেনের ওপর হাত শ্যাঁকার জন্যে এগিয়ে এলে মেঘলাল চা ভর্তি এলুমিনিয়ামের জগটি বাড়িয়ে দেয়। 'এই সে না কামের মতন কাম' – বলে হাত শ্যাঁকা বন্ধ রেখে শ্রীমন্ত জগটা ধরে। কাপও এসে যায় গোটা চারেক। এগুলো মেঘলাল পরমেশ হালদারের বাড়ি থেকে আগেই জোগাড় করে এনে রেখেছিলো।
রামপ্রসাদ কাপে কাপে চা ঢেলে আসরের দিকে এগিয়ে দেয়, কাপ ঘুরে ঘুরে আসে, ঘুরে ঘুরে যায়। মানুষগুলো মুখে শব্দ করে চুমুক টানে, চোখ বন্ধ করে বলে, 'আহ্'।
এর মধ্যে মেঘলাল এক প্যাকেট স্টার সিগারেট, একটা 'ম্যাচ' দিয়ে গেছে। রামপ্রসাদ চা শেষ করে সিগারেট ধরায়, নীলকদম নাক দিয়ে মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ে। গোঁসাই দাসের কাছে আসতে আসতে প্যাকেট শেষ। গোঁসাই দাস নিজের প্যাকেট থেকে বার করে সিগারেট ধরায়।
মানুষগুলো কথার ভেতর চলে যায় আবার। পুরোনো দিনের কথা, বর্তমান কালের সঙ্গে সেই হারানো দিন এবং হারানো মানুষের তুলনা, গ্রামে বারবার যে ডাকাতি হচ্ছে, এমনি করে কি চিরকাল মুখ বুজেই সহ্য করতে হবে? সমিতির নির্বাচন আসন্ন, কিন্তু খাল যে বুঁজে আসছে তার কি হবে,কিংবা নদীতে যে বাইরের লোকের লোভের চোখ পড়েছে তারই বা কি ব্যবস্থা হচ্ছে ?
মানুষের গলা চড়ে যায়, গানের আসর তর্কের আসরে রূপান্তরিত হতে থাকে।
ফণি বলে, 'কামের কাম কিছু নাই, খালি দলাদলি আর দলাদলি।'
মেঘলালের এই উঠোনে বসে কথাগুলো নিতাই বলেছিলো দিন কয়েক আগে। ফণি সেই কথারই প্রতিধ্বনি করে মাত্র, কিন্তু মেঘলাল কিংবা তার পিসীর সামনে বলা এক কথা, আর এতো লোকের মাঝখানে রামপ্রসাদের মতো সমিতির একজন প্রভাবশালী সদস্য, যে এই দলাদলির অন্যতম নেতা, তার সামনে বলা আরেক কথা।
রামপ্রসাদের বাদামী রঙের চৌকো মুখ লাল হয়ে যায়। ফতুয়ার ওপর মোটা উলের উঁচু গলার সোয়েটার ভেদ করে তার ৩৮ ইঞ্চি বুকের ঘন ঘন ওঠানামাটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
স্পষ্ট দেখা যেতে থাকে। কণ্ঠিপরা জবরদস্ত গ্রীবাটি ফণা-ধরা সাপের মতো টানটান হয়ে যায়, 'কী কইলি তুই? দলাদলি করি। এত বর সাহস তর।' -বলতে বলতে রামপ্রসাদ দাঁড়িয়ে পড়ে, তার দেখাদেখি ভাইপো হরিসাধন, তার পেছনে পীতাম্বর, গগন এবং শুকদেব-তাদের চোখ মুহূর্তের মধ্যে ঝলসে ওঠে।
নাক এবং কপালে চন্দনের তিলক-কাটা মানুষগুলোকে হারিকেনের আলোয় বড় খাপছাড়া মনে হয়। হতচকিত আসরবাসীরা, 'আরে আরে' বলে ব্যাকুল বাহুপ্রসারিত করে দাঁড়িয়ে যায়, দু'একজন বসে বসেই আসরের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্যে সরব প্রচেষ্টা চালায়।
রকের ওপর বসে থাকা মহিলাকুল তিলক-কাটা জগাই মাধাইদের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে, 'ম্যাঘ্যা, ম্যাঘা'...।
পিসী এতোক্ষণ একবার রান্নাঘর একবার রক করছিলো, এখন আসরের সামনে এসে করজোড়ে বলে, 'জোর-হাত করি বাবা সকল, তোমরা থাম।'
মেঘলাল খালের ধারে প্রস্রাব করতে বসেছিলো, প্রস্রাবরত অবস্থায় এমন কাণ্ড ঘটে গেলে মানুষের কি উপায় থাকে। তবু পড়িমরি করে করে ছুটে এসে উত্তেজিতভাবে আসরের মাঝখানে ঢুকে পড়ে সে, 'কী ওইছে, কী ওইছে?'
একদিকে যুদ্ধংদেহী মানুষগুলোর তর্জন-গর্জন, অন্য দিকে তাদের নিরন্তরত মেঘলালের সরব প্রচেষ্টা এবং শান্তি প্রিয় শ্রোতা তথা দোহারবৃন্দের সম্মিলিত কণ্ঠ, পিসীর উপর্যুপরি দোহাই বাণী, মেঘলালের বউ, নিতাইয়ের বউ,রবীন্দ্রের বোন, রকের ওপর শ্রোতৃ মহিলাবৃন্দের কাংস্যবাদ্য-এই মহাশোরগোলের মধ্যে আসর এবং রকের মানুষগুলোর অবিরাম অঙ্গসঞ্চালন মধ্যরাতে হারিকেন এবং প্রদীপের আবছা আলো-আঁধারীতে বড় অবাস্তব মনে হয়।
জেলে পল্লীর মানুষগুলো ঘুম ভেঙে তড়াক করে উঠে পড়ে ঘরের ভেতর থেকেই উৎকণ্ঠিত হয়ে কান পাতে। জানলার ঝাঁপ অল্প একটু ফাঁক করে অন্ধকারের ভেতর দিয়ে চোখ যথাসম্ভব তীক্ষ্ম করে তাকিয়ে থাকে। গ্রাম পাহারারত আশে পাশের জেগে থাকা মানুষগুলো নিজেদের মধ্যে কথা থামিয়ে চিৎকারের ধ্বনি তরঙ্গের স্বরূপ বুঝতে চেষ্টা করে।
এদিকে মেঘলাল ঘনঘন হাত-জোড় করে ক্ষমা প্রার্থনা করে রামপ্রসাদের কাছে। চিৎকারের মধ্যে ততক্ষণে আবেগের ওপর সম্ভবত বুদ্ধি বিশ্লেষণের কাজ চলতে থাকে ভেতরে ভেতরে। উত্তেজনা মন্দীভূত হয়ে আসে। কীর্তনের আসরে এতোটা মাথা গরম প্রবীণ মানুষ হিসাবে ঠিক হয়নি মনে করে নিজেকে ভেতরে ভেতরে আয়ত্তে আনতে থাকে রামপ্রসাদ। তবু বাইরের ঠাটটি বজায় রাখার জন্যে ক্রোধের বহিঃপ্রকাশের ক্রিয়াকর্মগুলো ঠিকঠাক রেখে খোলটি তুলে নিয়ে আসর ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য এগিয়ে গেলে মেঘলাল প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে রামপ্রসাদকে জাপটে ধরে।
গোঁসাই দাস জেলে নয় গোয়ালা, থাকে খালের ওপারে, ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে ওঠাবসা, তাছাড়া আইনগত সামাজিক স্বীকৃতি না থাকলেও গ্রামের মানুষজনের পরস্পরের মধ্যে যেমন লৌকিক আত্মীয়তা থাকে গোঁসাই দাস তেমন, নীলকদম জেলে হলেও সে এ পল্লীর মানুষ নয়, গানের আসর হলে গোঁসাই দাসের মতো তারও ডাক পড়ে। গণ্ডগোল থামাতে তারা এতোক্ষণ হিমসিম খেয়ে গেছে। রামপ্রসাদ এবং তার দেখাদেখি আরো ক'জন চলে যেতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
উদ্যত হলে তারা পথরোধ করে দাঁড়ায়। গোঁসাই দাস বলে, 'কি কর রামপ্রসাদ ভাই, প্রবীণ বুদ্ধিমান মানুষ তুমি, তুমি এমুন করলে পোলাপানরা কি করবো?'
জেলে পল্লীর মানুষগুলো ততক্ষণে বুঝে ফেলেছে ব্যাপারটা বাইরের কোন ধাক্কায় নয়, নিজেদের মধ্যে কি কারণে যেনো হট্টগোল করছে। তাদের কেউ কেউ হারিকেন হাতে এগিয়ে আসে, 'কি শুরু করছো তোমরা রাইত দুফরে।'
তাদের এই ধিক্কার ধ্বনি আসরের মানুষগুলোকে কাবু করে ফেলে।
হরিসাধনের তেজ তখনো নিঃশেষিত হয়নি, সে হাত-পা নেড়ে হারিকেন হাতে এগিয়ে আসা গ্রামবাসীকে ব্যাপারটা বোঝাতে গেলে রামপ্রসাদ প্রচণ্ডজোরে ধমক দেয়, 'চুপ যা তুই।'
হরিসাধন মাঝপথে থেমে গিয়ে কাকার মুখের দিকে বিমূঢ় হয়ে চেয়ে থাকে। নেতার এই হঠাৎ ভাবান্তর লক্ষ্য করে সঙ্গী যোদ্ধা, বিপক্ষ দলের নিতাই, ফণি, রবীন্দ্র এবং আসরের শান্তিপ্রিয় জনগণ কি করবে ভেবে পায় না। গোঁসাই দাস, নীলকদম এবং মেঘলাল ততোক্ষণে রামপ্রসাদকে আবার বসিয়ে দিয়েছে। হরিসাধন ক্ষোভ নিয়েও কাকার পাশে বসে পড়ে অগত্যা, তাদের দেখাদেখি পীতাম্বর, গগন এবং শুকদেব। নিতাই, ফণি এবং রবীন্দ্রকে মেঘলাল আসর থেকে বাইরে টেনে নিয়ে যায়। হারিকেন হাতে এগিয়ে আসা গ্রামবাসীর কেউ কেউ আর ফিরে না গিয়ে আসরেই বসে পড়ে। অন্যান্যদের সঙ্গে পাহারাদার যুবক ক'জন কথা বলতে বলতে চলে গেলে আসর আবার গোল হয়ে বসে।
কৃষ্ণদয়াল বলে, 'ছারান দ্যাও রামপ্রসাদ, দশজনের কাম করতে গেলে মাইনষে বালো মন্দ দুই কথা কইবোই, ওয়াতে কান দিতে নাই, তুমি যদি সৎ পথে থাক, দশজনের মঙ্গল ভাইব্বা কাম কর তার ফল আছে না?' বৃদ্ধ নিজের প্রশ্নে নিজেই মাথা নেড়ে উত্তর দেয়, 'আছে। তহন দ্যাকবা মন্দ কথা কওইয়া লোকগুলাও নিজেগো ভুল বুইজ্যা লজ্জা পাইবো, ভক্তি দিবো তোমারে।'
রামপ্রসাদ শান্ত হয়ে আসে, তার গলায় গাঢ় একটি সর পড়ে, 'তোমরাই কও, আমি যে সমিতির লেইগ্যা পাচ কথা কই, কোট-কাচারি করি, তা কি নিজের লেইগ্যা? হরকেষ্ট আর ঠাকুর দাস যে সমিতিরে লুইট্যা খাইতাছে তারে ঠেকাইতে গেছি দেইখ্যা দলাদলি ওইয়া গ্যাল? তগ লেইগ্যাই তো আঁ; আমার নিজের লেইগ্যা? কি দরকার আমার।' কৃষ্ণদয়ালের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আপনেগো আশীব্বাদে ঠাকুর আমারে বালই রাকছে।' চোখ মুখে যথাসম্ভব পরদুঃখে কাতর সৎ, হৃদয়বান, মহৎপ্রাণ মানুষের জ্যোতি ফুটিয়ে তোলে। তারপর বুকে চাপড় দিয়ে গলা চড়িয়ে দেয়, 'এই রামপ্রসাদ, পরমেশ হালদার, লক্ষ্মণ দাস আছে দেইখ্যাই টিক্কা আছস, কর না তরা সমিতি, চালা না, খালি বর বর কথা।'
'ছারান দ্যাও, ছারান দ্যাও।' গোঁসাই দাস হাত নাড়ে। 'হ, ছারান দিয়া একখান আনন্দ দ্যাও গো রামপ্রসাদ ভাই।' নীলকদমের এই অনুরোধে রামপ্রসাদ খোলে হাত বুলোয়, মাথাটি ঝুঁকিয়ে বোল তোলে, নীলকদম শ্রীমন্তের হাত থেকে করতাল নিয়ে খোলের সঙ্গে তাল মেলাতে মেলাতে গোঁসাই দাসের দিকে ভূনৃত্য করলে গোঁসাই দাস হারমোনিয়াম টেনে নেয়। কিছুক্ষণ খোল করতাল আর হারমোনিয়ামের ঐক্যতান চলে। সমস্ত আসর নীরব হয়ে থাকে। রামপ্রসাদ এক সময় হঠাৎ মাথা ঝাঁকিয়ে মুখ তুলে তার ভরাট ফ্যাসফেঁসে কিন্তু প্রচণ্ড

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
জোরালো গলায় গেয়ে ওঠে, 'আস নইদেয় কি ধ্বনি শুনলেম চমৎকা-আ-আর...।'
কৃষ্ণদয়াল চোখ বন্ধ করে সম্মিলিত বাদ্যযন্ত্রের ঐক্যতানে এতক্ষণ তার বৃদ্ধ মাথাটি ঝুঁকিয়ে তাল দিচ্ছিল শরীর দুলিয়ে, এখন রামপ্রসাদের গানে 'আহো' বলে মুদিত-নেত্র-রামপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে বলে, 'হরিবোল হরিবোল।'
রামপ্রসাদের চওড়া কব্জিওলা হাত প্রবল বেগে খোলে চাঁটি দিতে থাকে, চাঁটি গুলোযেনো বা রামপ্রসাদ বেয়াদব ফণির মাথাতেই দিচ্ছে। সমস্ত আসর তার গানের পদটি ধরে নিয়ে চিৎকার করে, 'আজ নইদেয় কি ধ্বনি শুনলেম চমৎকা-আ আ-আর...।'
মুদিত নেত্রের মানুষগুলোর ভেতর-চোখে গৌরকান্তি মুন্ডিত মস্তক উর্ধবাহু পুরুষটি নাচতে নাচতে দূরের পথ বেয়ে আসতে থাকে, তাঁর পেছনে আরও ক'জন। আসরটি তাঁদের সঙ্গীত-মুখের আগমন প্রত্যক্ষ করতে থাকলে রামপ্রসাদের কণ্ঠে পদটি আবার ঘুরে আসে, 'আজ নইদেয় কি ধ্বনি শুনলেম চমৎকা-আ-আ-আর...।'
নিতাই, মেঘলাল, ফণি, রবীন্দ্র আসরের এক পাশে এসে বসে, বড় জমিয়েছে রামপ্রসাদ। রকে বসে থাকা মেয়েদের কেউ আঁচলে চোখ মোছে।
রবীন্দ্রের বোন কি কারণে যেনো রান্নাঘর থেকে বাইরে এসে থমকে যায়; একবার রক, একবার আসরের দিকে তাকিয়ে দেখে মানুষগুলো দুধের ওপর সর বসার মতো জমে গেছে, অদূরে আসর থেকে ভেসে আসা চিৎকৃত সঙ্গীতে এবং খোল, করতাল, হারমোনিয়ামের আওয়াজের ওপর দিয়ে কোথা থেকে যেনো খুব দ্রুত এবং অস্থির কতিপয় ধ্বনি ঢেউ খেলে যাচ্ছে। যেনো খুব পরিচিত, কিন্তু ধরা যাচ্ছে না সমবেত পুরুষ কণ্ঠের 'আজ নইদেয় কি ধ্বনি শুনলেম চমৎকা-আ আ-আর...' তাকে ডুবিয়ে দিচ্ছে; একসময় গানের এক জায়গায় ছাড়া এবং ধরার মাঝামাঝি শূন্য জায়গাটিতে সেই ধ্বনি ঢুকে পড়লে বুকের ভেতর ছ্যাঁত করে ওঠে। সেখানে থেকেই চিৎকার করে ওঠে রবীন্দ্রের বোন, 'ডাকাইত, ডাকাইত...' মুহূর্তে হতচকিত রান্নাঘর এবং রকের মধ্যে হুলস্থূল পড়ে যায়, আসরের মানুষ তখনো শ্রীচৈতন্য এবং নিত্যানন্দদের অবলোকনে নিবিষ্ট, কিন্তু ক্ষণকালের মধ্যেই মহিলাবৃন্দ 'ডাকাইত ডাকাইত' ধ্বনি দিয়ে আসরের ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে পঞ্চদশ শতাব্দীর এই সুখ-চিত্রকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। মুহূর্তের মধ্যে আসরটি দাঁড়িয়ে পড়ে।
অদূরে অন্ধকারে শিশু ও নারীর কান্না, মানুষের ধাবমান ছায়া এবং গ্রামের পেছনের চক ও সামনের খালের দিক থেকে ছুটন্ত 'ডাকাইত পরছে, ডাকাইত পরছে' ধ্বনি মেঘলালের উঠোনকে ছত্রাখান করে দেয়। হারিকেন, প্রদীপ, ফুল সাজানো জলচৌকি উল্টে, প্রসাদের থালা পায়ে চেপ্টে, শামিয়ানা ছিঁড়ে মানুষগুলো গুলির আওয়াজে ডালে বসে থাকা পাখির মতো এক একদিকে ছিটকে পড়ে। একপাশে হুমড়ি খেয়ে পড়া শামিয়ানার নীচে ওল্টানো হারিকেন দপদপ করে নিভে যায়। মেঘলালের রান্নাঘরে অন্ন ব্যঞ্জনের হাঁড়ি-কড়াই থেকে ভাপ উঠে বিন্দু বিন্দু জলকণা জমতে থাকে সবার গায়ে। উনোনের আঙরা আভা ছড়াতে থাকে। দিশেহারা মানুষগুলো কেউ খালের ধার দিয়ে কেউ গ্রামের পেছনের ডাঙা জমির ওপর দিয়ে সরষে ক্ষেত মাড়িয়ে ছুটতে থাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
এলোমেলোভাবে।
পাহারারত মানুষগুলো দু'দিক থেকেই আওয়াজ দিয়ে ছুটে গেছে; যারা ভেবেছে খালের দিক থেকে ডাকাত উঠেছে তারা পেছনের ডাঙা জমির ওপর দিয়ে, যারা ভেবেছে চকের দিক থেকে–তারা ছুটেছে খাল ধরে।
মেঘলাল আসর থেকে তড়াক করে উঠে সংক্ষিপ্ত উঠোন পেরিয়ে ঘরের দিকে ছুটে গেলে দেখে, পিসীর বগলে পুটলী, এক হাতে বড় ছেলেটি ধরা, তার পেছনে স্ত্রী কাঁথা জড়ানো ক্রন্দনরত শিশু কোলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে, তার আঁচল ধরে বছর আষ্টেকের মেয়েটি। রকের নীচে থেকেই ছেলেটিকে সে পিসীর হাত থেকে টেনে নিয়ে কোলে তুলে নেয়, বউয়ের আঁচল–ধরা মেয়েটিকে হাত ধরে টান মেরে নীচে নামিয়ে নিয়েই পিসী, স্ত্রী এবং সন্তানদের নিয়ে বাড়ির সীমানা ছাড়িয়ে চকের দিকে ছুটে যায়; তার মধ্যেই উঠোনের ওপর ছিন্নভিন্ন জনতার মধ্যে দেখেছিলো, কাঁধে খোলটি ঝুলিয়ে রামপ্রসাদ গ্রামের দিকে ছুটে যাচ্ছে, গোঁসাই দাস হারমোনিয়াম বগলদাবা করে খালের দিকে নেমে যাচ্ছে, আর আর মেয়ে পুরুষের খুব সংক্ষিপ্ত চলমান অংশ–এইসব দেখতে তার এক সেকেন্ডও লাগে না; হুড়োহুড়ি কলরবের মধ্যে পেছন থেকে নিতাইয়ের চিড়– খাওয়া গলা শোনা যায়, 'এমুন কইরা বাইচ্যা কী ওইবো।'
চকে নেমেই মেঘলাল তার ছোট্ট পরিবারটিকে নির্দেশ দেয়, 'স্যান পারার দিকে চল।'
সরষে ফুলে ভরা বিস্তৃত উঁচু ডাঙার বাঁ দিকে সেন পাড়া, সামনে গোবিন্দপুর, চাইনপাড়া, ডানদিকে বাঁক নেওয়া খাল, তারপাশে হু হু করা দিগন্ত ছোঁয়া নীচু মাঠের বিস্তার কুয়াশা এবং অন্ধকারে স্থির হয়ে আছে।
বাতের ব্যথায় পদ্মচরণের হাঁটতে খুব কষ্ট হচ্ছিলো, রোগা হাড়্ডিসার বৃদ্ধের কোঁচকানো শিথিল চামড়ার ভেতরে ভেতরে জলের জোয়ারে চোখ মুখ এবং কাঠের মতো লিকলিকে হাতপা, পায়ের পাতা ফুলে টান টান হয়ে আছে, তার ওপর পোষ মাসের শীত কুয়াশা ভিজে গামছার মতো সমস্ত শরীরে লেপ্টে যেতে থাকে। মেয়ে আলোরাণী তার হাত ধরে আছে, উনিশ বছরের কন্যার ক্ষীপ্রতার সঙ্গে বৃদ্ধ বেতো পদ্মচরণ তাল মেলাতে পারে না, তার ওপর টনটন করা ব্যথায় বুড়ো কেঁদে ফেলে, 'আমি আর পারুম না, আমারে ফালাইয়া তরা যা গিয়া।'
হাত কয়েক দূরে এগিয়ে যাওয়া স্ত্রী চাপা অস্থির কণ্ঠে ধমকে ওঠে, 'ডং করন লাগবো না, পাও চালাইয়া আহ, বুইরা খাটাসটার লেইগ্যা হগলরে মরণ লাগবো অহন' –হরিমতি দাঁতে দাঁত ঘষে। আলো বলে, 'আহ্ মা।' –তার স্বর কেঁপে যায়।
গ্রাম ছেড়ে পদ্মচরণরা বেশি দূরে আসতে পারেনি, লন্ডভন্ড গ্রামের ভেতর থেকে চিৎকার, কোলাহল, কান্না স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে এখনো।
চকের ওপর যারা নেমে ছিলো তাদের কাউকে দেখা যায় না এখন আর। মধ্যরাতের এই শীতে ঝিঁ ঝিঁ পোকারাও চুপ করে গেছে। পদ্মচরণ স্ত্রীর কথার জবাব না দিতে পেরে আরো অসহায় হয়ে পড়ে। তার হাত একবার খোলে একবার মুঠো হয়।
আর তখনই তাদের ওপর পেছন থেকে ক'টি দ্রুত ধাবমান পদশব্দ এসে পড়লে কিছু বুঝে ওঠবার আগেই পদ্মচরণ মাটিতে ছিটকে পড়ে, শক্ত মাটির ঘায়ে তার মাথা ঝন্‌ঝন করে ওঠে, খুলির ভেতর নারকেলের ফোঁপলের মতো মগজ নড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ওঠে, একটি একটানা পিঁ ঈঁ ঈঁ ঈঁ ঈঁ ঈঁ ধ্বনিতে দৃষ্টি এবং শ্রুতি কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, কিন্তু একটি মর্মভেদী 'বাবা গো' ডাক পদ্মচরণের দৃষ্টির সেই কুয়াশাকে ছিন্নভিন্ন করে দিলে বালি বালি আলো-আঁধারিতে দেখে ক'জন মানুষ একটি মেয়েকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, তাদের পেছনে পেছনে আর একটি নারী দৌড়তে দৌড়তে কান্না ওপচানো ভাঙা ব্যাকুল কণ্ঠে বলছে, 'ছাইরা দ্যাও বাপ সকল, আমার মাইয়ারে ছাইরা দ্যাও, তোমরা আমার বাবা।'

মানুষগুলো কি বলে বোঝা যায় না, তারা মেয়েটির মুখে আঁচল পুরে দিয়ে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। মেয়েটির আঁচল মাটিতে লুটিয়ে লুটিয়ে চলে, চুল শূন্যে ঝোলে, উর্ধ্বমুখী মেয়েটির চোখ দু'টির ঠেলে বেরিয়ে আসা শাদা অংশটিও বুঝি দেখে পদ্মচরণ, তার মস্তিকের কুয়াশা কেটে যায়, পদ্মচরণ অস্তিত্ব এবং ভালোবাসার সমস্ত জোর দিয়ে ডেকে ওঠে, 'আ-লো- ও-ও-ও'

চাইনপাড়ার হাতেম আলী মন্ডলের বাড়ির গোয়াল ঘরে মানুষগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শতেক খানেক হাত দূরে ছোট্ট চরের মতো উঁচু শ্মশানের দিকে তাকিয়ে আছে।

আগে আগে চলে আসা জেলে পল্লীর মেয়ে পুরুষ, চাইনপাড়ার জন কয়েক, উত্তেজিত হয়ে ফিস্ ফিস্ করে। হরিমতি গোয়াল ঘরের নোংরা মাটিতে গড়াগড়ি দেয়, 'হায় হায়রে, আমি কি করলাম, মাছ মাইরা পোলা আইলে কি বুজামু। ঐ বুইরা, ঐ বুইরা খাটাসটা আমার মাইয়ারে খাইলো গো-ও-ও, ওহো....হো... হো।'

কেউ কেউ বলে চুপকর, চুপকর।'

পদ্মচরণ গোয়ালের খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে থাকে, গোয়াল ঘরে গরুর লেজ ও পায়ের আওয়াজ, মশার ভন্‌ভনের মধ্যে হারিকেনের আলোয় কালো একটি ঝোপের মতো মনে হয় তাকে।

চাপা ফিস্ ফিস্ এবং সরব বিলাপের মধ্যে আরও কিছুক্ষণ চলে যাবার পর ভয়ঙ্কর উত্তেজনায় একজন বলে ওঠে, 'ছারছে, ছারছে।'

এই অশ্লীল শব্দ পদ্মচরণের কানে এলে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সেই শব্দকে উড়িয়ে দেবার জন্যেই যেনো বা বলে, 'দী ন ব ন ধু উ উ. . .'

উত্তেজিত মেয়ে পুরুষ হুমড়ি খেয়ে পড়ে দেখার জন্যে। মেঘের আড়ালে চাঁদটি আছে-কি-নেই-আলো-আধাঁরির মধ্যে একটি নারী মূর্তির আগমন দৃষ্ট হয়।

পিঠে ধূলো, লুটোনো আঁচল, বিস্রস্ত চুল নিয়ে স্খলিত পদক্ষেপে আলোরাণী টলতে টলতে আসতে থাকে।

মহাকালের খাঁড়া

ভরত কোলে ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে।

খবরটা অবশ্য শুনছে বেশ কিছুদিন ধরেই। প্রথম প্রথম খবরের কাগজে, তার পর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
হোটেল বাজারে, রেলে বাসে।
আলের ধারে ফ্ল্যাগ পুঁতে ধান কেটে নিয়ে যাওয়া, রাস্তার ধারে গলা কেটে ফেলে রাখা, পুলিশের সঙ্গে পাইপগান নিয়ে সামনা-সামনি লড়াই-এ সবই শোনা কথা, খবরের কাগজে পড়া খবর। বর্ধমানের সা' বাড়ীর ঘটানাটা তো রীতিমতো হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিলো। কিন্তু এমন করে তার দোরগোড়ায় এসে যাবে ভাবতে পারেনি।
মাসখানেক আগে গরলগাছায় রাস্তার ধারে এক বাড়ীর গায়ে আলকাতরা দিয়ে বড় বড় হরফে লেখা: 'শ্রেণী শত্রু খতম চলছে চলবে' দেখে ভরতের বুকের ভেতর কলজে লাফিয়ে উঠেছিলো, তার বাড়ীর চার মাইলের মধ্যে এমন ছোরা-ওঁ চানো ব্যাপার চলে এসেছে, আর সে কিনা দূরের ঘটনা, খবরের কাগজের খবর মনে করে দিব্যি সুখে নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভেতরে ভেতরে সিটিয়ে যায় ভরত, আশপাশের লোকজনের দিকে মুখ তুলে তাকাতে পর্যন্ত পারে না, কী জানি কার ভেতর কি আছে।
বাড়ীতে ফিরেও স্বস্তি পায়নি, স্টেশনে গিয়ে ছেলেকে আড়ালে ডেকে খুব গম্ভীর মুখে সাবধান করে দিয়েছিলো: 'খবরদার, কোন ঝুট-ঝামেলায় যাবি না, খদ্দেরের সঙ্গে রাগ-ঝাল করবি না, আর আড্ডা বসাবি না দোকানে, রাজনীতি ফাজনীতির আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক করবি না।'
সুরেন মাথা হেঁট করে বাপের কথাগুলো শোনে। এতোগুলো 'না' চব্বিশ বছরের জোয়ান তাগড়া ছেলেটা কিভাবে নিচ্ছে বুঝতে পারে না ভরত, ছেলের মাথা নীচু করা মোটা টান টান ঘাড়ের দিকে তাকিয়ে ভারি অস্থির হতে থাকে সে। জোয়ান ছেলের বাপ হওয়া যে কী বিড়ম্বনার।
ইলেভেন ক্লাশ পর্যন্ত পড়ে পড়াশোনা ছেড়েছুড়ে দিয়ে ছেলেটা ইয়ার বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা আর যাত্রা থিয়েটার করে বেড়াচ্ছিলো। একমাত্র ছেলে, তার ওপর মা'র আদুরে গোপাল, ভরত কী করতে পারে। সে তার নিজের শতেক ঝামেলা নিয়েই ঝালাপালা। একলা মানুষ ক'দিকে সামলাবে। আর মাথা-ঝাড়া দেওয়া উঠতি বয়েসের ছেলেকে চোখে চোখে রাখা ভরতের কম্মো নয়।
গোপী দত্ত এসে কেঁদে পড়লো একদিন: 'ভরত আমার মান বাঁচা।'
খোঁজ খবর নিয়ে ভরত সব বুঝলো, ছেলেকে কিছু বললো না, উত্তর পাড়ায় ডাক্তারের ক্লিনিক থেকে গোপী দত্তকে দিয়ে তার মেয়েকে শুদ্ধ করে আনলো। সমস্ত খরচ দিলো ভরত। ছেলেকে রেডিও মেকানিজমে ভর্তি করে দিলো। ছেলে বুঝলো সবই, মাথা হেঁট করে বাপের ব্যবস্থা মেনে নিয়ে রেডিও মেকানিজম শিখতে গেলো।
বেগমপুর স্টেশনে ছেলেকে রেডিও ট্রানজিস্টার মেরামতের দোকান করে দিয়েছে ভরত। সুরেন ঘাড় গুঁজে ট্রানজিস্টার মেরামত করে। ব্যবসা সে বেশ ভালোই জমিয়েছে। গত বছর ভরত বিয়ে দিয়েছে ছেলের, গোপী দত্তর মেয়ের সঙ্গে নয়, জয়কেষ্টপুরের হারুঘোষ তার ছেলের শ্বশুর।
তবু ভয় যায় না ভরতের, জোয়ান বয়েসটাকে ভয়, তাগড়াই শরীরটার ভেতরে যে গরম রক্ত, তাকে ভয়, মুখের টানটান রেখাগুলোকে বড় ভয় পায় ভরত। গোপী দত্তর মেয়ের ব্যাপারটা ভুলতে পারে না সে।
-'বুড়ো বয়েসে আমাকে একটু শান্তিতে মরতে দে বাবা।' ভরত ভেতরে ভেতরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নুয়ে পড়ে একেবারে।

–'আহ্ বাবা, আমাকে নিয়ে তোমার এতো ভয়?'

গোপী দত্তর মেয়ের কথা ভরতের মাথায় ঝিলিক দিয়ে ওঠে, তবু সে বড় অসহায় কণ্ঠে বলে, 'ছেলের বাবা হ, তখন বুঝবি বাপ হাওয়া কি।'

ভরতের চোলাই মদের কারবার। শোনকা, বারুইপাড়া, বাকসা, মণিরামপুর, আদান, জনাই, বেগমপুর, চণ্ডিতলা, গরলগাছা, হাটপুকুর, কুমিরমাড়া জুড়ে তার গোপন কারবার আজ কুড়ি বছর ধরে চলে আসছে। এই কুড়ি বছরে হ্যাপা তাকে কম পোয়াতে হয়নি। পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে, সমাজতন্ত্রওলারা পিটিয়েছে। কিন্তু ভরতকে দমাতে পারেনি। কারবার তার ফুলে ফেঁপে ঢোল হয়েছে দিনে দিনে। আগে আদানের মদন সাহা আর সে ছিলো চণ্ডিতলা থানার ভেতর একচেটিয়া। ছুটকো–ছাটকা দু'একজন যে ছিলো না তা নয়, তবু তা ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না।

কিন্তু এই পাঁচ সাত বছরে যা হয়েছে, ভাবা যায় না, সাতআট মাইলের মধ্যে এমন গ্রাম খুব কমই আছে যেখানে দু'চারটে গোপন ভাঁটি নেই।

এতেও ভরত ঘাবড়ায়নি। বেগমপুরের পটলার সঙ্গে মিলে সে নতুন ব্যবসা ফেঁদেছে।

কাজ এমন কিছু নয়, মানুষ এসে জিনিস দিয়ে যাবে, সেই জিনিস জায়গা মতো পৌঁছে দিতে পারলেই করকরে নোটের তাড়া।

ঝুঁকি অবশ্য বড্‌ডো বেশি। তা ঝুঁকি নেই কিসে? তার মদের কারবারে ঝুঁকি নেই?

ভরত বলেছে: 'আমি রাজি, পটলা তুই লাইন কর।' পটলা লাইন করেছে রেলের ওয়াগন ভাঙা দলটার সঙ্গে।

ঠাকুরের কৃপায় ধরা ভরত এই পর্যন্ত পড়েনি। মদের কারবারও বন্ধ করেনি। লোক দেখানো গম কলটাও ঠিক রেখেছে তাজপুর বাজারে। জমি কিনেছে এন্তার। দখিনজলা, কোচের জলা, কাঁকড়াকূলের জলা। চারটে পেল্লায় গোলা ভরা টাবুটুবু ধান। বাঁশ বাগান, ফল–পাকুড়ের বাগান। পাঁচ পাঁচটা পুকুর লীজ নিয়ে মাছের চাষ করছে। শ্রীরামপুর–চণ্ডিতলা রুটে বাস চালু হতে ঝোঁক চেপে ছিলো, বাস কিনবে।

সুরেনের মা বারণ করেছে, 'কি হবে, কমতিটা কিসে তোমার, ঠাকুরের ইচ্ছায় লক্ষ্মী বাঁধা পড়েচে তোমার ঘরে, একটা ছেলে, ভগোবান বাঁচিয়ে রাখলে ফেলে–ঝেলে খেলেও ফুরোবে না। বাস কেনা ঝামেলা বৈ তো নয়।'

তা ঠিক, কমতিটা কি তার।

তিনতলা বাড়ী, সামনে সান বাঁধানো পুকুর, গোয়ালে গরু, চাকর–বাকর, আশ্রিত–পুস্যি, ঝি দাসী নিয়ে তার ভর–ভরন্ত সংসার।

কী থেকে কিসে এসে দাঁড়িয়েছে। ছিলো দু'কামরা মাটির ঘর। খোড়ো চাল। শ্রীরামপুরে জুতোর দোকানে মাস মাইনে চাকরী করতো। আকালের বছর বাপ মারা গেলো। ভগিরথ সাহার কাছে ঋণ করেছিলো বাপ। চক্রবৃদ্ধি সুদের সেই দেনা শোধ করতে গিয়ে মালিকের চোখ ফাঁকি দিয়ে তার মালই হাত সাফাই করেছে।

আনোখীলাল বলে[illegible] অভাব[illegible] [illegible]ষের আবার [illegible] কি। গরিব হওয়া টাই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
পাপ।'
আকাশের দিকে আঙুল উঁচিয়ে বলেছে, 'উ সালা যো ভগোয়ান মাথার উপরে বইসিয়ে রইয়েছে, উ সালা ভি বোঢ়ো লোকের দলে।' আনোখীলালের সঙ্গে গোপন কারবার করে বাপের ঋণ শোধ করেছে, কিন্তু নিজে রক্ষা পেলো না, মালিক ধরে ফেললো তাকে, জেলেই যেতে হতো, অনেক কষ্টে জেলের হাত থকে রক্ষা পেলো বটে, কিন্তু চাকরিটা গেলো। শ্রীরামপুর ছাড়তে হলো। তা ভালোই হলো শ্রীরামপুর ছেড়ে। যুদ্ধের বাজার তখন। সুতোর বড়ো টানাটানি। গুড়ুপ, বর্ধমান থেকে গোপনে সুতো পাচার চলছে। গ্রামে ফিরে ভরত ভিড়ে গেলো তাদের সঙ্গে। সেই থেকে শুরু।
কখন চুলে পাক ধরলো, কখন মাথায় টাক পড়লো, পঞ্চাশটা বছর পার করে দিলো ভরত, নিজের দিকে ফিরেও তাকায়নি।
নিজের মদের কারবার। মদ বিক্রি করে হাজারো লোককে মাতাল করে, নিজে মাতাল হয়নি কোনদিন। মদ ভরত স্পর্শ করেনি কখনো। মেয়ে মানুষের নেশাও নেই তার। নেশার কথাই যদি বলো, তাহলে মানুষের সবচেয়ে বড় নেশাটাই আছে ভরতের, টাকা করা, সম্পত্তি করা। পরিশ্রম করে, ফন্দি ফিকির করে, কৌশল করে ভরত টাকা করেছে, সম্পত্তি করেছে।
সেই টাকা আর সম্পত্তি এখন শতমুখী রাক্ষস হয়ে তাকে গিলতে আসছে, একমাত্র ছেলেও তার বুকের কাঁটা।
চলা ফেরায় ভরত বড় সতর্ক এখন। রাতের বেলা সদর দরোজা বন্ধ হয়েছে কিনা নিজে এসে পরখ করে যায়, ওপরের তলায় ওঠার সিঁড়ির মুখে কোলাপসিব্‌ল গেট বসিয়েছে, তবু রাতে ঘুম হয় না ভরতের।
স্ত্রী বলে, 'তুমি পাগল হয়ে যাবে এবার, ভরত ক্ষেপে যায়, 'তোমাদের কি, ঘরে বসে বসে খাও আর ঘুমোও, দিনকালের খরব তোমরা কি বুঝবে।'
ছেলেকে সাবধান করেও স্বস্তি পায়নি ভরত। পুত্রবধূকে সাবধান করেছে, সে যেনো স্বামীকে আগলে রাখে। অল্প বয়সী নতুন বউ তাতে আরো ঘাবড়ে যায়। রাতের বেলা স্বামীকে জড়িয়ে ধরে কাঁদো কাঁদো গলায় বলে, 'তুমি আরো সকাল সকাল আসতে পারো না, আমার খুব ভয় লাগে।'
সুরেনের অসহ্য মনে হয়, কী আরম্ভ করেছে মানুষটা, বুড়ো হলে কি ভিমরতি ধরে। একটা মানুষ এতোগুলো লোককে পাগল করে তুলেছে।
কারা যে এইসব লিখছে কিছুতেই বুঝতে পারে না ভরত, এই মাসের মধ্যে তার চারপাশের দেওয়াল ভরে গেলো। ভরত এখন মানুষের মুখ লক্ষ্য করে, মানুষের কথা লক্ষ্য করে, জটলা দেখলে তটস্থ হয়ে যায়।
পটলা বলে , 'দিনকাল বড়ো খারাপ পড়েছে ভরতদা, এই যে তোমার সঙ্গে আজ কথা বলছি, কার যে তোমাকে আবার দেখতে পাবো তার কোন গ্যারান্টি নেই, কি আমাকেই যে তুমি দেখতে পাবে তা-ই বা জোর দিয়ে বলি কি করে।' ভরতের বুকে রক্ত হিম হয়ে আসে। পটলা তার দিকে তাকিয়ে বলে, 'কাউকে আর বিশ্বাস করা যাচ্ছে না, কার মনে যে কি আচে কিছু বলতে পারো না তুমি। শম্ভু, কলেরা কি বলে জানো? বলে, আমরা শালা জান হাতে করে ওয়াগান ভাঙি, আমাদের ঘরে অভাব যায় না, আর তোমাদের তিনতলা বাড়ী ওঠে, জমি হয়, দোকান হয়,...

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কথা বলতে বলতে পটলা থেমে যায়, তোমার শরীর খারাপ নাকি, অতো ঘামচো কেনো?'

সামনে কালী পূজো, তার কারবারের মৌসুমে, কিন্তু ভরত যেনো ঝিমিয়ে পড়ছে, সংসার তার ছোট্ট, অথচ হাজারো গণ্ডা পুস্যি, তাদের সকলের দায়িত্ব ভরতের একার। কোনো কোনো দিন কারণে অকারণে ক্ষেপে যায় সে, স্ত্রীকে বলে, চলে যেতে বলো সবাইকে, এতো ঝামেলা আমি আর টানতে পারবো না।'

সরোজিনী বিমূঢ় হয়ে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে, বাইরের কেউ নয়, হুট বলতে এতোগুলো মানুষকে ঘর থেকে নামিয়ে দেবে। পাগল হলো নাকি লোকটা।

দুপুরবেলা সুরেনই খবরটা নিয়ে এলো। ভরত খেয়ে দেয়ে শুয়েছে তখন। ও ঘরে চাপা উত্তেজনা আর ফিসফাস তাকে উৎকর্ণ করে।

–'কি হয়েচে রে সুরেন?' ভরত চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে। কথাবার্তা ও ঘরে থেমে যায়। ভরত উঠে বসে, তার বুক ধড়ফড় করে, 'কিরে কি হয়েচে?'

এবার স্ত্রীর গলা শোনা যায়, 'কি আবার হবে, কিছু হয়নি, তুমি ঘুমোও।'

–'কি আবার হবে? আমাকে বলা যায় না? সুরেন শোন।'

অগত্যা সুরেনকে আসতে হয়, সুরেনের সঙ্গে সুরেনের মা–ও আসে, তার পেছনে পেছনে পুত্রবধূ।

সুরেন মহা ফাঁপরে পড়ে, এমন একটা ব্যাপার, রেখে–ঢেকে বলাও যায় না, যেমন করেই বলো, কথাটার বীভৎসতা বেরিয়ে আসবেই। অতএব সমস্ত ব্যাপারটাকেই খুলে বলতে হয় তাকে:

লালবেহারী ডাক্তারের ভাই পরিমল বাজারে গিয়েছিলো সকালে, বেলা বারোটা সাড়ে বারোটা বেজে যায় তখনো সে বাড়ীতে ফেরে না দেখে বাড়ীর লোকজন চিন্তিত হয়, এমন সময় বিভূতি লাহার নাতিটা, বছর দশেক বয়েস, পরিমলের বাজারের ব্যাগ নিয়ে তার বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত। আঠারো বিশ বছরের তিনটি অচেনা ছেলে ব্যাগটি পরিমলের বউকে দেবার জন্যে তাকে দেয়, ছেলে মানুষ অতোশত বোঝেনি, ব্যাগ নিয়ে পরিমলের বাড়ীতে যায়। বাড়ীর লোকজন শাক তরিতরকারী ভরা বাজারের ব্যাগটা উপুড় করে ঢালতেই খবরের কাগজে জড়ানো পরিমলের মাথা বেরিয়ে আসে।

সুরেনের বর্ণনা শেষ হতে না হতেই জল আন, পাখা আন, দৌড়ো–দৌড়ি পড়ে যায় ভরতের ঘরে।

সেই থেকে ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে ভরত। বাড়ীতে কেউ কারুর সঙ্গে নীচুগলায় কথা বললে ভরতের বুকের ভেতর ধড়ফড়ানি শুরু হয়। ডাক্তার বলেছে, দুশ্চিন্তা করা যাবে না, রেষ্টে থাকতে হবে।

ছেলে বলে, 'এতো চিন্তার কি আচে তাতো বুঝি না। পরিমল পার্টি করতো, আমরা তো কোনো পার্টি করি না' .....

ভরত খেঁকিয়ে ওঠে, 'এই তোর বুদ্ধি। পার্টি করিস আর না করিস, তুই ভরত কোলের ছেলে, ভরত কোলে ওদের চোখে শ্রেণী শত্রু, এ[illegible] বুঝলি রে গাড়োল। রাস্তা চলিস কি চোখ বন্ধ করে।'

অতএব ডাক্তারের [illegible] নির্দেশ [illegible]ই [illegible], আর [illegible]রেষ্ট, ভরতের মতো মানুষের রেষ্ট [illegible]

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ভরতের বুক ধড়ফড় করে, মাথা শুন্য মনে হয়, বাইরে বেরুলেই গলা শুকিয়ে আসে, রাস্তা হাঁটতে গেলেই মনে হয় কারা যেনো তাকে অনুসরণ করছে পেছনে পেছনে, ঘাড় পিঠ শির শির করে। বাস কিংবা ট্রেনে উঠলে কোনো মানুষ তার দিকে একবার ছেড়ে দুবার তাকালেই বুকের ভেতর ধড়াস করে ওঠে। কিন্তু উপায় কি, বাইরে ভরতকে বেরুতেই হয়।

প্রত্যেক বছরেই ভরতের বাড়ীতে কালী পূজো হয়। বেশ ধুমধাম করেই হয়। এ বছরে তায় একদম ইচ্ছা ছিল না। দেবীর ওপর ভক্তি উঠে গেছে নয়, পুজো মানেই উৎসব,উৎসব মানেই হৈ চৈ আর হৈ চৈ মানেই মানুষের দৃষ্টি পড়া। ভরত কোলে মানুষের আলোচনার বিষয়বস্তু হবে। কিন্তু কে শোনে কার কথা, এসব কথা বুঝবেটা কে? স্ত্রী বলবে, পাগল। ছেলে বলবে, ভিমরতি। আড়ালে হয়তো বা হাসাহাসিও করবে। এমনিই সেদিন ছেলেকে গাড়োল বলাতে ছেলে রেগে আছে মনে মনে, সামনে কিছু বলেনি, মাকে বলেছে, 'কেনো ধনী কি উনি একা, আর ধনী মানুষ নেই এ তল্লাটে?'

নিজের হাতকে নিজেরই কামড়াতে ইচ্ছা করে ভরতের।

সে যে চোলাই মদের কারবারী, সে যে বেআইনী ব্যবসা করে টাকা করেছে, সমাজতন্ত্রওলারা এক সময় যে পিটিয়েছে তাকে, আর পাঁচজন বড়ো লোকের চেয়ে মানুষের আক্রোশটা যে তার ওপরই বেশি, এসব কথাও কি ভরতকে নিজের মুখে বলতে হবে বউ ছেলেকে? যাক, যা খুশী করুক ওরা।

অতএব ভরতের বাড়ীতে কালী পূজো হচ্ছে।

পূজোর দিন দুপুরে ছেলে খেতে এলে মা বলে, এ বেলা দোকান না-ই বা খুললি, তোর বাবার শরীর ভালো নেই, পরকে দিয়ে কি এসব কাজ হয়।'

সুরেনের ভেতর তখন আসন্ন ফূর্তি বুজকুড়ি মারছে। আজ সন্ধ্যায় বহু দিন পর বন্ধুদের সঙ্গে একটু গা এলোনো মৌতাত করা হবে।

সুরেন তাড়াতাড়ি বলে, 'না না, দোকানে যেতেই হবে, ক'টা জরুরী অর্ডার ডেলিভারী দিতে হবে, দোকান বন্ধ রাখলে খদ্দের বিগড়ে যাবে।'

এরপর সরোজিনীর কিছু বলার থাকে না।

ছেলে দোকানে যাওয়ার সময় সরোজিনী বলে, 'তাড়াতাড়ি ফিরিস, যাবার সময় ভক্তি করে প্রণাম করে যাস্, কি যে সব হইচিস তোরা আজকালকার ছেলেরা, ঠাকুর দেবতার ওপর এক ফোঁটা ভক্তি নেই।'

ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেলো সুরেনের। অনেকদিন পর বড় আনন্দে কাটছিলো আজ। অনেক দিনের স্মৃতি জড়ানো টিনের চালের ক্লাব ঘরটায়-গান, হাসি, গল্প গুজোব, তার ওপর নিপু খাঁটি স্কচ জোগাড় করে এনেছিলো, কষা মাংসের সঙ্গে বড়ো জমেছিলো। যাত্রা থিয়েটার করে বেড়ানো সময়গুলোতে বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে এক আধ চুমুক খেয়েছে সুরেন, তা-ও দিশি। ভালো লাগেনি। দোকানের ঘানিতে বাঁধা পড়ার পর একদিনও হয়নি। বিয়ের পর তো একেবারে জাবরকাটা গরু। আজ বিলিতি মাল পেটে পড়ায় ভারী চনমনে হয়ে উঠলো মেজাজটা। সেই পুরোনো নির্ভার ফুরফুরে সময়টার বাতাস বইতে শুরু করেছিলো। আর তখন হঠাৎ করে সবিতার কথা মনে হতেই বুকের ভেতর কেমন মোচড় দিয়ে উঠলো। বন্ধুদের কথাবার্তায় সে মনোযোগ রাখতে পারছিলো না, নিজেকে খুব হেরে যাওয়া মনে হতে থাকে, মনে হতে থাকে তার জীবনটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
একেবারে বরবাদ হয়ে গেলো। মনে হলো, বড়ো ঠকিয়েছে তাকে সবাই। বাপ মা তার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে একেবারে ফিনিশ করে দিয়েছে তাকে।
সবিতার জন্যে তার প্রচণ্ড রকমের মায়া হতে থাকে। সবিতার ওপর সে জুলুম করেছে, বড়ো অবিচার করেছে সে। নিজের কাপুরুষতার জন্যে সবিতার জীবনটা নষ্ট করে দিয়েছে।
–'কি রে, উঠে পড়চিস যে বড়ো?' বন্ধুরা সমস্বরে হৈ হৈ করে ওঠে।
–'না চলি, ভাল্লাগচেনা।' একটু একটু জড়ানো ভারী গলায় সুরেন বলে।
–'লে ব্বাবা, অমন খাঁটি স্কচ খাওয়ালুম, তাও ভাল লাগচে না, কেনো ভরতেশ্বরী ছাড়া রোচেনা বুঝি আজকাল?'
বন্ধুরা হো হো করে হেসে ওঠে। সুরেন লাল হয়ে যায়। নিপু স্পষ্ট তার বাপের চোলাই মদের প্রতি ইঙ্গিত করেছে। মাখন বলে, 'আরে না না, মনে মনে হৃদয়েশ্বরীর ডাক শুনতে পেয়েছে। তাই নয় রে সুরেন?'
আবার হো হো হাসি। সুরেন প্রায় ছিটকে বেরিয়ে আসে বাইরে। কেমন আচ্ছন্নের মতো হাঁটতে থাকে সে।
নোনা পোতার রেলগেটের পাশে পূজো হচ্ছে। ভিড় তেমন নেই, তবু মেয়ে–দেখা মাস্তান দু' চারজন এখনও বড় জমিয়ে আছে। চালচিত্রের পেছনে রেলে পুকুরপাড়ে হয়তো বোতল চলছে। ঝাঁঝাঁ করে লাউড স্পীকার বাজছে 'এপ্রিল ফুল' বানায়া'...। পাতলা ভিড়ের ভেতর দিয়ে চলতে চলতে ঘড়ির দিকে চেয়ে চমকে ওঠে, সাড়ে দশটা।
মা সকাল সকাল ফিরতে বলেছিলো। বাবা হয়তো অস্থির হয়ে পড়েছে। বিনু ছটফট করেছে নিশ্চয়ই। সুরেন জোরে জোরে পা চালায়। একবার ভাবে রিক্সা নিই, তারপর হঠাৎ মনে হয়: কেনো, তার ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন দাম নেই? আমার খুশী, আমি দেরী করবো। প্রায় ছেলে মানুষের মতো গোঁ ধরে হঠাৎ রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর আবার হাঁটতে থাকে ধীরে ধীরে। সবিতার সঙ্গে সে মনে মনে কথা বলতে থাকে, 'সবিতা, আমি খুব অন্যায় করেছি, আমায় ক্ষমা করে দাও সবিতা।' বলতে বলতে সে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সবিতার পা জড়িয়ে ধরার জন্যে রাস্তার ওপর হাঁটু গেড়ে বসে পড়তে যাচ্ছিলো। পেছনের চলন্ত সাইকেল থেকে কে যেনো ডেকে ওঠে, 'কে, সুরেনদা নাকি?'
সুরেন ফিরে তাকাবার আগেই সাইকেল তাকে অতিক্রম করে যায়। হাত কয়েক দূরে গিয়ে সাইকেল আরোহী পেছন ফিরলে সুরেন চিনতে পারে, কে ঝন্টু?'
–হাঁ, চলি।'
ঝন্টু চলে যায়। সুরেন পেনো বাজারের মোড় পেরোয়। রাস্তাটার এখানে আবছা অন্ধকার। এখান থেকে বাড়ী ঘর ফাঁকা ফাঁকা। দু'পাশের গাছপালা নুয়ে আছে। সুরেন আর একটা বাঁক পেরোয়। পানু স্যাকরার ভাঙা বাড়ীর ধার ঘেঁয়ে, নন্দীদের পুকুরপাড়ের নীচে দিয়ে রাস্তাটা ক্রমে সুরু হয়ে গেছে। তারপর দুপাশে ব্রজ তাঁতির বিশাল বাঁশ বাগান। সুরেন রাস্তায় কোন মানুষ দেখে না, বাঁশ বাগানের খুব ভেতর থেকে শিয়াল ডেকে ওঠে, ঝিঁঝি'–র একটানা মন্ত্রোচ্চারণ চলে চারপাশে। সুরেনের কেমন গা ছমছম করতে থাকে। পা ভারী হয়ে এসেছে। হাত দু'টোও তার অন্য কারো হাত হয়ে গেছে।
হঠাৎ দেখে, সামনের বাঁশ ঝাড়ের গোড়ায় সবিতা দাঁড়িয়ে আছে। সুরেন আকুল

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
হয়ে ডাকে: 'সবিতা।' সবিতা তার দিকে মুখ তুলে তাকিয়েই সামনে ঝুঁকে দু' হাতে মুখ ঢাকে। সুরেন দ্রুত হাঁটতে যায়, পা জড়িয়ে আসে। সবিতা পিঠে চুল এলো করে দৌড়োতে থাকে।

'সবিতা, শোনো সবিতা।'

তার মোটা খসখসে ভারী হয়ে যাওয়া জিভে শব্দ ফোটে কি ফোটেনা, সুরেন গোঙানীর মতো করে গোপী দত্তর মেয়েকে ডাকে।

মেয়েটি হঠাৎ কোথায় যে লুকোয় সুরেন ঠাহর করতে পারে না। ঝিঁঝিঁর ডাক আর বাঁশ বনের শোঁ শোঁ কট কট শব্দ, শুকনো বাঁশ পাতার ওপর পোকামাকড় হেঁটে যাওয়ার কি তার পায়ের নীচে ভেঙে যাওয়া পাতার শব্দ–বাকীটা সুনসান নির্জনতা। সবিতা কি শ্বশুর বাড়ী থেকে পালিয়ে এলো! সুরেন হাঁটতে হাঁটতে খোঁজে। স্বামীটা লিলুয়া ওয়ার্কশপে চাকরী করে। শ্বশুর বাড়ীতে হয়তো কষ্ট দেয় সবিতাকে। হয়তো স্বামীর সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না। সুরেনের মাথার ভেতর মেঘ আর চাঁদের খেলা চলে। একবার আলো হয় একবার ঝাপসা হয়। অক্টোবরের কুয়াশাময় রাত্রিতে আকাশের চাঁদটি কোথায় আছে মাথার ওপর বাঁশ বাগানের ছাউনীর নীচে থেকে দেখা যায় না, শুধু একটু ময়লা ময়লা আলো অন্ধকারের সঙ্গে মিশে নষ্ট ডিমের মতো ঘোলা হয়ে আছে চারপাশে।

কী যে ঝামেলায় পড়লো সুরেন। একটাও কি মানুষ আসতে নেই। সবিতা যদি এখন এই বাঁশ বাগানের ভেতরে কোথাও একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসে!

ঐ, ঐ তো সবিতার আঁচল দেখা যাচ্ছে। সুরেন দৌড়োতে শুরু করে। এঁকে বেঁকে টাল খেতে খেতে দৌড়োয়; 'সবিতা, দাঁড়াও, সবিতা প্লিজ!' তার জিভ কৈ মাছের মতো ছটফট করে মুখের ভেতর। চোখে জল এসে যায়। মাটির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায় সুরেন, নিজের শরীর নিজের কাছেই প্রকাণ্ডভারী বোঝার মতো ঠেকে, কিছুতেই তুলতেপারে না, হাঁটু দুটির ভেতরকার টানটান বাঁধনগুলো সব আলগা হয়ে গেছে। তার ওপর ভর দিয়ে কোনো মতেই ওঠা যায় না। সুরেন দামাল শিশুর মতো হামা দেয়। হাত কয়েক দূরে গিয়ে উবু হয়ে বসে। মাটির ওপর দু' হাতের ভর দিয়ে সামনে ঝুঁকে বার দুই দোল খেয়ে উঠতে গেলে তার মাথা চক্কর দেয়, পেটে কষা মাংস আর নিপুর খাঁটি স্কচ ডিগবাজি খেলা দেখায়। বুক বেয়ে নোনতা ঝাঁঝালো স্বাদের ঢেঁকুর এবং জল উঠে আসে মুখে। সুরেন ওয়াক ওয়াক করে, বমি হয় না, থু থু করে থুতু ফেলে, মুখ হাঁ করে ঠাণ্ডা বাতাস টানে। খানিক্ষণ থম ধ'রে চোক বন্ধ করে বসে থেকে তেমনি দু' হাতের ওপর ভর দিয়ে প্রবল হ্যাঁচকা টানে নিজেকে উঁপড়ে নেওয়ার মতো ক'রে দাঁড় করিয়ে দেয়। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জেগেছে। সুরেন প্রাণভরে শ্বাস টানে, তারপর আবার হাঁটতে থাকে।

ব্রজ তাঁতির বাঁশ বাগানের শেষ মাথায় এসে পড়েছে। বাঁকের মুখে বটতলাটা দেখা যায়, তার পরেই জেলে পাড়া। আচ্ছা আমি এ রাস্তায় এলাম কেনো? বটতলার নীচে দিয়ে জেলে পাড়ার ওধার দিয়ে আমার সোজা চলে যাওয়ার কথা। মাইরি এ সবের কোনো মানে হয় না,– সুরেন নিজেকেই শোনাতে শোনাতে হাঁটে।

বটতলায় আশশ্যাওড়ার জঙ্গলের ভেতর চারজন অস্থির হতে থাকে, হরি বলে, 'কি হলো বলতো, ঝন্টে তুই দেকিচিস?'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
–'লে শালা, কথা বল্লুম।'
সুদীপ বলে, 'বোকাচোদাটা গেলো কোতা তা হলে?'
–আমার মনে হয় বাঞ্চোতটা রাস্তার ধারে কোথাও পোঁদ উল্টে পড়ে আচে।' ঝন্টু যুক্তি দেখানোর মতো করে বলে।
উঁচু বটতলার নীচে দিয়েই পাকা রাস্তা ধরে ভরত কোলের লোকজনেরা একটু আগে আলো হাতে কথাবার্তা বলতে বলতে স্টেশনের দিকে গেছে। হরি কোনো কথা বলে না, গলা উঁচিয়ে স্টেশনমুখী রাস্তার দিকে বারবার তাকায়।
অনাদি এতোক্ষণ কোনো কথা বলেনি, সে বলে, 'আচ্ছা হরি, এমনও তো হতে পারে, মাতাল শালা রাস্তা ভুল করে বাঁশ বাগানের ভেতর ঢুকে ঘুরপাক খাচ্ছে।'
এবার তিনজনই এক সঙ্গে অনাদির দিকে তাকায়। তাদের মাথায় আলো চমকে ওঠে। হরি বলে, ভেরি ন্যাচারাল, অনা তোর কতাই ঠিক, নেশা করেছে, ঝন্টে নিজে দেকে এসেছে, মাতাল মানুষ। মোড়ের মাথায় এসে দিক ঠিক করতে পারেনি, পানু স্যাকরার বাড়ীর পাশ দিয়ে কাঁচা রাস্তায় নেমে নন্দীদের পুকুর ধার দিয়ে সোজা ব্রজ তাঁতির বাঁশ বাগানে ঢুকেছে, রাইট! ঝন্টে, তুই রাস্তার দিকে নজর রাক্, আমরা বাঁশ বাগানে ঢুকি'
অনাদি বলে, না, ঝন্টে শুধু শুধু এখানে বসে থেকে লাভ কি, রাস্কেলটা যদি রাস্তার ওপরই পড়ে থাকে তাহলে ভরত কোলের লোকজন গেছে তারাই সঙ্গে করে নিয়ে আসবে, অতোগুলো মানুষকে ঝন্টু একা সামলাতে পারবে না, খামাখাই সব কাজ গুবলেট হবে। ঝন্টু তুইও চল।
চারজন যুবকের একজনের হাতে চটের একটা ব্যাগ, তারা সতর্ক হয়ে রাস্তায় নামে, তারপর এক দৌড়ে পাড়উঁচু বাঁশ বাগানে উঠে দ্রুত নিজেদেরকে আড়াল করে ফেলে।
হাঁটতে হাঁটতে সুরেন আবার সবিতাকে দেখতে পেয়ে দৌড়ে সামনের দিকে এগোয়।
বাঁশ পাতার ওপর খড়মড় আওয়াজ এবং ধুপধাপ পদ শব্দে চারজনই সামনের দিকে তাকালে টলমল পায়ে এগিয়ে আসা সুরেনকে দেখতে পায়; চাপা সোল্লাসে তারা সুরেনকে অভ্যর্থনা জানানোর মতো ক'রে বলে, 'আরেশ্বালা। গোলাপ তুমি এখানে।'
যেনো মজাদার কিছু। তারা সুরেনের সামনে এসে দাঁড়ায়। চারটে ড্যাগার সুরেনের পেট থেকে বিঘত খানেক দূরে অর্ধ চন্দ্রাকারে ঝক্‌ঝক্ ক'রে ওঠে।
ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায় সুরেন। সবিতার বদলে মাটি ফুঁড়ে চারজন এমনভাবে ছুরি হাতে সামনে দাঁড়িয়ে, তার ওপর অতি পরিচিত! বড় বড় চোখ ক'রে মানুষ চারজনকে দেখে, কোন কথা বলতে পারে না, ব্যাপারটা বড় ঘোলাটে ঠেকে, সবিতাকে দেখতে পাওয়াটা ঠিক, না এরা ঠিক?
তার ব্রহ্মতালু দিয়ে স্কচ হুইস্কির উত্তপ্ত ফ্লেবার বেরিয়ে যেতে থাকে হু হু করে।
কী যে হয় সুরেনের ভেতরে কে জানে, কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ সে 'বাঁচাও বাঁচাও' ব'লে পেছন ফিরে দৌড়োতে যায়।
ঝন্টুর ড্যাগারই তার পিঠদেশ বিদ্ধ করে প্রথম। সুরেন 'আ–আ–আ' ক'রে বিকট শব্দে মাটির ওপর উপুড় হয়ে পড়ে। হরি, সুদীপ, অনাদি তাকে ঘিরে ধরে 'খবরদার, চেঁচাবিনি শালা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
চটের ব্যাগের ভেতর থেকে সুদীপ পটকা বার করে ফাটায়।
ছুরির ঘাইটা তেমন জমেনি পিঠে। সুরেন থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে কান্না-ভাঙা গলায় বলে, 'আমায় মারিস নি, প্লিজ, তোদের পায়ে পড়ি, আমার বউয়ের বাচ্চা হবে।'
তাকে না মারার যুক্তি হিসাবে সুরেন কেনো যে তার বউয়ের বাচ্চা হওয়ার কথা নিয়ে এলো কে জানে।
হরি বলে, 'তাই নাকি? ঝন্টে, তাহলে তো শালার যন্তরটাই সাবড়াতে হয় আগে।'
সুদীপ তার মুখে রুমাল গুঁজে দেয়, তারপর তিনজন মিলে তাকে চিৎ করে। সুদীপ রুমাল চেপেই থাকে। হরি আর অনাদি সুরেনের দুই হাতের ওপর দাঁড়ায়। ঝন্টু বলে, 'আর একটু ওধারে নিয়ে যাই চল।' তখন তিনজন মিলে সুরেনকে চ্যাংদোলা করে তোলে। সুরেন মোড়ামুড়ি করে। তার আমড়া আমড়া চোখ দু'টি ঠেলে বেরিয়ে আসে। সুদীপ মুখের ভেতর রুমাল ঠেসে ধরে থাকে, তার ভেতর থেকে খুব ঘষা অস্পষ্ট গোঁ গোঁ শব্দ করতে থাকে সুরেন।
যুবক চারজন ভারী হাস্যকর কায়দায় তাকে বাঁশ বাগানের পায়ে-চলা সরু রাস্তার ওপর থেকে সরিয়ে নিয়ে-পাশে-আরো ভেতরদিকে একটা বড়ো ঝাড়ের আড়ালে নিয়ে গিয়ে ফেলে।
হরি বলে, 'তাড়াতাড়ি কর্, শালা যে জোর চেঁচিয়েচে!' আবার তারা আগের পজিশন নেয়: হরি আর অনাদি সুরেনের দুই হাতের ওপর, সুদীপ মুখে রুমাল চেপে।
ঝন্টু সুরেনের দুই হাঁটুর ওপর ব'সে ধুতি খোলে, ড্যাগার দিয়ে দড়ি কেটে আণ্ডারওয়্যার নামিয়ে দেয়।
সুরেন গলার দু'পাশের শিরা ফুলিয়ে চিৎকার করে, কিন্তু তার টাকরা পর্যন্ত ঠাসা রুমাল, আওয়াজ বেরোয় না, খুব ক্ষীণ হাওয়া বেরোবার অদ্ভুত একটা আওয়াজ হ'তে থাকে, ক্রমাগত সে মাথা এ পাশ ওপাশ করে। হাত টানে। ওপর নীচে কোমর নাড়ে। ঝন্টু আর একটু সামনে এগিয়ে উরুর ওপর আরো চেপে চুপে বসতে বসতে বলে, 'হাঁ হাঁ, শালা চিৎ হয়ে মনে মনে বউকে ঠাপা।'
বাম হাতে সে সুরেনের কুঁকড়ে যাওয়া শিশ্ন মুঠো করে ধরে ইলাস্টিকের মতো টেনে লম্বা করে, তারপর ডান হাতের ড্যাগার দিয়ে পোঁচ দেয়। বেশি দিতে হয় না, গোটা দু'য়েক পোঁচেই কাজ হয়। তীক্ষ্ণমুখী রক্তধারা পিচকারি দিয়ে উর্ধ্বমুখী হয় কি হয় না, সুদীপ সুরেনের ধুতির খুঁট দিয়ে ক্ষতস্থান চেপে ধরে। ঝন্টুর মুঠোর ভেতর সুরেনের লিঙ্গ কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে।
প্রধান কাজটা হরিই করে। তার জন্যে তার পজিশন চেঞ্জ করতে হয়, হরি সুরেনের বুকের ওপর চড়ে বসে। সুরেনের পুরুষাঙ্গ হাতে নিয়ে ঝন্টু হরির জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায়।
সুরেন এখন আর তেমন দাপাদাপি করে না, শুধু একটানা ক্ষীণ গোঙানী আর কোমরের, মৃদু মৃদু কাঁপন, কখনো এ পা কখনো ও পা একটু আধটু টানে। চোখ স্থির। হয়তো বা সুরেনের অজ্ঞান অবস্থায়ই হরি তার গলায় ছুরি চালায়। কেননা প্রথম পোঁচ দেবার পর একটু আগে চুপচাপ পড়ে থাকা সুরেন বেশ জোরে সমস্ত শরীরে ঝাঁকুনী দিয়ে নড়ে ওঠে। পরের পোঁচগুলোয় আর তেমন নড়ে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
সুরেনের গলা দিয়ে রক্তপ্রবাহের ঘড় ঘড় শব্দ হতে থাকে; হরি কর্ম সমাধা করে উঠে দাঁড়ায়।

হরির এ্যাকশন চলাকালে অনাদি বাঁশ বাগানের মাথার ওপর চাঁদটাকে খুঁজছিল। ঝন্টু এতোক্ষণ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ছিলো, সুরেনের হাতের ওপর দাঁড়িয়ে বার বার সেই ছবিটাই চলে আসছিলো তার মনে: রাস্তার ওপর টলমল পায়ে হাঁটতে হাঁটতে সুরেন জিজ্ঞেস করছে, কে, ঝন্টু?'

হরি হা: বলে মুখ থেকে স্বনিঃশ্বাস শব্দ করে উঠে দাঁড়ালে ঝন্টু নেমে আসে। অনাদি একটু দূরে গিয়ে প্রস্রাব করতে বসে। সুদীপ উঠে আড়মোড়া ভাঙে। ততোক্ষণে ঝন্টু একটা শুকনো কঞ্চি কুড়িয়ে নিয়ে তার আগায় সুরেনের কর্তিত লিঙ্গটি গাঁথে, তারপর সুরেনের দুই উরুর মাঝখানে কঞ্চিটাকে পুঁতে দেয় মাটিতে।

সুদীপ বলে, 'মাইরি যেনো শিবের ত্রিশূল। থাক। বেশ হয়েচে!' এবার তারা ব্যাগের ভেতর থেকেএকটি বড়ো সাইজের পটকা এবং ইঞ্চিচারেক চওড়া হাতদেড়েক লম্বা কাগজ বার করে। 'গলা কাটা চলছে চলবে' শ্লোগান সম্বলিত সেই লম্বা কাগজটি বিশ্বসুন্দরীর মতো করে সুরেনের ডান কাঁধ থেকে বুকের ওপর দিয়ে বাম কোমর পর্যন্ত প্রসারিত করে বিছিয়ে দেয়।

এই জরুরী কাজটি শেষ করে তারা পটকা ফাটিয়ে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যায়।

লিঙ্গহীন, জবাই করা, বাণীশোভিত উলঙ্গ সুরেন ঘড়ি হাতে চিৎ হয়ে পড়ে থাকে বাঁশ বাগানের ভেতর। তার দুই উরুর মাঝখানে কঞ্চিতে গাঁথা উর্ধমুখী শিশ্নটিকে বড়ো নিঃসঙ্গ দেখায়।

জেলে পাড়ার লোকগুলো ঘরের ভেতর উঠে বসে কান খাড়া করে। তারপর দরজা খুলে বাইরে রকের ওপর বেরিয়ে আসে। এ রক ও রক থেকে মানুষ কথা বলে: 'ব্রজ তাঁতির বাঁশ বাগান থেকে নয়?' আর একজন বলে, 'তাইতো মনে হলো?'

নিতাই জেলের যুবক ছেলেটি বলে, 'কেষ্টো কাকা, ব্যাপারটা একটু দেখতে হয় না?'

বৃদ্ধ নিতাই ধমকে ওঠে: 'হাঁ দেখতে হবে বৈকি?' হারিকেনের আলোয় তার মুখের চামড়ার কোঁচকানো ভাঁজগুলো কেঁচোর মতো কিলবিল করে ওঠে: 'রাত দুপুরে প্রাণটা হারাও আর কি!'

বৃদ্ধের এ কথায় মানুষগুলোর মাথার ভেতর লালবেহারী ডাক্তারের ভাই পরিমলের গলাকাটা লাশটি ধপাস করে এসে পড়ে।

রাত সাড়েবারোটার দিকে নতুন বাঁশের খাটিয়ায় শুয়ে মানুষের কাঁধে চড়ে সুরেন বাড়ী ফেরে। পুকুর পাড়ে মণ্ডপের সামনে ছোটখাটো মাঠের মতো জায়গাটা খালি হয়ে গিয়েছিলো, ঢাকীরা বসে বসে বিড়ি টানছিলো, দূর থেকে মানুষের কলরব ও বাঁশের খাটিয়া দেখে তারা আতঙ্কিত হয়ে দাড়িয়ে পড়ে, মুহূর্তের মধ্যে কোথা থেকে লোকজনে ভরে যায় জায়গাটা। সুরেনের অনুসন্ধানকারীরা স্বেচ্ছাসেবকের মতো খাটিয়ার চারপাশে দাঁড়িয়ে ভিড় ঠেকাতে থাকে। চিৎকার করে, হাত নেড়ে, স্থির হতে বলে। কিন্তু কেউ কারুর কথা শোনে না। মেলার মতো ক্রমাগত বিপুল জনসমাগমের ভিড়, হৈ চৈ, চিৎকার আর দৌড়াদৌড়ির

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
মধ্যে সুরেনকে মণ্ডপের এক পাশে নামালে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। স্বেচ্ছাসেবকের প্রতিরোধ ভেঙ্গে যায়। মানুষজন হুমড়ি খেয়ে পড়ে, নেপাল ইদিকে আয়', মাথাটা একটু সরাও না' 'ইস' ইত্যাকার ধ্বনি শোনা যেতে থাকে, কেউ কেউ এক পলক দেখে চোখ বন্ধ করে ফেলে, মানুষজন ফেলে বেরুবার জন্যে ছটফট করে–এই সবের মধ্যেও ভিড়ের চাপ বাড়তে থাকে।

জেলে পাড়ার দু'একজন একধারে দাঁড়িয়ে তাদের বীরত্ব কাহিনী বর্ণনার তোড়জোড় করছিলো, তাদেরকে থেমে যেতে হয়। সামনে এমন তাজা বীভৎসতা ফেলে কে তাদের শুকনো বর্ণনা শোনে।

ফলে মানুষ ক'জনের কিছুই করার থাকে না। ভূমিকাহীন অসহায় হয়ে তারা এদিক ওদিক তাকায়। ওদিকে মণ্ডপের ভেতর টিনের খাঁড়া হাতে একাকী দাঁড়িয়ে থাকা দেবীকে সঙের মতো মনে হয়।

ভরত কোলের বাড়ীর ভেতর ততোক্ষণে বিলাপ আর হৈ চৈয়ের মধ্যে সুরেনের মা ও তার পোয়াতি বউয়ের অজ্ঞান মাথায় জল ঢালা শুরু হয়ে গেছে।

সদর দরোজার সামনে সুরেনের অনুসন্ধানকারী দলটির একাংশ ও পাড়া প্রতিবেশীরা ভরত কোলেকে ঘিরে ধরেছে। সেই ভিড়ের ভেতর ভরত কোলের ভাঙা গলার কান্না এবং ধস্তাধস্তিরত তার মাথা, হাত, খালি গা এবং ধুতির কিছু অংশ চমকে ওঠে।

হঠাৎ দেখা যায় শিকল ছেঁড়া উন্মাদের মতো হা হা রবে ভরত কোলে দৌড়ে আসছে। তার পেছনে পেছনে আরো কিছু মানুষ।

সুরেনের লাশকে ঘিরে ভিড়, ঠেলাধাক্কা এবং হৈ চৈ–রত কয়েকশ' মানুষ ঘরে দাঁড়িয়ে যায়। জায়গাটায় হঠাৎ করে নিঃশ্বাসরুদ্ধ স্তব্ধতা নেমে আসে। মধ্যরাত্রির উন্মুক্ত আকাশতলে সেই স্তব্ধতার মধ্যে শোকোন্মত্ত পিতার 'বা বা সু রে ন রে' এই ত্রিভুবন ভাসানো সর্বভেদ্য হাহাকার, ও তার বিপুল বেগে ধেয়ে আসা–খালি গায়ের ছোটখাটো গোলগাল মানুষটিকে অবর্ণনীয় বিশালত্ব এনে দেয়।

ভরত কোলে মণ্ডপ অভিমুখে আসতে থাকে। কাছাকাছি এলে হ্যাজাকের আলোয় তার ধ্বসে যাওয়া অশ্রুময় মুখমণ্ডল চকচক করে।

ঝুলন্ত হ্যাজাক দুলিয়ে, বিশাল দিগম্বরী নৃমুণ্ড মালিনী কালী মূর্তির সামনে ভরত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেওয়ার মতো করে আছড়ে পড়ে: 'আমায় কেনো নিলি না মা, আমায় কেনো নিলি না।' কোষাকুষি ছিটকে পড়ে, মাটির ঘট ভেঙে জল গড়াতে থাকে, ফুল বেলপাতা পিষ্ট হয়, প্রৌঢ় ভরত দেবীর পদপ্রান্তে মাথা ঠোঁকে: 'আমি মহাপাপী আ মি ম হা পা পী–ই–ই...

ভরত কোলে মাথা দোলায়:'আমিই রক্তবীজ মা,আমিই অসুর আমিই অসুর.. ও হো হো হো হো... আমায় কেনো তার কণ্ঠস্বর ভেঙে চুরমার হয়ে যায়, 'বা রা সু রে ন–এ–এ–এ.... ও হো– হো– হো– হো' ....

মানুষ নিসর্গ, রাত্রিকাল–সমস্ত চরাচরকে ছিন্নভিন্ন করে এই লবণাক্ত চিৎকার মহাশূন্যতায় মিশে যেতে থাকে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দুই গায়কের গল্প

পিসী শখ করে নাম রেখেছিল জগন্নাথ। জগন্নাথ বারুই। জগন্নাথ সার্থক নামা। হাত পা ভাঙা নয় যদিও, মা শীতলা দয়া করে তার চোখ দু'টি নিয়েছেন বারো বছর বয়সেই। সেই থেকে জগন্নাথ চোখ হারিয়ে ঠুঁটো। চোখ গেছে, গলাটি আছে। গলার স্বরটি তার মুখশ্রাব্য নয় বটে, কিন্তু টানা এবং জোরালো।

জগন্নাথ বেঁটেও নয়, লম্বাও নয়। মধ্যম। রোগাও নয়, মোটাও নয়। মধ্যম।

ভাঙা-চোরা হারমোনিয়ামটি কাঁধে ঝুলিয়ে দোহার হরিদাসের সঙ্গে টেনে টেনে, স্টেশনের প্লাটফরমে, বাজারে কিংবা রাস্তার মোড়ে গান করে। তার গানের বিষয় বড়ো বিষন্ন, অসহায়, আকুল এবং উদাস, কিন্তু গাইবার সময় তার কণ্ঠস্বরের সঙ্গে মুখের হাঁ এবং বসন্তে খাওয়া মুখমণ্ডলের সম্মিলিত অভিব্যক্তিটি বীভৎস। অন্ধ শ্বেতকায় অক্ষিগোলক দু'টির ঘনঘন আলোড়ন সেই বীভৎসতাকে সহায়তা কললেও আলাদাভাবে চোখ দু'টিকে তখন মনে হয় ডুবন্ত দু'টি মানুষ জটিল লতা-গুল্মের দামের ভেতর থেকে হাঁস ফাঁস করতে করতে প্রাণপণ মাথা তুলতে চাইছে। সেদিকে তাকালে চক্ষুষ্মাণ ব্যক্তির নিজেরই দম আটকে আসে। ফলে বীভৎসতার মধ্যে কোথাও অসহায়তা থেকেই যায়। ছিটের জলজলে একটি হাফ শার্ট, খাটো করে পরা ধুতি এবং দু'পায়ে প্রচুর ধুলো নিয়ে হরিদাসের সঙ্গে মন্টুর চার দোকানে উঠে বলে, 'চা দে মন্টু।'

হরিদাসকে কেউ কোন দিন জামা গায়ে দিতে দেখেনি; কালো, গলা লম্বা, ল্যাকপেকে হরিদাস শীত লাগলে ধুতির একটি খুঁট গায়ে জড়িয়ে নেয় মাত্র।

হরিদাস সুস্থ মানুষ, কোন না কোন কাজ করে খেতে পায়, অথচ কেনো যে সে রগচটা জগার সঙ্গে ঘোরে তার কারণ বার করা মুস্কিল জগা সারাদিনই শালা বাঞ্চোত করছে। অতি তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে জগা যে ভঙ্গি এবং ভাষায় চেঁচামেচি করে তাতে যে কোনো লোকের মনে হবে হরিদাসের মতো এমন শত্রু জগন্নাতের জগত-সংসারে আর দু'টি নেই, আবার খানিক্ষণ পরে যখন দু'জন পালা করে গাঁজার কল্কিতে দম দেয়, কি বসে বসে গল্প করে তখন কে বলবে একটু আগে জগা হরিদাসকে লাথি মেরেছে। এই সব মুহূর্তে হরিদাস যদি বলে,'তুই যে আমার সঙ্গে এমন করিস, আমি কি তোর মাগ?'

জগা ভাবলেশহীন ভাবে বলে, 'মাগ হলে কি তুই আমার সঙ্গে থাকতিস?' এ কথায় হরিদাস কোন জবাব দিতে পারে না। অন্ধ জগার মুখের দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে থাকে তার কোন বর্ণনা হয় না।

জগা কি বোঝে কে জানে সে হঠাৎ হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে গান ধরে: 'রাধা নামে সাধা বাঁশি রাধা বিনে নাম জানে না।' হরিদাস হাসে, নতুন হাঁড়িটির মুখ পেটের ওপর রেখে দু'হাতের আঙুলে ভারী সুরেলা বোল তোলে,থেকে থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

পেটের ওপর হাঁড়িটিকে একবার এদিক একবার ওদিক অল্প অল্প ওঠা–নামা করিয়ে গুব গুব গুব গুব আওয়াজ তোলে। ভিড় জমে যায়।

এখানে একটা প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে হয়: জগন্নাথ অন্ধ হলেও তার একটা বউ ছিলো। বাপ মা মরা অন্ধ ভাইপোটিকে পিসী বহু চেষ্টায় বিয়ে দিয়েছিলো, বউ মাস ছয়েক ঘর করে পালিয়েছে তার গ্রামের এক ছেলের সঙ্গে। সে এক কেলেঙ্কারী।

এ জন্যে যে জগা খুব মরমে মরে আছে এমন নয়। আর বদমেজাজী সে ছেলেবেলা থেকেই। অতএব স্ত্রী সংক্রান্ত কেলেঙ্কারীর জন্যে তার মেজাজ বিগড়ে গেছে এ কথা বলা যাবে না। তবু মাঝে মাঝে কথা প্রসঙ্গে হঠাৎ হঠাৎ এমন কথা বেরিয়ে আসে।

হরিদাসের মা আছে, বউ আছে। বউকে হরিদাস খুব ভালোও বাসেনা, অপছন্দও করে না। তাছাড়া হরিদাসদের মতো মানুষের ভালোবাসায় কোনো সৌখিনতা নেই বলে তা চট করে বোঝাও যায় না।

হরিদাসের বউয়ের মেজাজ মর্জির ঠিক ঠিকানা নেই। মেজাজ ভালো তো সারাদিন সংসারের কাজ বড়ো নিখুঁতভাবে ক'রে যায়, শাশুড়ীকে কুটোটি নাড়তে দেয় না, ছেলে মেয়েদের তেল–কাজলে পরিপাটি করে রাখে।

আবার মেজাজ যদি বিগড়োলো তো সংসার থাকলো কি গেলো, পা লম্বা করে বসলো কাঁথা সেলাই করতে।

শাশুড়ী বারকয়েক ডেকে কোন সাড়া না পেয়ে গজগজ করতে করতে নিজেই যায় রান্না ঘরে। আর ছেলে মেয়ে তিনটেও সেদিন কি বোঝে কে জানে, যেনো বুড়ীকে জ্বালাবার জন্যেই যতো উৎপাত শুরু করে।

মালতী ফিরেও দেখে না, গুণ গুণ করে গান গাইতে গাইতে কাঁথা সেলাই করে যায়।

ক্ষান্তমণির হয়েছে জ্বালা, ছেলে দিনরাত কানাটার সঙ্গে গান গেয়ে ভিক্ষে করে ফেরে, কিছু দেখেও না শোনেও না। ভাত খেতে খেতে মা'র কথা শোনে মাথা হেঁট করে, শোনে কিনা ভগোমান জানে, ভালো মন্দ কোন জবাব দেয় না।

হরিদাস চলে গেলে বেলা দু'টো আড়াইটার দিকে মালতী উঠে হাঁক দেয়, 'কি গো ভাল মানুষের ঝি, রান্না–বাড়া হলো? নিজের ছেলেকে তো খেইয়ে দেইয়ে এক কাহন করে শোনালে, পরের মেয়েটা যে এতোক্ষণ না খেয়ে রয়েচে তার কতা মনে কি আচে?'

ক্ষান্তমণির তখন কান্না পাওয়ার দশা। বেচারীর এমনিতেই সারাদিন ধকল গেছে, অভিমান কষ্টের কথা ছেলেকে বলেও কোন মুখ পায়নি। তার ওপর যদি ছেলের বউয়ের এমন কথার ছিরি হয়, তাহলে কেমন লাগে।

কিন্তু বউয়ের কথায় শাশুড়ী কোন জবাব দেয় না, কি বলবে, উত্তর দিতে গেলেই মালতী তুলকালাম করতে শুরু করবে, ক্ষান্তমণি বউকে বড় ভয় করে।

পাড়া প্রতিবেশীর কাছে বলে, 'পাগোল, পাগোল।' এ কথায় ক্ষান্তমণির চোখে মুখে স্নেহ উপচে পড়ে, কিন্তু অন্তর জ্বলতে থাকে। না বলে উপায় কি, ক্ষান্তমণির মানসম্মানবোধ বড়ো প্রখর।

ইচ্ছা করলে রঘুনাথপুরে মেয়ের বাড়ীতে যেতে পারে। জামাইয়ের ধানচালের কারবার। দু' ছমাস কাটিয়ে এলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু অন্তরে বড় বাধে। ছেলের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
সংসারে অশান্তি বলে মেয়ের বাড়ীতে গিয়ে থাকায় কেমন অসহায় কাঙালেপনা আছে। ক্ষান্তমণির লজ্জা লাগে।
অথচ ছেলেটা হয়েছে উল্টো ধাঁচের। ক্ষান্তমণির জ্বালা কি কম।
জামাই কতোবার বললো, 'আমার সঙ্গে লেগে পড়ো, আলাদা করে ব্যবসা করতে চাও, তাই করো, পুঁজির টাকা দিচ্ছি। এমন করে কাটালে আমাদের মাতা হেঁট হয়।'
কিন্তু কে শোনে কার কথা।
অতএব সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে ছেলের ওপর। নিজে বুঝিয়ে না পেরে একে ওকে বোঝাতে বলে, হাত ধরে অনুরোধ করে। মাঝে মাঝে জগন্নাথকে অভিশাপ দেয়, 'হেই ভগোমান, কানা য্যানো আজ রাতেই ওলা উটো হয়ে মরে।'
কিন্তু পর দিন সকাল বেলাই জগন্নাথ বাড়ীর সামনে এসে হাঁক দেয়, 'কইরে হরি'।
হরিদাস হাঁড়িটি বগলদাবা করে বেরিয়ে যায়। ক্ষান্তমণির চোখ ফেটে জল আসে।
জগন্নাথ হরিদাসের কোন ঠিক নেই। কোনো কোনো দিন বি,এন, আর লাইনে রামরাজাতলা, সাঁতরাগাছি, মৌড়িগ্রাম, আন্দুল, সাঁখরাইল, আবাদা চলে যায়। কোনোদিন ব্যাণ্ডেল লাইনে কখনও কড লাইনে সিঙ্গুর কি বর্ধমান পর্যন্ত।
জগার ব্যবসায়িক বুদ্ধি বড় টনটনে; এক কম্পার্টমেন্টে দু'টোর বেশী গান গায় না। জগা হরিদাসের গানের স্টক মোটামুটি কম নয়, কীর্ত্তন, রামপ্রসাদী, বাউল, লোকগীতি, অন্যান্য গান মিলিয়ে গোটা বিশেক গান তাদের কণ্ঠস্থ।
এর মধ্যে জগার কতোগুলো হিট গান আছে। এসব গান সে জায়গা বুঝে ছাড়ে। এ ব্যাপারে হরিদাস আছে। ট্রেনে, লোকালয়ে ঘুরে ঘুরে মনুষ্য চরিত্র সম্বন্ধে ঝানু হয়ে গেছে হরিদাস, কামরায় উঠলেই বলে দিতে পারে কোন গান দিতে হবে এখানে।
শ্রোতাদের ভেতর যদি চ্যাঙড়া-ফচকে বেশী থাকে, ট্রেনের কামরায় যদি কম বয়সী মেয়ে থাকে, হরিদাস জগার কানে কানে বলে: 'ঝিল্লি' অর্থাৎ মেয়ে আছে।
জগা গান ধরে: 'আয় সখী জড়িয়ে ধরি, তোকে নিয়ে রাত কাটাই।'
পদটি জগা একবার গেয়ে ছেড়ে দিলে হরিদাস ধরে, হরিদাস ছাড়লে আবার জগা। ছেলে ছোকরাদের ভেতর থেকে মন্তব্য আসে: 'মরে যাবো মাইরী।'
মেয়েরা চোখে মুখে পুরু ক'রে উদাসীনতার প্রলেপ মাখিয়ে নিতে থাকে। ট্রেন দুলতে দুলতে ছোটে।
'আমি কালার জ্বালায় হই উতালা
একলা কেঁদে মরি ভাই।'
দ্বিতীয় পদটি শেষ হলে জগা আবার প্রথম পদে ফিরে আসে: 'আয় সখী জড়িয়ে ধরি, তোকে নিয়ে রাত কাটাই।'
কামতাড়িত কৃষ্ণহীন রাধিকার এই বাসনাটি জগা হরিদাসের কণ্ঠে কণ্ঠে ঘুরতেই থাকে।
রোজগারপাতি মন্দ হয় না দু'জনের। কোনো কোনো দিন তারা ট্রেন থেকে নেমে লোকালয়ের দিকে চলে যায়। হাঁটতে হাঁটতে চারিদিকে তাকিয়ে হরিদাস বলে, 'এই গান গেয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ানোর মতন সুখ আর কিছুতেই নেই।' জগা তার কথার জবাব দেয় না, জেবের ভেতরে হাত চালিয়ে টাকা পয়সার হিসাব করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
করতে চলে।
জগার কাছ থেকে কোনো উত্তর না পেয়ে হরিদাস গুণ গুণ করে: 'আমি মথুরা নগরে প্রতি ঘরে ঘরে যাইবো যোগিনী বেশে।' গান থামিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে 'রতের আর ক'দিন বাকী র‍্যা?'
জগার কাঁধে ঝোলানো হারমোনিয়াম ভার হয়ে বসছে। দু'দিকের আঙটায় বেল্টের মতো করে বাঁধা গামটা ঝাঁকিয়ে একহাত দিয়ে তুলে স্থান পরিবর্তন করতে করতে বলে, 'ই লক্ষীবারের পরের লক্ষীবারে।'
হরিদাস আকাশের দিকে তাকায়। 'দিন কাল বড্ডো পেল্টে যাচ্চে মাইরী। আষাঢ় মাস, ক'দিন বাদেই রত, এমন দিন জল ঝড়ে বেরুনো দায়, আর আগাশ দ্যাক, য্যানো চোত মাস।'
অন্ধ জগাতে আকাশ দেখতে বলা যে কতো বড়ো পরিহাসের ব্যাপার একথা মনেও থাকে না হরিদাসের। আর হরিদাস তা ভেবেও বলেনি।
জগা বলে, 'সবই তো পাল্টাচ্ছে আর ভগোবান শালা পাল্টাবেনে।'
–'দেশে গরীব থাকবেনে বলে?'
–'ক্যানো, কুন স্বর্গে যাবে?'
এর উত্তর হরিদাসের জানা নেই। তার বিদ্যে ক্লাশ থ্রি পর্যন্ত। চলতে ফিরতে পোষ্টার কিংবা দেওয়ালের গায়ে বড়ো বড়ো হরফে আলকাতরার লেখাগুলো হোঁচট খেয়ে খেয়ে বানান করে পড়ে, দোকান–বাজারে মানুষের মুখে শুনে শুনে তার মতো করে সে একটা ধারণা গড়ে নিয়েছে, কিন্তু সে ধারণা এমন নয় যে, অন্যকে বিশ্লেষণ করে বোঝাতে পারে। তাছাড়া রাজনীতির ব্যাপারে জগা কেনো জানি বড়ো চটা।
হরিদাসের রাগও হয় না, উল্লাসেরও কোন কারণ দেখে না। দেওয়ালের লেখা পড়ে বা মানুষের মুখে শোনা কথা নিয়ে সে মাথার ভেতর অত্যন্ত স্বল্পক্ষণ নাড়াচাড়া ক'রে শেষ: 'ধুস, ইসব হলো ভদদোল্লোকের ব্যাপার, আমার বাপের কি আর জগার বাপেরই কি।'
নিজেকে জগা থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে হরিদাস কোনো কিছু ভাবতে পারে না।
তাছাড়া চার পাশে যে সব ঘটনা ঘটছে, দেওয়ালের গোটা গোটা হরফে যে সব কথা লেখা হচ্ছে তাতে মাথা গুলিয়ে যায়।
গেলো বছর লালবেহারী ডাক্তারের ভাই আর ভরত কোলের ছেলের ব্যাপারটা ভাবলে এখনও বুক কেঁপে ওঠে। কিছুদিন আগেও স্টেশন থেকে শুরু করে সারা বেগমপুর কারফিউ দিয়ে যে ধর পাকড়টা গেলো।
জগা এসব ব্যাপারকে যতোই পাত্তা না দিক, ঘটনাগুলো তো ঘটছে। চোখওলা মানুষ হরিদাস, এ সবের ভেতরকার জটিলতা বুঝুক আর নাই বুঝুক একেবারে না ভেবেও পারে না। ভাবনা আর কি, রাস্তা ঘাটে চলা ফেরা করে, সঙ্গে কানা মানুষ, রাত বিরেতে কোথায় কোন ঝামেলার মধ্যে পড়ে।
গোঁয়ারটাকে এসব বোঝানোও যাবে না, হরিদাসকে একাই চোখ কান খাড়া রাখতে হয়।
হরিদাস দেখে জগার জুলফি থেকে গাল বেয়ে কেঁচোর মতো ঘাম নামছে। এবড়ো–খেবড়ো তামাটে মুখ তেলতেলে লালচে হয়ে গেছে। নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছে। হারমোনিয়ামের ভার থামছে আছে কাঁধের ওপর। হরিদাস বোঝে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

জগা রেগে উঠছে ভেতরে ভেতরে। পাটি-ফোটির কথা বললে জগা খেঁকিয়ে উঠবে এখন। সে জগার কাঁধ থেকে হারমোনিয়ামটা নিজের কাঁধে ঝুলিয়ে নেবার জন্যে হাত দিলে জগা বলে, 'থাক, ঠিক আছে।'

যেদিন সকালবেলা ট্রেন ধরে দুপুরের খাবারটা সেদিন তারা বাইরেই খায়। হাটবারের দিনগুলোতে দূরে যায় না। সকালের দিকে আশপাশ ঘুরে, দুপুরে বাড়ীতে স্নান খাওয়া দাওয়া করে মণিরামপুর কি খরসরাইয়ের হাট তলায় গিয়ে:

'আমার শ্যাম শুক পাখী গো
ধইরা দে ধইরা দে।
ও সে শিকলি কেটে উইড়া গেলো
আমায় দিয়া ফাঁকি
ধইরা দে ধইরা দে।'

শুরু করে দেয়।

জগার একটা বড়ো বদ অভ্যেস আছে। জগা বলে, লীলা। দশ বারো দিন অন্তর সে একবার লীলা করার জন্যে কখনো শ্যাওড়াফলি, শ্রীরামপুর কি চুঁচূড়া, কখনো জনাই কখনো আন্দুল, যখন যেদিক পড়ে, ট্রেন থেকে নামে। 'কেষ্টার ষোলোশো গোপিনী ছ্যালো, তার ব্যাটা শাম্ব'র আরো কয়েক গুণ, আমার তো শালা অন্তত ষোলোটা থাকা উচিত।' এই হলো জগার যুক্তি।

ব্যাপারটা হরিদাসের ভালো লাগেনা, কিন্তু বলতেও পারে না। কানা মানুষ, বউ নেই, জোয়ান বয়েস। হরিদাস বাইরে বসে থাকে, জগা লীলা করতে ঘরে ঢোকে। জগার পিসী হরিদাসকে খুব ভালোবাসে। হরিদাস জগার বাড়ীতে গেলেই পিসী বলে, 'এইচিস মোর বাপ, বোস।' দু'টো নাড়ু কি কাঁসার বাটিতে মুড়ি, তার সঙ্গে গোটা চারেক বাতাসা, কোনো দিন কচি শশার দুটো টুকরো দেবেই বুড়ি। জগার আবার বিয়ে দেবার পিসীর বড় ইচ্ছা। হরিদাসকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলে, 'খোঁজ খবর কিছু কত্তে পাল্লি?' কথা শুরু করার আগেই পিসীর চোখে জল এসে যায়, গলার স্বর জড়িয়ে আসে, 'আমি বাদে কানা ছেলেটার যে কি হবে, সেই চিন্তায়ই মরি।'

হরিদাসের গায়ে মাথায় হাত বুলোয়, 'বেঁচে থাকো মোর বাপ, কানা মানুষটাকে এগলে রেকিচিস , কি বলে যে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করবো।'

বুড়ী কতো কি যে বলতে থাকে। কিন্তু মেয়ে কোত্থেকে জোগাড় করবে হরিদাস? জগা শুনলে খেয়ে ফেলবে তাকে। তা সত্ত্বেও হরিদাস বোঝে এভাবে চলতে পারে না জগার, সত্যিই তো পিসী মরলে জগার কি দশা হবে।

নিজের যে একটা বউ আছে হরিদাসের অনেক সময় তা মনেও থাকে না। রাতের বেলা ছাড়া হরিদাস বাড়িতে বড় একটা থাকে না। বউয়ের সঙ্গে কথাবার্তাও খুব কমই হয়। মাঝে মাঝে শরীরের টানে শরীর মেশে, তারপর হরিদাস এক পাশে পড়ে ভোঁস ভোঁস ক'রে ঘুমোয়।

কখনো কখনো আটগাছা চুড়ি, কি একটা গন্ধ তেল এনে দেয়, তা মালতীর অনেক দিন ধরে বারবার করে বলার পর।

তবুও তো তারা স্বামী স্ত্রী।

গান আজ একদম জমছে না। জগন্নাথ হরিদাস দুজনের কেউই জমাতে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
পারছেনা।
আর জগা গানও বেচেছে একখানা: কি পড়ে না তোমার, মহাজনের আছে যে ঋণ। ভোলা মন ফাঁকি দিয়ে থাকবি কতো দিন।'
ব্যাপারটা বোধহয় তা-ও নয়, সকাল থেকেই জগা আজ বড় গম্ভীর, হরিদাস জিজ্ঞেস করি করি করেও করেনি, কি জানি বুনোটা আবার ক্ষেপে যায় নাকি।
জগা শুধু বলেছিলো 'দুপুরে আসিস।' আর কোন কথা হয়নি। হরিদাস মুখ দেখেই টের পেয়েছিলো আর কোন কথা হবে না এখন, কাজেই পিসীর সঙ্গে সারা সকালটা বকর বকর করে কাটিয়ে বাড়ী ফিরে ছিলো। আসার সময়েও দেখেছিলো জগা শুয়ে আছে। পিসীকে জিজ্ঞেস করেও কোনো কারণ বার করতে পারেনি। পিসী শুধু বলেছিলো, 'কি জানি বাবা, ওর মতিগতি বোজবার সাদ্যি আমার নেই, জিগেস কত্তে যেয়ে কি মুকঝাড়ি খাবো?'
স্নান খাওয়া-দাওয়া করে গিয়ে দেখেছিলো, জগা তৈরী হয়ে আছে, কিন্তু মুখ তেমনি থমথমে। হরিদাস কি মনে ক'রে হারমোনিয়ামটা নিজের কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে হাঁড়িটা বগলদাবা করে জগন্নাথের হাত ধরে বেরিয়েছিলো। বাকী রাস্তা দু'জনের ভেতর একটিও কথা হয়নি।
কামরা বদল করার জন্যে গোবরায় নেমেই হরিদাস দেখলো বর কনে নিয়ে একটা দল মহাব্যস্ততার সঙ্গে হাঁকডাক ক'রে দু'কামরা আগে উঠেছে। খুব একটা শাঁসালো পার্টি নয়-ও হরিদাস এক নজরেই বুঝে ফেলে-তবু বর যাত্রী তো।
জগাকে খবরটা কানে দিয়েই হরিদাস প্রায় টেনেই নিয়ে চলে।
এসব সুযোগ বড় একটা মেলে না, ছেলে ছোকরারা আজকাল বড় হুঁশিয়ার, রাস্তা-ঘাটে যতোই ফষ্টিনষ্টি করুক, টোপর দেওয়ার ব্যাপারে মাথা পাততে চায় না।
লোকজন মহা ফুর্তিতে আছে। কামরায় উঠলে দু'জনকে রীতিমতো অভ্যর্থনা করে বসায়।
সবাই অল্প বয়সী। বয়স্করা গেছে পাশের কামরায়। তারুণ্যে তাই মনের ভেতর তিন লাফ দিচ্ছে।
সমস্ত কামরা ঠাসা, কিন্তু তার মধ্যেও জগা হরিদাসের জায়গা হয়ে যায়।
মেঝের ওপর বসে লম্বা ঘোমটার ভেতরে শ্যামলা ছেলেমানুষ মুখটা হরিদাস ঠিকই দেখে নেয়। তার পাশে ঘিয়ে রঙের সিল্কের পাঞ্জাবী পরা লম্বা গলার গাল মুখ ভাঙা হাড়গিলে বরটিকে একটুও মানায় না।
হরিদাস জগার দিকে তাকায়। জগন্নাথের মুখ ভাবলেশহীন। সেদিকে চেয়ে হরি দমে যায়। জগন্নাথ বড় আনমনে এলোমেলো হারমোনিয়াম বাজাচ্ছে।
হরিদাস জানে জগাকে এখন কিছু বলা যাবে না। তা ছাড়া বলবেটা কি, জগা তো জানেই। হরিদাস জগন্নাথের দিকে তাকিয়ে হাঁড়ির পেটে হাত বুলোয়।
-'অতো বড়ো ঘোমটায় কান ঢাকা থাকলে গান শুনবে কি কোরে?'
-'ঠিক বলচো হারুদা।'
-'নাকের সামনে ধুলো নে দ্যাক, নিশেষ পড়চে, নাকি দম আটকেই বসে আচে।'
হো হো হাসির ভেতর ঘোমটা ঢাকা নীচু মাথা আরো নীচু হয়ে যায়।
-'লাও ভাই, জম্পেশ ক'রে একখানা ধরো দিকিন।' মোটাসোটা হারুদা নিজেই জম্পেশ করে বসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

'সখী গো আমি কেমনে বাঁধিব হিয়া/আমারই বঁধুয়া আন বাড়ী যায় আমারই আঙিনা দিয়া।'

হরিদাস চমকে ওঠে। জগার দিকে তাকিয়ে তার দম আটকে আসে। এ কি গান ধরেছে জগা। আর কেউ না বুঝুক হরিদাস তো বোঝে জগন্নাথের মনের ভেতর এখন কী ছেঁড়াখোঁড়া চলছে।

হরিদাস অন্যদিকে মাথা খুব নীচু করে হাঁড়ি বাজায়। ট্রেন চলতে থাকে। গান চলতে থাকে। কামরা ভর্তি এতো লোক, তার মধ্যে কথা থেমে থাকে না, গান শুনতে শুনতে কথা বলে, কথা বলতে বলতে এক সময় গানশেষ হয়।

'বড়ো খারাপ কতা। এতো মানহানির মামলা হে!'

সবাই আবার একচোট হাসে। জগন্নাথ নির্বিকার। ট্রেন ডানকুনি এসে থামে। স্টেশনের হৈ চৈ, যাত্রীদের এ কামরা ও কামরায় দৌড়া–দৌড়ির আওয়াজ আসে। হরিদাস জগন্নাথের কানে কানে জিজ্ঞেস করে, খারাপ লাগচে?'

জগন্নাথ মাথা নাড়ে।

–'চা খাও।' জগন্নাথ হরিদাসের দিকে দু'টি ভাঁড় এগিয়ে দেয় একজন।

হুইসিল বাজে, ট্রেন চলতে শুরু করে। চা খেতে খেতে একজন বলে 'এইবার একটা জমাটি গান ধরো।'

–'হ্যাঁ, হ্যাঁ, গাড়ীকে শালা বিন্দাবন বানিয়ে দাও।' বরের প্রতি ইঙ্গিত করে হারুদা বলে, 'তাহলে বিপিনের বড়ো বিপদ। এক আয়ান ঘোষ, এতো কেষ্টোকে সামাল দেওয়া'

আবার কামরা শুদ্ধ হো হো হাসি।

আকাশের মেঘ জমেছে। বাড়ী থেকে বেরুবার সময় রোদের যেমন তেজ ছিলো, এখন আর তা নেই। হরিদাস জগন্নাথের হাত ধরে ওভার ব্রীজে উঠতে থাকে। 'মোর হাত দুটি ধরে নিয়ে চলো সখা আমি যে পথ চিনি না'–হরিদাসের ভেতর এখনো রেশ চলছে, 'তোমার উপর করিনু নির্ভর আর কারো ধার ধারি না।'

কিন্তু সঙ্গের মানুষ যদি এমন চুপচাপ হয়ে থাকে তো কাঁহাতক পারা যায়। হরিদাস বারদুয়েক জগার মুখের দিকে তাকিয়ে 'যা থাকে কপালে' মনে করে জিজ্ঞেস করে বসে, 'আচ্ছা কি হয়েচে তোর বলতো আজ?'

জগন্নাথ এ কথার কোন জবাব না দিয়ে হরিদাসকে আচমকা প্রশ্ন করে, 'তুই তোর বউকে কি রকম ভালোবাসিস?'

হরিদাসের ভির্মি খাওয়ার জোগাড়। কোনো রকমে ঢোক গিলে বলে, 'ক্যানো বল্‌তো?'

–'না, এমনি।' জগার গলার আওয়াজ বড় নরম এবং অন্যমনস্ক।

তারা নামতে থাকে। হরিদাস সাবধানে ধীরে ধীরে জগন্নাথকে সিঁড়ি দিয়ে নামাতে থাকে। হরিদাসের কেনো জানি মনে হলো, এখন বলা যায়। হাঁটতে হাঁটতে হরিদাস, বাবা যেমন করে দস্যি ছেলেকে বুঝিয়ে বলে তেমন করে জগন্নাথকে বলে, 'তুই যাই বলিস, একটা বে করা একান্ত দরকার তোর।' বলে একটু সতর্ক হয়, কি জানি, ক্ষেপে গিয়ে জগা এই রাস্তার ওপরই চড় মেরে বসে কি না।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, চড় মারা তো দূরের কথা, জগার মুখের কোথাও রাগের চিহ্নপর্যন্ত নেই। মাথা নীচু করে খুব গভীর ভাবে মানুষ যেমন কোনো বিষয় নিয়ে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ভাবে, তেমনি করে জগন্নাথ হাঁটতে থাকে হরিদাসের হাতে হাত রেখে।
বেরুবার পর থেকে হরিদাস দ্বিধায় পড়েছে, বলবে কি বলবে না। তার বুক ঠক্ ঠক্ করছে এখনো। জগন্নাথ নীরব। হরিদাস জগন্নাথের মুখের দিকে তাকায়। সন্ধার মুখে বৃষ্টি হয়ে গেছে এক পশলা। আকাশে মেঘও নেই জ্যোৎস্নাও নেই। জগার মুখ ভালো করে দেখা যায় না।
জনাই পতিতালয় থেকে তারা বেশ খানিক দূরে চলে এসেছে। হরিদাসের একবার মনে হয়, বলি; জগন্নাথের নীরব নিশ্চিন্ততা দেখে আবার দমে যায়। আহ্, কানা হওয়া যে কতো বড়ো শান্তির!
জগার হাত ধরে হরিদাস অন্ধকারের ভেতর দিয়ে খোয়া-ওঠা রাস্তার খানা-খন্দ বাঁচিয়ে হাঁটতে থাকে।
মোড়ের কাছে উঁচু বাঁশঝাড় নুয়ে আছে। জায়গাটাতে অন্ধকার। পেছন থেকে একটা পুলিশের জিপ এগিয়ে গেলো তাদের পাশ দিয়ে। বেশী দূর যেতে পারলো না, অন্ধকারের ভেতর কোথা থেকে দুম করে আওয়াজ হলো। তারপর আরো কয়েকটা, জিপের টায়ার ফাটলো প্রচণ্ড শব্দে। হরিদাস জগাকে প্রায় হিঁচড়ে রাস্তার পাশে ডোবার ধারে নিমগাছের আড়ালে নিয়ে এলো কোনমতে। ততক্ষণে শুরু হয়ে গেছে।
জগন্নাথ হরিদাসের হাত ঝাকুনি দেয়: 'কি হলো?'
-'চুপ, পুলিশের সঙ্গে নকশাল পার্টির ফাইট হচ্ছে।'
পুলিশ ততক্ষণে ওধারে রাস্তার ঢালুর নীচে পজিশন নিয়েছে জীপ আড়াল করে। জীপে আগুন ধরে গেছে।
সামনে থেকে যেভাবে পুলিশের রাইফেলের গুলী ছুটে আসছে, নিমগাছের আড়াল খুব একটা সুবিধের নয়। হরিদাস জগাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি ডোবার ধারে নমে যাবার জন্যে এগুতেই লুটিয়ে পড়লো। অন্ধ জগার হাত হরিদাসের হাতের মুঠোয়, হারমোনিয়াম নিয়ে জগন্নাথও হরিদাসের ওপর গিয়ে পড়ে। জগন্নাথ হরিদাসের গোঙানীর শব্দ পেলো।
-'কি হলো হরি চোট লাগলো?' জগন্নাথ হরিদাসের গায়ে হাত বুলোয়, তার হাত চট চট করে। জগন্নাথ হতভম্ব হয়ে যায়। হরিদাসকে ধরে ঝাঁকুনি দেয়, 'হরি, হরি।' তার গলার স্বর ভাঙা ভাঙা।
হরিদাস গুলী এবং বোমের শব্দের মধ্যে খুব দূর থেকে যেনো, হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, 'জগা তুই আর জনাই বেশ্যাবাড়ী আসিস নি।' জগন্নাথ হরিদাসের কথার কোনো জবাব দেয় না, অসহিষ্ণুভাবে খালি কাঁধ ঝাঁকুনি দেয়, 'হরি, হরি।'
তার মুখ দেখা যায় না, কণ্ঠের কান্না মেশানো বিকৃত 'হরি হরি' ডাক শুনতে শুনতে হরিদাস হাঁপায়, 'ওখানে' হরিদাস আবার হাঁপায়, ওখানে তোর,.... তোর বউকে দেকনু আজ।'
হরিদাস নিস্পন্দ হয়ে যায়। জগন্নাথ ভাঙা মূর্তির মতো বসে থাকে।
গুলী আর বোমের আওয়াজ এখনও চলছে। হঠাৎ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে উঠে দাঁড়ায় সে: 'শালা শুয়ারের বাচ্চারা, দাঁড়া,'-জগন্নাথ হাঁচড়ে-পাঁচড়ে ডোবার গা বেয়ে উঠতে থাকে। তার চোখে জল। গলার স্বরে কান্না। তবু কোথা যেনো দাউ দাউ করতে থাকে জগন্নাথের। জগন্নাথ প্রচণ্ড চিৎকারে গলা ফাটিয়ে দেয়, 'ওই কুত্তার বাচ্চারা, ওই শোরের বাচ্চারা'-চিরকালের গোঁয়ার-গোবিন্দ কান' জগন্নাথ

দুনিয়ার পাঠক এক হও

ডোবার ধারে উঠে দাঁড়ায়। জিপের আগুন প্রবল বেগে জ্বলছে। অন্ধ জগা এতদূর থেকেও গরম আঁচ পায়।

খাটো করে ধুতিপরা, হাফহাতা শার্ট, মধ্যম মাপের টান টান করে দাঁড়ানো মানুষটাকে এখন মনে হচ্ছে সমস্ত দুনিয়াটাকে গুঁড়িয়ে দেবার জন্যে হারমোনিয়ামটা হ্যামারের মতো করে দুহাতে উঁচিয়ে ধরেছে।

রাগে জগন্নাথ থর থর করে কাঁপে। যেনো এখখুনি ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। তার চোখের জল দ্রুত শুকিয়ে যেতে থাকে। গোলাগুলীর মধ্যে সে ক্ষ্যাপা মোষের মতো জ্বলন্ত জিপের দিকে হারমোনিয়াম উঁচিয়ে লাফ মেরে তেড়ে যায়: 'আয় শালারা, আয়' ...

এই অন্ধকার ফাটানো চিৎকার নিয়েই সে মাটি থেকে ওপরে উঠে যায়। দু'হাতে উত্তোলিত হারমোনিয়াম ছুটে যায় সামনে। জগন্নাথের শরীর শূন্যে একটি মোচড় খায়। ধনুকের মতো ব্যাঁকে; তারপর; যেনো ধনুক থেকে তীর ছুটে গেলো, জগন্নাথ সমস্ত শরীর দিয়ে পৃথিবীকে বিদ্ধ করে।

নিয়ামত আলীর জাগরণ

হাড়ি পাড়া থেকে তাড়ি টেনে ফিরছিলো।

ঘডুইয়ের দোকানের সামনে এসে তার ইচ্ছা হলো, এখন সে গান গাইবে। হঠাৎ তার এমন ইচ্ছা কেনো হলো বলা মুশকিল, কিন্তু টলমল করে হাঁটতে হাঁটতে দোকানের সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, আরক্ত চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে হঠাৎ অত্যন্ত বাজে গলায়: 'প্রাণ কোকিলারে আমায় এত রাতে ক্যানে ডাক দিলি' গেয়ে উঠলে খদ্দের, দোকানদার সবাই তার দিকে তাকায় দোকানের ভেতর থেকে গামছায় বাঁধা সদা-পাতি নিয়ে বেরুতে-বেরুতে তিনু মণ্ডল পরিহাস তরল গলায় বলে, 'কি বাবা নিয়ামত আলী, ক' গেলাশ চড়িয়েচো মোর বাপ?'

তিনু, মণ্ডলের কথার কোনো জবাব না দিয়ে সে দোকানের ওশরায় পা ঝুলিয়ে ব'সে হাঁক দেয়: 'এ্যাকটা বিড়ি দে তো র‍্যা।'

নিবারণ ঘডুইয়ের ছেলে পরিমল কোনো জবাব না দিয়ে ভাবলেশহীন মুখে ডাল মাপতে থাকে।

নিয়ামত জড়ানো গলায় আবার বলে 'কই রে।'

-'বিড়ি নেই।'

-'নেই? মিচে কতা বলবার আর জ্যায়গা পাসনি? ক্যানো এ্যাকটা বিড়ি দিলে কি তোর কারবার লাটে উঠবে, এ্যাঁ? নকশালরা যে বড়ো লোকদের ধ'রে ধ'রে গলা কাটচে ঠিকই কচ্চে শালা।'

খদ্দের, দোকানদার সবাই কাঁটা হয়ে যায়: 'মাত[illegible]তলামি করবার আর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
জ্যায়গা পেলুনি।'
তিনু ট্যাঁক থেকেবিড়ি বার করে: লে লে, একটা বিড়ি খাবি, এই তো, লে ধর!'
তিনুর হাত থেকে বিড়ি নিতে-নিতে নিয়ামত বলে: 'না মামু, ছোঁড়ার কতা শোন, নেশা করিচি বলে কি মানুষ লই, এ্যাঁ?'
তিনু তার কথার জবাব না দিয়ে নিজের জ্বলন্ত বিড়ি এগিয়ে দেয়, নিয়ামত বিড়ি ধরিয়ে শোঁ-শোঁ ক'রে গোটা কয়েক টান দিয়ে আবার শুরু করে; আমাকে তুই চিনিস?'
হঠাৎ সে উঠে দাঁড়িয়ে প'ড়ে পরিমলের দিকে ফিরে বুকের ওপর তর্জনীর টোকা দিয়ে চিৎকার ক'রে বলে, 'হামকো তুম পাচেন্‌তা, হাম বর্মা ফ্রন্ট মে লড়াই কিয়া হ্যায়। আর তুই শালা হালি মুদির বেটা মুদি...'
'আহ্ বাদ দে না উসব, ওরা সিদিনকার ছেলে, ওরা জানবে কোত্থে কে? চল্।'
তিনু তাকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে, তার মধ্যে থেকেই এলোমেলো পায়ে হাঁটতে-হাঁটতে নিয়ামত ঘাড় ফিরিয়ে হাত নেড়ে চেঁচাতে থাকে: 'হাম ভি দেক লেগা, শালা ঘড়ুই কা বাচ্চা।'
পিঠে তার একটা অপারেশনের দাগ আছে মেরুদণ্ড বরাবর। নিয়ামত বলে, জাপানীদের গুলী লেগেছিলো; মরেই যেতো, নেহাত তার বাপ-মার নেকীর জোরে বেঁচে গেছে। শিরদাঁড়ার বিঘতখানেক নাকি বাঁদরের হাড় লাগানো। হাড়টা ঠিকমতে সেট হয়নি, অমাবশ্যা-পূর্ণিমায় এখানে ব্যথা করে।
এ সব কথা অনেক পুরোনো, নিয়ামত বলতে বলতে তেল চিটচিটে ছেঁড়া ডোলি-ডোলি হয়ে যাওয়া গামছার মতো ক'রে ফেলেছে।
লোকজন আড়ালে মুখটিপে হাসে, 'ফোড়া কি কার্বাঙ্কল হয়ে ছ্যালো বোধহয়, হারামজাদা তাকে বানাচ্ছে গুলী।'
তা গুলীই লেগে থাকুক, কি কার্বাঙ্কলই হয়ে থাকুক, পিঠে বেশ বড়ো রকমের একটা স্থায়ী দাগ নিয়ে নিয়ামত আজ ২৪/২৫ বছর ধ'রে একটু কুঁজো হয়ে হাঁটে।
প্রথম-প্রথম খাকি প্যান্ট-শার্ট পরে বেশ তেল-পাট হয়ে বেরুতো মাঝে মাঝে।
-'কোতা যাচ্ছো গো?'
-'এই বাপু যাচ্ছি একটু শেরামপুরে, পেনশনের টাকাটা তুলে আনি।'
প্রশ্নকর্তা খুব যে একটা আগ্রহ নিয়ে প্রশ্ন করেছে এমন নয়, কিন্তু নিয়ামত দাঁড়িয়ে যায়, বিষয়টি আরো খানিকক্ষণ চলুক, এমন একটা ইচ্ছা নিয়ে সে কিঞ্চিৎ মিলিটারীঠাট এনে ফেলে। কিন্তু অপর পক্ষের তেমন কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। কাজেই প্রসঙ্গটা ওই পর্যন্ত এসেই শেষ হয়ে যায়।
খাকি পোশাক জোড়া এখন আর নেই। পেনশনের প্রসঙ্গও চাপা পড়ে গেছে। কিভাবে না কিভাবে যেন প্রকাশ হয়ে পড়েছিলো ওসব পেনশন-ফেনশন কিছু নয়, পেনশন তোলার নাম ক'রে নিয়ামত শেরামপুরে বেপাড়ায় যায়।
কে যেন নিজের চোখে দেখেও এসেছে। 'তাইতো বলি, কি এ্যামোন কাণ্ডানটা, জন্যে তার গরমেন্ট পেনশন দেবে, হ্যাঁ:।'
শেষে সাব্যস্ত হয় যে, নিয়ামত কোনোদিন রাইফেল ছুঁয়েও দেখেনি। 'করতো বাবুর্চির কাজ, এখোন গ্যাস ছাড়ে লড়াই ক'রে জখম হয়েছে, হুঁ:।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
অতএব বার্মার স্মৃতিচিহ্ন বলতে কালো পিঠের ওপর বড়ো সড়ো ধরনের তেঁতুলেবিছের মতো দাগটা আর একখানা ওভারকোট। ওভারকোটটি ন্যাপথলিন দিয়ে যত্নে রাখে নিয়ামত।
বউ ছেলেমেয়ে কেউ নেই তার। ঘর ভিটেটুকু বাপই ফুঁকে দিয়ে গেছে। অতএব নিয়ামত থাকে ইয়ার আলী কসাইয়ের কারখানার পাশে ছোট্ট চালা ঘরটায়। ইয়ার আলীর পোষা গোরু-ছাগল দেখা শোনা করে, মাথায় বাজরা নিয়ে ঘুরে-ঘুরে গোরুল গোস্ত বিক্রি করে পাড়ায়-পাড়ায়। শীতের সন্ধ্যায় কোটটি গায়ে দিয়ে হারিকেন হাতে তাগাদায় বেরোয়।
সেই নিয়ামত যদি এখন 'হাম বর্মা ফ্রন্ট মে লড়াই কিয়া হ্যায়' বলে আস্ফালন করে তাহলে লোক হাসবে বৈকি।
দর্জির দোকান, মনোহরীর দোকান, কাঠের গোলার মানুষগুলো হাতে কাজ থামিয়ে হাসে।
এদিক-ওদিক সামনে- পেছনে পানের বোরোজ, বাঁশঝাড়, গ্রামের দিকে যাবার মুখে টিলা পাহাড়ের মতো উঁচু জমিতে নানা রকম আগাছা আর ঘাস, ঢালুতে কলা ঝাড়-ডিষ্ট্রিক বোর্ডের রাস্তা দিয়ে দিনে রাতে বার কয়েক মাস যাওয়া-আসা করে, গোরুর গাড়ি যায়, ট্রেনের প্যাসেঞ্জার যায় পায়ে হেঁটে বা সাইকেলে। ভোরবেলা ক্ষেতের কাঁচা তরিতরকারি নিয়ে চাষীরা বাজারে যায়, কাঁধে ভার নিয়ে ছানাওয়ালারা দুপুরে ট্রেন ধরতে ছোটে, মেছুনিরা শূন্য ঢালা নিয়ে ফেরে। তার মধ্যে রাস্তার দু'পাশে এই গোটা কয়েক দোকান-পাট। ঘটনা-বিরল শাদামাটা জায়গাটায় এমন একটা রগড়, লোকগুলো ভারী মজা পায়।
নিয়ামতের মাথায় এখন গান নেই।
পেটের ভেতর গেঁজে-ওঠা তাড়ি আর ভাদ্র মাসের রোদ তাকে তেজিয়ান ক'রে তুলেছে। তাছাড়া, মাতাল মানুষ কথা বলতে শুরু করলে কথার ঝোঁকে পেয়ে বসে।
বেশ খানিকটা দূরে নিয়ে এসেছে তিনু। সাপটে ধরা তিনুর কাছ থেকে নিয়ামত তেড়ে বেরিয়ে যেতে চায় থেকে থেকে: 'আগুন জ্বেলিয়ে দেবো। বোমা মেরে উড়িয়ে দেবো শালাদের' প্রথমে তিনু মজা এবং মমতা নিয়ে ধরেছিলো। এখন বিরক্ত হ'তে থাকে। একে রোদ, সঙ্গে সদাপাতি, তার ওপর দোকানের ছেলে ছোকরারা 'লে-লে ধর-ধর' ব'লে হৈ-হৈ করছে, শিস দিচ্ছে।
কালভার্টের কাছে এসে তিনু থেমে যায়। 'ঘরে যাবি না এখানে...' তিনুর কথা শেষ হয় না, নিয়ামত ঘাড়বাঁকিয়ে রক্ত জবা চোখ দুটো ঘুরিয়ে বলে, 'না আমি দেকে লোবো শালাকে' তিনু মহাবিরক্ত হয়ে তাকে ছেড়ে দিয়ে বলে, 'তবে তুই দেকতে থাক, আমি চন্নু।'
নিয়ামত স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছে না; লিকলিকে দু'টি ঠ্যাঙের ওপর শরীরের ব্যালান্স রাখতে রাখতে তিনুর হনহনিয়ে চ'লে যাওয়া দেখে: 'উঁ-হু, শালার ব্যাটা শালার দেমাক। 'যা'-এই শব্দটি জোরের সঙ্গে ব'লে একটু থামে, তারপর চিৎকার ক'রে ওঠে, গেট আউট, গো আন, সব্বাই চলে যা,' আবার বলে, 'সব্বাই চলে যা,আমার খুশি আমি যাবুনি, কী কত্তে পারিস তুই। এঁহু, আমাকে অর্ডার দিচ্ছে, শালায্যানো কতো বড়ো অপিসার।' অসম্মতিসূচক মাথা নেড়ে টেনে টেনে বলে, 'আমি যা বু নি।'
আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

এই এখানে বস্‌নু, কুন শালার ক্ষ্যামোতা আচে দেকি আমাকে এখান থেকে ওটায়।' নিয়ামত সত্যি-সত্যি কালভার্টের এক দিকের উঁচু চাতালে বসে, 'গরমেন্টের জ্যায়গা, কারুর বাপের জ্যায়গা নয়; আমাকে আইন দেকাবি কি রে শালা,আইন কি আমি কম জানি, এ্যাঁ?' সামনের অদৃশ্য শ্রোতাদের দিকে হাত নেড়ে বলে, 'তোমরাই বলো, আইন আচে,আমাকে ওটাবার আইন আচে?'

কালভার্টের নিচে দিয়ে নালা। সরস্বতী নদী থেকে বেরিয়ে মাইল তিনেক পথ হেঁটে এই কালভার্টের ভেতর মাথা গলিয়ে ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে বাঁশ বাগান, ডাঙা জমি, মানিকতলার বিশাল অশথ ছায়ার নিচে দিয়ে এঁকে-বেঁকে জয়কেষ্টপুর হয়ে কোচোর জলায় গিয়ে পড়েছে। জায়গাটা এখানে বেশ ফাঁকা, বিকেল বেলা দু'-একজন চাতালের ওপর এসে বসে, গল্প-গুজব করে, ঘন বর্ষায় কালভার্টের নিচে প্রবল জলের তোড়ের মুখে মানুষ ঘুনি আঁটল বসিয়ে মাছ ধরে।

এবার আষাঢ়-শ্রাবণ রুখুসুখু গেছে। ভাদ্র মাসেও তাই নালায় কালচে কাদা-পানি-আছে কি- নেই অবস্থা।

তিনু অনেকটা দূরে চ'লে এসেছে। পাকা রাস্তা থেকে নামবার মুখে এতোক্ষণ পর সে পেছন ফিরে তাকায়। লম্বা সটান ফাঁকা রাস্তা; দূরে, কালভার্টের ওপর ব'সে-থাকা নিয়ামতকে এতোটুকু দেখায়, নলি-নলি ঠ্যাঙ দু'টি ঝুলিয়ে হাত-মাথা নাড়িয়ে আপন মনে কাকে যেন কি বোঝাচ্ছে নিয়ামত। তিনু একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। তার রাগও হয় না, হাসিও পায়না। গম্ভীর মুখে পাকা রাস্তা থেকে মাথা ঝুঁকিয়ে নেমে ধুলোময় পথ ধ'রে হাঁটিতে থাকে।

মাতাল নিয়ে ফূর্তির ভাবটা অনেকক্ষণ আগে উবে গেছে। নিবারণ ঘড়ুইয়ের ছেলে টাকা বানাবার অতিশয় সরল এবং জটিল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদ্ধতির মধ্যে মগ্ন। কাঠের গোলার মজুরটি হুমহাম কুড়ুল চালায়। একদিকের ভাঙা পায়ায় গোণাগুণতি সাতখানা থান ইঁট দিয়ে বসানো চৌকি, তার ওপর মাদুরে ব'সে ক্যাশবাক্সের উপর কানুইয়ের ভর রেখে খালি গায়ে হারানচন্দ্র হাতপাখার ডাঁটি দিয়ে ঘামাচি চুলকোতে-চুলকোতে বলে: 'ই শালার দেশ উচ্ছন্নে গেচে।'

কেন উচ্ছন্নে গেছে তার কারণ ব্যাখ্যার চেয়ে ঘামাচির চুলকুনি থামানো এখন অনেক জরুরি, কাজেই সে উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে মুহুমূহু পাখার ডাঁটি ঘষে-ঘষে পিট লাল ক'রে ফেলতে থাকে।

মজুর লোকটি কোনো উত্তর দেয় না। কাঠের ওপর কুড়ুলের কোপ মারতে মারতে একবার হারানচন্দ্রের অন্যমনস্ক মুখের একাংশ এবং টানটান চকচকে ভুঁড়ির দিকে তাকিয়ে আবার কুড়ুল তুলে কোপ মারে।

লোকটির ভেতর কি ভাবনা চলে কে জানে, কুড়ুলটা শূন্যে তুলে আবার হারানচন্দ্রের দিকে এক পলক তাকিয়ে তারপর স্বনিঃশ্বাস 'হুম' শব্দে কোপ মেরে মোটাসোটা ডালটা মাঝ বরাবর দু'চির ক'রে ফেলে।

দর্জির দোকানে ঝাঁ-ঝাঁ মেশিনের শব্দের মধ্যে হেমামালিনী-ধর্মেন্দ্র'র গল্পের স্রোত চলে।

ভাদ্র মাসের গুমোট দুপুরে ব'সে থাকতে থাকতে কি হয় নিয়ামত আলীর কে জানে, উঠে দাঁড়ায় সে। টাল খেতে-খেতে সিধে হয়। দূরে [illegible] দোকানপাটের দিকে তাকায়। ঘড়ুইয়ের দোকানে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে ক[illegible]বলের মুখে থুতু ছুঁড়ে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
মারতে গেলে নিয়ামত ভেতর থেকে ঝাঁকুনি খায়, মাথার ভেতর মগজহীন শূন্যতা ঝিঁঁ ঁঁ ঁঁ ঁঁ করে উঠে চোখের সামনে সবকিছু হলুদ ক'রে ফেলে, সে হলুদের মধ্যে পরিমল নেই, নোনতা, টকটক, তেতকুটে স্বাদ নিয়ে ঝাঁকুনি খেতে খেতে সে হড় হড় করে বমি করতে থাকে।
নিয়ামতের শরীর সামনের দিকে অর্ধচন্দ্রাকারে ব্যাঁকানো, কালভার্টের চাতালের ওপর বাঁহাতের ভর দিয়ে সে হাঁপায়, উত্তাপ বেরোয় তার দু'কান দিয়ে, কপালে ঘামের প্রলেপ পড়ে, বুকের ভেতর কলজে লাফায়। নিয়ামত দু'হাতে কপাল ধ'রে সামনে ঝুঁকে চোখ বন্ধ ক'রে ব'সে পড়ে চাতালের ওপর।
চোখ বন্ধ করে থুতু ফেলে, নাকের সিকনির মতো আঠালো থুতু সহজে পড়তে চায় না, সুতোর মতো ঝুলে থাকে ঠোঁটের সঙ্গে। গলা এবং বুকে চৈত্র মাসের দুপুরের খাঁ-খাঁ পিপাসা। নিয়ামত চোখ মেলে, থু-থু ক'রে থুতু ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ায়; বড় দুর্বল লাগে, তবু মাথার বোঝা নামিয়ে দিলে মানুষের যেমন হয়, নিয়ামত তেমনি অনেকটা হাল্কাবোধ করে।
সে আস্তে-আস্তে হাঁটে। হাটতে-হাটতে মল্লিকদের গেটওলা পাঁচিলঘেরা বাগানে ঢোকে, সান বাঁধানো পুকুরঘাটে নামে, চাপড়ে-চাপড়ে পানি দেয় মাথার তালুতে। পানির ঝাপ্‌টা দেয় চোখে-মুখে, কুলি করে, আঁজলা ভ'রে ভ'রে পানি খায়।
সিঁড়ি বেয়ে উঠতে-উঠতে পা ভেঙে আসে ক্লান্তিতে। ঘাটের ওপরে দু'পাশে দু'টি হেলান-দেয়া বেঞ্চের মতো পাকা চাতাল। একদিকের চাতালে বকুল গাছের বেশ বড় ছায়া পড়েছে, নিয়ামত সেখানে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে, এবং অল্পক্ষণের মধ্যে ঘুমের ভেতর চ'লে যায়।
মল্লিকদের এই বাগানটিকে লোকে বলে হাওয়াখানা। বিঘে তিনেক জমির ওপর বাগানটির চারপাশে পাঁচিলঘেরা। গেটের দু'পাশে দুটি কামরা, প্রত্যেক কামরায় রাস্তার দিকে দুটো এবং বাগানের দিকে দুটো ক'রে জানালা। ভেতরের দিকে দু'কামরাতেই দুই জানালার মাঝখানে একটি ক'রে দরোজা।
হাত তিনেক চওড়া একটি প্রবেশপথ। সেই পথ দিয়ে রাস্তা থেকেই সরাসরি বাঁধানো ঘাট চোখে পড়ে। পথটি দু'পাশের দু'টি কামরাকে বিচ্ছিন্ন করলেও টালিখোলার একটি অখণ্ড ছাদ, হাতখানেক উঁচু হয়ে ত্রিভুজের মতো, প্রবেশ পথের মাথার ওপর আচ্ছাদন দিয়ে রেখেছে। টালির ছাদের প্রান্তভাগ সামনের দিকে কিঞ্চিৎ প্রসারিত, সেই প্রান্তরেখা ধ'রে ইঞ্চি চারেক চওড়া কারুকাজ-করা কাঠের টানা বর্ডার, ফলে সব মিলিয়ে একটা বাংলোর ছাদ।
বাগানটিতে খুব যে দামি দুর্লভ গাছ আছে এমন নয়, ঘাস আর আগাছার মধ্যে আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল, পেয়ারা, কুল-মাঝখানের পুকুরটিকে ঘিরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে এইসব গাছপালা। জায়গায়-জায়গায় ভেঙে যাওয়া পাঁচিলের গা ঘেঁষে চৌকো বাগানটির চারপাশে লম্বা-লম্বা নারকেল গাছের সারি। ঘাটের মুখে বেশ ঝাঁকড়া মাথার একটি বকুলগাছ, সেই গাছের ছায়ায় এখন নিয়ামত আলী গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। এখান থেকে মল্লিকদের বাড়িটি মিনিট তিনেকের পথ। পাকা রাস্তার ধারে হলুদ রঙের বিশাল দোতলা বাড়ি। বাইরে, বৈঠকখানার সঙ্গে লাগানো মানুষ আড়াইয়েক উঁচু প্রকাণ্ড সদর দরজা। সদর দরজার গা ঘেঁষে বেশ উঁচু একটি পাঁচিল বাড়িটিকে বাইরের জগত থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রেখেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
দেরাসতুল্লা মল্লিকের অধঃস্তন পুরুষরা এখন শহরে। পরের দোকানে সেলসম্যানগিরি করে, বেতন বাকির জন্যে স্কুলে ছেলেদের নামকাটা যায়, দু'একজন পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে তাঁতিপাড়ায় গিয়ে দৈনিক মজুরিতে তাঁত বোনে, দাম-দস্তুর ক'রে চুনো মাছের ভাগা কিনে কিশোর কুমারের গান গাইতে গাইতে বাড়িতে ফেরে। হাওয়াখানার ভেতর কেউ ঢোকে না বড় একটা। দু'পাশের বেশ খানিকটা তফাতে লোকালয়, ফলে ভেতরটা দিনরাতই নির্জন থাকে। কখনো-সখনো কেউ গোরু-ছাগল খুঁজতে আসে, কি কাঁঠাল পাতা ভেঙে নিয়ে যায়। অতএব বেশ নির্ঝঞ্ঝাটে বার্মা ফ্রন্টে চলে যায় নিয়ামত। ফ্রন্টে এখন গোলাগুলীর শব্দ নেই। চারপাশে নিবিড় গাছপালা, দূরে পাহাড় শ্রেণী, বেশ-বড় সড়ো একখানা চাঁদ উঠেছে আকাশে। ঘন জঙ্গলের ভেতর জ্যোৎস্না, মাটিতে গাছের পাতার জাফরি কাটা ছায়া। কোথা যেন কুবকুব শব্দে অচেনা একটা পাখি ডাকছে। টগবগ ক'রে মাংস ফুটছে বড় ডেকচিতে। সেই মাংসের সৌগন্ধের মধ্যে চুলোর আগুনের দিকে চেয়ে ব'সে আছে নিয়ামত।

হঠাৎ করে ডেকচির মুখ খুলে গেলো, আর তার ভেতর থেকে বাঁকানো শিঙওলা একটি নধর খাসি লাফিয়ে নেমে নিয়ামতের পাশ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলে নিয়ামত ভীষণ ভয় পেয়ে যায়, লোকজনকে সে খেতে দেবেকি। আজ নির্ঘাত তার কোর্ট মার্শাল। সে পড়িমড়ি ক'রে বেরিয়ে ছুটন্ত খাসির পেছনে দৌড়োতে থাকে। পা উঠতে চায় না সহজে।

এর মধ্যে গোলাগুলী শুরু হয়ে গেছে। কারা যেন দুদ্দাড় করে পালাচ্ছে। নিয়ামত ধড়মড় ক'রে উঠে ব'সে পড়ে। তার গা দিয়ে কুল কুল করে ঘাম ছুটছে, ধক্‌ধক্ করছে বুকের ভেতর। পেটে প্রচণ্ড ক্ষিদে। গলা শুকিয়ে কাঠ।

জঙ্গলের মধ্যে সে এখন একা, কটাস কটাস গুলী চলছে। বুটের শব্দ পায়। জাপানীরা তাহলে ঘিরে ফেলেছে। এখন সে কি করে। সেও কি দৌড়োবে।? কিন্তু কোনদিকে? ভাবারও সময় পায় না, টর্চের আলো এসে পড়ে, অন্ধকারের মধ্যে রাইফেলের নল জেগে ওঠে।

হতভম্ব নিয়ামত দু'হাত মাথার ওপর তুলে দাঁড়িয়ে যায়।

-'আর সব কোথা গেলো?'

এই নির্ভেজাল বাংলা ভাষা তাকে বড় বিভ্রান্ত করে ফেলে।

জ্যোৎস্নান্ধকারে মানুষগুলোকে দেখতে দেখতে তার মাথার ভেতরকার আলো-আঁধারি দ্রুত কেটে যেতে থাকে। চারপাশে তাকায়, বার্মা ফ্রন্ট থেকে সে সরাসরি মল্লিকদের হাওয়াখানায় চ'লে আসে।

ভেতর ভেতরে নিজেকে তৈরি করে নিয়ে খাকি পোশাকপরা রাইফেল উদ্যত লোকগুলোর দিকে ভালো করে তাকায়।

নিয়ামত বুঝতেই পারে না পুলিশ তার দিকে রাইফেল উঁচিয়ে ধরেছে কেন।

সেকি বলবে ভেবে না পেয়ে বলে, আমি স্যার নিয়ামত' আবারও বলে 'আমি স্যার নিয়ামত আলী আমি

-' আরগুলোর নাম কি?'

এ কথায় সে সত্যিই বেকুব বনে যায়। বোঝে একটা জটিল কিছুর মধ্যে সে জড়িয়ে গেছে।

বাগানের ভেতর দিয়ে ছুটে পালানো কিছু লোক দেখেছিলো সে। সেই ছুটে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
পালানো লোকজন....গুলীর শব্দ... রাইফেল ওঁচানো পুলিশ... তার মাথার ভেতর দপ করে আলো জ্ব'লে ওঠে: আমি স্যার নকশাল নয়, আমি
খাকি পোশাকরা পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করে।
–'হারামজাদা পাক্কা বদমাইশ।'
–'আমি'....
–'শাটাপ, ইউ ব্লাডি নক্সালাইট।'
ও. সি হাত মাথা নাড়িয়ে ঈশারা করে। নিয়ামত পিঠে রাইফেলের খোঁচা খায় ঠিক অপারেশনের দাগের ওপর। এই স্মৃতি জাগানিয়া দাগের ওপর পুলিশের রাইফেলের খোঁচায় তার ভেতরকার বহুদিনের পুরোনো, সৈনিকের শ্রেণীগত কৌলীন্যের অহঙ্কারে চোট লাগে।
নিয়ামত এক পা–ও এগোয় না। মেরুদণ্ডের পুরোনো জখমের জন্যে এঁটেনশনের নিখুঁত ভঙ্গিটি আসে না যদিও।
তবু লঙ্গি–গেঞ্জি–পরা নিয়ামতের উর্ধ্বমুখী হাত দু'টি মুষ্টিবদ্ধ হয়: গ্রীবায়, দুই চোয়াল এবং চোখে অখণ্ড শানোনো দৃঢ়তা এসে যায়।
ও.সি বলে, 'কুইক, কুইক।'
নিয়ামতের ভেতর দুপুরের সেই রাগ ফিরে আসতে থাকে। তীব্র ক্ষিদেয় সেই রাগের ওপর বজ্রের প্রহার চলে। পেছন থেকে আবার রাইফেলের খোঁচা লাগে: 'চল্ শালা।' নিয়ামতের মাথার ভেতর দুম ক'রে বোমা ফাটে। প্রচণ্ড ঘৃণায় সে ও.সি'র উদ্দেশে কি যেন একটা খিস্তি করার জন্যে মুখ খুলতেই বমি বেরিয়ে আসতে থাকে। শরীরে শৈথিল্য আসে না, সটান দাঁড়িয়ে–দাঁড়িয়ে জ্বল–জ্বলে চোখে ও.সি'র মুখের দিকে তাকিয়ে ওয়াক ওয়াক ক'রে বমি করতে থাকে নিয়ামত আলী।

লাশকাটা ঘর

মানুষটা কালীনাথ বড় চুপচাপ।
তবে কাজের লোক। ছোট–বড় যে কোন কাজ বড় মনোযোগের সঙ্গে করে। বড় কাজ করার সুযোগ অবশ্য তার জীবনে আসেনি কখনো।
'চিন্তাহরণ মেডিকেল স্টোর'–এ ওষুধ বেচে আর মিকশ্চার তৈরী করেই তার তিরিশ বছর কেটে গেলো, ২৫ বছর বয়েসে ঢুকেছিলো এখানে, এখন চুল দাড়ি পেকেছে, চামড়া কুঁচকেছে, গাল মুখ ভেঙেছে, কপাল চওড়া করে টাক পড়েছে, মানুষটার স্বভাব বদলায়নি। আগে ধুতির ওপর হাতে–কাচা হাফশার্ট পরতো, ৬৪'র দাঙ্গার পর ধুতি ছেড়েছে, এখন তার নিত্যদিনের পোশাক শার্ট পাজামা।
হাফ শার্ট পরা মানুষ বড় একটা দেখা যায় না আজকাল। কালীনাথ আজো হাফ শার্ট পরে।এর দ্বারা অবশ্য তার বৈশিষ্ট্য সচেতনতা বোঝানো হচ্ছে না। অনেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
কিছুর মতোই এটা তার স্রেফ অভ্যাস।
চিন্তাহরণ মেডিকেল স্টোরে তার চাকরী করাটাও যেনো অভ্যাস। রোজ সকালে টুকটুক করে হাঁটতে হাঁটতে এসে দোকানে ঢোকে।
রাস্তা ঘাটে কতো ধরনের রগড় হয়। না হোক, হাঁটতে হাঁটতে মানুষ এদিক ওদিক তাকাও তো। কালীনাথের ওসব নেই। বাড়ী থেকে মাথা হেঁট করে এই যে বেরুলো আর মাথা তোলবার নামটি নেই। একেবারে সোজা এসে দোকানে। যেনো দম দেওয়া পুতুল। মেকাররা যেমন তৈরী করে দিয়েছে ঠিক তেমনটি। খদ্দের এসে হয়তো বললো: 'লারগ্যাকটিল সিরাপ' আছে? যদি থাকে কোন কথা না বলে আলমারী থেকে ফাইলটি বার করে এনে কাউন্টারের ওপর রাখে। যদি না থাকে, বলবে: 'নাই।'
'নাই' শব্দটি শুধুই একটি ধ্বনি, চোখে মুখে কালীনাথের কোন অভিব্যক্তি ফোটে না। খদ্দের যদি বলে: 'কোথায় পাবো বলতে পারেন?'
কালীনাথ এবার আর মুখে বলবে না, মাথাটি খুব সংক্ষিপ্ত নাড়িয়ে জানিয়ে দেবে সে জানে না।
হয়তো কালীনাথ হার্ডবোর্ডের পার্টিশন দেওয়া খুপরীটায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিকশ্চার বানাচ্ছে। দোকানের মালিক ললিতবাবু কোন ব্যাপারে হয়তো ডাকলেন। কালীনাথ কোন জবাব না দিয়ে খুপরী থেকে বেরিয়ে এসে ললিতবাবুর মুখের দিকে তাকাবে। ললিতবাবু কোন কথা জিজ্ঞেস করলে অতি সংক্ষিপ্ত জবাব অথবা মস্তকের হাঁ বা না বাচক মুদ্রা দেখিয়ে আবার খুপরীর ভেতর ঢুকে গিয়ে আপন কাজে মগ্ন হয়ে যায়।
মিকশ্চার বানানোর কাজটা তার অবশ্য সারাদিন করতে হয় না। বিকেলবেলা ৫টা থেকে ৭টা এই দু'ঘন্টার জন্যে ডাঃ আব্দুল হান্নান এসে বসেন। (তার জন্যে একপাশে আর একটা খুপরীআছে।) তখন কালীনাথকে ইনজেকশন ফোঁড়া, মিকশ্চার বানানো–এইসব টুকটাক কম্পাউণ্ডারীর কাজটুকু করতে হয়।
এই সময়টা ললিতবাবু নিজেই খদ্দের সামলান। তবে মিকশ্চার টিকশ্চার আজকালকার ডাক্তাররা দেয় না বড় একটা। ইনজেকশন আর পেটেন্ট ওষুধই চালায়।
ইনজেকশন ফোঁড়ার জন্যে রুগী প্রতি দু'টাকা। এই টাকাটা কালীনাথের উপরি আয়। কাছাকাছি সিরিয়াস রুগী হলে অবশ্য বাড়ীতে গিয়ে ফুঁড়ে আসতে হয়। কাজটা কালীনাথের মোটেই পছন্দ নয়, তবু বাধ্য হয়ে যেতে হয় অনেক সময়। স্বামীর এই অপছন্দের ব্যাপারটা গিরিবালার কাছে নিতান্তই অপরাধের। গিরিবালা বলে: বজ্জাতি।
'হাবাইত্তা মিনসা কি কম! মিটমিটা শয়তান। কারুর সুখ চায় না। খালি নিজেরটা বোঝে। ক্যান, কি এমুন জমিদার খান অইছ যে মানষের বারিত্ গিয়া ইন্‌জিশন দিলে মান যাইবো? আহা মান অলারে, গোয়ার নাই চাম রাধাকিষ্ট নাম। হুঁ:।'
চ্যবনপ্রাস খেতে খেতে নিশিকান্ত বলে: 'মানুষটারে একটু শান্তিতে থাকতে দিবো না,রাইত দিন'... বাক্যটি সম্পূর্ণ করতে পারে না, তার মুখের চামড়া দলামোচা কাগজের মতো কুঁচকে যায়, চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসে, গলার রগ ফুলে ফেটে যেতে চায়। বিছানার ওপর বসে বসে প্রবল ঝড়ের ঝাপটায় তালমাটাল নিশিকান্ত নুয়ে নুয়ে পড়ে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
হৈমবতী স্বামীর পিঠে এক হাত বুকে এ হাত রেখে বুলোতে থাকে। পেটের ভেতর সাত মাসের সন্তান পিতার কাশির শব্দে কেঁপে কেঁপে ওঠে।
'কতো কই বালো দেইখ্যা এ্যালাপাথি ওষুধ খাও, ডাক্তার দ্যাহাও, তা না কি ছাতার এক চব্বনপাস পাইছে'–রাগে দুঃখে মমতায় তার কথা ভিজে চপচপে হয়ে জড়িয়ে যায়।
নিশিকান্ত'র কি হয় কে জানে, তার কাশির ঝড় থেমে আসে, বিছানার ওপর হাতের ভর দিয়ে একদিকে ঘাড়–মাথা হেলিয়ে সে মুখ হাঁ করে শ্বাস নেয়, তার তোবড়ানো বুকটি বেগে ওঠা নামা করে, আর সেখান থেকেএকটানা ঘড় ঘড়ানি নিয়ে হোঁ... হোঁ... শব্দ বেরিয়ে আসতে থাকে নিশিকান্তর মুখ দিয়ে।
হৈমবতী ধীরে ধীরে স্বামীকে শুইয়ে দিয়ে বাতাস করতে থাকে। বাতাস করতে করতে সারিসারি ঘুমিয়ে থাকা ছেলেমেয়েদের দিকে এক পলক তাকিয়ে দুর্জ্ঞেয় কারণে দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্বামীর দিকে মনোযোগী হয় আবার।
এই সময় হৈমবতী সাইকেলের শব্দ পায়। মনোতোষ মাস্টার প্রাইভেট পড়িয়ে ফিরলো। পারেও লোকটা। সকাল বেলা বাজার–হাট করে দিয়ে এক ঝাঁক ছেলে পড়িয়ে স্নান খাওয়া–দাওয়া ক'রে স্কুলে ছোটে, দুপুরে একবার খেতে আসে, তারপর এইরাত দশটা সাড়ে দশটায় ফিরলো। এর মধ্যে আবার রাজনীতিও করে।
ঘরে বাইরে লোকজনকে মহা উৎসাহে তার রাজনীতি বোঝায়, কতো কি যে বলে, ও ছাইভস্ম বোঝেও না হৈমবতী শুনতেও চায় না।
নিশিকান্ত পার্টি–ফার্টির ধার কাছেও নেই, কিন্তু রাজনীতির আলোচনায় বড় উৎসাহী। চাকরী করে সাধনা ঔষধালয়ের এক ব্রাঞ্চে। প্রত্যেকদিন দোকানে বসে খবরের কাগজটি তার পড়া চাই। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে বলে: 'হঃ, হ্যারা করবো রাজনীতি। নেতা আছিলো দেশবন্ধু, নেতা আছিলো নেতাজী সুভাষ বোস, গান্ধী। খালি চিককুর পারলেই যদি নেতা হওন যাইতো'... কাশির ধমকে মাঝ পথেই থামতে হয় তাকে।
একটু দম নিয়ে নিশিকান্ত স্ত্রীকে বোঝায়: 'বুঝলানি, ওই মনতোষ মাস্টারের সমাজতন্ত্র, ওই সব অইলো গিয়া বুলি, এক হালারে বালো মনে করো তুমি? সব খালি বোচকা মারনের ফন্দি।'
হৈমবতী দেশবন্ধু, নেতাজী, গান্ধী কাউকেই চেনে না, রাজনীতির অতো ঘোরপ্যাঁচও বোঝে না, কিন্তু সে মনোতোষ মাস্টারকে চেনে, হাসি খুশি মানুষটা, মনে কুনো কালি নাই, ঠ্যাকা বেঠ্যাকায় দুই দশ টাকা পাওন যায়।
–'মনতোষ মাস্টারের কথাগুলো তো খারাপ না।'
–'আহ্, খারাপ তোমারে কইতাছে কে, কিন্তু করনের লোকটা দেহাও।'
–'হ, তোমার লগে অহন আজাইরা প্যাচাল পারি। আমার আর খাইয়া কাম নাই।' হৈমবতী ঘাড় টান করে সংসার সামলাতে উঠে যায়।
মনোতোষ মাস্টারের স্কুলের বেতন এবং ছেলে পড়িয়ে মাসিকআয় হাজার দুয়েক টাকার মতো। সংসারে মানুষ বলতে স্বামী–স্ত্রী আর ছোট দুটো ছেলে–মেয়ে। গ্রামের বাড়ীতে বাপ আছে, ডাক্তারী করে, জায়গা জমি দেখা শোনা করে, মামলা মকদ্দমা সামলায়। সম্প্রতি বোনটি বিধবা হয়েছে, তাকে কিছু কিছু সাহায্য করতে হয় এই যা।
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
হৈমবতী মনোতোষের স্ত্রী জয়াকে বলে, 'তোমার চিন্তা কি, তোমার ছোট পরিবার সুখী পরিবার, আমাগো অইলো গিয়া হুয়োরের পাল।' হাসতে হাসতেই বলে হৈমবতী। কিন্তু জয়ার মুখ কিঞ্চিৎ গম্ভীর হয়ে যায়: 'হ, মানুষ বাইর থেইক্যা ওইটাই দ্যাখে।'
হৈমবতী এতোটুকু হয়ে যায়: 'আমি কিন্তু কিছু ভাইব্যা কই নাই, মনে কষ্ট নিও না।' জয়ার মুখ-ভার তবু কাটে না। হৈমবতী সে দিকে তাকিয়ে বলে: 'না, কামপইরা রইছে, উঠি।'
মনে মনে হৈমবতী জ্বলে: 'মাগীর গাও ভরা হিংসা। বিধবা ননদরে মাসে ছয় মাসে ৫০/১০০টা টাকা দিতে অয়, তাতেই বুক ফাটে, স্বামী তো এদিকে শুনি ধইন্যা না শ্যামপুরে জমি রাখছে তিন কাঠা।'
রাতের বেলা শুয়ে শুয়ে নিশিকান্ত বলে: 'বুঝলা শিবুর মা, এইসব ওইলো তোমার গিয়া বিজনেস, বুঝছো, মহাজনরা যেমুন চাইল ডাইল মজুত কইরা বাজারে দাম বারায়, সুযোগ বুইজ্যা চরা দামে মাল বেচে, এ-ও হেমুন; জাগা জমিনের দাম বারতাছে, অহন সস্তায় কিন্যা থুইলো, দুই তিন বছর থাউক না পইরা, আরবের পয়সা আইতাছে মানুষের আতে, দুই চার বছর পর ওই জমি মনতোষ ৮গুন দামে বেচবো-বুজলা অহন, সমাজতন্ত্র কারে কয়? হুঁ:
জয়া গিরিবালাকে বলে: 'কি কমু মাসীমা, কি যে পায় রাজনীতির মইদ্যে, আমার বালো লাগে না, পোলাপান বয়সে করছে করছে, অহন কি? থাকি হ্যাকেগো দ্যাশে, হ্যাগো মাথা গরম, কুনসুম কি অয় কওন যায়? আমরা অইলাম গিয়া ইন্দু মানুষ, আমাগো অতো মাথা ব্যথা ক্যান? হ্যাগো দ্যাশ হ্যারা যেম্নে মনে লয় চালাউকগা, তোমার অতো রাজনীতির আউস ক্যান?'
কুয়োতলা থেকে সর্বানী জবাব দেয়: 'পুরুষ মানুষের কতো রকমের আউস থাকে, তাই ধরলে কি আর চলে?'
সর্বানীর স্বামী বাসুদের ফরাসগঞ্জের কোন আড়তে চাকরী করে। মদ গাঁজা খায়, জুয়া খেলে, বেপাড়ায় যায়, সর্বানীর মুখে 'পুরুষ মানুষের কতো রকমের আউস থাকে' কথাটায় জয়ার কোথা যেনো ঘা খেলো।-কোথায় বাসুদেব, একটা অশিক্ষিত, মাতাল, যার সংসারে, দু'বেলা ঠিক মতো হাঁড়ি চড়ে না, যে বৌ পেটায়, তার সঙ্গে যেনো সর্বানী মনোতোষকে একই পাল্লায় তুলে দিচ্ছে। জয়ার ভেতরটা রি-রি করে।
'হ, আউস তো অনেক রকমের, কেউ মদ গাঁঞ্জা খায়, জুয়া খেলে, বাজে পারায় যায়, হেইটাও আউস, আর কেউ রাজনীতি করে হেইটাও আউস; কি কন মাসীমা, দুইটা কি এক অইলো?'
'কী!'-সর্বানী সটান দাঁড়িয়ে পড়ে, তার আঁটসাঁট শরীরটা ফনা তোলা সাপের মতো দুলতে থাকে: 'আমার স্বামী মদ গাঁঞ্জা খায় নিজে কামাই কইরা খায়, জুয়া খেলে নিজের পয়সায় খেলে তাতে কার কি'- হাত নেড়ে দ'চোখে আগুন নিয়ে সর্বানী চিৎকার করে বাতাস কাটতে থাকে: 'আমার স্বামী বাজে পারায় যায়? ক্যান কারুর আত দইরা কুনদিন টান দিছে, না কাউরে নিয়া' ....
-'চুপ করো।' গিরিবালা ধমক দিয়ে সর্বানীকে মাঝপথে থামিয়ে দিতে চায়। একটানা কথা বলে হাঁফ ধরে গিয়েছিলো, ছোট্ট করে শ্বাস টেনে সর্বানী আবার শুরু করে; 'না চুপ করুম ক্যান, বিচার করেন, কি খারাপ কথাটা কইছি আমি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
হেয় আমার স্বামীর কথা কইবো? আমার স্বামী নি তারে নিয়ে কুনদিন'
–'আহ চুপ করো না, তোমার স্বামীর নাম নিয়া তো কয় নাই।'
–'ওইসব আমরা বুঝি'....
জয়া তেতো কথার খোঁচা যেমন দিতে পারে, ঝগড়া ততোটা গুছিয়ে করতে পারে না। তার জড়িয়ে জড়িয়ে যাওয়া কথা সর্বানীর চড়া গলায় আওয়াজের নীচে চাপা পড়ে যেতে থাকে। এর মধ্যেই সে খুব একটা জুৎসই কথা বলে সর্বানীকে কাবু করতে পারে অবশ্য, কিন্তু সামনে গিরিবালা, তাছাড়া বলে পরে সর্বানীকেই সামলাতে পারবে বলেও ভরসা পায় না।
ব্যাপারটা আর কিছু নয়, গিরিবালার বড় ছেলে সুকুমার, যে ইদানিং মাস্তান হয়ে উঠেছে, সেদিন রাত্রে, বাসুদেব তখনো ফেরেনি, জয়া নিজের চোখে দেখেছে, সর্বানীকে সাপ্‌টে ধরে চুমু খাচ্ছে।
হৈমবতী শুয়েছিলো, তার শরীরটা ততো ভালো নয়, বিকেল শেষ হয়ে আসছে তবু তার উঠতে ভালো লাগছিলো না, আর এমন সময় হঠাৎ এই ঝগড়া; সে কোন কথা বললো না, তক্তপোষের ওপর শুয়ে শুয়ে জানালা দিয়ে না দেখার ভান করে ঝগড়া দেখতে লাগলো। কী যে ভালো লাগছে তার, মাগীর বড় দেমাক, বোঝ্ অহন কেমুন লাগে। হেই দিনকা হাইস তামাসা কইরা একখানা কথা কইছিলাম, ওমা তাইতে মাগীর কি গোস্‌সা।
বাড়ীটা একতলা। সরু সরু নীচু দরজা, ফোকরের মতো জানালা, ঘরের ভেতর ঢুকলে প্রথমেই মনে হবে ঠেলা দিয়ে দেওয়ালগুলোকে সরিয়ে দিই; এর ভেতরই তক্তপোষ, বাক্স–প্যাটরা, সস্তাদামের আলমারী, আলনা, ছেঁড়া লেপের তুলো ভরা চটের বস্তা, চালের টিন, গমের টিন, হাজারো গণ্ডা জিনিসপত্র স্যাঁতসেঁতে ঘরকে আরো অন্ধকার করে রাখে।
রাস্তার দিকে পিঠ করে দাঁড়ানো দুটি কামরার একটিতে থাকে কালীনাথ অপরটিতে নিশিকান্ত। কালীনাথের ঘরের গায়েই লাগানো সদর দরজা, সদর দরজার মাথাটি কালীনাথের ঘরের ছাদের সঙ্গে মিলে কার্নিশের শেষ সীমানা পর্যন্ত এসেছে: একদিকে বাড়ীর পাঁচিলের কাঁধে ভর অপর দিকে ঘরের কার্নিশে, ফলে সদর দরজা দিয়ে ঢুকলেই মনে হয় একটা সুড়ঙ্গ, সুড়ঙ্গটি পেরুলেই এক খামচা উঠোন, উঠোন এবং পাঁচিলের গা ঘেঁষে তুলসী মঞ্চ, একটি গন্ধরাজ ফুলের গাছ, কয়েকটা সন্ধ্যামালতী, গোটা তিনেক কলাবতী, তার লাগোয়া ঘরটি মনোতোষ সরকারের। ওধারে, কল, কূয়োতলা এবং পায়খানার দিকে টিনের চালের ঘরটিতে থাকে বাসুদেব। বেড়ার দেওয়াল আর টিনের চালের রান্নাঘরগুলো যার যার ঘরের সামনে বা পাশে।
এই বাড়ীতেই দীপালীর জন্ম, কিন্তু আজকাল তার দম বন্ধ হয়ে আসে। আগে তবু যা হোক সারাদিনটা স্কুলে তার বেশ কাটতো। আজ এক বছর তা–ও বন্ধ হয়েছে। এই ক'দিনে ফুলে–ফেঁপে কী বড়ই না হয়ে গেছে সে। নিজেরই লজ্জা লাগে, মা তবু তাকে শাড়ী পরতে দেবে না।
গিরিবালা যতোই চেষ্টা করুক, দীপালীর ভেতরে যে আর একটি দীপালী আছে গিরিবালার সাধ্য কি তাকে সেলাই করা কাপড়ে বেঁধে রাখে, সময় নেই অসময় নেই দীপালী ঠেসে স্বপ্ন দেখে! কিন্তু এই স্বল্প পরিসর ঘর থেকে, এই বাড়ীর চৌহদ্দি থেকে তার স্বপ্নকে কতোদূর আর নিয়ে যেতে পারে কালীনাথের মেয়ে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কালীনাথের ছেলে থালাটাকে সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে চাপা গলায় গর্জন করে ওঠে: 'এই দিয়া খাওন যায়?' হারিকেনের আলোয় তার ঘাড় পর্যন্ত নেমে আসা কোঁকড়ানো চুলভরা মাথার বিশাল ছায়া মেঝের ওপর ভল্লুকের মতো নড়ে।

–'ই হি রে নবাব পুত্তুর, খাওন যায় না! লজ্জা করেনা কথা কইতে? একখান ফুটা পয়সার মুরাদ নাই, আবার বর বর কথা–' এই দিয়া খাওন যায়?'–মুখ বিকৃত করে মাথা দুলিয়ে গিরিবালা ভারী কুৎসিত একখানা ভঙ্গি করে। 'খাইতে তরে কয় কে? যা না যে বন্দুগো লগে রাইত দিন আড্ডা দিয়া বেরাস হ্যাগো কাছে যা গিয়া রাইত দুফুরে অহন আইছস মুখ নারতে! এত বড় জুয়ান গাববুর একখান, একটু যদি চিন্তা করে, একটু যদি ভাবে!'

থালাটা একটানে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে বেরিয়ে গেলে ঠিক ঠাক মানানসই কাজটা হয় এখন। কিন্তু সুকুমার ওঠে না। ধারালো চোখমুখ, টানটান ঘাড় নিয়ে ম্যাচ–ম্যাচ করে ভাত মাখতে থাকে মাথা নিচু করে। দেখলে মনে হয় সে ভাত মাখছে না আটা ছানছে।

'বোইনটা বর অইতাছে তার বিয়া দিতে ওইবো, ছোট ছোট ভাইবোন গুলার মানুষ করতে অইবো, এতোবড় পোলা হেই চিন্তা নাই।'.....

সুকুমার মুখ তোলে, তার চোখ মুখ থমথমে: 'করুমটা কি? চাকরী আমার লেইগ্যা বহায়া থুইছে সব। ক্যান, বাবা'

গিরিবালা কথাটা চিলের মতো ছোঁ মেরে ধরে: 'ওই মেচিবিলাই তরে চাকরী দিবো? কথা কইতে জানে মান্‌ষের লগে? ভগোবান অর মুখ দিছে? হ্যায় আছে সব কয়টিরে চিতায় তুইল্যা দিয়া পিণ্ডি দেওনের অপেক্ষায়। হ্যায় তরে দিবো চাকরী ঠিক কইর‍্যা।'

গিরিবালার তোপের মুখ কালীনাথের দিকে ঘুরে যায়: 'হারা জনম আমারে জ্বালাইয়া কয়লা করছে। হ্যায় কি একটা মানুষ? পুরুষ মানুষ এমুন অয়? বাপ দাদার ভিটাখান রক্ষা করতে পারলো না, একদিন গিয়া খারাইলো না পর্যন্ত! অখন মোসলমানেরা ভোগ করতাছে!'

সরু তক্তপোষ এখন চিতা, তার ওপর কালীনাথের শব। গিরিবালা এবং সুকুমার ভারী চমৎকারভাবে চিতা জ্বালাতে থাকে। মুখের দিক থেকে আগুন আস্তে আস্তে বুক পেট পায়ের দিকে ছড়িয়ে পড়তে পড়তে এক সময় সমস্ত চিতা দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। কালীনাথকে আর আলাদা ক'রে চেনা যায় না। গোটা কালীনাথই এখন অগ্নিময় চিতা। ছোট্ট ঘরের ভেতর সেই প্রচণ্ড আগুনের উত্তাপ হা হা ক'রে ফিরতে থাকে। উর্ধ্বমুখী রক্তাভ অগ্নিশিখা কড়ি বরগাতে গিয়ে ছোবল মারে। ধোয়ায় ঘর ভরে যায়। মেঝের ওপর সার সার ঘুমন্ত ভাই–বোনের পাশে–পড়ে–থাকা দীপালীর চোখে সেই ধোঁয়া এসে লাগে। দীপালীর চোখ জ্বালা করে। দু'চোখ বেয়ে জল বিরিয়ে আসতে থাকে তার।

'দ্যাহ কুত্তার বাচ্চারা রাইত দুফুরে'... নিশিকান্ত গিরিবালা সুকুমারকে বিড়বিড় করে গালাগালি করে একা একা। কিন্তু গালাগালিটা খুব জুৎসই করে করতে পারে না। মগজের সঙ্গে বাঁধা সুতোগুলোয় টান পড়ে। কপালের দু'পাশের রগ টনটন করে। চোখ মুখ কামড়ে নিশিকান্ত কাশি ঠেকায়।

হৈমবতীর ঘুম বড়ো বেশী, একবার যদি বিছানায় পিঠ দিলো তো গেলো। কিছুক্ষণ আগেও কোমরের কশি ঢিলে করে সে [illegible] মাসের গাভীন পেট

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
মেলে চোখ বুঁজে চিৎ হয়ে পড়ে পড়ে স্বামীর আদর নিচ্ছিলো; আর অহন দ্যাহ কেমুন নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেছে। 'মাইয়া মানুষটার খালি আছে খাওন, ঘুমান আর' বাকী অনুপ্রাসটি কাশির জন্যে উচ্চারণ করতে পারে না নিশিকান্ত, তাতে তার রাগ আর একটু বাড়ে।

রাগ মনোতোষেরও বাড়ে। তার পা থেকে আগুনের একটি হলকা মাথার ভেতর গিয়ে ধাক্কা মারে। সেই আগুনের উত্তাপে মনোতোষের চোখ-মুখ ঝলসে যায়। জয়া গোঁজ হয়ে বসে আছে। টেবিলের ওপর খাতাটাকে আছরে ফেলে দিয়ে মুহূর্ত কয়েক কিছুই বলতে পারে না মনোতোষ, শুধু নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ শোনে।

–'তোমারে নিয়া আর পারা গেলো না।'

তার ক্রোধের তুলনায় বাক্যটি বড় বেমানান, কিন্তু মনোতোষের গলার আওয়াজে টের পাওয়া যায় কী অসীম চেষ্টায় সে নিজেকে সামলাচ্ছে। মনোতোষ দম নেয়। তোমার মনটা হইল এতটুক, বুঝলা?'

মনোতোষ জয়ার দিকে হাত বাড়িয়ে ডান হাতের পাঁচটি আঙুলকে একত্রিত ক'রে মনের আয়তনটা দেখায়। জয়া চোখ তুলতে গিয়েও তোলে না। তুললে দেখতে পেতো রাগটা মনোতোষের হঠাৎ করে নয়। বহুদিন ধরে একটু একটু করে জমতে জমতে ক্রোধ যখন গরল হয়ে যায় কেবলামাত্র তখনই রাগের সময় মুখের চেহারা মানুষের এমন হয়ে থাকে।

–'বাবায় আইতে চায় না ক্যান জানো? শুধু তোমার কারণে। তুমি'

জয়া ফোঁস করে উঠে: 'ক্যানআমি তারে কী কইছি?'

'কইতে হয় নাকি, মানুষের ব্যবহারেই বোঝন যায়।'

–'তখন মনে আছিলো না? ভাল ব্যবহারের মানুষ আনলেই পরতা।'

–'তখন কি আর এত বুঝছি। তখন তো তুমি রং ঢং দিয়া ভুলাইয়াছিলা।'

বিষের জ্বালায় জয়া ছটফট করে: 'কী, আমি রং ঢং দিয়া ভুলাইয়াছিলাম তোমারে? তুমি এইকথা কইলা?'

রাগের মাথায় কথাটা বড়ো খারাপ বলে ফেলেছে মনোতোষ। কিন্তু তখন যা হবার হয়ে গেছে। জয়া দেওয়ালে মাথা ঠুকতে থাকে।

মনোতোষ উঠে গিয়ে জয়াকে ধরে: 'আহ্, কি পাগলামী কর।' গলার স্বরকে মনোতোষ প্রাণপণ বদলে ফেলতে চায়।

–'না', তুমি আমরে ধরবা না, ছার, তোমারে আমি চিনছি, আর মিঠা কথা কইতে ওইবো না।'

চোখে জলএসে যায়। গালের জুলুনি মগজ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু কোন কথা বলে না, দু'হাতে গাল ঢেকে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। তার মাথায় চুল ভেঙে ছড়িয়ে পড়েছে, আঁচল লুটোচ্ছে, একদিকের স্তনচক্রের আভাস বাসুদেবকে আরো ক্ষিপ্ত করে: 'আমি বুঝিনা, না? রাইত দিন ঠাকুরপো ঠাকুর পো! ক্যান,অতো মাখামাখি ক্যান' টলমল পায়ে বাসুদেব এগোয়, আত্মরক্ষার জন্যে সর্বানী সামনে ঝোঁকে। বাসুবেদ প্রহার করে না, আঁচল ধরে টান দেয়: 'আঁ?'এই 'আঁ' ধ্বনি দিয়ে সে বাক্যটিকে সম্পূর্ণ করে। নিরুত্তর সর্বানী প্রতি মুহূর্তে চপেটাঘাতের আশঙ্কায় কেঁপে কেঁপে ওঠে। বাসুদেব ক্ষিপ্রহাতে সর্বানীর বস্ত্র হরণ করে।

মধ্যম পুত্রটির ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো, ঘুম চোখে হারিকেনের আলোয় বাসুদেবের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

কংসমূর্তি, চাপা গর্জন এবং উলঙ্গ মাতৃ–দর্শনে ছিটিয়ে পড়ে থাকে সে।
'তরে খুন কইরা ফালামু' –বাসুবেদ ন্যাংটো সর্বানীকে হ্যাঁচকা টানে কাছে নিয়ে আসে। অতঃপর ঘাড়ে রদ্দা মারলে সর্বানী তার শরীরে বাসুদেবের প্রত্যাশিত ভঙ্গিটি এনে ফেলে। বাসুদেব মেঝের ওপর সর্বানীকে কুকুরের মতো রমন করতে থাকে।
কালীনাথ আস্তে আস্তে তক্তপোষ থেকে নামে। পা টিপে টিপে দরজার কাছে যায়। নিশিকান্ত প্রবল বেগে শ্বাস টানছে। কালীনাথ নিঃশব্দে দরজার খিল খোলে। বাইরে এসে চারপাশে তাকায়, নিথর বাড়ীটায় শুধু নিশিকান্তর শ্বাস টানার শব্দ। কালীনাথ সুড়ঙ্গের মুখে এসে দাঁড়ায়। তার বিভ্রম আসে, মনে হয় আর একটু এগোলেই কঠিন কয়লার বিশাল চাঙটায় ঘা খেয়ে তার নাক মুখ থেঁতলে যাবে। কালীনাথ হাত বাড়ায়, তার হাত অন্ধকার শূন্যতায় কোথাও ঠাঁই পায় না। দু'পা এগিয়ে সে আবার থমকায়, মনে হয় এই অন্ধকারের ভেতর কালো লোমশ একটা জন্তু গুঁড়ি মেরে বসে বসে কপিস চোখে দেখছে তাকে। কালীনাথ হৃৎপিণ্ডের শব্দ শোনে। শব্দটি তার নিজের না জন্তুটির? কালীনাথের আবার বিভ্রম আসে। হঠাৎ তার পায়ের ওপর দিয়ে কিচকিচ ক'রে ছুঁচো দৌড়োয় সামনের দিকে। কালীনাথ চমকে লাফিয়ে ওঠে। আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দটিকে স্পষ্ট চিনতে পারে এবার।
এই শব্দ তার মস্তিষ্কে কাজ করে কে জানে, কালীনাথ অন্ধকারে ভেতর দু'হাত মেলে হাঁতড়ে হাঁতড়ে সদর দরজাটা খুঁজতে খুঁজতে এগিয়ে যেতে থাকে।
মনে হয় সুড়ঙ্গ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে, একবার মনে হয়ঐ তো সামনে খিল আঁটা বিশাল সদর দরজাটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটা মোহ ক্রমে আচ্ছন্ন করে ফেলতে থাকে তকে। কালীনাথ দরজার কাছে যাবার জন্যে অস্থির হয়। আর তখন ছাদের কার্ণিশে প্যাঁচাটা ডেকে ওঠে।
'রাইত দুপুরে আর ডং করন লাগবোনা বুরা বয়সে।' কালীনাথ একটি হাতের স্পর্শ পায় পিঠে: 'চল'।
হাতটি তাকে ঘুরিয়ে দেয়। সদর দরজা এখন কালীনাথের পেছন দিকে।
অন্ধকারে অদৃশ্য গিরিবালা তাকে পেছন থেকে ঠেলে: 'মরতে চাইলে একাই মরণ লাগবো, বুঝছো, অখন আর সহমরণ নাই।'
কালীনাথের পা শিথিল হয়ে আসে। প্যাঁচার ডাকটা তার মাথার ভেতরে ঢুকে গিয়ে বোঁ বোঁ করে ঘোরে।
গিরিবালাকে আর ধাক্কা দিতে হয়না, কালীনাথ দিতেই হাঁটতে থাকে মাথা ঝুঁকিয়ে। এতোক্ষণে কালীনাথ সঠিক কালীনাথে ফিরে আসে। কেননা এই ভঙ্গিটি তার একান্ত নিজস্ব।

গগনের চিকিৎসা তৎপরতা

নৌকোয় উঠতেই [illegible] ডাক এলো, 'ও বীরেনদা।'
বীরেন ব্যাগটা পাটাতনে রাখতে যাচ্ছিলো, রাখা হলো না, সোজা হয়ে ফিরে

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
হয়ে দেখলো, গগন দাঁড়িয়ে আছে হাত তুলে।
ঘেমে গেছে, বুকের ওঠা–নামাও দেখা যায়। বোঝা গেলো গগন দৌড়ে এসেছে। আর গরমটাও পড়েছে এবার! বীরেন মাথার ছাতা সামলে জিজ্ঞেস করে, 'কিছু ক'বি?'
–'যাইতাছেন কৈ?'
–'কানাইপুর।'
–'ফিরবেন কখন?'
নৌকো তখন চলতে শুরু করছে। বীরেন হাতের ঘড়ি দেখে, তারপর পাড়ের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'এই ধর দেড়টা দুইটা'
গগন বলে, 'আইচ্ছা যান, পরে কথা ওইবো।'
বীরেন পাটাতনের ওপর ব্যাগটা রাখতে রাখতে ভাবে, কি এমন কথা, এই রোইদে হাঁপাইতে হাঁপাইতে দৌড়াইয়া আইছে।
ভাবতে ভাবতে সে পাড়ের দিকে তাকায়, উঁচু পাড়ের ওপর দিয়ে একাকী গগন লম্বা লম্বা পা ফেলে ফিরে যাচ্ছে।
মুখে একটা আফসোসের ধ্বনি করে বীরেন মাথা নাড়ে। মাঝি এতোক্ষণ চুপ করেছিলো, এবার বীরেনের দিকে তাকিয়ে বলে, 'বুঝলা ডাক্তার; সবই অদ্দিষ্ট।'
বৈঠার তালে তালে সে মাথা নাড়ে, 'আহা এমুন জুয়ান বয়স'
বীরেন কোনো কথা বলে না। রোদের তেজে খালের জল থেকেও গরম ভাপ উঠে আসছে। সে মাঠের ওপর দিয়ে দূরে দিগন্তরেখার দিকে তাকিয়ে থাকে। নৌকো সাঁসাঁ করে এগিয়ে যেতে যেতে বৈরাগীর ভিটের বাঁকে মোড় নিলে বীরেন পেছন ফিরে দেখে গগন নেই।
এ তল্লাটে ডাক্তার বলতে একা বীরেনই। ফলে চাপও তার বেশি। কিন্তু একটু এদিক ওদিক হলেই সামনে না হোক লোকে আড়ালে বলে, 'ইস, আমাগো বীরেইন্যার ডাট বড় বাইরা গেছে। ওইবো না, আশপাশের দুই চাইর গেরামের মইদ্যে আর কুন ডাক্তার নাই। পাশ করা ডাক্তার না ওইয়াও দুই হাতে পয়সা কামাই করতাছে, ডাট না ওইয়া পারে?'
না, বীরেন পাশ করা ডাক্তার নয়। তার কাকা রসিকলাল পাল ছিলেন এল.এম.এফ। বীরেনের যেটুকু শিক্ষা সব এই কাকার কাছ থেকে। তারপর দিনে দিনে মানুষের বুদ্ধি বিবেচনা, অভিজ্ঞতা তো আছেই; কিন্তু ওই যে ভিতটা, সেটা কাকা রসিকলালই বড় যত্নে নিজের হাতে গেঁথে দিয়ে গেছেন।
আর পয়সা কামাইয়ের কথা? হুঁ:' সে আর বলে কাজ নেই। ভিজিটের টাকা তো দূরের কথা, ওষুধ যে বীরেন দেয়, সে তো তার মাচার সীম কি শশা নয়, দস্তুর মতো গাঁটের পয়সা খরচ করে শহর থেকে কিনে আনতে হয়, কিন্তু তার ক'টা পয়সা পায় বীরেন?
তুব তাকে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দৌড়তে হয়। স্ত্রী বলে, 'ডাক্তারীটা তোমার ব্যবসা তো না, নেশা।'
কানাইপুরে নেমে হাঁটতে হাঁটতে তার আবার গগনের কথা মনে হতে থাকে: কি কইতে চায় গগন?
সারাদিনই তার ব্যস্ততায় কেটেছে গতকাল। সকালবেলা উঠে রমণী মুখুজ্জেকে দেখে সোজা গোবিন্দপুর গেছে হেঁটে, সেখানে ক'টা রুগী দেখে নৌকোয় করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

কানাইপুর, কানাইপুর থেকে ফিরতে ফিরতে বেলা শেষদুপুর; স্নান-খাওয়া-দাওয়া করে একটু গড়িয়ে নেবে গড়িয়ে নেবে ভেবেছিলো, রাধানগরের নারাণ এসে কেঁদে পড়লো। কি আর করে, যেতে হলো।
বছর ছয়েকের ছেলে, হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেছে। গিয়ে দেখে, বেশ টেম্পারেচার। জ্বরটা মনে হয় ভেতরে ভেতরে আগে থেকেই ছিলো, বাচ্চা ছেলে অল্প জ্বরেও দৌড় ঝাঁপ করে বেড়ায়, কেউ খেয়াল করেনি। পাল্‌সে টের পাওয়া যাচ্ছে শরীর খুব দুর্বল, অল্পতেই কাহিল হয়ে পড়েছে; তা কাহিল হবে না? শরীরে পুষ্টি আছে যে রোগের সঙ্গে যুঝবার মতো ক্ষমতা থাকবে! ওষুধের সঙ্গে একটা ভিটামিন দিলে ভিটামিনটা বাদ দিয়ে শুধু ওষুধ কেনে।
গ্রামের এই অশিক্ষিত লোকজনও বুঝে গেছে ভিটামিনটা ওষুধ নয়, ওটা শরীরের বলের জন্যে।
শরীরের বল? ও খেতে ফিরতেই এসে যেতে কতোক্ষণ। তার জন্যে আবার আলগা খরচ?
আহা, কতো যেনো খায়। যা-ও খায় তা কি খাইদ্য। এক গাদা মশলা, শুকনা মরিচ, পয়জন, পয়জন! অসুখের নিমিত্ত কইরা ওইলেও এক আধটা ভিটামিন খা, তা-না।
ধমক দিলে চুপ করে থাকে। বীরেন বোঝে ধমক দিয়ে লাভ নেই, কিন্তু সে কি করতে পারে। এদিকে তাড়াতাড়ি অসুখ ভালো না হলে বলবে, 'এতো ওষুধ খাইয়াও রোগ সারে না।'
আরে বাবা, ডাক্তারের উপর দিয়া ডাক্তারী ফলাইলে রোগ সারে কেমনে?
কিন্তু কে শোনে কার কথা!
ক্লান্ত, তিত-বিরক্ত হয়ে ফিরছিলো, মাঝপথে গগনকে দেখে বীরেনের দুই ভ্রূর মাঝখানে গিট পড়ে-
লও, আমি ভাবতাছি অখন গিয়া বিছানায় টানটান ওইয়া একখানা ঘুম দিমু, আর পথে পাইলো পাগলে- ঠোঁট কুঁচকে যায় বীরেনের, নার্ভগুলি অখন কি অবস্থায় আছে কে জানে।
গগণ হাসে, 'অখন ফিরলেন?'
বীরেনের শরীর আরো শিথিল হয়ে আসে, সে দাঁড়ায় না, চলতে চলতেই বলে, 'হুঁ।'
গগন তার পাশাপাশি হাঁটতে থাকে, 'আপনার একটা কথা জিগামু কইয়া' -
তার কথা শেষ হয় না, বীরেনের গলায় বিরক্তি ফুটে ওঠে, 'কি কথা?'
এই বিরক্তি গগন টের পায় কিনা বোঝা গেল না। সে বলে, 'আইচ্ছা রোগ কি সারে?'
বীরেন ডাক্তার দাঁড়িয়ে পড়ে, 'মানে?'
কিন্তু গগনের মুখের দিকে তাকিয়েই সে দু'পা পিছিয়ে আসে, গগন তার দিকে তাকিয়ে আছে, চোখ দু'টো স্থির, সে দৃষ্টির জ্বলজ্বলে উজ্জলতার ওপর একটা অন্যমনস্ক মত্ততার ছায়া। বীরেন ঢোক গেলে, খুব মোলায়েম স্বরে ডাকে, 'গগন।'
গগন সেকেণ্ড-কয়েক তার দিকে একই দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, তারপর চোখ নামিয়ে নিয়ে কোনো কথা না বলে মাথা ঝুঁকিয়ে উল্টো দিকে হাঁটতে শুরু করে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
রোদ পড়ে এসেছে। উঁচু ডাঙা জমির ছাই ছাই রঙের ঘাস, কোঁকড়ানো আগাছা, তার মধ্যে সরু আলের ওপর দিয়ে গগন হেঁটে যাচ্ছে।
বীরেন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। এখন তার শরীরের ক্লান্তি, মনের বিরক্তি কিছুই তাকে স্পর্শ করছে না; আলের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া গগন, দূরে খাল পেরিয়ে ওই নীচু জমির বিস্তৃত প্রান্তর, তার মাঝখানে মাঝখানে গাছপালা নিয়ে ছোট ছোট দ্বীপের মতো গ্রাম–এই সবের দিক তাকিয়ে বীরেন নিজের মনে বিড় বিড় করে, কথাটার মানে কি?
বীরেনের দু'কামরা ইটের ঘর। টিনের চাল দাওয়া পর্যন্ত ঢাকা। উঠতে বাঁদিকে দাওয়ার সঙ্গে লাগানো সামনে প্রসারিত হাতের মতো রান্নাঘর, ঘরটি বেড়ার, চাল টিনের।
উঠোনের এক পাশে একটা পেয়ারা গাছ, তার নীচে ভাঙা সানের দু'হাত বাই দেড় হাত একটা টুকরো ফেলা, সেখানে দাঁড়িয়ে খালি গায়ে বীরেন হাত পা ধুতে ধুতে কথা বলে, বুঝলি নেপাল!
নেপালকে সম্বোধন করলেও দাওয়ায় বসে থাকা সকলেই বীরেনের দিকে তাকায়, পা ধুতে ধুতে বীরেন বলে, 'গগণটার মাথা মনে হয় এইবার ভালো মতনই বিগড়াইছে।'
বীরেন শেষবারের মতো মুখ ধোয়, কুলকুচি করে, 'উঁ, তর গিয়া কথা কম কয় আগাগোড়াই, অখন মনে অয় ব্যাপার আরো খারাপের দিকে।'
গগনের প্রসঙ্গে সকলের চোখ মুখেই গাম্ভীর্যের ছায়া পড়ে, তবু বীরেন কি বলে শোনার জন্যে উৎকর্ণ থাকে সবাই। বীরেন হাত মুখ মুছতে মুছতে দাওয়ার উঠে আসে; কিন্তু খারাপের দিকে কেন মনে হচ্ছে সে ব্যাখ্যা বীরেন দেয় না।
দেওয়ালে হেলান দিয়ে পাটির উপর বসে, 'চা খাইছস তরা?'
বীরেনের কণ্ঠস্বর বরাবরই একটু ভাঙা ভাঙা। চৌকো, তামাটে, কিঞ্চিৎ শীর্ণ মুখ; হাসলে মুখের দু'পাশে পাতলা সরু ক'টা ভাঁজ পড়লেও চোখ দুটো বুঁজে আসে, দাঁতের মাড়ি পর্যন্ত দেখা যায়, ফলে এই ভাঙা–চোরা শীর্ণতা সত্ত্বেও হাসিটিতে ভারী ছেলে মানুষী সারল্য আসে।
কিন্তু বীরেনের মুখে এখনও হাসি নেই। হারিকেনের লালচে আলোয় বেশ ক্লান্ত দেখায় তাকে। প্রশ্নের উত্তরে স্ত্রী হিমানী বলে, 'না, এই তো আইলো সব।'
–'অ, এক গ্লাস জল দেও।'
–'দুইটা মোয়া দেই?'
এতোক্ষণে খেয়াল করে পাটির মাঝ–বরাবর কাঁসার বাটিতে একটা মোয়া। পাঁচ/সাতটা ভাঙা চোরা মুড়িও ছড়িয়ে আছে পাটিতে। বীরেন সেগুলো খুঁটে তুলতে তুলতে বলে, 'না, থাউক গা।' বাটির দিকে তাকায়; 'খাইলি না?'
মধু বাটি এগিয়ে দেয়, খাইছি, আপনে খান। বীরেন মোয়াটি তুলে নিয়ে মুখে দেয়।
মোয়া চিবোতে চিবোতে জিজ্ঞেস করে, 'তরা কৈ আছিলি এতোক্ষণ?'
মুখভর্তি মুড়ি, কথা তার জড়ানো জড়ানো হয়ে বেরোতে থাকলে বীরেন আধ–চিবানো মুড়ির বেশ খানিকটা তাড়াতাড়ি গিলে নিয়ে অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক গলায় জিজ্ঞেস করে, 'নিখিল গো বারী?'
–'না, নিখলদা তো বারীত নাই, শ্বশুর বারী গেছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
বীরেন তাহলে ভালোই করেছে নিখিলদের বাড়িতে না গিয়ে।
নৌকো থেকে নেমে সে হরেন্দ্রর দিকে ফিরে বলছিলো, যেমুন যেমুন কইলাম মনে থাকবো তো? নৌকোয় বসে হরেন্দ্র মাথা নাড়ে, হ।
গলুই ধরে ঠেলে দিয়ে বীরেন সোজা হয়ে দাঁড়ায়, 'কেমুন থাকে কাইল আইসা জানায়া যাইস; দেরী করিস না, সককালেই কানাইপুর যাইতে ওইবো আমার।'
বীরেন ডাক্তারের স্বর নীচু থেকে উঁচুতে ওঠে, কেন না হরেন্দ্র ততক্ষণে খালের মাঝ বরাবর চলে যাচ্ছে।
উঁচু পাড় বেয়ে উঠতে উঠতে ভাবে, নিখিলদের বাড়িতে যাবে নাকি? হয়তো ফনি নেপাল মধুরা আছে। তাস খেলা চলছে। বাজে ক'টা? গাছপালার ছায়ার অন্ধকারের ভেতর শ্যাওলা শ্যাওলা চাঁদের আলোতে বীরেন ঘড়ি দেখে। একবার মনে হয় সাড়ে সাতটা, একবার মনে হয় আটটা পঁচিশ, আবার মনে হয় পৌণে আটটা। দেশলাইটা জ্বালিয়ে দেখবে? তাহলে আবার হাতের ব্যাগ নামিয়ে রাখো, পকেট থেকে দেশলাই বার করে জ্বালো, যে রকম বাতাস, জ্বালতে গেলেই বার বার নিভবে।
হিমানী জল আনে। গ্লাস নিতে নিতে বীরেন বলে, 'আইচ্ছা তোমাগো কি কামটা কও তো?'
–'ক্যান কি ওইলো?'
–'যা একখান্ অসুবিধায় পরছি আইজ, আমার ব্যাগে হাত দেয় কে?'
–' তোমার ব্যাগে আবার কে হাত দিবো?'
–' আমার টচ'....
এতোক্ষণে চিন্তিত জিজ্ঞাসু চোখে মুখে হাসি ফোটে হিমানীর, 'মজিদরে তুমি না কাইল সারাইতে দিলা?'
–'ওহ হো, তাইতো।' বীরেন এবার হাসে।
ছোট মেয়েটি ঘরের ভেতর থেকে টর্চটা এনে দেয়। সমাবেশ নীরবে হাসে। হিমানী হাসতে হাসতে বলে, 'এই তাল করবো সব সময় উনি। পকেটে কলম থুইয়া বারী মাথায় তুলবো, আমার কলম কৈ, কলম কৈ।'
হিমানী বীরেনের খোঁজার ভঙ্গি নকল করে দেখায়। তার কথা ও ভঙ্গিতে অন্য সবাই সশব্দে হাসে। বীরেন লাইট জ্বালিয়ে উঠোনের দিকে ফোকাস দেয়, মুখে মনোযোগী ঔদাস্যের ভাব আনতে গিয়েও ব্যর্থ হয়, লজ্জাটে হাসি নিয়ে আলোর দিকে চেয়ে থাকে।
–'আইচ্ছা, এই মন লইয়া মাইন্ষে ডাক্তারী করে কেমনে?' স্ত্রীর এই শেষ বাক্যটিতে বীরেন অস্বস্তিবোধ করে।
স্বপন বীরেনের বিব্রত মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'রোগ আর ওষুধ নিয়া সব সময় ভাবে দেইখ্যাই এই সমস্ত ভুল হয়!'
স্বপনের কথায় বীরেন যেনো শক্ত করে ধরে উঠে দাঁড়ানোর একটা অবলম্বন পায়, সে বলে, 'চা কৈ? বাহ্, চা দাও!'
বীরেন শুধু অস্বস্তিই বোধ করেনি, বিরক্তও হয়েছে স্ত্রীর কথায়।
বীরেনের বয়েস একচল্লিশ চলছে, কিন্তু তার চেয়েও বারো/চোদ্দ বছর কম বয়সের এইসব ছেলে ছোকরাদের সঙ্গে তার ওঠা–বসা, হাসি–তামসা, আড্ডা! হোক এরা অতি কাছের মানুষ, তবু তার পেশা নিয়ে অন্যের সামনে এই ধরনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ঠাট্টা।
–'মা, ছাকনিটা কৈ?'
রান্নাঘর থেকে বড় মেয়ে মিনতির গলা শুনে হিমানী আসর ছেড়ে উঠে যায়।
না, মজিদ–কাজের ছেলে, ডাক্তার মানুষের টর্চ; দেরী হলে অসুবিধে হবে–এই কাণ্ডজ্ঞানটা আছে। নিজেই এসে দিয়ে গেছে আজ।
কিন্তু কখন দিয়ে গেছে সে কথা আর জিজ্ঞেস করে না বীরেন।
চা এসে যায়। চুমুক দিয়ে বীরেন বলে, 'আহ্।'
চা বীরেন একটু বেশীই খায়। শহরে–বাজারে ঘোরে, মানুষের কাছে বীরেনের বাড়ির চায়ের সুনাম আছে। সেই চা পেটে পড়তেই আসর চাঙা হয়ে ওঠে।
গল্প–গুজব হাসি–তামাশার মধ্যে বীরেন টের পেতে থাকে তার ভেতরকার এতোক্ষণের দম–চাপা অবস্থাটা কেটে গিয়ে বেশ হালকা বাতাস বইতে শুরু করেছে।
কিন্তু নেপালরা বিদায় নিলে খাওয়া দাওয়া করে শুতেই আবার সেই ভাবটা হতে থাকে। বীরেন এ ঘরে একলাই শোয়। মেয়েদের নিয়ে হিমানী ও ঘরে। আজ বুধবার, মেয়েরা ঘুমিয়ে গেলে হিমানী এ ঘরে আসবে;কিন্তু বীরেনের বড়ো ক্লান্ত লাগছে ক্লান্তির ভেতর সেই দম–চাপা সন্ধ্যাবেলাটা চেপে বসতে চাইছে থেকে থেকে।
নিখিলদের বাড়িতে না গিয়ে নিজের বাড়ির দিকে আসছে, জেলে পাড়ার কোণের জামগাছটার নীচে দেখে গগন দাঁড়িয়ে আছে। চারপাশে কোনো লোকজন নেই, তাঁর মধ্যে এই রাতের বেলা গগনকে দেখে বীরেন একটু থমকে যায়, গতকাল বিকেলের সেই চোখ দুটো মনে পড়ে। সে হাসবার চেষ্টা করে, 'কে, গগন?'
গগন তার দিকে এগিয়ে আসে, 'দ্যান, ঘায়ের মলমটা দ্যান।'
'ঘায়ের মলম?' বীরেন অবাক হয়ে গগনের দিকে তাকায়।
–'ক্যান, সকালে কইলাম, আনেন নাই?'
তার স্বরে বীরেন বুঝতে পারে না কি বলবে। সে মনে মনে ভাবে ঘায়ের মলম.... ঘায়ের মলম....–'ও হ হ ঘায়ের মলম। খাড়া।'
জামগাছের গায়ে পা নিয়ে উরুর ওপর রেখে বীরেন ব্যাগ খুলে নীচু হয়ে হাতড়ায়। তারপর 'বেটনোভেটে'র সরু টিউবটা তুলে বলে: 'এই তর ঘায়ের মলম।'
হাতে নিয়ে গগন প্যাকেট থেকে বার করে টিউবটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে থাকে।
–'খুব ভাল মলম!' ক্যানভাসারের খদ্দের পটানোর মতো করে বীরেন বলে, 'একটুতেই কাম দিবো।'
–'দাম কত?'
–'আঁ, দাম ? ও, তা ভালো হউক না, পরে; দিলেই চলবো!'
গগন আর কোনো কথা না বলে চলে গেলে বীরেন লম্বা করে নিঃশ্বাস ফেলে।
সিগারেট টানতে টানতে এখন ভাবে, গতকাল জিগাইলো,রোগ কি সারে? আইজ সকালবেলা অমুন হাপাইতে হাপাইতে দৌড়াইয়া আইলো, সন্ধ্যাবেলায় দাবী করলো ঘায়ের মলম, ছ্যামরাটার ওইছে কি?
কিন্তু বড় বাচা বাচছি আইজ। ভাগ্যিস আছিলো ব্যাগে!
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
হিমানী দুই ঘরের মাঝখানের দরজা দিয়ে এ ঘরে ঢুকে নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করে বীরেনের তক্তপোশের দিকে এগিয়ে আসে।
দরজা খুলে গগন বাইরে এসে দেখে, জ্যোৎস্না থৈ থৈ করছে। চারপাশ কী শুনশান! শুধু একটানা ঝিঁঝিঁর ডাক, সেই ডাক নিস্তব্ধতাকে আরো গাঢ় রে দিয়েছে।
ডাঙার গগন আকাশের চাঁদের দিকে তাকিয়ে হাসে। তারপর নির্জন খাল-পাড় দিয়ে সে হাঁটতে হাঁটতে চলে, গগনের সঙ্গে চাঁদও হাঁটে। হাঁটতে হাঁটতে তারা দু' জন জামতলায় আসে।
গগন গাছের নীচে বসলে চাঁদটা জামগাছের ডালে নেমে এসে ফিস্ ফিস্ করে ডাকে, 'গ গ ন!'
গগন চাপাস্বরে বলে, 'এই যে,আমি এইখানে!'
চাঁদ বলে; 'মলম আনছ?'
গগন উঠে দাঁড়ায়, দেখে, চাঁদের গালের দগদগে ঘা' টা আজ আরো বেড়েছে।
বেদনায় মমতায় গগনের বুকের ভেতরটা টনটন করে, তবু সে হাসে, মলমটা তুলে দেখায়, 'এই যে আনছি।'
চাঁদ বলে, 'আহ্ গগন, তুমি বড়ো ভালো!'
এ কথায় গগনের বুক ভরে গিয়ে তার চোখে জল আসে। সে প্যাকেটের ভেতর থেকে টিউবটা বার করে নিয়ে বলে, 'খাড়াও, আমি আইতাছি।'
গগন এদিক ওদিক তাকিয়ে আস্তে আস্তে জামগাছে উঠতে থাকে।
ভোরবেলা জেলেপাড়ার তারকদাস মাঝি প্রথম আবিস্কার করে, চিৎ হয়ে গগন পড়ে আছে মাটিতে, নাক মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসা রক্তের ধারা শুকিয়ে আছে। পাশে পড়ে আছে একটা বড়ো ভাঙা জাম ডাল।
খবর পেয়ে বীরেন দৌড়ে গিয়ে দেখে, কলরবরত বহু লোকজনের মাঝখানে মৃত গগন গড়ে আছে।
তার মুঠোয় তখনো মলমের টিউবটা ধরা।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈতৃক ভিটে ও মালপদিয়ার রমণী মুখুজ্জে

গ্রামের নাম মালপদিয়া। লোকে বলে মালোইদ্দা। ফাঁকা মাঠ, ডাঙা জমি, জায়গায় জায়গায় গাছপালা, দূরে দূরে উঁচু দ্বীপের মতো কাঠের পাটাতনওলা টিন বা বেড়ার ঘর নিয়ে এক একটা বাড়ী। বিক্রমপুরের এই বৈশিষ্ট্যহীন গ্রামটি দেখবার জন্যে চার মাইল পথ কখনো পাটক্ষেত কখনো পোড়ো ডাঙা জমি, কখনো নিচু জমির আল ভেঙে, পানি কাদা মাড়িয়ে, নালা ডোবা, নড়রড়ে বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে জষ্টি মাসের চামড়া- পোড়া রোদে কেউ যায়?
জৈনসার গ্রাম থেকে পথ প্রদর্শক হয়ে আসা যুবকটি বিরক্ত হয় মনে মনে।
প্রথম প্রথম সহাস্য প্রশ্রয়ে গল্প করতে করতে চলছিলো, কিন্তু রোদ প্রখর হতে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
থাকলে মুখের হাসিটি তার শুকিয়ে যায়, বাক্যহীন মুখটি হয় গম্ভীর, বিরক্তি গোপন করা দুষ্কর হয়ে ওঠে তার পক্ষে। কিন্তু আমরাও নাচার। কষ্ট কি তার একার? রোদ, পথ হাঁটার পরিশ্রম, ক্লান্তি সে তো আমদেরও। অবশ্য পার্থক্যও আছে, আমরা যাচ্ছি প্রত্যাশার কৌতূহল নিয়ে, সে চলেছে ভদ্রতার দায় টেনে টেনে। প্রাপ্তিহীন ভদ্রতা টোল খেতে কতক্ষণ!

কিন্তু মালপদিয়ায় পৌঁছে আর এক সমস্যা। এই গণ্ডগ্রামে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে চেনার তো প্রশ্নই ওঠে না, এতো বছর পর এই গ্রামেরই মানুষ তাঁর বাবা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়কেই বা কে চিনবে? কিন্তু হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়কে চেনাতে না পারলে তাঁর ভিটেও খুঁজে বার করা যাবে না।

মনে মনে ঠিক করি এই গ্রামের সবচেয়ে প্রাচীন ব্যক্তিটিকে পেতে হবে।

গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতে থাকা মানুষজন আমাদের দেখে কৌতূহলী হয়, একজনকে জিজ্ঞেস করি, 'আচ্ছা আপনাদের এই গ্রামের সবচেয়ে বয়স্ক লোক কে?'

ধুতিপরা, উদোম গায়ের, কালো, না যুবক না প্রৌঢ় মানুষটির দুই ভ্রুর মাঝখানে গিঁট পড়ে, ক্যান? অন্যান্যরাও এগিয়ে আসে, কি ব্যাপার?

মহা সমস্যায় পড়লাম দেখছি, ব্যাপারটা কিভাবে বোঝানো যায়? মুখে হাসি এনে বলি, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নামে খুব বড় একজন লেখক, তাঁর পৈত্রিক ভিটে আপনাদের এই গ্রামে, সেই ভিটে দেখতে এসেছি।'

ভিটে মানে জায়গা জমি। বড় গোলমেলে জিনিস, বিশেষত: বাঙলাদেশে। কে জানে, কার জমি বেদখল করার মতলবে এরা এসেছে না কি কে বলবে! কেউ কেউ ঝামেলা এড়াবার জন্যে সরে যায়, যে লোকটিকে প্রশ্ন করেছিলাম তার মুখে সন্দেহের ছায়া দেখেও তাকে বলি, হেসেই বলি, 'দেখুন ব্যাপারটা তেমন কিছু নয়, আমরা শুধু ভিটেটা দেখার জন্যে সেই ঢাকা থেকে এসেছি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় খুব বড় লেখক, তাঁর পৈতৃক ভিটে আপনাদেরই গ্রামে, এতো আপনাদের গৌরব। আপনারা জানেন না, আপনাদের গ্রামের খুব বুড়ো কেউ থাকলে তিনি হয় তো বলতে পারেন'

লোকটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্যে গৌরবের অংশিদারিত্ব নিতান্ত অবহেলায় ছেড়ে দিয়ে, কি ভেবে, হয় তো বার বার 'লেখক লেখক' শুনে, কথাবার্তা এবং পোশাক-আশাকে আমাদের আগ্রহের ব্যাপারটি তার মতো করে বুঝে বলে, 'এই গ্রামে সব চাইতে পুরানা মানুষ রমণী মুখুইজ্জা, ওই যে গাছপালা, ওইখানে গেলেই একতলা পাকা দালান, ওইটাই রমণী মুখুইজ্জার বাড়ি।' চিনিয়ে দেবার জন্যে সঙ্গে একটি বালককেও পাঠায়।

অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে অদেখা অচেনা রমণী মুখোপাধ্যায়ের উদ্দেশে বিদায় নিই তার কাছ থেকে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম সাঁওতাল পরগণার দুমকা শহরে হলেও আদি পৈতৃক নিবাস ঢাকা জেলায় বিক্রমপুরের শিমুলিয়া গ্রামে, কিন্তু লেখকের পিতামহ অর্থাৎ হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবা করুণাচন্দ্র মালপদিয়া গ্রামে তার মামা ব্রজনাথ চক্রবর্তীর বাড়িতে লালিত পালিত হন এবং এখানেই বসবাস করেন আজীবন। সেই সূত্রে মালপদিয়াই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈতৃক নিবাস বলে পরিচিত।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় নিদারুণ অস্বচ্ছলতার মধ্যেই ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল, ঢাকা কলেজ ও কলকাতা সিটি কলেজে পড়াশোনার পর ১৮৯৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'বি কোর্স' বা বিজ্ঞান বিভাগে বি.এ. পাশ করেন। মালপদিয়া গ্রামের তিনিই প্রথম গ্রাজুয়েট।

এইসব তথ্য মাথায় নিয়ে রমণী মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে গিয়ে উঠলাম হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভিটের খোঁজে।

খানিকটা ঢালু বেয়ে ওপরে উঠে গাছপালার ভেতর একতলা জীর্ণ একখানা কোঠা বাড়ি। সদর দরজা বলতে কিছু নেই। যেখানে সদর দরজা হতে পারতো তার পাশেই বেড়ার তৈরি রান্নাঘর। সেই রান্নাঘরের সামনেই দেখা হলো মলিন শাড়ি পরিহিতা এক শীর্ণকায়া মহিলার সঙ্গে, তার মুখ দেখে ঠিক বয়েস আন্দাজ করা যায় না, ৩৫ও হতে পারে ৪৫ও হতে পারে। শীর্ণ মুখটি বড় বিষাদময়, দেখলেই বুকের ভেতরটা কেমন মুচড়ে ওঠে। সঙ্গের বালকটি তার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বলে, 'এনারা দাদুর লগে কথা কইতে চায়।'

মহিলা আমাদের দিকে ভালো করে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'কোইথে ইকা আইছেন আপনারা? কি ব্যাপার?'

আবার সেই বিপদ। মরিয়া হয়েও বলি, 'দেখুন একজনের দাড়ির খোঁজে এসেছি, খুব পুরোনো কালের মানুষ না হলে তার পরিচয় দিতে পারবে না কেউ, শুনলাম রমণী মুখুজ্জে'...

–'হ, আমার শ্বশুর। কিন্তু উনি কানেও শুনেন না চোখেও দেখনে না, মাস–দুই আগেও ঘুইরা বেড়াইছে, অহন তো এককেরে বিছানায় পড়া।

নীলু আমার কানে বলে, 'ওই যে রমণী বাবু। উনিই হবেন নিশ্চয়ই।' দরজার ফাঁক দিয়ে দেখি এক বৃদ্ধ বসে আছেন মাথা নীচু করে, সম্পূর্ণ মানুষটা নয়, খানিকটা অবয়ব চোখে পড়লো, ভারী গলার কাশিও কানে এলো। হঠাৎ কেমন উত্তেজনা বোধ করলাম। বহুদূরে অতীতের কত আলো আঁধারি, জীবনযাপনের কতো সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা ওই পক্বকেশ প্রাচীন মস্তকটির কোষে কোষে সঞ্চিত আছে, সেখানে হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় আছে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আছে।

রমণী মুখোপাধ্যায়ের পুত্রবধূকে বলি, 'দেখুন আমরা অনেক দূর থেকে এসেছি। বাড়িতে পুরুষ মানুষ কেউ নেই? রমণীবাবুর সঙ্গে একটু আলাপ করতে চাই।'

পথ দেখিয়ে নিয়ে আসা ছেলেটিকে কাকে যেন ডেকে আনতে বলেন মহিলা। বালকটি চলে যায়।

খানিকটা সঙ্কোচ নিয়ে মহিলা এবার জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা কি 'হিন্দু, না মোসলমান?'

বড়ো বিব্রতকর প্রশ্ন। আমাদের সঙ্গী গাইডটি সঙ্গে সঙ্গে বলে, 'না আমরা হিন্দু না, মুসলমান।'

মহিলা রান্নাঘরের দরজায় খুঁটি ধরলেন। তারপর আমাদের দিকে আবার তাকালেন, সেই বিষাদময় মুখের দৃষ্টি দেখে বুকের ভেতর আবার মুচড়ে উঠলো, আহা, কেন পরিচয় দিতে গেলো। মনে মনে বলি, পরিচয় পেয়ে ওই যে তিনি হঠাৎ রান্নাঘরের দরজার খুটি ধরলেন, ওই যে চোখের তারা কেঁপে উঠলো, ওই যে দৃষ্টিতে ছায়া পড়লো–ওসব দেখে আহত হয়ো না, লজ্জিত হও। এ তোমার এ আমার পাপ!

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
অল্পক্ষণের মধ্যেই রমণী মুখুজ্জের নাতি এলো। লুঙ্গিপরা, খালি গা, ১৭/১৮ বছরের বেশ মজবুত শরীর। মায়ের মতোই চাপা শ্যামলা রঙ, তবে বিষাদময় নয়, প্রাণ প্রাচুর্যে চঞ্চল চোখ মুখ তার সদা-হাস্যময়।
সেই কিশোর-যুবা তার দাদুর কাছে নিয়ে গেলো আমাদের।
আচ্ছাদনহীন সরু বারান্দার পর মূল বিল্ডিংটার তিনটি দরজা, দরজা পেরুলেই ভেতরে কাঠের কড়ি বরগা লাগানো উঁচু শিলিংয়ের একটা লম্বা হলের মতো, সেই হল ঘরের এক প্রান্তে একটি বিছানাহীন জীর্ণ তক্তপোষ পাতা, সেখানে বসলে ঠিক নাক বরাবর দরমার বেড়ার পার্টিশনের দিকে পিঠ করে মেঝেতে পাটির ওপর এক বৃদ্ধ বসে আছেন মাথা ঝুঁকিয়ে। ছোট ছোট করে, ছাঁটা চুল, সমস্ত মাথাটিই শাদা, কিন্তু সেই শাদা বকের মতো নয়, শাদা কাপড়ে খুব ঘন করে নীল দিলে যেমন রঙ হয়, বৃদ্ধের চুলের রঙ তেমনি; খালি গা, শিথিল চামড়ার ওপর উপবীতটি ব্রাহ্মণত্বের শেষ গৌরব ধরে রেখেছে। জীর্ণ লুঙ্গি পরা কোমরের কাছে মোটা মলিন রঙিন হ্যাণ্ডলুমের একখানা চাদর কোনভাবে জড়িয়ে আছে।
তাঁর বসে থাকা, তাঁর গুম্ফহীন খোঁচা খোঁচা দাড়িময় অত্যন্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ মুখমণ্ডলের মাখখানে উদ্যত খাঁড়ার মতো নাক-সব মিলিয়ে এক ভীতিময় রোমাঞ্চ জাগে। পাশে একটি ছোট্ট বালিশ, তার ওপর ততোধিক ছোট্ট ওয়াড়, ফলে নানান কাপড়ের জোড়াতালি দেওয়া অপরিচ্ছন্ন বালিশটির শক্ত অবয়বের এক চতুর্থাংশ বেরিয়ে আছে। তার পাশে ছেঁড়া-খোঁড়া একটি তালপাতার পাখা। একটি সস্তা দামের ছোট এলুমিনিয়ামের বাটি।
বৃদ্ধের নাতি হাত কয়েক দূরে বসে থাকা তার দাদুর কাছে নিয়ে যায় আমাদের। দেখি সেই বাটিতে মিষ্টি জাতীয় রসালো কিছু ছিলো, কালো কালো ক্ষুদে পিঁপড়ে তার লোভে শূন্য বাটিতে ভিড় করেছে।
প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসস্তূপের মতো ঘোলা চোখে এই যে বৃদ্ধ বসে আছেন, শেষ বয়সে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবাও কি এমনি বসে থাকতেন? মৃত্যুকালে তাঁর বয়েস হয়েছিলো ৮৮, রমণী মুখুজ্জে কি এখন সেই বয়েসে পৌঁছেছেন, না তারও বেশি? কে বলবে?
রমণী মুখুজ্জের ছেলে আসেন। বয়েস ৪৭/৪৮, কালো ছিপে ছিপে শরীর, ব্যাকব্রাশ করা ঈষৎ কোঁকড়ানো চুল, সেই চুলে দুই কানের পাশে পাক ধরেছে; খাটো করে ধুতিপরা, খালি গা, কালো শরীরের ঝোলানো শাদা উপবিতটিকে আরো শাদা দেখায়। মাঠের কাজের তদারকি ফেলে এসেছেন খালি পায়ে ধূলো নিয়ে। কিন্তু গোঁফ দাড়ি কামানো চৌকো মুখের হাসিটিতে শহুরে ছাপ।
-' কোথা থেকে আসছি? কি ব্যাপার?' সেই একই প্রশ্ন।
ব্যাপার বললাম। রমণী মুখুজ্জের ছেলে আমাদের দিকে ভালো করে তাকালেন তেমনি হাসি মুখে। ডেকে নিয়ে গেলেন ঘরে। ঘর মানে সেই হল রুমের পরেই দুই প্রান্ত পাশাপাশি দু'টি রুম। হলরুমে তক্তপোশের লাগোয়া একটি বন্ধ দরজা লক্ষ্য করেছিলাম ভেতরে ঢুকে। রমণী মুখুজ্জের ছেলে সে রুমে না নিয়ে গিয়ে বৃদ্ধের পিঠের দিকে যে বেড়ার পার্টিশন, তার ওধারে অন্য রুমে নিয়ে বসান।
ঘরটির পেছন দিকে একটি মাত্র জানালা। জুলাই মাসের ঘোরতর দুপুরেও ঘরের ভেতর শেষ বিকেলের ম্লানতা। হল ঘরের মতো এ ঘরের দেওয়ালেও চুন-

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
সুরকি-খসা-জীর্ণতার চিহ্ন জায়গায় জায়গায়। আসবাব বলতে একটি চওড়া পুরোনো তক্তপোশ এবং একটি কাঠের সিন্দুক, তক্তপোশের চেয়ে সিন্দুকটি আরো পুরোনো। রমণী মুখোপাধ্যায়ের ছেলে আমাদের নিয়ে তক্তপোশের ওপর বসে ছেলেকে ডেকে চা দিতে বললেন।

আবার তেমনি হাসি, 'ব্যাপারটা কি কন তো? জায়গা জমির কোন ব্যাপারে' – বোঝা গেলো বিষয়টি তার কাছে ধোঁয়াটে, কে না কে একজন লেখক, তার পৈতৃক ভিটের খোঁজে সেই ঢাকা থেকে এই রোদে মানুষ আসতে পারে, রমণী মুখুজ্জের ছেলের কাছে একথা অবিশ্বাস্য, মুখের হাসির আড়ালে সেই সন্দেহের স্থির ছায়া দু'চোখে।

মুড়ি, নারকেল-কাটা তার সঙ্গে গুড় এলো, চা এলো। খেতে খেতেই নাম পরিচয় হলো পরস্পরের। খানিকটা হাসি, খানিকটা হাত বা মাথা নাড়া, 'কি যে বলেন, না, না আপনি নিঃসঙ্কোচে বলুন'-এই ধরনের দু'চারটি বাক্যতে বিমলবাবু সহজ হয়ে আসেন, সন্দেহের পর্দা সরে যায়, 'কি আর কমু, দ্যাশ গ্রামের অবস্থা ভালো না, আত্মীয় স্বজন সব ওই পারে, যে কোন দিন চইলা যাইতে পারি, পারি না খালি বাবার জন্য, এমুন বৃদ্ধ, দুর্বল, অক্ষম মানুষ নিয়া এতো দূরের পথ কেমনে যাই, বাবা দেহ রাখলেই যামু গিয়া। কেমনে থাকি কন, নিজের জায়গা জমি তা-ও রক্ষা করা দুষ্কর, জীবনের উপর দিয়াও হামলা গেছে পথে, ঘরে ওইলো ডাকাতি, এমুন কইরা ভয়ে ভয়ে মানুষ বাচে কেমনে!'

রমণী মুখুজ্জে ঘাটশিলার স্টেশন মাস্টার ছিলেন বৃটিশ আমলে। তার ছেলে বিমল এক সময় ঢাকায় লায়ন সিনেমার বুকিং ক্লার্কের কাজ করেছেন, সপরিপারে থাকতেন জিন্দাবাহারে। (ভাষার টানে ঢাকা শহরের প্রভাব লক্ষ্য করলাম।) এখন স্ত্রী ছেলে মেয়ে এবং বৃদ্ধ বাবাকে নিয়ে দেশে জমিজমা দেখা শোনা করে, সর্ব কনিষ্ঠ ভাইটি বছর দুয়েক আগে চলে গেছে এখান থেকে সংস্কৃতে আদ্য মধ্য শেষ করে। এখন বাটানগরে এক হাইস্কুলে সংস্কৃতের শিক্ষক। ভালো আছে। বিমলও যাবে-বাধা শুধু এখন বাবা। কাজেই ঐ বৃদ্ধ পিতার মৃত্যু-প্রতীক্ষা ছাড়া বিমলের আর কি-ই বা করার আছে।

বিমলবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। মুখে তার হাসি, কপালে হাত ঠেকিয়ে বললেন, 'কপাল, বুঝলেন কপাল!' বিমল মুখুজ্জে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, চোখে কি তার জল এসে গিয়েছিল? কি জানি। তাড়াতাড়ি উঠে বললেন, 'চলেন বাবার কাছে, দেখি আপনাগো ঠিকানার হদিশ মেলে কি না।' আবার হাসলেন, 'আশ্চর্য মানুষ আপনারা, এই সামান্য ব্যাপারে এতো দূরের পথ...সত্যি আশ্চর্য' বিমল মুখুজ্জে মাথা নাড়েন। আমরা ঘরের বাইরে পার্টিশনের এপারে আসি।

বিমলবাবু মেঝেতে উবু হয়ে বসে রমণী মুখুজ্জের কানের কাছে নিয়ে গিয়ে উচ্চৈঃস্বরে ডাকেন, 'বা বা।'

অন্ধ রমণী মুখুজ্জে নির্বিকার, অভিব্যক্তিহীন বসে থাকেন। বিমলবাবু আবার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
তেমনি গলায় বলেন, 'বা বা।'
রমণী মুখুজ্জে এবার তার বামে, বাইরে যাবার দরজার দিকে মুখ ফেরান, চক্ষুষ্মান ব্যক্তি যেমন বাইরের দিকে তাকায়, রমণী মুখুজ্জে তেমনিভাবে তাকিয়ে বলেন, 'বাইরে কে ডাকে? কেডা আইলো?'
তাঁর গলা গম গম করে। আমরা হাত কয়েক দূরে মেঝের ওপর দাঁড়িয়ে আছি, বিমল আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসেন, 'বুঝতে পারে নাই'
আবার রমণী মুখুজ্জের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে আরো জোরে বলেন, 'বাইরে না, তোমার সামনেই তো আমি।'
এবার রমণী মুখুজ্জে ঘোলা চোখ তুলে বিমলের দিকে মুখ ফেরান, 'তুই কে রে।'
–'আমি বিমল।'
–'অ, তুই বি–ম–ল।'
আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে যান। কিন্তু পুত্রের নামটি টেনে উচ্চারণে কী যে স্নেহ এবং নিশ্চিন্ত নির্ভরতা ফুটে উঠলো তার কোন বর্ণনা হয় না। মুহূর্ত কয়েক অভিভূত হয়ে তাকিয়ে থাকি বৃদ্ধের দিকে। রমণী মুখুজ্জে কি জানেন তাঁর ছেলে তাঁকে ভবিষ্যতের বাধা মনে করে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় আছে?
আর ঐ যে বিমল সেই সম্বোধনে পিতৃস্নেহে অভিষিক্ত কোমল চোখে পিতার দিকে তাকিয়ে আছে–এই সত্যের সঙ্গে তার একটু আগে বলা সত্যের দ্বন্দ্ব–মিলনের রূপটি কেমন? পরিবারের আর সবাই? বিমল বাবুর এই যে সংসার, তাঁর স্ত্রী, তার পুত্র এবং কন্যা– এই বৃদ্ধকে কেন্দ্র করে বিমলের সঙ্গে নিশ্চয়ই একটি মানসিক ব্যবধান আছে তাদের, কেননা এই বৃদ্ধের সঙ্গে বিমলের যেমন সম্পৃক্ততা অন্যের তেমন হতে পারে না। রমণী মুখুজ্জেকে বাধা মনে করা বা তাঁর মৃত্যু প্রতীক্ষা করার মধ্যেও অন্যের সঙ্গে বিমলের দুস্তর পার্থক্য। বাইরের মানুষ যখন থাকে না কোন কোন রাতে কিংবা একান্ত ঘনিষ্ঠ পারিবারিক পরিবেশে অনিশ্চিত ভবিষ্যত, অসুখী, দুশ্চিন্তা–ভরা বর্তমান তখন কোন রূপ নিয়ে দাঁড়ায় এদের সামনে? কোনো তিক্ত অসন্তোষের বিষবাষ্পে কি এই ঘর ভরে ওঠে? সেখানে বিমল কি খুব একা হয়ে যায়? তখন ঐ বৃদ্ধ পিতার ওই স্নেহসিক্ত 'বিমল' ডাকের জন্যে তার ভেতরটা কি হাহাকার করে ওঠে? অন্ধ বধির রমণী মুখুজ্জে কি সেই কদর্য বাস্তবতাকে অনুভব করতে পারেন?
বিমল আমাদের জিজ্ঞেস করেন, 'কি জানি নাম কইলেন?'
–হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।'
বিমল আবার পিতার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলেন, 'আমাগো গ্রামে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে কেউ আছিলো?
বিমলবাবুকে বলি, 'বলুন, তাঁর ছেলে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, খুব বড় লেখক।'
বিমলবাবু আমাদের কথার হুবহু প্রতিধ্বনি করেন তাঁর বাবার কাছে।
রমণী মুখুজ্জে চুপ করে থাকেন।যেন শুনতে পাননি। বিমলবাবু আবার বলার প্রস্তুতি নিলে রমণী মুখুজ্জে মুখ খোলেন, 'কি কইলি? হরিচরণ বাড়ুইজ্জা? না, চিনি না।' আবার নীরব হয়ে যান, মাথা ঝুঁকিয়ে যেন অতীতের অন্ধকার জলরাশির মধ্যে হাঁসের মতো ডুব দেন।
আমরা তাঁর অভিব্যক্তি দেখে বুঝতে পারি সেই অন্ধকারের মধ্যে তিনি হাঁতড়ে হাঁতড়ে খুঁজছেন, কোনো প্রশ্ন না করে বিমল এবং আমরা প্রতীক্ষায় চেয়ে থাকি।
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
মুহূর্ত–কয়েক পর যেনো তিনি পেয়েছেন এমনভাবে ভেসে উঠে স্বগতোক্তির মতো বিড় বিড় করেন, 'হরিচরণ বাড়ুইজ্জারে চিনি না, তবে হরিহর বাড়ুইজ্জা আছিল।'
আমাদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, হরিহর, হরিচরণ নয়, ভুল হয়েছিলো, হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়।'
দু'পা এগিয়ে যাই তাঁর দিকে। তিনি যেনো অতীতের দিকে চোখ রেখে বলেন, 'তার ছেলে সুধাংশু বাড়ুইজ্জা বড় সরকারী চাকরী করতো।'
–'হ্যাঁ হ্যাঁ'–আনন্দে উত্তেজনায় এবার বিমলের পাশে রমণী মুখুজ্জের কাছে গিয়ে বসে পড়ি–যেন পরিবারের একজন, যেনো আমার পরিবারেরই গুরুজন এমনভাবে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। তিনি স্মৃতি রোমন্থনের মতো করে বলেন, 'হরিহর বাড়ুইজ্জা এই গ্রামের প্রথম গ্রাজুয়েট, তাঁর ছেলে সুধাংশু বাড়ুইজ্জা খুব বড়ো সরকারী চাকরী করতো।'
–'হ্যাঁ, হ্যাঁ আবহাওয়া দপ্তরের উঁচু পোস্টে'
–'সুধাংশু বাড়ুইজ্জার বিয়াতে কলিকাতায় নেমন্তন্ন খাইছি,' বৃদ্ধের মুখে সেই সুখ স্মৃতির জন্যে মৃদু হাসি ফোটে, 'ভালো খাওন দাওন হইছিলো, গ্রামের মানুষকে যে ক'জন কলিকাতায় আছিল, 'তাগো খুইজা খুইজা নেমন্তন্ন করছিল হরিহর বাড়ুইজ্জা, বেশ বড়ো ঘরে বিয়া হইছিলো।'
আচ্ছা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিনতেন না? হরিহর বাড়ুজ্জের ছেলে সুধাংশু বাবুর ছোট, খুব বড় লেখক।
রমণী মুখুজ্জের আবার হাতড়ান। তারপর মাথা নেড়ে বলেন,
–'না চিনি না।'
না চিনুন। আমরা খুশি। বিমলবাবুও খুশি। আমরা খুশি আমাদের প্রত্যাশা পূরণ করে দিতে পারাতে। সে বাবার দিকে তাকায় খানিকটা গর্বের চোখে, যিনি এতো বড় লেখক, যাঁর পৈতৃক বাড়ীর খোঁজে আমরা ঢাকা থেকে এই গণ্ডগ্রামে এসেছি, এমন একজন বিখ্যাত ব্যক্তির বাবার সঙ্গে, তার এতো বড় অফিসার ছেলের সঙ্গে পরিচয় ছিলো, তার বিয়েতে নেমন্তন্ন পর্যন্ত খেয়েছে বিমলের বাবা, বোধকরি এ ধরনের একটি ভাব ছিলো বিমলের মধ্যে।
বিমলবাবু এবার হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভিটের কথা জিজ্ঞেস করেন, 'এনারা তার ভিটার খোঁজে ঢাকা থেইক্যা আইছে।'
–'ক্যান, জায়গা জমির কোন ব্যাপার?'
রমণী মুখুজ্জের স্বাভাবিক প্রশ্ন। বিমল বাবু ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললে তিনি বলেন, 'অ!' তারপর খানিকক্ষণ নীরব থেকে ধীরে ধীরে বলেন, 'ভিটা তো তার নিজের না, হরিহর বাড়ুইজ্জার বাবার মামা ব্রজনাথ চক্কোত্তির, হরিহর বাড়ুইজ্জা ওই বাড়িতে মানুষ; কিন্তু সেই ভিটার তো কিছুই অহন আর নাই, অন্যেরা আছে, কেউ চিনবোও না। এক কাম কর, মোহান্ত মণ্ডলের লগে দেখা করতে ক, তার বাড়ির পাশেই ব্রজ চক্কোত্তির ভিটা। আমার তো সেই অবস্থা নাই নাইলে আমিই নিয়া যাইতাম, আমি ছাড়া আর চিনবো একমাত্র মোহান্ত মণ্ডল, আপনারা তার লগে দেখা করেন।'
রমণী মুখুজ্জে এই প্রথম আমাদের উদ্দেশে কথা বললেন। আগাগোড়া তাঁর কথা, কণ্ঠস্বর এবং অভিব্যক্তি লক্ষ্য করছিলাম, একজন বিজ্ঞ, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন বৃদ্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ভদ্রলোকের আন্তরিকতা সহজেই মনকে স্পর্শ করে।
কথা শেষ হলে মনটা ভার হয়ে এলো, এই বৃদ্ধের সঙ্গে জীবনে আর কখনো দেখা হবে না, বৃদ্ধের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে নমস্কার জানালাম, তিনি প্রতিউত্তরে দুই হাত কপালে ঠেকালেন। দীর্ঘ দৃষ্টিপাতে শেষবারের মতো রমণী মুখোপাধ্যায়কে দেখে নিয়ে বাইরে এলাম বিমলবাবুর সঙ্গে। যথেষ্ট করেছেন তিনি, মাঠের কাজের জরুরী তদারকি ফেলে আমাদের জন্যে এতক্ষণ ব্যয় করা, আগাগোড়া তাঁর হাসি মুখের ব্যবহার, ধৈর্যময় সহযোগিতা ভোলবার নয়। ঠিকানা জানিয়ে আমরা বললাম, ঢাকায় এলে দেখা করবেন। কি জানি সে হাসির অর্থ কি। নমস্কার বিনিময় করে চলে আসার সময় পথ দেখিয়ে দেবার জন্যে ছেলেকে দিনে সঙ্গে।
বাড়িটির দিকে তাকালাম, বাইরে কার্নিশের ঠিক নীচে লম্বা কারুকাজ করা বর্ডার। দরজাগুলোর মাথার দেওয়ালে ধনুকের মতো বাঁকা করে লতা-পাতার কারুকাজ। বাড়িটির আঙিনা মোটামুটি, তবে পাঁচিল নেই, গাছপালার আবেষ্টনীই সীমানা নির্দেশ করে। একপাশে কয়েকটি বেড়ার ঘর, জিজ্ঞেস করে জানলাম, অন্য লোক থাকে। হয়তো বিমলবাবুর জ্ঞাতি।
হাঁটতে হাঁটতে একটা জিনিষ লক্ষ্য করছি, এই গ্রামে রমণী মুখুজ্জের বাড়ি ছাড়া আর কোন পাকা বাড়ি নেই। উঁচু ঢেউ খেলানো ডাঙায় কিছু বেঁটে বেঁটে গাছপালা, অধিকাংশই ফাঁকা, নীচে চাষের জমি। দূরে দূরে বিক্রমপুরের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পাটাতনওলা বেড়া কি টিনের বাড়ি।
পথে পেলাম বৃটিশ আমলের-একটি চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারি-কাঁঠাল গাছের ছায়ায় বারান্দাওলা পাকা দু'কামরার একতলা বাড়ি। ভেতরে বেশ মোটা শক্ত কাঠের কাউন্টার, তার পেছনে র‍্যাকে নানা রঙ ও আকারে শিশি বোতল সাজানো।
রোদে, গরমে, ঘামে, ক্ষিদেয়-অস্থির-শরীর ও মনে কাঁঠাল তলার ছায়ায় খানিক দাঁড়াই, টিউবওয়েলের পানিতে মুখ হাতপা ভালো করে ধুয়ে নিয়ে পানি খেলাম পেট ভরে। দ্বীপের মতো উঁচু ডাঙাটায় কাঁঠাল গাছ একটা নয়, ছোট বড় কয়েকটা, ফলে ছায়া বেশ দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। সেই ছায়ার বাইরে জষ্টি মাসের রোদ বড় নির্দয়, জায়গাটা ছেড়ে চলে আসতে ইচ্ছা করে না, তিনটে ছাগল একটা কুকুর সেই ছায়ায় শুয়ে আছে। একজন মহিলা তার ছোট্ট বাচ্চাকে নিয়ে ডিসপেন্সারিতে ঢুকলো, আমরা আবার যাত্রা শুরু করলাম।
আবার সেই ঢেউ খেলানো ডাঙা জমি, কখনো কচ্ছপের পিঠের মতো, কখনো ঢালু প্রায় নালার মতো, সেই নালা পেরিয়ে আবার কচ্ছপের পিঠ, ঝলসে যাওয়া ঘাসের আস্তরণ, জায়গায় জায়গায় আগাছার ঝোপ, এক ফোঁটা বাঁশঝাড়, ছাড়া ছাড়া গাছ-ছাড়া ছাড়া বাড়ি-ঘর, লম্বা ব্যারাকের মতো পাকা একতলা স্কুল ঘর। এই সবের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে ভাবছিলাম, রমণী মুখুজ্জে আর তার ছেলে বিমল এবং তার পরিবারের কথা, এই মালপদিয়া গ্রাম, একদিন এখানে হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন, সেই গ্রাম আছে, সেই প্রকৃতি আছে, তাদের উত্তর পুরুষরা আছে, কিন্তু এর মধ্যে ভেতরে ভেতরে বহু পরিবর্তন হয়ে গেছে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবা তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, এই গ্রামের 'অধিকাংশ বারুইজীবী ও ২/৪ ঘর মাত্র কায়স্থ ছিল। বারুইগণ চাষী শ্রেণীর লোক, পানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ব্যবসা তাহাদের ছিলো না। ক্ষেতের ফসল, বাড়ির সাক সবজী ও কলা, কাঁঠাল, আম ইত্যাদি বিক্রী করিয়া সংসার চালাইত।' এই দারিদ্র্যের পাশাপাশি হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রেখে গেছেন, 'আমাদের গ্রামে হিন্দু মুসলমান দুই জাতীয় লোকেরই বাস, কিন্তু হিন্দুর সংখ্যা অনেক বেশী। মুসলমানগণ একভিন্ন পাড়ায় বাস করিয়া আছে। দুই জাতির মধ্যে তখন এত সদভাব দেখিয়াছি যে, তাহার শতাংশ এখন থাকিলেও বর্তমান কালের বীভৎস কাণ্ড ঘটিতে পারিত না।'

আমরা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই মালপদিয়া গ্রামে হাঁটছি, এর ভূমি, প্রকৃতি, মানুষজনের বাড়িঘর মিলিয়ে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয় না, সেই দারিদ্র্য তেমনি আছে, (বরং তার প্রবৃদ্ধি ঘটেছে) এ গ্রামের বারুইয়া চাষী শ্রেণীর লোক, পানের ব্যবসা সেকালেও ছিলো না এ কালেও নেই, কিন্তু তাদের সেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা কি তেমনি আছে? নেই। কেন? অথচ এই গ্রামে কখনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি, আজো হয় না, তবু বিমল মুখুজ্জেকে মালপদিয়া ছেড়ে, বাঙলাদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্যে অর্থব পিতার মৃত্যু প্রতীক্ষায় প্রহর গুণতে হয়। কেন? বড় গভীর এবং জটিল সেই জট।

বিমলবাবুকে বলতে পারতাম, জায়গা জমি নিয়ে এসব জটিলতা একা আপনার নয়, এবং আপনি হিন্দু বলেই শুধু নয়, সারা দেশ জুড়েই এ সমস্যা আছে, যারা এই অবস্থা করছে তারা নিজের সম্প্রদায়কেও রেহাই দেয় না; আর ডাকাতি! সে তো এ দেশের মুসলমান ঘরেও হচ্ছে, কিংবা যে দেশে যেতে চাইছেন সেখানেও ডাকাতি হয়, তারা তাই বলে দেশ ছাড়ে না।

হ্যাঁ, এসব কথা বিমলবাবুকে খুব চমৎকার করে, রীতিমতো শ্রেণী দৃষ্টিকোণ থেকে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে, চাই কি একখানা ছোট-খাটো আর্থ-সামাজিক থিসিস বলতে পারতাম মুখে মুখে, কিন্তু বিমলবাবুকে কি তা বলে কোনো কার্যকরী নিরাপত্তা বিধান করতে পারবো? না, তা পারবো না, কেননা এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে গভীর এবং জটিল মনস্তাত্ত্বিক কারণ-যার মূলে আছে রাজনীতি। ১৯৪৭ সালের ভারত বিভক্তির পর আজ পর্যন্ত -এতো বছর পরও বিভক্ত ভারতবর্ষে প্রবল দুই ধর্ম সম্প্রদায় হিন্দু মুসলমান-যারা তাঁদের স্ব স্ব জন্মভূমিতে 'সংখ্যালঘু' এই নামে অভিহিত হয়ে আসছে-অর্থাৎ সংখ্যাগুরু দ্বারা রাষ্ট্রীয়ভাবে শাসিত হয়ে আসছে, কি হিন্দু কি মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এক ধরনের মানস সংকট সৃষ্টি হয়ে আছে, মনোজগতের সেই পরবাসী চেতনাই তার শিকড় আলগা করে দিয়েছে স্বদেশের ভূমিতে। কিন্তু পাশাপাশি সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের একজন নিঃস্ব ব্যক্তিও এ ধরনের মানস সংকটে ভোগেন না-তার কারণও সেই একই রাজনীতি।

এ ধরনের এক গভীর তত্ত্বগত বিশ্লেষণে মন আচ্ছন্ন হয়েছিলো।

-'আ কতদূর?' গাইড ছেলেটির কথায় মালপদিয়ার জষ্টি মাসের রোদে ফিরে এলাম।

বিমলবাবুর ছেলে আঙুল দিয়ে দেখায় ঐ যে দূরে, জোড়া তালগাছ, ঐ বরাবর একটু আগাইয়া গেলেই'

বেশ বেলা হয়ে গেছে, বেচারার এখনও খাওয়া হয়নি; তাকে হাসি মুখে বিদায় দিয়ে নিজেরা আবার এগোতে লাগলাম।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

যে আগ্রহ নিয়ে মালপদিয়ায় এসেছিলাম, তা কি আর অবশিষ্ট আছে? রমণী মুখুজ্জে এবং তার পরিবারের মধ্যে যা পেলাম তার কাছে এই ভিটে দেখতে যাওয়া কী অর্থহীন অকিঞ্চিতকরতা!

পেছন ফিরে দেখলাম, রমণী মুখুজ্জের নাতি বেশ দূরে চলে গেছে। তার চেয়েও দূরে গাছপালায় ফাঁকে দেখা যায় রমণী মুখুজ্জের বাড়ি। দূর থেকে সবুজ গাছপালার ফাঁকে শাদা বাড়িটি ছবির মতো মনে হয়। এই যে মানুষজন দূরে দূরে, এই যে দূরে দূরে ছায়া–ঘন–বাড়ি–ঘর–না কোন অশান্তি নেই, কেমন শান্ত, স্থির, মন্থর, সরল–এই আকাশ আর গাছপালার মতোই স্বাভাবিক, অথচ এর গভীরে যে জটিল কুৎসিত কূটিল বাস্তবতা সাপের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে! মানুষের শ্রমে ঘামে, ক্ষুধায় দারিদ্র্যে, ভালোবাসায়, আতঙ্কে, অশ্রুতে, দীর্ঘশ্বাসে মিশে আছে। তাকে তো এর মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে না। কী সীমাহীন অসঙ্গতিময় এই বাস্তবতা!

মনের গুমোট কাটাবার জন্যে নীলুকে বলি, আমাদের এ যাত্রা ঐতিহাসিক হয়ে থাকলো হে।

নীলু হাসে: 'বিষয়টা নিয়ে লিখবে না?'

–হ্যাঁ, হয়তো লিখবো একদিন, তবে সেখানে রমণী মুখুজ্জে আর তাঁর পরিবারই বোধহয় সবটা জায়গা জুড়ে থাকবে।'

নীলু গম্ভীর হয়ে যায়। খানিকক্ষণ থেমে বলে, 'সত্যি, ভেতর ভেতরে কী সব অবস্থা।'

ওকে আরো একটু টোকা দেবার জন্য বলি, 'বিমলবাবুর বউয়ের কথাবার্তায় কি মনে হয়?'

–ভালো লাগেনি।' নীলুর গলায় স্পষ্ট অভিমান এবং অসন্তোষ।

আমি হাসি। জানতাম এমন উত্তর পাবো।

–'কিন্তু নীলু, এমন কেনো হয় ভেবে দেখেছো?'

–'তা হলেও'

–'না, এটাই স্বাভাবিক, এ হলো আমাদের সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনের অভিশাপ।'

নীলু চুপ করে থাকে। হয়তো কথাটা ভাবে।আমি ওর ভাবনাকে আরো একটু সজাগ করে দেবার জন্যে এখন সাম্প্রদায়িকতা, অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারি। কিন্তু সে কথা এখন থাক।

আরে এতো বড় পুকুর! খুব প্রাচীন মনে হয়। ধ্বসে যাওয়া স্থানচ্যুত দৈর্ঘ্য–প্রস্থে বিশাল পাকা ঘাট। কঙ্কালের দাঁতের মতো ঘোর কালচে পাতলা পাতলা প্রাচীন আমলের ইট। সারা পাড় সেই ইটে বাঁধানো। জায়গায় জায়গায় ফাটল, কোথাও কোথাও ধ্বসে গেছে, ঘাটেতে মেয়ে পুরুষ কেউ স্নান করছে, কেউ থালা বাসন মাজছে। কিন্তু এমন প্রাচীন অভিজাত পুকুর অথচ এর মানানে তেমন অট্টালিকা তো কোথাও দেখছি না চারপাশে? কাদের এ পুকুর? গাউড যুবটি, নীলু এবং আমি, তিনজনই অবাক।

উঁচু চওড়া পাড়ের ওপরই একজনকে জিজ্ঞেস করি, 'মোতাহার মণ্ডলের বাড়িটি কোন দিকে ভাই?' লোকটির কৌতূহল কম। অথবা তার ব্যস্ততা আছে, উত্তরে আঙুল দিয়ে দেখায়–'ঐ তো।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ঢালু পাড় বেয়ে বাঁশঝাড়ের পাশ দিয়ে নামতেই লকলকে চওড়া ঘাস, ছিপ ছিপে পানি কাদা, কাঠপিঁপড়ে পেরিয়ে আমগাছের ছায়ার নীচে দাঁড়ালে অদূরে টিনের চাল, বেড়ার ঘর, আঙিনার এক ফালি নজরে আসে।
এক মহিলা দারুণ সন্দেহের চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, কি চাই আমরা।
–'মোহান্ত মণ্ডলের খোঁজে এসেছি।'
মহিলা দূর থেকেই বিরক্তি নিয়ে বলে, 'বাড়ী নাই।'
–'কোথায় গেছেন?'
–'বাজারে।'
মহিলা চলে যায়; আমরা এখন কি করতে পারি? আমতলার ছায়ার বাইরে মালপদিয়ার আকাশ, রোদ, ডানদিকে বাঁশঝাড়, বাম দিকে উঁচু জমি, মানুষ সমান পাটগাছ, এর মধ্যে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবো। নিজেদের মধ্যে কথা বলি; ক্ষিদে, ক্লান্তি নিয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে অর্থহীন হাসি হাসি। দুটি বাচ্চা আসে, তাদের সঙ্গে ভাব জমাতে চেষ্টা করি। জানতে পারি এরা মোহান্ত মণ্ডলের নাতি। কখন আসবে তাদের দাদু?' 'বাজারে গেছে, অহনই আইসা পড়বো।' এতো বেলায় বাজার? মনে মনেই বলি, চাষী মানুষ, হয় তো জমির কোন ফসল বেচতে গেছে। কি জানি। ভেতর থেকে বাচ্চা দুটোকে ডেকে নেয়। আমাদের উপস্থিতিতে বিরক্তি প্রকাশ করে ভেতরের মহিলাকূল, দূর থেকে তাও বুঝতে পারি, কিন্তু মোহান্ত মণ্ডলই আমাদের দাঁড় করিয়ে রেখেছে এখানে, আমরা কি করতে পারি!
একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, বিমলবাবুর স্ত্রী এ গ্রামেরই বউ, কিন্তু তার কথা, অভিব্যক্তি, ব্যবহারের মধ্যে যে মার্জিত রূপটি দেখেছি এ বাড়ির মহিলাদের মধ্যে তার ছিটে ফোঁটাও নেই, এদের হাঁটা–চলা, ঘাড় ঘুরিয়ে দেখা, চোখের চাউনি, মুখের অভিব্যক্তি, কণ্ঠস্বর, এমন কি শাড়ী পরার বিশেষ ধরনটির মধ্যেও পার্থক্য।
মোহান্ত মণ্ডল আসেন। মাথা ভরা টাক, গোফ দাড়ি কামানো গোলগাল বেশ বড়–সড় মুখ, খাটো করে ধুতি পরা, খালি গা, দোহারা দীর্ঘদেহী বাদামী রঙের মোহান্ত মণ্ডল লম্বা পা ফেলে এগিয়ে আসেন–'কি ব্যাপার?'
–'মোহান্ত মণ্ডল'
–'আমিই মোহান্ত মণ্ডল।' তাঁর কপালে কুঞ্চন ফুটে ওঠে।
সংক্ষেপে ব্যাপারটা বললে তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'ঠিকানা পাইলেন কই?'
রমণী মুখুজ্জের কথা বললাম। এবার তার মুখে হাসি ফুটলো–'হ, আমার কাছেই তো পাঠাইবো, ঠিক লোকের কাছেই আইছেন।' তার হাঁক ডাকে এবার জলচৌকি আসে, ছোট বেঞ্চ আসে। নিজে জলচৌকিতে বসে আমাদের বেঞ্চে বসতে বলেন।
বয়েস ৭০/৭২ হবে, কিন্তু মোহান্ত মণ্ডলের দীর্ঘ ঋজু শরীরে জরার চিহ্ন নেই কোথাও। দেখলেই বোঝা যায় দারুণ আত্মবিশ্বাসী, দৃঢ় এবং গোঁয়ার। চোখে আছে চাতুর্যের ঝিলিক। কিন্তু গপ্পোবাজ লোক।
মোহান্ত মণ্ডল বেশ জম্পেশ করে বসে, 'হ, জায়গা মতই আইছেন, তবে দেখনের কিছু নাই অহন।'

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

–'কারা থাকে এখন?'
–'কারা আর থাকবো? বাড়িতো হরিহর বাড়ুইজ্জার না, তার বাবা করুণাচন্দ্রের মামা ব্রজ চক্কোত্তির; হরিহর বাড়ুইজ্জার দাদুর। হরিহর বাড়ুইজ্জা এই বাড়িতেই মানুষ হইছে।
–'হ্যাঁ, হরিহর বাড়ুইজ্জেদের আসল বাড়িতো শিমুলিয়া।'
আমার কথায় মোহান্ত মণ্ডল চোখ বন্ধ করে হাসি মুখে মাথা নাড়িয়ে সায় দেন। একটা জিনিস লক্ষ্য করছি, কথা বলার সময় কোন সমর্থন বা অসমর্থনসূচক ভঙ্গিতে তিনি নীচের ঠোঁটটিকে মুখের ভেতর দাঁতের নীচে আলগা ভাবে চেপে ধরে চোখ বন্ধ করে মাথা নাড়িয়ে ছেড়ে দেন।
–'ব্রজ চক্রবর্তীদের কেউ নেই এখন...'
–'না:।' আবার সেই ভঙ্গি।
–'তাহলে কারা আছে?'
–'আর কারা, যারা থাকনের তারাই আছে।' মোহান্ত মন্ডলের গলায় আক্ষেপ এবং অসন্তোষ।
মনে মনে বুঝলাম মোহান্ত মণ্ডল এই বহু বচনে কাদের প্রতি ইঙ্গিত করছেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করতে না দিয়ে মোহান্ত মণ্ডল এবার আমাদের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সরাসরি প্রশ্ন করেন, 'বিষয়টা কি কন তো? হরিহর বাড়ুইজ্জা, ব্রজনাথ চক্কেত্তি হগলেরই নাম জাইন্যা এত দূর থেইকা ভিটার খোজে আইছেন, আসল বিষয়টা কি, জায়গা জমিনের ব্যাপার?' তার মুখে এখন আর আমুদে হাসি নেই, চোখ স্থির এবং তীক্ষ্ম।
আমি এবং নীলু সমস্বরে বলি, 'না, না, সে সব কোন ব্যাপারে নয়।' আগ্রহের মূল কারণটা জানালাম। মোহান্ত মণ্ডল, পরম বিজ্ঞের ভান করে বলেন, 'অ:।'
তাকে সহজ করার জন্যে বলি, 'এদিকে অবস্থা কেমন?' মোহান্ত মণ্ডল চালাক মানুষ, কথাটার অর্থ ঠিকই বুঝতে পারলেন। 'অবস্থা আর কি।' হাসলেন, 'আছি, বাড়িতে দুইবার কইরা ডাকাইত পড়লো, আছি।' 'আছি' বলার সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই হাসি। বড় বিচিত্র সেই হাসি। যেন কাউকে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছেন, দেখি আমার কি করতে পারিস!
হাসতে হাসতেই বাহুমূলের পেছন দিকে একটি পুরোনো ক্ষতচিহ্ন দেখালেন।
–'কিসের দাগ?'
–'বল্লমের খোচা, জানলা দিয়া মারছিল।'
আমরা তাঁর মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি দেখে যেনো তার ভেতর জমিয়ে গল্প বলার মেজাজ এসে গেলো; কিন্তু আমি জানি এ লোককে এখন চান্স দিলে সহজে ছাড়বে না, মোহান্ত মণ্ডল গ্রামের লোক, কৃষক মানুষ, সকালবেলা এক পেট ভাত খেয়েছেন, আমাদের অবস্থা তিনি বুঝবেন কেমন করে? কিন্তু চান্স না দিতে চাইলেও এই বৃদ্ধকে এখন ঠেকাবো কি ভাবে? মোহান্ত মণ্ডল যে রকম ডিটেল দিয়ে তাঁর বীরত্বের কাহিনী শুরু করেছেন, সেই গল্পের তোড়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈতৃক ভিটে দেখা বুঝি ভেসে যায় এবার।
রেহাই পাওয়ার জন্যে ফাঁক বুঝে বলি, 'সাংঘাতিক সাহস তো আপনার।'
মোহান্ত মণ্ডল হাসেন, 'না অহন বয়স হইছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
–'কিন্তু দু' দু'বার ডাকাত ঠেকিয়েছেন এ বয়েসে, কম কথা নয়।' এবার তার চোখে মুখে দৃপ্ত ভঙ্গি ফোটে, ঠেকাইছি, কিন্তু সেই বয়স থাকলে এক হালারেও মাথা নিয়া ফিরৎ দিতাম না।'
আমি টোকা দেবার জন্যে বলি, 'কিন্তু এভাবে ভয়ে ভয়ে থাকা।'....
'না থাইকা উপায় কি, নিজের বাড়ি ঘর জাগা জমিন, থাকতেই হইব।'
এই হলো খাঁটি কৃষকের কথা।
একই সম্প্রদায়ের একই গ্রামের একই সমস্যার দু'জন মানুষ–বিমল মুখোপাধ্যায় এবং মোহান্ত মণ্ডল, কিন্তু একজন দেশত্যাগ করার জন্যে পিতার মৃত্যু–প্রতীক্ষায় বসে আছে আর একজন বল্লমের খোঁচা খেয়ে বলে, 'নিজের বাড়ি ঘর নিজের জায়গা জমিন থাকতেই হইব।'
নিজের বাড়ি–ঘর নিজের জায়গা জমি তো বিমল মুখুজ্জেরও, তাহলে মোহান্ত মণ্ডলের সঙ্গে তার পার্থক্যটা কোথায়?
পার্থক্য শ্রেণীতে। বিমল মুখুজ্জের বাবা ছিলেন ঘাটশিলার স্টেশন মাস্টার, কলকাতা শহরেও কাটিয়েছেন, অর্থাৎ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, বিমল নিজেও চাকরী করেছেন ঢাকা শহরে, পরিবার পরিজন নিয়ে শহুরে মধ্যবিত্তের জীবন কাটিয়েছেন দীর্ঘদিন, এক ভাই পশ্চিমবঙ্গের বাটানগরে সংস্কৃতের শিক্ষক। গ্রামে এমন প্রাচীন পাকা বাড়ি, সে বাড়ির চটা উঠে গেলেও, আচারে ব্যবহারে, চালে চলনে, হাসিতে কথায় পরিবারের মধ্যবিত্ত পালসটি ঠিকই আছে। বিমল এখন জায়গা জমি দেখা–শোনা করলেও, মোহান্ত মণ্ডলের মতো মৃত্তিকা–নির্ভর ঘোর কৃষক নন। অর্থাৎ কৃষির ওপর জীবিকা নির্ভর করলেও, বিমল কৃষক নন, মন–মানসিকতায় তিনি উত্তরাধিকারী সূত্রেই মধ্যবিত্ত। তার সঙ্গে বংশ কৌলিন্য এবং সম্পন্নতা অতীত অহঙ্কার আজ ক্ষয়িষ্ণু বর্তমানেও মোহান্ত মণ্ডলের সঙ্গে এক হতে দেয়নি। পার্থক্য এখানেই। এবং অহঙ্কার সর্বদাই বিস্তৃতি চায়, সেই মানুস বিস্তৃতির ক্ষেত্রটি প্রবলের চাপে সংকুচিত হতে হতে তাকে সব দিক দিয়ে কোণঠাসা করে ফেলেছে।
কিন্তু এই শ্রেণীগত পার্থক্যই সর্বশেষ কথা নয়, পার্থক্য যেমন আছে মিলও তেমনি এক প্রবল বিষয়ে, এ মিল উভয়ের ধর্ম সম্প্রদায়গত মিল।
প্রবলের চোখে দু'জনই সংখ্যালঘু হিসাবে বিবেচ্য। এবং বিমল ও মোহান্ত নিজেরাও নিজেদের সেভাবেই দেখেন। মোহান্ত মণ্ডল বাইরে বাইরে যতো বেপরোয়া মনোভাবই দেখান, ভেতরে ভেতরে মর্মজ্বালা ঠিকই আছে।
তদুপরি উভয়েরই বাস গ্রামে, এবং গ্রাম সব সময়ই যৌথ জীবনের আবেষ্টনীতে আবদ্ধ, সেখানে দৈনন্দিন জীবনের নানান মুদ্রায় উভয়ই একই শূন্যতা বোধ করেন।
যার জন্যে বিমলকে পিতার মৃত্যু প্রতীক্ষায় প্রহর গুণতে হয় এবং ব্রজনাথ চক্রবর্তীর ভিটেতে এখন কারা থাকে জানতে চাইলে মোহান্ত মণ্ডলের গলায় অসন্তোষ ধ্বনিত হয়, 'কারা আর থাকব? যারা থাকনের তারাই আছে।'
অর্থাৎ ভিন্ন একটি সম্প্রদায় যখন শাসন নিয়ন্ত্রণের নিয়ন্তা হয় তখন শ্রেণীর পার্থক্য, বর্ণের পার্থক্য ছাপিয়ে সংখ্যালঘুর সামনে প্রবল হয়ে দাঁড়ায় সেই ভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাদের নিজেদের সম্প্রদায়গত পার্থক্য, সেখানে 'মুখুজ্জে'র সঙ্গে 'মণ্ডলে'র কোন ভেদ নেই।
আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
এই বিভাজিত চেতনার ভিত্তিতেই এই উপমহাদেশের রাজনীতি পরিচালিত হয়ে এসেছে। বাঙালী জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক স্বাধীন বাঙলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হলেও এই সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির প্রবল মূঢ় অন্ধকারের প্রতিপক্ষ হিসাবে সুস্থ সবল দৃঢ়-ভিত্তিক কোন মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কেন হয়নি? সে অনেক কথা। সে কথা থাক।

এখন আমরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈতৃক ভিটে দেখবো।

মোহান্ত মণ্ডল ১২/১৩ বছরের একটি ছেলেকে দেন আমাদের সঙ্গে, ছেলেটিকে বলে দেন কোন বাড়িটি আমাদের দেখানো হবে।

মোহান্ত মণ্ডলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সেই বালকের সঙ্গে আমরা বাঁদিকের উঁচু পাটক্ষেতে উঠে যাই, ছোট একটুকরো উঁচু ডাঙা জমি, (হয়তো মোহান্ত মণ্ডলেরই) তার সরু আল ধরে এগিয়ে সেই ডাঙার শেষ সীমানায় গিয়ে পৌঁছুই, নীচের আগাছা ভরা ঢালুর পরেই একটি ডোবার মতো পুকুর, সেই পুকুরের ওপারে ভেঙে যাওয়া ছোট পুরানো ঘাট, মাটির ভেতর থেকে ভাঙাচোরা নোনা ধরা ইট বেরিয়ে আছে, তার ওপরই টিনের চালের খান দুই হতশ্রী বেড়ার ঘর দাঁড়িয়ে আছে, তার উঠোনে শাঁখা-সিঁদুরহীন মহিলাকূল, শিশু এবং বালক বালিকা দেখা যায়।

এই হলো ব্রজনাথ চক্রবর্তীর ভিটে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে থেকে মানুষ হয়েছেন। কিন্তু তার কি পরিচয় আছে? মোহান্ত মণ্ডলের বাড়ির লাগোয়া ওই যে বাড়িটি ও-তো যে কোন একটি দরিদ্র বাড়ি দেখলেই হয়। পুরোনো চিহ্ন বলতে উঁচু মাটির ঢিবি, ডোবার মতো পানাভরা একটি ছোট্ট পুকুর আর ভাঙা ঘাটের আভাস দেওয়া মাটি-খাওয়া কিছু ইট-এই তো? এর জন্যে এই দুপুর-রোদে ক্ষিদে পেটে, ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে এতো পথ অতিক্রম। এবং এই ক্ষুধা ও ক্লান্তি নিয়ে জষ্টি মাসের রোদের মধ্যে আবার ফিরে যাওয়া।

কিন্তু কি পেতে চেয়েছিলাম? দরিদ্র বারুইদের বাড়ি বাড়ি পুজো করে সংসার চালানো অকৃতদার দরিদ্র ব্রাহ্মণ ব্রজনাথ চক্রবর্তীর বাড়ি এতো দিনে আমাদের আর কিরূপ দেখাবে? কিন্তু সেই বাড়ি দেখতে এসে যা পেলাম-রমণী মুখুজ্জে, বিমল, তার পরিবার, মোহান্ত মণ্ডল-এমন অপ্রত্যাশিতভাবে এতো পাওয়া কে ভেবেছিলো আগে?

ফিরতি পথে ডাঙা জমিটা অতিক্রম করতে গিয়ে নীলু হঠাৎ অদূরে জোড়া তালগাছ দেখিয়ে বলে, 'ঐ তাল গাছের নীচে দাঁড়িয়ে বোধ হয় কুসুমের সঙ্গে শশী কথা বলতো।' নীলু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসের শশী কুসুমের কথা বলছে।

ওর নিঃশব্দ হাসির সঙ্গে আমিও হাসি, 'কিন্তু সে তো গাওদিয়া, বিক্রমপুরেরই আরেক গ্রাম। আর এতো জোড়া তালগাছ, শশী কুসুম তো এক তালগাছের নীচে কথা বলতো।' নীলু বলে, 'তা হোক, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামের নাম গাওদিয়া রাখলেও মালপদিয়ার এই তালগাছ দেখেই 'পুতুল নাচের ইতিকথা'য় তালগাছ এনেছে'!

হাসতে গিয়ে চমক লাগালো, আচ্ছা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কি এই গ্রামে কখনো এসেছিলেন। তাঁর মামার বাড়ি এখান থেকে আরো বেশ কয়েক মাইল

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
দূরে গাওদিয়া গ্রামে, সে গ্রাম এখনো আছে, সেই গ্রামের কথা আছে, পুতুল নাচের ইতিকথা উপন্যাসে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিশ্চয়ই গেছেন সে গ্রামে। কিন্তু এই যে মালপদিয়া গ্রাম–যেখান দিয়ে আমরা হাঁটছি, তাঁর পিতা যেখানে মানুষ হয়েছে, সেই মালপদিয়ায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আসেন নি কখনো? বিশ্বাস হয় না। মন বলছে, এসেছেন তিনি, নিশ্চয়ই এসেছেন, হয়তো আমরা যেখান দিয়ে হাঁটছি এখান দিয়েই হেঁটেছেন, হয়তো ওই জোড়া তালগাছের দিকে আমাদের মতোই তিনি তাকিয়েছেন! শিশুর মতো রোমাঞ্চ অনুভব করি।

এসব ১৯৭৯ সালের কথা, তারপর কতো বছর কেটে গেছে। কিন্তু সে দিনের কথা ভাবলেই সব দেখতে পাই, সেই মালপদিয়া গ্রাম, তার প্রকৃতি, সেই রমণী মুখুজ্জের বাড়ি, রমণী মুখুজ্জে, বিমল, বিমলের স্ত্রী–পুত্র–কন্যা, মোহান্ত মণ্ডল, ব্রজনাথ চক্রবর্তীর ভিটে, সেই জোড়া তালগাছ–সব দেখতে পাই।

কিন্তু এ–ও জানি সব আর তেমন নেই, মোহান্ত মণ্ডল হয়তো বেঁচে নেই, ডাকাতের বল্লমের খোঁচা–খাওয়া মোহান্ত মণ্ডলের মৃত্যু হলে স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে তো? ডাকাতরা দু'বার ব্যর্থ হয়ে শাসিয়ে ফিরে গেছে, তৃতীয় বার এলে নিশানা ঠিক করেই বল্লম চালাবে। না, মোহান্ত মণ্ডলের কথা বলতে পারবো না, তবে আমি স্থির নিশ্চিত রমণী মুখুজ্জে আর বেঁচে নেই, কিন্তু বিমল কি পিতৃভূমি ত্যাগ করে চলে গেছে স্ত্রী–পুত্র, কন্যা নিয়ে? বিমল মুখুজ্জে বলেছিলেন তাঁর আত্মীয়–স্বজনের অধিকাংশই চলে গেছে, এ গ্রামের অনেকেই চলে গেছে, যারা আছে তাদের মধ্যেও অনেকের যাই যাই ভাব। কিন্তু এই ক'বছরে ক'জন গেছে? ক'জন যেতে পেরেছে? কেন যেনো মনে হয়, সেই অনেকের মতো বিমলেরও যাওয়া হয়নি। যাওয়া বললেই কি যাওয়া হয়? হয়তো নানান রকম আপোষ করে বিমলকে এখানেই থেকে যেতে হয়েছে। কিন্তু এতোদিন যে পিতার মৃত্যু প্রতীক্ষায় ছিলো তাঁর মৃত্যুতে বিমল কি কোনো শূন্যতা অনুভব করে? পিতৃহীন বিমলের ভেতর কি হাহাকার ধ্বনিত হয়? সেই নিয়ত মৃত্যু–প্রতীক্ষার জন্যে কোন দংশন কি তাকে অস্থির করে? মালপদিয়া যখন ঘুমের গভীরে চলে যায় তখন সেই জীর্ণ বাড়িতে রমণী মুখুজ্জের সেই স্নেহসিক্ত 'বি–ম–ল' ডাকটি শোনার জন্য বিমল মুখুজ্জে বিভ্রমের বশে কখনো কি মধ্যরাতে হঠাৎ বিছানায় উঠে বসে অন্ধকারে কান পাতে?

নিরাশ্রিত অগ্নি

নিদারুণ খরা গেলো বছরটায়।

দুপুরে সূর্য মাটি ফাটালো। ধানের চারা জ্বলে গেলো বীজতলাতেই। রাতের বেলা চাঁদটা উঠতে থাকলো রোজ। ডালডার টিনের কাটা ঢাকনির মতো ধারালো চাঁদের গা থেকে ঠিক্‌রে পড়া জ্যোৎস্না বিশাল শূন্য মাঠ জুড়ে কোমরে দু'হাত

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
রেখে বুক চিতিয়ে ভারী অহঙ্কারী হাসি হাসতে থাকে, তার ভেতর মেঠো ইঁদুর ক্ষিদের জ্বালায় কি করবে ভেবে না পেয়ে ছুটে বেড়াতে লাগলো পাগলের মতো। মানুষগুলো মানুষ বলে তাদের দায় ও মানুষের মতো।

ফজর আলী গরীবের গরীব, ছোটলোকের ছোটলোক–গ্রাম পঞ্চায়েত–এর বিচারে সে সকলের পেছনে বসে, উঁচু হয়ে হাঁটুর ওপর কনুইয়ের ভর দিয়ে হাতের তালুতে থুতনি রেখে হাঁ হয়ে মানুষের দিকে চেয়ে কথা শোনে। কোনো সিদ্ধান্তের কথা এলে গাঁয়ের রেইস মোড়লরা যখন জিজ্ঞেস করে, 'তোমরা কি বলো গো'?– সে তেমনি বসে থাকে, কেউ যদি চাপা হাসি নিয়ে বলে, 'ফজরালি কি বলো?'–সে ভারী অপ্রতিভ হয়ে পড়ে, গলা তার শুকিয়ে আসে–যেনো ভারী লজ্জার কথা!

সেই ফজর আলী এখন গোরস্থানের ধারে দাঁড়িয়ে মাঠে দিকে চেয়ে আছে। দেখবার মতো এমন কোন শোভা নেই, ফুটিফাটা কর্কশ শূন্য মাঠ, তার ওপর দুপুর রোদের কাঁপন, তার ওপারে রেল লাইন, রেল লাইনের পেছনে ধূসর গাছপালার ভঙ্গিল আবেষ্টনী–দেখতে দেখতে মনে হয় চোখের ওপরই হয়তো ছানি পড়েছে। গোরস্থানের ধারে বাবলা আর আমগাছের ছায়ার নীচে দাঁড়িয়েও রোদের তাপ আগুনের আঁচের মতো বাতাসের সঙ্গে এসে গায়ে লাগে। তবু ফজর আলী দাঁড়িয়ে ছিলো।

অনেক খাপছাড়া ব্যাপারের মধ্যে ফজর আলীর এটাও একটা অভ্যাস, কোন সমস্যায় পড়লে চলতে চলতে সে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে ভারী ফাঁকা দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে একদিকে। তখন তার ভাঙাচোরা চৌকো মুখ, খরায় পোড়া মাঠে নিতান্ত ভাগ্য–জোরে টিঁকে যাওয়া এক আধটা আগাছার মতো গরীব দাড়ি, মোটাসোটা আঙুল নিয়ে ধ্যাবড়া পায়ের পাতার ওপর কালো একজোড়া যেনো–তেনো প্রকারের পা, তার ওপর কালো টিনের তোরঙের মতো কাঠামোটা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ফজর আলীকে কি রকম যে দেখায় বলা মুস্কিল, সে এমন কোন সৌম্যদর্শন নয় যে, তাকে দেখে মানুষের দুঃখে কাতর কোন মহাপুরুষের মতো মনে হবে, তবু তার ভঙ্গির ভেতর হয়তো বা তেমন একটা ভাব ফুটে ওঠে।

নিজের দুঃখ কষ্টের কথা কাউকে কখনো বলে না ফজর আলী। তার মানে এই নয় যে, সে খুব আত্মমর্যাদাবান,–নিজের কষ্টকে অনুভব করবার জন্যে মনের যে সৌখিনতা থাকবার দরকার তা তার নেই। তার কাছে যে কোন আঘাত বেদনার নয়, সমস্যার।

দেবেন নাপিত। ছোট্ট একটা হাত বাক্স, সারিবাদি সালসার একটা বোতলে পানি নিয়ে গ্রামে আসে মাঝে মাঝে। পাড়ার জামরুল তলায় বসে গল্প করতে করতে চুল কাটে মানুষের। ফজর আলী দশইঞ্চি থান ইঁটটার ওপর বসে আমুণ্ডু গলা বাড়িয়ে দিলে মুখে ফ্যানা লাগানো ব্রাশ ঘষতে ঘষতে দেবেন হয়তো বলে বসে,

তোর মুখের দিকে চাইলে মন বলে না যে দাড়ি কামাই।'

সবাই সুন্দর হয় না; দেবেনও বেছে বেছে সুন্দর মুখেরই দাড়ি কামায় এমনও নয়। অন্য যে কোন লোককে যে কথা বললে হাতাহাতি হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়, তেমন কথা দেবেন অবলীলায় ফজর আলীকে বলে। আর ফজর আলীও তখন গরুর গলায় হাত বুলিয়ে দিলে যেমন ভঙ্গিতে গলা বাড়িয়ে মাথা উঁচু করে আদর নেয়ে, তেমনি ভঙ্গিতে দেবেনের দিকে গলা বাড়িয়ে ব্রাশ আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
সাবানের ভিজে কোমল স্পর্শ নিতে নিতে তার মাথা ডিঙিয়ে মুখ উঁচু করে অদূরে বাজ-পড়া বাঁকা নারকেল গাছটার দিকে তাকিয়ে ভাবতে বসে, তাই তো...

হয়তো এইসব কারণেই কখনো কখনো তার ভঙ্গিতে মহাপুরুষের ছায়া পড়ে। কিন্তু যেহেতু সে শুধু মাত্রই ফজর আলী এবং ফজর আলীর বউয়ের বাপ তার মেয়েকে ১০০১ টাকা দেনমোহরে তার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে এবং যেহেতু ফজর আলীর বউ মহাপুরুষ নয়, পুরুষ মানুষ চায়, অতএব ১০০১ টাকার বন্ধনের জোরে জমিরন বাঁশ ফাড়ার মতো গলায় বলেছেন, 'নিজের মাগ-ছেলেকে দু'বেলা দু'মুটো খেতে দেবার মুরোদ নেই যে মানুষের তার আবার সংবার করার শখ ক্যানো?'

এ কথা অবশ্য বাড়াবাড়ি। আজ দশ বছর বিয়ে হয়েছে ফজর আলীর-তিন মেয়ে এক ছেলে স্ত্রী নিয়ে তার সংসার, দু'বছর আগের কথা ধরলে তার মা'কেও ধরতে হয়, এই দশ বছরে তার সংসারে থেকে, চার চারটে ছেলেমেয়ে বিইয়ে, সব ক'টিকে নিয়ে জমিরন বেঁচে আছে, অতএব দু'বেলা দু'মুঠো খেতে দিতে পারেনি সে, এ কথাটা মানা যায় না। কষ্ট করে হোক, আধপেটা খেয়ে হোক-এই দশ বছর জমিরনকে, তার ছেলেমেয়েকে ফজর আলীই বাঁচিয়ে রেখেছে। মোটে দু'বছর আগে তার মা'র মৃত্যু হয়েছে, তা-ও ম্যালেরিয়ায় ভুগে; অতএব ফজর আলীর দোষ দেওয়া যায় না।

সে যা হোক, এসব অবশ্য ধরছে না ফজর আলী, কিন্তু এসবের সঙ্গে বিয়ে বা সংসার করার কী সম্পর্ক। এভাবেই তো বাঁচতে হয়-তার বাপ এভাবেই কাল কাটিয়ে গেছে, তার বাপের বাবাও এমন কোন রাজা-মহারাজা ছিলো না; যতো দূর বোঝে, তার দাদার বাপও নয়; জন্মের পর থেকেই ফজর আলী দেখে আসছে, দাদাকালি আমলের এবড়ো থেবড়ো নোনালাগা দু'কামরা মাটির ঘর, ডোঙা খোলার চাল, একফোটা উঠোন, উঠোনের পাশে আগাছার জঙ্গল, বাড়ির পেছনে অনন্ত সা'র বাঁশবাগান আগেও যেমন বাড়ীটার ওপর ঝুঁকে খুপরীর মতো ঘর দু'টোকে দিনের বেলায়ও অন্ধকার ক'রে রাখতো, আজও তেমনি।

ফজর আলীর মতোই তার বাপের কোন বাঁধা কাজ ছিলো না-ঘরামির কাজ, বাঁশ কাটা, পরের জমিতে নিড়োনো, ধান কাটা, বাঁশের ঝাঁকা চুপড়ি বোনা-পেটে শূল-ব্যথা নিয়ে এইসব করে সংসার চালাতো; ফজর আলীর মা, দুই বোন তার ভেতরই আধপেটা খেয়ে, না খেয়ে মানুষ হয়েছে, কই তার মা কোনদিন স্বামীকে এমন কথা বলেছে বলে তো মনে পড়ে না।

বউয়ের কথায় ফজর আলী যে খুব দুঃখ পেয়েছে তা নয়, তেমন লোকই নয় সে, বিষয়টাকে নিয়ে সে শুধু ভাবছে, তার বউকে বিয়ে করাটা তার দোষ হয়েছে কি না।

দোষ যদি করে থাকে তার বাপ করেছে, দাদা করেছে, দাদার বাপ...এমনি করে যতো পেছনে যাওয়া যায় সকলেরই দোষ। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়-মানুষের হাতের পাঁচ আঙুল যেমন সমান নয়, খোদার আলমে মানুষেরও তেমন ছোট বড়ো আছে, তা না হলে জগত বলে না, গরীব না থাকলে দান খয়রাত, জাকাত, এইসব নিয়ম কি করে হবে? সেটাও ভাবো।

এমন করে সব জ্ঞানের কথা সে যে ভাবতে পারে তার ধারণাই ছিলো না, একটু

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
উত্তেজনাই বুঝি বোধ করে ফজর আলী।
এমন সময় দূরে ট্রেনের হুইসিল শুনতে পায়, অনেক দূর থেকে ভেসে আসা প্রায় ঝাপসা ধ্বনির সঙ্গে মনে পড়ে, কথাগুলো তার নিজের নয়, কোথায় যেনো শুনেছিলো? একথা মাথায় আসার সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের সামনে একটা সবুজ গাছ ঘুরতে ঘুরতে দূর থেকে কাছে আসতে থাকে, ধীরে ধীরে তার নীচে সাদা, নীল কালো কতোগুলো রঙ জেগে ওঠে, রঙগুলো আরো স্পষ্ট হয়ে এক সময় জামাকাপড় কি খালি গায়ের কতোগুলো মানুষ হয়ে যায়, এবং সেখানে ফজর আলী নিজেকে দেখতে পায়–খোদাবক্স মৌলবী হাত নেড়ে নেড়ে কথাগুলো বলছে জামরুল তলায় দাঁড়িয়ে।
গ্রামের প্রাইমারী স্কুলের মাস্টার আবদুর রহমান হাসতে হাসতে বলে, 'আপনার কথা মানি, হাতের পাঁচটা আঙুল সমান নয়, কিন্তু থালা থেকে ভাত তুলে মুখে দেবার সময় পাঁচটা আঙুলকেই সমান করতে হয়।' খোদাবক্স মৌলবীর মুখ লাল হয়ে যায়, আর দাঁড়ায় না, 'বেদীন, নাসারা, নাস্তিক' বলতে বলতে রেগেমেগে চলে যেতে থাকে।
ছবিটা শেষ হয়ে গেলে বড় অসহায় হয়ে পড়ে ফজর আলী। মেলায় হারিয়ে যাওয়া শিশুর মতো এদিকে ওদিকে তাকাতে তাকাতে গোরস্থানের ভেতর নজর যায়, জ্বলে যাওয়া বন–পালা, ঘাস–মাটিতে লম্বা লম্বা ধ্বস নামা কি উঁচু হয়ে থাকা সারি সারি কবর দুপুরের রোদে কর্মহীন বেচারা মজুরের মতো ভারী ফাঁকা দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছে।
ফজর আলী কি মনে করে গোরস্থানের ভেতর ঢুকে পড়ে, মাথার ওপর কোন গাছ নেই, ছায়া নেই, চামড়া পোড়ানো রোদের মধ্যে সে গোরস্থানের ভেতর ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে তার বাপের কবরটা খোঁজে। বছর বারো আগে মরে যাওয়া বাপ এই শত শত কবরের ভেতর কোথায় যে পড়ে আছে কে জানে? বাপকে কবর দেওয়ার সময় এমন কোন চিহ্ন দিয়ে রাখেনি, ফলে এই কয়েক বিঘে জমির ওপর গোরস্থানের সব ক'টি কবরকেই তার সমান মনে হয়। একবার মনে হয় এটা–কাছে গিয়ে মনে হয় এটা নয়, ঐটা–তার কাছে গেলে মনে হয় এটাও নয়–যেন বাপ–বেটার লুকোচুরি খেলা চলছে। ফজর আলী ঘামতে থাকে, মাথার তালুতে সূর্যরশ্মি বল্লমের মতো গেঁথে যাচ্ছে। পায়ের নীচে শুকানো আগাছার সরু সরু ব্যথা খোঁচা দিতে থাকে।
এই রোদে, এই অস্থিরতার মধ্যে ঘোর–লাগা ক্ষ্যাপার মতো দেখাতে থাকে ফজর আলীকে।
বাবলাগাছ থেকে ঘুঘু ডাকে, গোরস্থানের শুকনো মৃত খটখটে ঘাস, আগাছার ভেতর দিয়ে গিরগিটি কি আরো সব নানান পোকামাকড় যার যার ধান্ধায় ঘুরে বেড়ায়। তাদের চলাফেরার আওয়াজ ফজর আলীর কানেও পৌঁছোয় না। ফজর আলী তার পিতাকে খোঁজে। খুজতে খুঁজতে একবার সামনে, একবার পেছনে, একবার ডানে, একবার বাঁয়ে ঘুরে ঘুরে ঘুরতেই থাকে। এক সময় যখন প্রবল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে 'ঐ সামনেরটাই হবে' মনে করে এগোতে থাকে তখন হঠাৎ দেখতে পায় মাটি ফুঁড়ে একটি ফণা শূন্যে দুলছে, পাটকিলে রঙের শরীরটা ফুলতে ফুলতে আগুনের শিখার মতো লক লক করে ওপরে উঠতে থাকে। ফজর আলী দেখতে পায় যে কবরটার কাছে সে যেতে চাইছিলো ঠিক সেই বরাবর

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চন্দ্রবোড়াটি; হলদেটে-বুক পেট আর পাটকিলে রঙের জমির ওপর চাকরা-বকরা মাথা, পিঠ, লেজ সব নিয়ে রোদের ভেতর যাত্রায় দেখা রাজার মতো ঝলমল করে।

তার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ফজর আলীর ভেতর কি সব ভাঙচুর হতে থাকে, তার বুক ওঠা-নামা করে, হাতের পেশী শক্ত হয়ে ওঠে; মুহূর্তের মধ্যে সে পাশের ধ্বস নামা কবর থেকে প্রায়পচা বাঁশটি টেনে নিয়ে মাথার ওপর তোলে, তার চেয়েও ক্ষিপ্রতায় প্রায় উড়ে এসে চন্দ্রবোড়াটি সগর্জন ছোবল মেরে আবার ফনা তুলে দ্বিতীয়বার ছোবল মারার জন্য দুলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ফজর আলী ঠিক ফণার ওপর সজোরে বাড়ি মারে। ফজর আলীর সেই একটি ঘায়ে সাপটি হাত কয়েক দূরে ছিটকে পড়ে, অমন মুকুটপরা রাজকীয় মস্তক ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে, তার বিশাল শরীর কয়েকটি পাক খেয়ে স্থির হয়ে যায়।

ফজর আলীর হাতের বাঁশটির অর্ধেকটা ভেঙে গেছে, বাকিটুকু এখনো শক্ত করে ধরা। সে নিজের পায়ের দিকে তাকায়, খুব ছোট দুটি বিন্দু পায়ের পাতার ওপর দামী পাথরের মতো চক্ চক্ করে।

ফজর আলী কবরটির দিকে না এগিয়ে সাপটির কাছে যায়। কী অকিঞ্চিতকরভাবে পড়ে আছে। ফজর আলী হাতে ধরে থাকা আধ-ভাঙা বাঁশটির দিকে তাকায়, সাপটিকে মারবার সময় জোরে বাঁশটিকে দুই থাবার মধ্যে চেপে ধরেছিলো, এখনো তেমনি টানটান করে ধরা আছে। ফজর আলী আবার সাপটিকে দেখে, তারপর বসে প'ড়ে মৃত সাপটিকে দমাদ্দম পিটতে থাকে। দু'চোখে কোথা থেকে যে এতো ঘৃণা এবং ক্রোধ জমা হতে থাকে কে জানে। পিটতে পিটতে তার প্রবল তৃষ্ণা পেতে থাকে, মাথা ঝিমঝিম করে; পরিশ্রান্ত ফজর আলীর ঘুম পেতে থাকে, ফজর আলী মৃত সাপটির পাশে শুয়ে পড়ে এবং ঘুমিয়ে যায়; তখনো তার হাতে বাঁশটি তেমনি ধরা থাকে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রতীক্ষিত লণ্ঠন

অবশেষে এসেই গেলো। জনাই বাজারে শম্ভুর দোকানে বসে চা খেতে খেতে এ্যাসিষ্ট্যান্ট অলোককে বলেছিলো, তেরপলটা ঢেকে দে।
অলোক অবাক হয়ে যায়, এবং তখন ক্রুদ্ধ স্বরটা তাকে কুঁকড়ে দেয়: লে শালা, হাঁ করে চেয়ে আছে! আবে হাঁদাকান্ত, যা বলি কর।
মেজজটা তার খারাপই। সেই সকাল থেকে।
তখন নিম গাছের পাতা ঝরে পড়ছিলো। কোথা থেকে ইঁদুর ধরে এনে পাঁচিলের ওপর কাকটা আছড়াচ্ছিলো। সেই সকাল বেলা। তখন তুই চলে গেলি উঠোন কাঁপিয়ে, আর মনটা আমার ফাঁকা হয়ে গেলো। দুপুর বেলা সুখলাল এসে বক বক করে গেলো অনেকক্ষণ। সাঁঝ বেলা গানের আসরে যেতে বলে হাত ইশারায় বোতল দেখিয়েছিলো। আমি গেলাম না।
গ্যারেজ থেকে গাড়ী বার করে আকাশের দিকে চেয়ে সে থমকে গিয়েছিলো প্রথমে। তারপর বিড়বিড় করে গালাগালি করলো। তখন অলোক আসে। এবং এখন জনাই বাজার থেকে ফিরছে খগেন কোলের দোকানের মাল নিয়ে। কথা ছিলো আগামী কালের।
কিন্তু আমার মনটা খারাপ। সেই সকাল থেকে। তুই চলে গেলি। তখন নিমপাতা ঝরছিলো। আর মনটা আমার ফাঁকা হয়ে গেলো। কাকটা কি মনে করে ইঁদুরটাকে মাটিতে ফেলে উড়ে গেলো ডেকে ডেকে। ইঁদুরটা মরা। সমস্ত শরীরটা তার ঠোঁটের ঘায়ে ছেঁড়া খোঁড়া। একটা চোখ নেই। কষ বেয়ে রক্ত পড়ছে। সরু সরু দাঁতগুলো বেরিয়ে এসেছে। শাদার গায়ে লালের ছোপ। প্রায় ঝুলে থাকা চোখ ছেয়ে আছে আতঙ্কে, যন্ত্রণায়। আমার তখন খারাপ লাগছিলো। ভেতরটা ফাঁকা ফাঁকা, দখিন জলার মতো। আর তার ভেতর যেনো বাতাস পাক খাচ্ছিলো। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে গাড়ী বার করলুম।
তারপর জনাই বাজার। পাল মশাই অবাক হয়ে বললেন, কিরে আজই এসে গেলি, তোর না কালকে আসবার কথা!
–না বাবু, আজকেই এসে গেলুম। কাল একটু অন্য কাজ আছে।
পাল মশাই তখন বিকেল বেলার জলযোগ করছিলেন বাতাসা দিয়ে। বললেন, তা এখনই নিবি? লোকজন তো দেখছি না: ও ভজা, ভজারে। এবং তখন বনমানুষের মতো ভজা এসে দাঁড়ায়।
খগনে বাবুর চালটা গাড়ীতে তুলে দে তো। লখা কোথায়?
লক্ষণকে পাওয়া গেলো না। অগত্যা ভজাকেই সব তুলতে হয়। বাইশ বস্তা চাল। তখন ভজা যেনো বৃষ্টিতে ভেজা কালো পাথর।

বাংলা বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

জানলার বাইরে মুখ রেখে ইস্কুল দেখছিলো অলোক। সামনে খেলার মাঠ। সবুজ ঘাস। গোল পোষ্ট। ছড়ি হাতে মাস্টার ক্লাশে ঢুকছে। বাতাস উঠলো । আর ধূলো। আর তার ভেতরটা এলোমেলো হয়ে যায়। যুদ্ধ হইতে প্রতাপ পলায়ন করিলেন, কিন্তু এখনও তাঁহার বিপদ, শান্তি হয় নাই। দুইজন মোগল, একজন খোরাসানী, একজন মুলতানী তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে।
তখন হু হু করে বৃষ্টি এসে যায়।
শশ্মান ঘাটের পোলের কাছে আসতে না আসতে চারপাশে সন্ধ্যা নেবে গেছে। আর তুমুল বৃষ্টির ভেতর বাতাসের গোঁ গোঁ শব্দ। কাঠের দোকানের ঝাঁপের ভেতর আলো। ভিজে বাতাসে পোড়া গন্ধ আসে নাকে। গাড়ী তখন পোলের ওপর। নীচে খালের পানিতে হুড় হুড় শব্দ। আর থেকে থেকে বাতাসের ঝাপ্টা, বিদ্যুতের চমক। বৃষ্টি আর গাড়ীর একটানা আওয়াজ। বাকি সব সুনসান।
পোড়া ভাত খাচ্ছিস, দেখিস তোর বে'তে বিষ্টি হবে। কে বলে। আমি আর বাঁচবো নাগো কানের কাছে কে ফিস ফিসিয়ে ওঠে। মা আর একটু সাবু দিই। এই আর এক ঢোঁক।
মা, বিষ্টির দিনে তুই চলে গেলি! একা আমার ভয় লাগে। শ্মশান থেকে ফিরে এসে ভুল করে তোকে ডেকে ফেলেছিলাম। মা, খুড়ি আমাকে কষ্ট দেয়। মা, তুই আমায় ফেলে চলে গেলি কেনো? মাগো তুই যদি আবার ফিরে আসতিস!
এবং আরে চেপে বৃষ্টি নাবে! বাতাস তুখোড় হয়। দাঁতাল শূয়োরের মতো গাড়ীটা গোঁ গোঁ করে ছুটে চলেছে। যেনো একের পর এক অন্ধকারের দরোজা খুলে দিচ্ছে কেউ।
আচ্ছা, রক্তের ভেতর কি কান্না ওঠে? এই যে এখন পোলের নীচে খালের পানিতে শব্দ হচ্ছে! মনে হয় যেনো আমার রক্তের ভেতর কেউ কাঁদছে।
শম্ভুর দোকানে বসে গুপী বলছিলো, তোমাকে আজ বিলিতি খাওয়াবো, থেকে যাও। কিন্তু আমার ভেতরটা তখন দখিন জলা। বাতাস পাক খাচ্ছিলো, আমি চলে এলুম।
বিষ্টু নাপিতের স্বামীর ঘর না করা নষ্ট মেয়েটাকে ওরা পটিয়েছে। মেয়েটার জোয়ানী বটে। ওরা তখন ভাদ্র মাসের কুকুরে মতো ছোঁক ছোঁক করছিলো। আমি চলে এলুম। আর এখন বৃষ্টি হচ্ছে।
বৃষ্টির ঝাপটা মারছে এদিক থেকে, ওদিক থেকে। আর ক্ষয়ে যাওয়া স্যাণ্ডেলের মতো রাস্তায় গাড়ীটা তাড়া খাওয়া কুকুরের মতো ছুটছে।
অলোকের যেনো ঘুম পেতে থাকে। কাল সারারাত ঘুম হয়নি। খালি কেঁদেছে। কোন কারণ নেই, কিন্তু উথলে উথলে উঠছিলো।
এখন চুপচাপ বসে বসে ঘুম আসে। জাহান ভাই কোন কথা বলছে না। চুপচাপ। আর আমার খারাপ লাগছে। জাহান ভাইয়ের হাত ষ্টিয়ারিং হুইলে ঘুরছে। চোখ সামনের উইণ্ডগ্লাস। উইণ্ড গ্লাসে বৃষ্টির কণা। যেনো কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, আর দু'টো আঙুল সেই ঘাম মুছে ফেলছে। চেয়ে থাকতে থাকতে কেমন গা শির শির করে ওঠে। মনে হয় অন্ধকারের ভেতর কোথাও থেকে দুটো শীর্ণ আঙুল উঠে এসে উইণ্ড গ্লাসের ওপর আঁচড়াচ্ছে।
তখন শ্মশানের কথা মনে আসে, আর চার পাশে অন্ধকার। গায়ে কাঁটা দিয়ে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ওঠে।
মা, তোর আলতা পরা পা টুকটুক করছিলো। আর ওদের কাঁধে তুই উঠলি। চারপাশ থেকে তখন হরিধ্বনি উঠলো। ফুল ঝরলো। আর আমার ভেতরে আমি লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদতে থাকলাম। তখন আবার হরিধ্বনি উঠলো। মা, যেনো তুই নয় আমি, শূন্যে ভাসতে থাকলাম। হারাণদার হাত ধরে আমি তখন খালি পায়ে তোর পেছনে পেছন হাঁটছিলাম। তোর টুকটুকে পা, লাল পেড়ে নতুন শাড়ী। মনে হচ্ছিলো তুই বিয়ের পিঁড়িতে চড়েছিস।
এবং এখন আস্তে আস্তে তার ভেতর কাঁটা দেওয়া ভয়টা কেটে গিয়ে একটা নির্বোধ ব্যথা মোচড় দিচ্ছে। শক্ত সিটের ওপর থাকতে থাকতে তার মনে হয় এখনই ঝাঁপ দিয়ে পড়ে রাস্তায়।
তখন কোথা বাজ পড়ে পৃথিবী কাঁপিয়ে, চকিতে আলো শিউরে ওঠে, আর তার ভেতর জাহানের নির্বিকার মুখ, অল্প অল্প ঘাম ভ্রূর পাশে, কপালে, চোখের নীচে আর গালের ওপরে। এবং গাড়ী ছোটে। ঝড়, বৃষ্টি আর অন্ধকারের ভেতর দিয়ে ক্রমাগত ছুটতে থাকে। বুনো শূয়োরের মত, ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো। আর অলোক বসে থাকে। জাহান বসে থাকে। চুপচাপ। কেউ কোন কথা বলে না। ষ্টিয়ারিং হুইল একটু একটু ঘোরে। পা দু'টো ওঠা নামা করে থেকে থেকে। আর ওরা বসে থাকে। বসে বসে বৃষ্টির শব্দ শোনে।
গাড়ী বাঁক নিচ্ছে। বুড়ো শিবতলায় ঝুরি নাবা বটগাছের ডাল রাস্তার ওপর মাথা নীচু করে ঝুঁকে আছে। তার পাশে পানা পুকুর। ব্যাঙ ডাকছে, বিরীজ তাঁতীর বাঁশ বাগান, ফুরোতে চায় না, ফুরোতে চায় না। তারপর এক সময় হু হু করে ফাঁকা ডাঙা জমি। নন্দীদের পানের বরোজ পেরিয়ে যেতে থাকে।
তখন সামনে আওয়াজ ওঠে। হেড লাইটের আলো এসে পড়ে আর সাঁ করে ঢাকা জীপটা ভিজে মুরগীর মতো বেরিয়ে যায়। তারপর আবার আগের মতো বৃষ্টি, হাওয়া, অন্ধকার আর গাড়ীর শব্দ এবং ওরা দু'জন বসে থাকে চুপ চাপ।
বউ, ক্যাতা আনলি নি, ছেলে শোবে কোতা?
লকলকে আগুনের লাল আভাটা দূরে, গাছপালার ফাঁক দিয়ে চমকে চমকে ওঠে, আর শোঁ শোঁ বাতাসের মতো তরঙ্গিত কোলাহল ভেসে আসে। ছাদে, বারান্দায় লোক গিজ গিজ করে। কুন দিকে যাবে গো, সিড়িটা দেখিয়ে দাও না বাবা। কোতা গেলি গো, কানা মানুষ কুন দিকে যাই,অ বউ। বাতাসের বেগ বাড়ছে। পাক খাচ্ছে, মোচড়াচ্ছে।
সকাল বেলা তুই চলে গেলি আর এখন অন্ধকারের ভেতর আমি গাড়ী চালাচ্ছি। নিয়ামতকে তুই.... আর আমি তোকে মারলাম, আর তুই চলে গেলি। তখন কাকটা কোথা থেকে একটা ইঁদুর এনে আছড়াচ্ছিলো, ছিঁড়ছিলো। নিমপাতা ঝরে পড়ছিলো আর আমার ভেতরটা ফাঁকা হয়ে গেলো। আমি গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আর এখন ঝড় বৃষ্টির ভেতর ঘরে ফিরছি। কিন্তু তুই ঘরে নেই। বার বার খালি সেই ছেঁড়া খোঁড়া ইঁদুরটার কথা মনে পড়ছে আমার।
অলোক গাড়ীর ঝাঁকুনিতে ঢুলছে। জাহান একবার ওকে দেখলো। মাথাটা সামনে ঝুঁকে এসে প্রায় বুকের ওপর ঝুলছে। ঢাকলো না কিংবা ধমক দিলো না।
বরং হঠাৎ এখন তার মায়া জাগছে। আর সেই রক্তের ভেতর থেকে, কান্নার

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

ভেতর থেকেএকটা মমতা সারা চেতনায় ছড়িয়ে যাচ্ছে।

মনে হচ্ছে অলোক নয়, সে বসে আছে। সেই ছেলে বেলার জানু। বাবার পাশে গাড়ীতে বসে মামার বাড়ী বেড়াতে যাচ্ছে। –গোলাপ ছড়ি, গোলাপ ছড়ি, পিপারমেন্ট লজেন্স, কোকো খান, তানসেন গুলি।–খোকা খুকুর 'হাসিখুসী' নিয়ে যান, ভালো ভালো রঙিন ছবিঅলা ছড়ার বই নিয়ে যান। অন্ধকার যেনো বাতাসের পায়ে মাথা কোটে, সিঁড়িটা কুন দিকে বাবা, আমি কানা মানুষ। অ বউ। গাড়ী এখন বেগমপুর পোষ্ট অফিস পেরিয়ে যাচ্ছে, তারপর পূন্যময়ী বিদ্যামন্দির। পেরিয়ে গেলো। অলোক মাথা তুললো। জাহানের দিকে চাইলো। তারপর সামনের দিকে ভ্রূ কোঁচকালো। এখন ও বৃষ্টি। আর গাড়ীটা যেনো কতোদিন থেকে চলছে! কতোদিন থেকে ওরা দু'জন পাশাপাশি বসে আছে, কোন কথা নেই। আর হু হু করে অন্ধকারের ভেতর দিয়ে ঝড় বৃষ্টি মাথায় নিয়ে গাড়ী চলছে। এদিকে দোকান–পাট প্রায় নেই–ইঃ যা দু'একটা ভাঙা চোরা আছে, তা–ও এখন বৃষ্টিতে ঝাঁপ বন্ধ করা।

এবং এক সময় চারপাশে তুমুল ঝড় বৃষ্টি আর নির্জন অন্ধকারের ভেতর গাড়ী থেমে যায়। সামনে শাদা রেল গেট, বন্ধ। তারপর অন্ধকার দখিন জলা থেকে হাওয়া উঠে আসছে হা হা করে। জাহান হর্ন দেয়। বৃষ্টি আর বাতাস যেনো সেই শব্দকে ছেঁড়া কাগজের মতো অন্ধকারের ডাষ্টবিনে ফেলে দেয়।

এবং সেই অঝোর বৃষ্টি, ক্রুদ্ধ হাওয়া, সামনে পেছনে আর পাশে অন্ধকার নিয়ে ওরা দু'জন বসে থাকে, কখন লণ্ঠন হাতে বুড়ো গেটম্যান থিরুমল এসে বন্ধ গেট খুলে দেবে।

গোপাল কামারের তলোয়ার

এ কাহিনী খুবই পরিচিত, একান্ত সাদামাটা। তবু এ মানুষের কাহিনী– মানুষের কাহিনী কখনো পুরনো হয় না।

গোপাল বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের এক উপজেলা সদরের লাগোয়া গ্রামের বাসিন্দা।

বংশগতভাবে সে কামার।

বাড়ি বলতে পুরনো আমলের দু'কামরা মাটির ঘর। খোলার চাল।

প্রয়োজনের তাগিদে ঘর একখানা তুলতে হয়েছে গোপালকে; সে ঘর, মাটিরও নয়; ইটেরও নয়, বেড়ার। সেখানে থাকে কনিষ্ঠ পুত্র নারায়ণ ওরফে নারু।

ঘরের ভেতরে, চারপাশের বেড়ার গায়ে সিনেমা পত্রিকা থেকে হলিউড, বোম্বে, লাহোর, কলকাতা, ঢাকার তাবৎ নায়ক–নায়িকার বিভিন্ন বর্ণের বিচিত্র ভঙ্গির ছবি সাঁটা, তাতে বেড়ার ঘরের আবরু এবং শোভা যেমন বজায় হয়েছে, তেমনি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
শ্রীমান নারু তাদের উষ্ণ সান্নিধ্যে পরম তৃপ্তিতে নিশি যাপন করে।
বাজারের এক ধারে বিশাল এক ছাতিম গাছের নিচে গোপালের কামারশালা। গোপালের বাপ পঞ্চানন কর্মকারও এখানে বসে কাজ করতো।
আগে ছিল গোলপাতার ছাউনি, গোপালের বিয়ের বছর চারেক আগে এক চৈত্র মাসের দুপুরে কিভাবে না কিভাবে আগুন লেগে বাজারের অনেকগুলো ঘর পুড়ে গিয়েছিল সেই থেকে গোলপাতার জায়গায় টিনের চাল বহাল হয়েছে, সে টিনও জীর্ণ হয়ে এখন বাতিলের পর্যায়ে। বর্ষা বাদলে মাটির মেঝে চষা মাঠ হয়ে যায়। সামনের দিকটা দেওয়াল-সমান খোলা। বাঁশের বাতার খোপ খোপ ঝাঁপই বলো আর দরজাই বলো, দু'পাশ থেকে সে দুটোকে ঠোঁটে ঠোঁটে সেঁটে বাঁশের খুঁটির সঙ্গে এ মাথায় ও মাথায় এবং মাঝখানে শেকল দিয়ে তালা লাগিয়ে গোপাল রাতের বেলা বাড়ি ফেরে।
কামারশালার ভেতরটায় ছায়া ছায়া শীতলতা। সেখানে কর্মক্লান্ত হাপর, হ্যামার, হাতুড়ি, সাঁড়াশি, কাঠ কয়লার স্তূপ রাত দশটার পর ঘুমিয়ে পড়ে। একটি বড় জালার নিচের অংশটা ভেঙে হাঁড়ির মতো করা, তার পানিতে মশককূল মনের সুখে বংশবৃদ্ধি করে সারারাত।
রাত বাড়তে থাকলে বাজার লোকালয়, মাঠ-প্রান্তর আর মানুষের থাকে না। আগুনের মালসা মাঠের ওপর দিয়ে শূন্যে ভাসতে ভাসতে এসে বাজারের শেষ মাথায় তেঁতুল গাছে গিয়ে ওঠে। সেখান থেকে কালো লিকলিকে ঠ্যাং বাড়িয়ে দিয়ে আর এক প্রান্তে যোগেশ পালের কাঠের গোলার অদূরে বটগাছের ডালে দোল খায়। কেউ কেউ কট কট করে হাসতে হাসতে বাজারের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত ডিগবাজি খেতে খেতে চলে।
একরাতে গোপালের বাপের হাত থেকে মাছ নেবার জন্য ঐ তেঁতুল গাছের ডাল থেকে সটান হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। গোপালের বাপ শিবনাথের আখড়া থেকে গাঁজা টেনে ফিরছে, মেজাজই তার আলাদা তখন! মাছ চাইলেই হলো!
পঞ্চু কামার হাঁকাড় দেয়, কুন শালারে....
তারপর অবশ্য আর কিছু মনে নেই তার। দশদিন পর যখন বিছানা ছেড়ে উঠলো সেদিন তার মনে পড়ে, খাল থেকে হাঁক পেড়ে যে তাকে থামিয়ে তীরে নৌকো ভিড়িয়ে নামমাত্র দামে পাঙাশ মাছটা দিতে দিতে বলেছিল, মাছখান বড় সরেস রে, খায়ে দেহিস- সে ছিল দামোদর জেলে তিরিশ বছর আগে যে মরে গেছে কলেরায়।
ছাতিম গাছটির পায়ের ঢালুর নিচে নালা। নানা রকম আগাছায় সারা বছরই প্রায় ঢেকে থাকে। দু'পাশ ঝাঁপানো আগাছায় ঢাকা সেই শুকনো খটখটে নালা দিয়ে আষাঢ়-শ্রাবণে বর্ষার ঢল ঘুরতে ঘুরতে ছোটে মাঠ-প্রান্তরের দিকে।
ছাতিম গাছের কাছে দাঁড়ালেই অদূরে বিস্তৃত ক্ষেতখামার, সেই সঙ্গে লী লী করা দিগন্ত রেখার খানিকটা নজরে আসে। মাঠের ওপর দিয়ে মাঝে মাঝে উঠেছে বিশাল বিশাল ইলেকট্রিক পোস্ট, তার মাথায় কাছির মতো টানা তারের লম্বমান প্রবাহ।
ছাতিম গাছের গোড়ায় পোড়া কয়লা আর ছাইয়ের স্তূপ। প্রস্রাবের বেগ ধরলে গোলাপ এই গাছের মোটা গুঁড়ির আড়ালে বসে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
গোপালের পূর্বপুরুষরা শোনা যায় ছিল রাজা প্রতাপাদিত্যের অস্ত্রশালার কারিগর। ঢাল তলোয়ার থেকে কবে তারা কাস্তে, বটি, দা খুন্তিতে নেমে এসেছে সে কথা গোপাল জানে না। বাপের কাছ থেকে এইটু কেবল শুনেছে, তাদের আদি নিবাস ছিল পূর্ণিয়ায়।

ক'দিন ধরে অজানা অদেখা সেই সব পূর্বপুরুষের কথা খুব মনে হচ্ছে গোপালের। মনে হওয়ার অবশ্য কারণও আছে।

নাতির ফরমায়েশ, তলোয়ার বানিয়ে দিতে হবে তাকে। বয়েস তার বছর নয়েক। ক'দিন আগে সে মামার বাড়ি বেড়াতে গিয়ে যাত্রা দেখে এসছে–'বর্গী এলো বঙ্গে'।

সেই থেকে ঝোঁক ধরেছে, তলোয়ার বানিয়ে দাও। যে সে তলোয়ার হলে চলবে না, আলীবর্দী খাঁর মতো তলোয়ার চাই।

হাট থেকে তার মামা পাতলা টিন কাটা ছেলে ভুলনো তলোয়ার একখানা কিনে দিয়েছিলো যদিও, কিন্তু আলীবর্দী খাঁর সংলাপের সঙ্গে একবার ঘোরাতেই সে তলোয়ার দু'মড়ে গেছে, অতএব তলোয়ার খানা হওয়া চাই মজবুত।

সোজা আর লম্বা হওয়া লাগবি, এই দ্যাহো তোমারে আঁকোয়ে দেহাই। খাতার ওপর পেন্সিল দিয়ে সে ডিজাইনও করে দিয়েছে। ধরবার জায়গায় নিচির দিকি এম্বা চাঁদের মতন করে দেবা বুজিছ তো? আর শোন, তরোয়ালের মুখটা করবা চোক্‌খা।

এই নিয়ে দাদা–নাতিতে বেশ খানিকটা দরকষাকষি হয়: হ্যাঁ, চোক্‌খা তরোয়াল দিয়ে তুমি একটা রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটাও।

নাতির বায়না মেটাতে টিনের পাত চাই, টিন কাটা কাঁচি চাই। গোপালের কাজ লোহা নিয়ে, তার সব ভারী ভারী যন্ত্র।

গোপালের স্ত্রী শৈলবালা ধমকায়, ছ্যামড়ার যতো আদেখলা বায়না, আর উনিও আছেন তেমনি, নাতি কোল উনিও ন্যেইচে উঠলেন।

– ন্যেইচে উঠতি দেখলি আবার কোয়ানে, বুজোয়ে-সুজোয়ে কোন মতে....

–উরে চালাক, ফাঁকি দিতি চাও আমারে?

নিজের বোকামিতে নাতির কাছে ধরা পড়ে গিয়ে গোপাল হাসে, হ্যাঁরে পাগল, তরোয়াল দিয়ে তুই করবিডা কি ক'দিনি?

–বর্গী মারবো।

–বর্গী মারবি? বগী কোয়ানে?

–কত্তো বর্গী! চারিদিকি বর্গীতে এহাবারে গিজগিজ করতিছে!

ছেলেমানুষী খেয়ালেই বলে কথাগুলো; কিন্তু সামনের দিকে হাত প্রসারিত করে এ মাথা থেকে ও মাথা তর্জনী দিয়ে এমন করে দেখায়, যেন উঠোনের ধারে শৈলবালার সীম শসা থেকে শুরু করে তার পেছনে কলা, পেঁপে ও অন্যান্য গাছপালা শ্রীমান তপনকুমারের তলোয়ারের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে, তার হাতে তলোয়ার এসে গেলেই শুরু হয়ে যাবে তুমুল যুদ্ধ।

শৈলবালা আতঙ্কে হাঁ হাঁ করে ওঠে, খবদ্দার, ও সব তলোয়াল মরোয়াল বানা দেবা না, ছ্যামড়া আমার গাছপালা সব নিকেশ করবি।

আলীবর্দী খাঁ বগী ঠেকালেও গোপাল নাতি ঠেকাতে পারে না। শেষ পর্যন্ত টিনের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
পাত, টিন কাটা কাঁচি- সবই আসে। গোপালের ছেলে নারুই সব জোগাড় করে এনে দেয় কোথা থেকে। সে এখন পারে না কি? চেয়ারম্যানকে জেতাবার জন্য জান লড়িয়ে দিয়েছে না সে!
বাড়িতে নারু থাকে না বড় একটা। সময় কোথা তার? শার্ট প্যান্ট, হাতে ঘড়ি: চল বউদি, গুরুর বই দেখোয়ে আনি।
-গুরু কিডা? ছবিরাণী হাসিমুখে ভ্রূতে টঙ্কার তোলে।
-গুরু তো একজনই, অমিতাভ বচ্চন। আমরা ভি, সি আর চালু করিছি। টিকিট সিস্টেম। তোমার জন্যি ফ্রি। পয়সা লাগবি না।
-ওমা তাই! ছবিরাণী একেবারে খুকি হয়ে ওঠে।
ছবিরাণীর স্বামী সহদেব খালিশপুর মিলে চাকরি করে, বাড়িতে আসে পনেরো দিন অন্তর।
ন' বছরের তপনের পর ছবিরাণীর আর কোন ছেলেমেয়ে হয়নি এ পর্যন্ত! লম্বা ঠাস বাঁধুনির শরীর লাস্যে কলকল করছে সব সময়। তার ইচ্ছা সে সহদেবের সঙ্গে খালিশপুরে থাকবে। এখানে এই ঝুপসী অন্ধকারে রাত জেগে বসে বসে কুপির আলোয় শাশুড়ির সঙ্গে ঠোঙা বানিয়ে আর কতো কাল! শ্বশুর লোহা পিটিয়ে আর ক' পয়সা পায়। ঘর ভিটেটুকু ছাড়া এক ছটাক জমি নেই। কি ভবিষ্যৎ আছে এ সংসারের! বলতে গেলে গোটা সংসারটা চলে সহদেবের ওপর। তাহলে?
কিন্তু সহদেব রাজি হয়নি। বৃদ্ধ বাপের ক' পয়সাই বা রোজগার। নারুর কোন জ্ঞানবুদ্ধিই হয়নি। ওর হাতে বুড়ো বাপ-মাকে ছেড়ে দিয়ে যেতে পারে না। সহদেব তো আর সাধ করে মিলের মজুর হয়নি। স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে যাওয়া মানে আর একটা সংসার।
দু' সংসারের বোঝা টানার হিম্মত সহদেবের নেই।
কিন্তু অবুঝ মেয়েমানুষকে এসব বোঝাতে যাওয়া ঝকমারি।
সে স্ত্রীকে বলে, তুই পাগল হইছিস। মিলির বস্তিতে মানুষ থাহে? নরক, নরক!
ছবিরাণী নরক দেখেনি। মিল-কারখানা মানে সিনেমা-থিয়েটার, হিমানী-পাউডার, বিজলীবাতি। নিজের আলাদা সংসার। স্বাধীন, নির্ঝঞ্ঝাট।
-আসলে তুমি নিতি চাও না। তোমার ফূর্তিতে কোম পড়বি।
-ফূর্তি আবার দেখলি কোয়ানে? খাটতি খাটতি পিরান যায়, উনি দেখেন ফুর্তি!
-পুরুষ মাইনষেগের কতা কিছু কওয়া যায়?
-অ, তুই এই সবই ভাবিস!
-আমি কি ভাবি না ভাবি তার দাম দিতিছে কিডা!
খুব ভেতরে সহদেব খানিকটা জ্বালা অনুভব করে। কি কষ্ট করেই না সে থাকে! আর ই মিয়ামানুষ সে কথা ভাবেই না বলে কি না ফূর্তিতে কোম পড়বি!
ছবিরাণী পাশ ফিরে শুয়ে আছে তার দীঘল শরীরের খাঁজে খাঁজে নোনা ঢেউয়ের থমথমে নিস্তব্ধতা। সহদেব সেদিকে হাত বাড়ায়: তুই এতো বোকা ক্যানো ক' দিনি?
এ কথায় কতটা মমতা আর কতোটা মোহ বলা মুস্কিল। ছবিরাণী নড়ে না। সহবেদ এবার পেছন থেকে সাপটে ধরে গালের ওপর গাল রেকিয়ে বলে, এরাম চ্যাম্পিয়ন বউ থাকতি কুনো পুরুষ বাইরে ফূর্তি করে না, বুঝলি?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ছবিরাণী বলে ছাড়ো আর সোয়াগ লাগবি না!
সেই ছবিরাণী ভিসিআর-এর নামে খুকি হয়ে উঠবে না তো কে হবে?
গোপাল ভিসিআর দেখেনি। ছিল নাকি এসব?
নোনা লাগা কালচে টিনের হুমড়ি খেয়ে পড়া খান কয়েক দোকান ঘর, চার খুঁটির ওপর গোলপাতার ছাউনির ক'খানা চালা ঘর, বাঁকের মুখে বটতলায় দু'তিনটে গরুর গাড়ি, বলদগুলো তার ছায়ায় বসে জাবর কাটে, একটা মাত্র রাস্তা খালপাড় পর্যন্ত। সে রাস্তাও কাঁচা। পাকা বলতে এক ফোটা থানাটি।
দূরেদূরে গাছপালায় ঠাসা এক একখানা গ্রাম। চারিদিকে নিচু ফসলের জমির বিস্তৃত প্রান্তরের মাঝখানে দ্বীপের মতো বাজারই বলো আর গঞ্জই বলো –এই ছিল নয়নপুর। এখানে সিনেমা হলই কোথায় আর ভিসিআর-ই কোথায়? শীতের সময় বরিশাল থেকে ফরিদপুর থেকে যাত্রার দল আসতো। মানুষ রাতভর যাত্রা দেখতো।
তারও আগে, সে সব গোপাল দেখেনি, তার বাবার মুখে শুনেছে, গোটা এলাকাটা ছিল গভীর জঙ্গলে ভরা। গ্রামের ভেতর দিয়ে বাঘ চরে বেড়াতো। মানুষ ঘরে ঢুকতো সন্ধ্যার আগেই। তখন বাজারই কি গ্রামই কি গোটা এলাকাটাই হয়ে যেতো জনশূন্য জঙ্গলের অংশ।
গ্রামে ছিল খুব প্রাচীন এক কালী মন্দির। লোকে বলতো সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ি। সেই মন্দিরকে ঘিরেই মানুষের বসতি। পাল বাড়ি, নাগ বাড়ি, ঘটক বাড়ি, মুখুজ্জে বাড়ি, দত্ত বাড়ি, মিশ্র বাড়ি-মুসলমান পাড়া খানিক তফাতে।
মিশ্রদের সম্পর্কে শোনা যায় সেই কোম্পানী আমলে কালা-ধলার লড়াইয়ে এক দেশী সিপাই ব্যারাকপুর থেকে পালিয়ে এসে এই গ্রামে লুকিয়ে ছিল অন্য আর একজন সঙ্গী নিয়ে, অন্যজনের খবর জানা যায় না, বদ্রিনাথ মিশ্রই মন্দিরের পূজারী হয়ে থেকে গিয়েছিল এখানে।
সে মন্দির এখন আর নেই, '৭১ সালে ধ্বংস হয়ে গেছে, কষ্টি পাথরের অমন বিশাল কালীমূর্তিটিও উধাও, কালীবাড়ি এখন প্রাইমারি স্কুল।
গোপালের মাথাটা বেশ বড়। ছেলেবেলায় তাকে দেখে নিবারণ চক্রবর্তী বলেছিল, পঞ্চু তোর ছেলেকে স্কুলে দে, মাথাখান দেহিছিস ঠিক যেন বিদ্যাসাগরের মাথা।
পঞ্চুকামার একবার ছেলের মাথা একবার নিবারণ চক্রবর্তীর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে থাকলে পণ্ডিত মশাই খেকিয়ে ওঠে, হতভাগ্য মুখ্যু, গাঁজা টেনে, পাঁঠা কেটে আর লোহা পিটিয়ে মগজের মাথা খায়ে বইসে আছিস, বুঝবি কি করে.....
স্কুলের একগাদা ছেলের সামনে, তার নিজের ছেলের সামনে এ ধরনের ভর্ৎসনায় পঞ্চু লজ্জা পাবে কি, সে পণ্ডিত মশাইয়ের মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে: কার লেখাপড়া কেমন হবে তা মাথা দেখে বলা যায়-এমন কথা সে বাপের জন্মেও শোনেনি!
পঞ্চু অন্যান্য ছেলের মাথার দিকে তাকায়, কারো বেলের মতো, কারো হুঁকোর মতো- ছোট ছোট মাথার সারির সঙ্গে নিজের ছেলের মাথার তুলনা করতে গিয়ে কেমন এক ধরনের ভয় মেশানো রোমাঞ্চই অনুভব করে।
ততক্ষণে নিবারণ পণ্ডিত একখানা বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ খুলে পঞ্চু কামারের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
সামনে তুলে ধরে, দ্যাখ্ হতভাগ্য দ্যাখ্, এই হলো তোর গিয়ে ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। মাথা দেহিছিস?
পঞ্চুর ছেলে গোপাও দেখে, গায়ে চাদর জড়ানো, গোঁফ-দাড়ি কামানো একজন লোক, চওড়া কপাল, বড় মাথা।
উত্তেজনায় গোপাল নিজের মাথায় হাত দিয়ে ফেলে, তার মাথার মতো বিদ্যাসাগরের মাথা শুধু বড়ই নয়, ছোট ছোট কোঁকড়ানো চুলও তার মতোই।
বাংলাদেশে, বুঝিছিস, এমন মানুষ কহনো হয়নি আর হবিও না। যেমন বিদ্যে তেমনি দয়া। বিদ্যার সাগর, দয়ার সাগর।
পণ্ডিত মশাইয়ের চোখ ছলছল করে। তার ধরে-আসা গলার স্বরে অভিভূত পঞ্চু কি করবে ভেবে না পেয়ে ছবির মানুষটির দিকে তাকিয়ে দু' হাত কপালে ঠেকায়। বাবার দেখাদেখি গোপালও।
বাপ- বেটার ভক্তি দেখে নিবারণ চক্রবর্তী উৎসাহিত হয়ে বলে, বাওনের ছেলে, বাড়ুজ্জে; কিন্তু গরীব, কতো কষ্ট করে লেহাপড়া শিখিছেন, বড় হইছেন, মানী হইছেন, দেশ-জোড়া নাম হইছে।
গোপাল তার কামারশালায় বসে বসে তামাক টানতে টানতে বহুদিন মনে মনে হেসেছে, কোথায় বিদ্যেসাগর, বাওনের ছেইলে আর কোথায় শালা আমি কামারের বাচ্চা কামার-মাথা বড় হলেই হলো? পণ্ডিত মশাইয়ের যেমন কথা!
নিবারণ পণ্ডিতের ওই এক স্বভাব ছিল, লোক পেলেই হলো, ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করাও।
নিজের একটিমাত্র ছেলে তা-ও পাগল। পরের ছেলেকে মানুষ করানোতে কী যে সুখ তা সে নিবারণ পন্ডিত আর তার ভগবানই জানতো!
লোকে আড়ালে বলতো ছেলেধরা পণ্ডিত। সামনে বলতো, মাস্টার মশাই, গরীব মানুষ, নিজেগোর প্যাটের জোগাড়ই কত্তি পারি না .....
ওই তোদের এক রোগ; আচ্ছা, হুই দ্যাখ, মাঠে যে গরুডা চরতিছে অ-ও পৃথিবীতে আয়েছে, তুইও আয়েছিস, তোর পোলাডাও আয়েছে, অ-ও খায়, তুইও খাস, তোর পোলাও খায়, তাহলি তুই, তোর পোলা আর ওই গরুডা কি এক?
-তা হবি ক্যানো? ওডা তো গরু, আর আমরা হলাম তো মানুষ।
-এঁহ মানুষ! খুবতো বুজিছো, মানুষ! দুই পায়ে হাঁটলেই মানুষ, না? বলি তফাতডা কোহানে?
নিবারণ পণ্ডিত পেটে হাত দিয়ে দেখায় এহানে না, এই হানে-নিজের মাথায় তর্জনীর টোকা দেয়, এই খুপরির ভিতরে যে মগজডা আছে তফাতডা সেই হানে।
প্রধানত: চাষী এলাকা, কিন্তু বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের মতো এ এলাকাতেও সকলের জমি নেই, পরের জমিতে বর্গা করে কি গতর খাটে, গরুর গাড়ি চালায়, ঘরামির কাজ করে, জন-মজুরি করে-কখনো কখনো কর্মহীন বেকার জীবন কাটায়।
পণ্ডিত মশাইয়ের কথায় গাছতলায় তাদেরই দু' চারজন ধ্যারড়া ধ্যাবড়া পা নিয়ে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে যায়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
প্রায় নগ্ন শরীরের ভালুক ভালুক চেহারার এগুলো কি মানুষ? নিবারণ পণ্ডিতের রাগও ধরে মায়াও হয়– পেট ভরে খেতে যে পায় না সে কথা কে না জানে, নিবারণ সে কথাই তো বলতে চায়, কিন্তু মাথাটার কি হবে? জমিতে চাষ দিতি হয়, বীজ বুনতি হয়, বৃষ্টি না হলি জলের সেচ দিতি হয়, নিড়ানি দিতি হয়, কতো পরিশ্রম, কতো যত্ন, তবে না ফসল। মাথাডাও, বাবা সকল–ওই চাষের জমির মতন, তারও যত্ন–আত্যি লাগে, তবেই হয় বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান, তার পরে না তুমি মানুষ; অমনি মানুষ করে ফাল পাড়লেই মানুষ?

সারাদেশ জুড়ে বাই উঠিছে স্বরাজ চাই!

বিদ্যা নাই, শিক্ষা নাই–স্বরাজ। স্বরাজ দিয়ে কি কলাডা করবানে? বলি দেশডা তো চালাতি হবি, না ইংরেজ খেদালেই দেশ তোর রেলগাড়ির মতন গড় গড় গড় গড় করে চলতি শুরু করবি, এ্যাঁহ? তহন দেখবি বারো ভূতে লুটে খাবে: অন্ধ হতভাগার দল, এহন যা দু'মুঠো খাতি পাচ্ছিস তা–ও পাবি না, এই কয়া থুলাম আমি

কিন্তু নিবারণ পণ্ডিতের অতো যে সাধের মাথা গোপালের, সে মাথায় কি আছে ভগোবান জানে, পড়াশোনার কিছুই ধরে রাখা যায় না সেখানে। মার খেতে খেতে হদ্দ গোপাল একদিন এই শ্রেষ্ট মাটির দাওয়ায় ফেলে দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে ঝাঁঝের সঙ্গে মাকে শুনিয়ে বলে, এ বাঁড়ার লেহাপড়া আমার পোষাবি না, মনেই থাহে না কিছু, আর লেহাপড়া শিখে কি কলাডা হবে নে!

পঞ্চু কামার খেপে যায়, লেহাপড়া যহন শিখবিই না তো শালার বিটা শালা হাপর টান। এঁহ বিদ্যেসাগরের মতন মাথা, আমার...

অবিরাম পঞ্চু খিস্তি করে যায়।

বালক হলেও গোপাল তখন বেশ শক্ত পোক্ত। পুরোনো দিনের লম্বা লম্বা নারকেল গাছের উচুতে ফোকর কেটে টিয়া পাখি বাসা করে, সেই ফোকরে অনেক সময় সাপও ঢোকে বাচ্চার লোভে। কিন্তু কে মানে নিষেধ, বই শ্লেট পুকুর পাড়ে ঝোপের ধারে রেখে তর তর করে উঠে গিয়ে সেই ফোকরে হাত ঢুকিয়ে গোপাল মাংসের ড্যালার মতো ছানা পেড়ে আনে।

তা হবে না কেনো, এখনকার মতো মায়ের পেট থেকে পড়েই স্কুলে যাওয়া তো তখন ছিলো না। তাছাড়া বয়েসের তুলনায় গোপাল আগাগোড়াই লম্বা চওড়া। বাপের কথায় সে মাথা গুঁজে হাপর টানে।

এসব কি আজকের কথা!

গোপালের জন্ম তারিখ গোমুখ্য পঞ্চু কামারের লিখে রাখার কথা নয়, গোপালের মা বলতো, সেই যি বছর জমিদারের মেজো ছেলে রূপসা নদীতে ঝড়ে পানসী ডুবে মরিছিলো সেই বছর তুই হইছিলি, আশ্বিন মাসের বুধবার রাত্তিরে।

বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জে অধিকাংশ মা এভাবেই হিসাব রাখে। সেই হিসাব করেই নিবারণ পণ্ডিত স্কুলের খাতায় যে সালটি লিখেছিলো তাতে গোপালের বয়েস এখন হয় সাতষট্টি।

মোটা নাকের নিচে কাঁটা ঝোপের মতো গোঁফ। শক্ত চোয়ালের চৌকো মুখ। মাথার সঙ্গে লেগে থাকা আংটির মতো প্যাঁচানো প্যাঁচানো চুল। মোটা ঘাড়। চওড়া কাঁধ। মুগুরের মতো দু'খানা হাত। সবচেয়ে দেখার মতো হয় হাপর

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
চালানো কিংবা লোহার পাতের ওপর হাতুড়ি পেটানোর সময় তার পিঠটা। কাঁধের নিচে থেকে দু' দিকের ডানার পেশীগুলোর দিকে তাকালে মনে হয় দু'টো বুনো মোষ মুখোমুখি লড়াই করছে। ঘেমে যাওয়া তামাটে মসৃণ পিঠে ছবিটা খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিড়ি সিগারেট গোপাল কোনকালেই খায়নি। সে খায় হুঁকো। হুঁকোর ধোঁয়ায় গোঁফের রঙই গেছে পাল্টে, মনে হয় মেহেদী লাগায় নিয়মিত। ফলে কাঁচা আর পাকার তফাত করাই মুস্কিল। মাথার চুলও ধূসর। আর যে রকম টানটান চামড়া গোপালের , কে বলবে তার বয়েস এখন সাতষট্টি! তবে ওই যে মোটা নাকের নিচে কাটা ঝোপের মতো গোঁফ, তাতে গোপালকে বেশ খানিকটা ভারিক্কি দিয়েছে।

বেলা পড়ে আসে, হাপরের বাতাসে ছোট ছোট অগ্নিশিখা ওঠে, কাঠ- কয়লা লাল আভা ছড়ায়, সেই শিখার ভেতর দিয়ে, সেই জ্বলন্ত আঙরার ওপর দিয়ে অজস্র মানুষ ছুটে যেতে থাকে। গোপালের বিশাল মাথার ভেতর হাজার হাজার মানুষের পদধ্বনি, কান্না আর চিৎকার মথিত হয়। আবার দেখো, শত শত কৃষক আলের ধারে লাল নিশান পুঁতে ধান কাটতে নেমেছে মাঠে। লাঠি হাতে পাহারা দিচ্ছে ভলান্টিয়াররা: 'তোমার কাস্তেটারে দিও জোরে সান কিষাণ ভাইরে/কাস্তেটারে দিও জোরে সান।'

বিস্তৃত ধানক্ষেতে, অঘ্রাণের রোদে শত শত কাস্তে ঝিকিয়ে উঠছে। হঠাৎ গান থেমে যায়, দুপুর-রোদ ঝপ করে পড়ে গিয়ে চারপাশ অন্ধকার হয়ে আসে, সেই অন্ধকার ফিস ফিস করে ওঠে: বুজিছ তো, কেউ জানতি যেনো না পারে, খবদ্দার। আমরা কাল এমন সময় আইসে নে যাবো, ঘরের বার করবা না, সাবধান। শীতের রাতে চাদর মুড়ি দেওয়া যুবক তিনজন অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

-কিডা গো এতো রাত্তিরে?

-চুপ, চুপ মাইরে থাক।

-কিডা করা তো.....

-আ রে মাগী কতিছি চুপ..... গোপালের গলা চাপা খ্যাস খ্যাস করে, নক্সাল, জানতি পারলি সাঙর ভাঙি দিবি।

কোথায় তখন ভিসিআর!

এখন পাকা রাস্তা, ফাঁকা নিচু জমি ভরাট করে কোর্ট বিল্ডিং, চেয়ারম্যান অফিস, ডাক বাংলো, ব্যাংক-আরো কতো কি সব অফিসের জন্যে বিল্ডিং উঠছে হুমহাম করে। দোকানে দোকানে হারিকেনের বদলে বিজলী বাতি। পান সিগারেটের সঙ্গে সৌখিন মনোহারি দোকান, ওষুধের দোকান, হেল্‌থ কমপ্লেক্স। এখন ভিসিআর কেনো সিনেমা হলও হলো বলে।

তা হোক যতো খুশি পারুক হোক- যে মাথার জন্যে নিবারণ পণ্ডিত গোপালের মধ্যে অশেষ সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেখেছিলেন, যে মাথার জন্যে গোপালের লেখাপড়া হয়নি, সেই মাথা দিয়েই গোপাল নিজের সঙ্গে আলাপ করে, কিন্তু তাতে হবেডা কুন কলা, আমরা সব রাজা হয়ে যাবানে নাহি?

তা কেউ কেউ ভাবে বৈকি। তার ছেলে নারুই ভাবে। চেয়ারম্যানের সঙ্গে জীপ গাড়িতে চড়ে যেতে যেতে সে গোপালের কামারশালার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে অন্যদিকে; মনে মনে হয়তো গালই দেয় গোপালকে, শালা কামারের বাচ্চা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
কামার।
কিন্তু গোপাল বড় অবাক হয়, এরা সব ছেলো কনে? দিনরাত খালি ছোঁক ছোঁক করতিছে, ফন্দি আটতিছে। ছেলো কনে এরা সব?
শৈলবালা ছেলেকে বলে, এই যে তুই শিব ঠাকুরের মতন বম বম করে ঘুরে বেড়াচ্ছিস, চেয়ারম্যান তোরে রাজা করে দিবি? ক'পয়সা পাইছিস? মানুষের পেছন পেছন তোর ঘোরাই সার হবি।
–ম্যালা ফ্যাচ ফ্যাচ করিস নি, পয়সা কামাতি হলি পয়সা ঢালতি হয়, বুজিছিস? আছে তোর, দিতি পারবি? শালা এমন ঘরে জন্মাইছি....
নারুর এই প্রবল আক্ষেপের মুখে শৈলবালা দপ্ করে জ্বলে ওঠে: হারামজাদা, ঘরের মান খুইয়ে তাই তুমি জাতে উঠতি চাও?
–ঘরের মান খোয়ালাম কি রাম?
– ভেইবে দ্যাখ।
–বল্ না শুনি।
–ঘরের বউরি রাত বিরিতে ভে,সি,আর দেখাতি নে যাচ্ছিস তাতে মান যায় না?
– ছোট লোকের বাচ্চা, ঘরের বউ ভিসিআর দেখলি ঘরের মান যায়? আর কেউ যাতিছে না?
–তাগেরে বাড়িতি চেয়ারম্যানের ছোট ভাই যায়?
–তুই কি কতি চাস, কুচুটে মাগী?
আগুনের পর আগুন ছুটতে থাকে।
আজাদ অবশ্য বাড়ির ভেতর ঢোকে না কখনো। মোটর সাইকেলে বসেই বাইরে থেকে নারুকে ডাকে।
ছবিরাণী প্রথম যেদিন ভিসিআর দেখতে গেলো, তার দু'দিন পর বিকেলের দিকে মোটর সাইকেলের আওয়াজ শোনা গেলো বাড়ির সামনে।
গোপালের বাড়িতে কোন পাঁচিল নেই, সদর দরজাও নেই; বাঁশের ভারার ওপর শুকনো কলাপাতা ঝুলিয়ে পাঁচিলের আব্রু। সেখানে দাঁড়িয়েই আজাদ প্রথম দিন ডেকেছিলো নারুকে। নারু ছিলো না, কিন্তু শৈলবালা অবাক হয়েছিলো ছবিরাণীকে হাসি মুখে কথা বলতে দেখে।
–কিডা, বৌ?
ছবিরাণী একগাল হেসে বলেছিলো, আজাদ ভাই, চেয়াম্যান সাহেবের ছোট ভাই।
–তুই চিনলি কেম্বায়?
–ওমা সিদিনকে ভিসিআর দেখতি গেলিত কত্তো খাতির করে বসালো, হেইসে কথা কোলো...
গোপাল শৈলবালার কাছ থেকে বৃত্তান্ত শুনে কোন মন্তব্য করেনি। সহদেব ঘরে ফিরলে ছবিরাণী কেঁদেকেটে এক সা হয়েছিলো।
সময় বদলাচ্ছে, মানুষের সাধ আহ্লাদ বদলাচ্ছে, ভিসিআর দেখতে যাওয়ার মধ্যে–তাও বিনা পয়সায়–দোষের কিছু দেখতে পায়নি সহদেব।
চেয়ারম্যানের ছোটভাইয়ের সঙ্গে নারুর বন্ধুত্ব হবে না? চেয়ারম্যানের জন্য কম করেছে নাকি নারু! তার খোঁজে যদি এ বাড়িতে আজাদ এসেই থাকে সে তো

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
গৌরবের। আর দেওরের বন্ধুর সঙ্গে হেসে কথা বললে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়। এইসব সেকেলে মানুষ নিয়ে দুনিয়া চলা বড় মুস্কিল।

ছবিরাণীর খালিনাপুরে থাকার নিয়মিত বায়নাকে ঠেকানোর এই মোক্ষম সুযোগটিকে সহদেব খুব চমৎকারভাবে কাজে লাগায়। অন্যদিকে নিজের জেদ বজায় রাখতে গিয়ে প্রধান আয়ের উৎস বড় ছেলেকে বিগড়ে দেবে? তিন যুগের পাকা গিন্নি শৈলবালা সংসার থেকে তাহলে শিখলো কি? এতএব খালিশপুরে থাকা না হোক, ভি,সি আর দেখার অধিকার ছবিরাণীর পাকা হলো।

বাজারের এক কোণে, ছাতিমগাছের নিচে, নিরিবিলিতে তলোয়ার বানাতে বানাতে গোপাল ভাবে তার পূর্বপুরুষের কথা। কেমন দেখতে ছিলো তারা? কোন ভাষায় কথা বলতো পূর্ণিয়ার সেই দুরন্ত মানুষগুলো? ছাতিম ফুল ফুটেছে, তার ঝাঁঝালো গন্ধ গোপালের নাকের সুড়ঙ্গ বেয়ে মাথার খুপরিতে রাখা মগজ ধরে ঝাঁকুনি দেয়, নেশায় গোপালের চোখ বুঁজে আসে, আপন মনে সে বিড় বিড় করে: গোপাল চন্দ্র কর্মকার, পঞ্চানন কর্মকার, হরিসাধন কর্মকার, উদ্ভবচন্দ্র কর্মকার, গোবর্ধন কর্মকার–পেছন দিকে যেতে যেতে গোপাল তার ঠাকুরদার বাপ পর্যন্ত গিয়ে ঠেকে যায়।

হেমন্তের ভিজে চাঁদ, একটু একটু হিম–কুয়াশা আর কামারশালের হারিকেনের আলোয় সে তলোয়ারখানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, কিন্তু গোবর্ধনের বাপের নাম, কি তারো আগের কোন পূর্বপুরুষের নাম মনে করতে পারে না, এ কথাও জানে না, ক' পুরুষ পেছনে গেলে প্রতাপাদিত্যের অস্ত্রশালায় পৌঁছনো যাবে।

'যশোর নগর ধাম প্রতাপাদিত্য নাম।

মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।'

গোপাল খানিকটা সুর দিয়ে গুণ গুণ করে। কিন্তু পরের লাইনগুলো আর মনে করতে পারে না। তলোয়ারখানা শূন্যে ঘোরায়। কামারশালের আধো আধো আলো–অন্ধকারে দেওয়ালে ছায়া পড়ে: বিশাল মাথা, প্রকাণ্ড শরীর, হাতের তলোয়ার দেওয়াল পেরিয়ে চাল ছুঁয়েছে। গোপাল সেদিকে তাকিয়ে একবার সামনে যায় একবার পেছনে আসে, ছায়া–শরীর কখনো দূরে সরে গিয়ে হারিয়ে যায়, আবার বিশালতর হয়ে এগিয়ে আসে গোপালের দিকে। গোপাল অস্ফুটে বলে, খবরদার।

ছায়া–শরীর থমকে দাঁড়ায়। তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মৃদু–মৃদু দোলে। গোপাল তার নিঃশ্বাস পতনের শব্দটিও পায়।

ও কিরে গোপাল, কি করিস?

গোপালের হাতের উত্তোলিত তলোয়ার নেমে আসে। সে এদিক–ওদিক তাকায়, কাউকে দেখতে পায় না।

বাজারের এদিকে এমনিতেই লোক চলাচল কম, তবু গোপাল বোঝে বেশ রাত হয়ে গেছে। কিন্তু কথা বললো কে?

তলোয়ারখানা নিয়ে এক সময় সে বেরিয়ে এসেছিলো।

বাতাস হিম হিম। বুনো গাছপালার কিংবা পকমান ধানের গন্ধ ছিলো সে বাতাসে, তার সঙ্গে হয়তো মাটির সোঁদা গন্ধও মিশে থাকতে পারে, কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে ছাতিম ফুলের ঝাঁঝালো গন্ধ তার মগজের ওপর মধুর মতো গাঢ়

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
প্রলেপ দিতে থাকলে গোপালের পা কিঞ্চিৎ টলে ওঠে। ক্রমশ ভারী হয়ে আসা মাথার ভেতরে পূর্ণিয়ার সেই লোকগুলো এসে বসেছে মনে হয়, কিয়া নাম তুম লোককা, হাম গোপাল চন্দ্র, তুম লোককা বংশধর হ্যায়, নাম বাতাও।
লোকগুলো কোন জবাব দেয় না, হাতের তালুতে খইনি ডলতে ডলতে নিজেদের মধ্যে কথা বলে। গোপাল কথাগুলো শোনার জন্য কান পাতে।
ও কিরে গোপাল, কি করিস?
চমকে উঠে সে এদিক ওদিক তাকায় কেউ কোতাও নেই। অথচ স্পষ্ট শুনেছে, কামার শালে যেমন শুনেছিলো অবিকল সেই গলা।
হাঁটতে হাঁটতে গোপাল তেঁতুল তলার বাঁক পেরিয়েছে, লোকজন কথা বলতে বলতে তার পাশ দিয়ে চলে গেছে, হয়তো হাতে তার তলোয়ার দেখে দু'বার ফিরে তাকিয়েছে, গোপাল খেয়াল করেনি।
তেঁতুল তলা পেরুলেই বাজারের সীমানা শেষ, তারপর উঁচু বাঁধের মতো চওড়া কাঁচা রাস্তার দু'পাশে নিচু ক্ষেত প্রান্তর। এখান থেকে লোকালয়ের আপাত বিরতি। দু'পাশের বাধাহীন খোলা প্রান্তরের ঠাণ্ডা হাওয়া এসে লাগে গোপালের গায়ে। মাঠে মাঠে এখন ধানের দুধ গাঢ় ক্ষীর হয়ে উঠেছে, আর ক'দিন পরই দানাদার হয়ে উঠবে।
গোপাল সেই গানটি শোনার জন্য কান পাতে। মনে হয়, ঐ মাঠের কোনো আলে এখনই নূরু মণ্ডলকে দেখা যাবে: লুঙ্গির ওপর কোমরে গামছা জড়ানো, বাম হাত কানে, ডান হাত সামনে প্রসারিত করে মাথা ঝাঁকিয়ে এক্ষুণি গেয়ে উঠেছে, 'তোমার কাস্তেটারে দিও জোরে সান কিষাণ ভাইরে/কাস্তেটারে দিও জোরে সান।'
কিন্তু গান শোনা যায় না। আঁকানো হেমন্তের চাঁদ। দু'পাশে ফসলের মাঠের বিস্তৃত 'শূন্যতার ওপর দিয়ে কুয়াশা–মাখা হিমেল বাতাস বয়ে যাচ্ছে।
গান শুনতে পায় না, কিন্তু নূরু মণ্ডলকে স্পষ্ট দেখতে পায়। কে যায়?
বাড়ির সামনে গাছতলায় খেজুর পাতার চ্যাটাইয়ে বসে রোদ পোয়াতে পোয়াতে নূরু মণ্ডল জিজ্ঞেস করে।
–আমি গো দাদা, গোপাল!
অ, গোপাল।
ঘষা কাঁচের চশমার একদিক উঁচু করে ধরে, সেই সঙ্গে হাঁ–করা মুখটাও উঁচু হয়। বিরল–দন্ত মুখগহ্বরের ভেতরে পানের ছোপ লাগা জিভটাও দেখা যায়।
–তা খবর কি, বাজারে যাতিছিস?
–হয় দাদা।
–মানুষ চিনতি এখন বড় অসুবিধে হয়রে ভাই। ডাক্তার ক'লো চোখ কাটাতি ঢাকা যাতি হবি। তা ঢাকা যাওয়া কি সোজা কম্পো। তা বাদে আছে টাকা পয়সার ব্যাপার। আমি গরীব মানুষ, অতো পয়সা পাবো ক'নে! আসমতও কয়, চেয়ারম্যানরে ক'য়ে ব্যবস্থা করবো।আমি কই তুই পাগল হইছিস আসমত, সরদার বাড়ির কাছে হাত পেতে আমি চোখ কাটাতি যাবো ঢাকায়। গণী সরদারের সঙ্গে আমরা লড়াই করিছি তেভাগার সুময়। তোর মনে নি গোপাল? তার নাতির কাছে হাত পাতবো আমি? অ গোপাল, দুনিয়াডারে আল্লা অনেক দিন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
তো দ্যাহালোই, আর শ্যাষকালে যদি দেখতি না দ্যায় তো দ্যাখপো না! তাই বইলে সরদারের নাতির কাছে হাত পেতে চোখ ভালো কত্তি হবি? এ শালার চোখ থাক আর যাক, তা পারবো না।

গোপাল দেখে, কালো লিকলিকে শরীরের লোলচর্ম বৃদ্ধ নূরু মণ্ডলের ঝাঁপসা কাঁচের চশমার ভেতরে প্রায় মরে যাওয়া চোখ থেকে যেনো দপ করে আলো জ্বলে উঠলো।

গোপাল মাঠের দিকে তাকায়, সেখানে কুয়াশা ক্রমে গাঢ় হয়ে উঠছে। মাথা নিচু করে হাঁটতে থাকে সে। কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকালয়ের ঘন আবেষ্টনী মাঠের শূন্যতাকে আড়াল করে দাঁড়ায়। গোপাল গ্রামে প্রবেশ করে।

–কি গো, এতো রাত করে বাড়ি ফিরতিছো? বুড়ো মানুষ ঠাণ্ডা লেগে যাবি যে। হারিকেন হাতে না যুবক না প্রৌঢ় জমিরুদ্দিন দাঁড়িয়ে পড়ে।

–হয় বাবা, রাত হয়ে গেলো।

–হাতে ওডা আবার কি? ও বাবা, এ যে দেহি তরোয়াল।

–হয়, নাতির ফরমানা–গোপালের মুখে হাসি ফোটে, শালা বলে বর্গী মারবি।

–বর্গী?

–মামার বাড়ি গে যাত্রা দেখিছে; এ হন বলে, আলীবর্দী খাঁর মতন তলোয়ার বানা দিতি হবি....

জমিরুদ্দিনও হাসে, দ্যাহো দিহি কাণ্ড!

–তা তুই যাতিছিস কনে?

–আমাগের ছোট বউয়ির ব্যথা উঠিছে, আমির গেছে বাগেরহাট, কতো কলাম, এমন বউ ফালা থুয়ে কোথাও যাসনি এহন। তা ক'লো খুব দরকার, না গেলেই নয়, দু'দিনের মদ্যিই চইলে আসপো। তা সে দু'দিন পেরোয়ে আজ পাঁচ দিন হতি চল্‌লো, ছ্যামড়ার কুনো পাত্তা নি–সি এক চিন্তা, তারওপর বউয়ের উঠিছে ব্যথা, মা ক'লো, লক্ষীর মারে ডাইকে আন, তাই যাচ্ছি।

জমিরুদ্দিন চলে যায়। অন্ধকারে তার হাতে ঝোলানো হারিকেনের আলো দুলতে দুলতে অদৃশ্য হয়ে যায় গাছপালার আড়ালে।

তপন কি তার তলোয়ারের জন্যে জেগে আছে এখনো? গোপাল তলোয়ারখানা মৃদু মৃদু ঘোরায়, নতুন টিনের পাত আধো আধো আলো–আঁধারিতে রূপোর মতো ঝকঝক করে। বাহ্, খাসা হইছে। হবে না? রত্তোর ধারা বলে কথা আছে না? তুই না বলেছিলি আলীবর্দী খাঁর মতন হওয়া লাগবি, তা শালা দ্যাখ হইছে কিনা তোর আলীবর্দী খাঁর মতন তরোয়াল।

নাতির কথা ভেবে গোপালের হাঁটার ভঙ্গিই বদলে যায়। তার দীর্ঘদেহের সচ্ছন্দ গতিভঙ্গি, লোহা–পেটানো মুঠিতে বাগানো তলোয়ার যেনো আলীবর্দী খাঁই–চলেছে বর্গী দমনে!

সামনে একটা বাঁক। বাঁক পেরোলেই ডান দিকে মিশ্রদের বাড়ি। মিশ্ররা সেই কবে চলে গেছে ওপারে, ভিটের চিহ্নটুকুও নেই; আজহার মোল্লা কলার চাষ করেছে সেখানে।

কলাবাগানের ভেতর দু'জোড়া জ্বলজ্বলে চোখ দেখে গোপাল থমকে দাঁড়ায়, হঠাৎ এক জোড়া চোখ পেছন ঘুরে খ্যাঁক করে ওঠে। উরে শালার শিয়েল, রাত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
দুপুরে রং মারতি আইছ এহানে? ভাগ্ শালারা। ভাগ। মানুষের গলা পেয়ে শিয়াল দু'টো দ্রুত পালিয়ে যায় গাছপালার অন্ধকারে। বদ্রিনাথ মিশ্র কি খালি হাতেই পালিয়ে এসেছিলো? সে কতোকাল আগে–বিহার কি দিল্লী, আগ্রা না কোন জায়গার কোন বদ্রিনাথ মিশ্র এসে লুকিয়ে ছিলো এখানে, গোপালদের এই গ্রামে। কি তাজ্জবের কথা!

সেই বদ্রিনাথ মিশ্র পূজারী হয়েছে এই গ্রামের মন্দিরে। বিয়ে করেছে। সংসার হয়েছে। তার বংশধররা বাংলায় কথা বলতো, এই ভিটেতে তিরিশ চল্লিশ বছর আগেও ছিলো, এখন সেখানে আজহার মোল্লার কলাবাগান, সেই বাগানে শিয়াল ঘোরে। ভাবো দিনি কাণ্ডডা একবার!

গাছপালার জড়াজড়ির ভেতর দিয়ে সুঁড়িপথ বেয়ে খানিকটা এগিয়ে গেলেই গ্রামের শেষ প্রান্তে প্রায় একা একা গোপালের বাড়ি। গোপাল উঁচু সদর রাস্তা ছেড়ে সেই সুঁড়িপথে নেমে আসে। দু'পাশে গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়া জমাটবদ্ধ গাছপালা। গাছেদের নিঃশ্বাসে ঠাণ্ডা এখানে ঘন।

গাছপালার নিঃশ্বাসের শীতলতা, পায়ের নিচের মাটির শীতলতা ছাতিম ফুলের ঝাঁঝালো সুবাসের মধুতে ডুবে থাকা মগজের কোষে কোষে গিয়ে পৌঁছুলে গোপালের মনে হয়, আহ্, এখন পাতলা কাথাঁখানা গায়ে দিয়ে শুলেই ঘুম এসে যাবে, তার আগে অবশ্য চাট্টিখানি খেতে হবে, ভরা পেটে ঘুমের আমেজই আলাদা। কিন্তু তপন? সে কি এখনো জেগে আছে, দাদা কখন তার তরোয়াল আনে এই আশায়?

ছ্যামড়ার বায়নার বহর দেখো, আলীবর্দী খাঁর মতন তরোয়াল চাই।

তা শালা নে তোর আলীবর্দী খাঁর তরোয়াল।

নাতির কথা ভেবে চলার গতি তার বাড়ে, কিন্তু বেশীদূর এগোতে হয় না তাকে। ফিস ফিস, কাঁপা কাঁপা স্বনিঃশ্বাস কথাবার্তা শুনে থমকে যায় গোপাল।

–না, না, কেউ দেখে ফ্যালাবি.....

–কেউ দেখবি না, উম্‌ম.....

চারপাশের ঘন গাছপালার মধ্যে সামনে খানিকটা ফাঁকা ঘেষো জমি, চাঁদের ম্লান আলোর সঙ্গে গাঢ় কুয়াশা–কেমন গোলাপী গোলাপী রং ধরেছে, মার মধ্যে ছবিরাণীকে শরীরের সঙ্গে পিষে ফেলে চুমু খাচ্ছে চেয়ারম্যানের ছোট ভাই।

গোপাল পিছু হটতে থাকে। ইস কি ঠাণ্ডা। পা থেকে মাথা পর্যন্ত সমস্ত শরীরটা একেবারে পাথরের মতো ভারী হয়ে উঠেছে। কার্তিক মাসেই এই অবস্থা। শীত বেশ কড়াই পড়বে এ বছর।

জমিরুদ্দিন ঠিকই বলেছে, এতো রাত করে ফেরা তার ঠিক হয়নি।

বয়েস বলে কথা আছে না। সব বয়েসে সব কি সয়? নাতির তরোয়াল বানাবার ঝোঁকে ছিলো, রাত বুঝতে পারেনি।

সুঁড়িপথ ছেড়ে বাঁ পাশে আগাছা আর দীর্ঘ গাছপালার দুর্গের মধ্যে গোপাল তলোয়ার হাতে প্রবেশ করে। ভারী পা, ভারী শরীর, কিন্তু গোপালের প্রতিটি পদক্ষেপ একেবারে মাপা। ঝরে পড়া একটি শুকনো পাতারও আওয়াজ হয় না।

ছোট বড় গাছ মিলিয়ে এমন ঘন, এমন নিবিড়–প্রায় কুঞ্জই বলা যায় এতোকাল ধরে যাওয়া আসা করছে গোপাল, খেয়ালই করেনি কোনোদিন।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
বদ্রিনাথ মিশ্র যেদিন প্রথম এ গ্রামে ঢুকেছিলো তার সঙ্গী নিয়ে, এমনি জঙ্গলের মধ্যেই কি তারা কাটিয়েছিলো সেদিন? হাতে তাদের তরোয়াল ছিলো, না খালি হাত?

জঙ্গল তখন আরো গভীর ছিলো; বাঘ চরে বেড়ানো সেই কোন্ আদিকালের জঙ্গলেরই তো ছানাপোনা এইসব গাছপালা। সেখানে দ্যাখো গোপাল একা একা দাঁড়িয়ে আছে। বদ্রিনাথ মিশ্রও হয়তো এই গ্রামেরই কোথাও এমনিভাবে দাঁড়িয়েছিলো। কোথাকার বদ্রিনাথ মিশ্র দ্যাখো ঠাঁই গেড়েছিলো কোথায় এসে। বদ্রিনাথ কোনো? গোপালদের কথাই ধরো না, কম তাজ্জবের।

গোপালের চেয়ে গোপালের বাপ ছিলো আরো লম্বা চওড়া। মাথায় ঘাটের সিঁড়ির মতো থাক্ থাক্ বাবরি চুল। মোটা গোঁফ। বড় বড় লালচে চোখ, গাঁজা টেনে সেই চোখ আরো লালচে করে রাখতো, তেমনি ছিলো গলার স্বর!

অচেনা লোক হলে একবার ছেড়ে বার বার ফিরে ফিরে দেখতো। গ্রামের কে যেনো একবার বেলেছিলো, এবার দুর্গা পূজোর সময় অসুর না গড়ে আমাদের পঞ্চুকেই কাঠামোর মইদ্যে বসিয়ে দাও।

তা মিছে বলেনি। বংশের ধারাটা তাদের অমন। ঠাকুরদাকে গোপাল দেখেনি, শুনেছে ঠাকুরদাও নাকি ছিলো অমনি জোয়ান। কালা জ্বর হয়ে জোয়ান বয়েসেই মরে গেছে।

গোপালের ছেলে দুটো সে ধারা পায়নি। সহদেব লম্বা হলেও গায়ে-গতরে তেমন নয়, আর নাক্টা না গায়ে-গতরে, না লম্বায়-কোনো দিকেই নয়। সাধ-আহ্লাদ বদলাচ্ছে, বদলাতেই থাকবে, তোদেরটা এখন তোরাই বোঝ।

ক র র র র র র-চন্দ্রবোড়া সাপ ডাকছে কোথাও। গোপাল অস্ফুটে বলে, আয়! শীতকালে গর্তে ঢুকে ঘুমোবার আগে এই সময়টা সাপেরা তাদের সব বিষ ঢেলে হালকা হয়ে নেয়।

গোপাল এদিক ওদিক তাকায়, গাছপালার ফাঁক-ফোকর দিয়ে আসা কুয়াশা-মাখা চাঁদের ডোরাকাটা ম্লান আলো আর ছায়ার কোথায় যে সে তার চক্রা বক্রা ঠাণ্ডা শরীর নিয়ে বসে ডাকছে কে জানে।

তুমি কেমন হে, কোন্ অন্ধকারে বসে কবর করর করো, এখানে এলেই তো পারো!

তোমার কি ঘুম পাতিছে? এতো আগেই? এহন তো মোটে কাত্তিক মাসের মাঝামাঝি, পুরো অঘ্রাণ মাস এখনো বসানো রইছে সামনে, তার পরে না শীতকাল! তুমি এহনই ঘুমাতে যাতি চাও? না হলি অমন করতিছ ক্যানো? থলি কি টন টন করতিছে? তা আইসে পড়, এই তো নিমগাছের আড়ালে চুপচাপ দাঁড়োয়ে রইছি। কিছু কবো না, তুমি টপ করে এসে কাজটুকু সেরে আবার চলে যাও!

ব্যথার বড় কষ্ট, থলির বিষঝেড়ে ফ্যালালেই আরাম, তারপর ঘুম!

আইসে পড় মনি, কতোক্ষণ খাড়োয়ে থাকপো, আয়.....

কিন্তু চন্দ্রবোড়া আসে না, নারুর গলা শোনা যায়: ঝুম ঝুমকে নাচো গাও, নাচো গাও.... বড় সুখের গান গাইতে গাইতে আসছে নারু।

গোপাল ভেবেছিলো, ভি, সি, আর দেখিয়ে চেয়ারম্যানের ভাই একাই সহদেবের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
বউকে আজ এগিয়ে দিতে এসেছে।
পিশাব কত্তি তোর এতো সুমায় লাগে? চেয়ারম্যানের ছোট ভাইয়ের গলায় কৌতুক।
গোপালের ঠোঁটের কোণ একটুখানি ব্যাঁকে, সেটা ঠিক হাসি কিনা বলা মুস্কিল।
গোপাল বিড়বিড় করে, আড়াল মানুষরি কতো ভাবেই না কত্তি হয়!
তিনজনেই তাহলে প্রাইমারী স্কুল ঘুরে, দত্ত পুকুরের পাড় দিয়ে এসেছে। কিন্তু গোপাল এখন কোনদিক দিয়ে বাড়িতে ঢুকবে?
সহদেবের বউ কল কল করে কথা বলছে, কি কথা ওদের এতো? চেয়ারম্যানের ভাই আর কতোক্ষণ থাকবে? নারু কি তাকে এখন বাড়িতে নিয়ে তুলবে?
না সরলে ওদের সামনে দিয়ে তরোয়াল হাতে গোপাল এখন যায় কেমন করে?

নচিকেতাগণ

সরু একটা বাথরুম, এর মধ্যে ১৬ জন মানুষ, শোয়া তো দূরের কথা ছড়িয়ে বসাও যায় না, পা গুটিয়ে দেওয়ালে হেলান দিয়ে দিনরাত বসে থাকতে থাকতে ঘাড়, পিঠ, কোমরে টনটনে ব্যথা। ক্লান্তিতে চোখ জড়িয়ে আসে, কিন্তু গোসলহীন অভুক্ত শরীর, অবিরাম টেনশন, অসাচ্ছন্দ্য থেকে থেকে জাগিয়ে দেয়। একটি মাত্র দরজা, সব সময় বন্ধ, জানলা নেই, দেওয়ালের একদিকের মাথায় শিলিং ছোঁয়া একটা ১০ ইঞ্চি বাই ৮ ইঞ্চি ফাঁকা ভেন্টিলেটার। এর মধ্যেই ১৬ জন মানুষের প্রস্রাব পায়খানা; দুর্গন্ধের চেয়ে অস্বস্তিটাই মারাত্মক।
গত বুধবার ভোর ছটার দিকে আমাকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়েএসেছিলো এখানে। জিপের পেছনের সীটে আমার দুপাশে দুজন রাইফেলধারী মিলিটারী, মুখোমুখি দুজন। সামনে, ড্রাইভিং সীটে একজন, তার পাশে আর একজন–বোধহয় অফিসার লেভেলের কেউ হবে। আমি তার মুখের এক পাশটা দেখতে পাচ্ছিলাম, মসৃণ গাল, জুলফির নিচে টকটকে ফর্শা–গালে নীলচে আভা। এতো সকালেই এমন শেভ–করা মুখ।
মুখোমুখি সৈনিক দু'জন আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে, অস্বস্তিতে আমি চোখ রাখলাম বাইরের দিকে।
রাস্তায় লোকজন খুব কম, ১টা বাস চলে গেলো, ২টো রিকশা, ১টা কুকুর, ২জন মানুষ। রাস্তা মোড় নিলো–বাঁ দিকে পার্ক ডান দিকে পানির ট্যাংক, ৩টি রিকশা, ১টা বেবী ট্যাকসী, ১ জন বৃদ্ধ ভিখারী, ডান দিকে কোর্ট বাঁদিকে চার্চ, ডান দিকে টেজারী বাঁ দিকে সিনেমা হল, জিপ এগিয়ে যাচ্ছে, এই পরিচিত রাস্তা, পরিচিত বাড়ীঘর, গাড়ি, মানুষজন– এক সীমাহীন অর্থহীনতার ভেতর দিয়ে আমি চলেছি।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
আমি আবার সৈনিক দুজনকে দেখলাম, তারা তেমনিভাবেই তাকিয়ে আছে আমার দিকে। একজনের মুখে খুব সূক্ষ্ম একটু হাসির আভাস, কিন্তু তার চোখ দুটি আগের মতোই ধারালো এবং স্থির।
নড়েচড়ে বসতে গিয়ে খেয়াল হলো আমি কাঁপছি, আমার হাঁটু দুটো, তার ওপর রাখা হাত দুটো ভীষণভাবে কাঁপছে।
আমার পাশের দুজনের মুখ দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু তারাও ব্যাপারটা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে আসছে এতোক্ষণ ধরে।
আমি মাথা নিচু করে চোয়ালের দাঁত দিয়ে দাঁত চেপে ধরলাম; কিন্তু আমার এতো যে পরিচিত শরীর, সমস্ত কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যে এখন আমার সবচেয়ে আপন, তাকে কোনভাবেই নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছি না। নিজের লেখার ব্যাপারে সবচেয়ে অসন্তুষ্ট আমি। লেখার চেয়ে লেখা নিয়ে ভাবনা-চিন্তায় সময় কেটে যায় আমার অনেক বেশি। ফলে লেখার সংখ্যা বাড়ে না। লেখালিখি নিয়ে এতো বছর কেটে গেলো; কিন্তু লিখতে বসলেই মনে হয় এই প্রথম কলম ধরছি, দারুণ চ্যালেঞ্জ বোধ করি-যেন রিংয়ের ভেতরে ক্রুদ্ধ ষাঁড়ের সামনে ম্যাটাডোর। যে কোন সময় ওই তীক্ষ্ম শিংয়ে আমাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।
নিজেকে এতো যে দুমড়ে মুচড়ে নিংড়ে শেষ করে লেখাটা লিখলাম সেই লেখাই যখন ছাপার হরফে দেখি তখন নিজের অক্ষমতার জন্যে নিজের ওপরেই রাগ ধরে। কোথায়? যেমন করে কথাগুলো বলতে চেয়েছিলাম তা বলা হলো কোথায়?
এই হলো আমার লেখালেখির অন্দর মহলের খবর। না, নিজের লেখা নিয়ে আমি স্থির নিশ্চিত হতে পারিনি এখনও। সারা জীবনেও কি পারবো?
তবে একটি ব্যাপারে আমি নিশ্চিত, যতোদিন বেঁচে থাকবো, লিখে যেতে হবে আমাকে। না লিখলে জীবনযাপনের এতো যে চাপ, প্রতি মুহূর্তের এতো লাঞ্ছনা, এতো অপমান, ক্রোধ, ঘৃণা, হতাশা ক্লান্তি, ভালোবাসা,, সাধ, স্বপ্ন, বিশ্বাস-এ সব ধারণ করবো কিভাবে? কাজেই লিখতেই হবে আমাকে। হাঁটুর ওপর রাখা হাত দুটো হাতের আঙুলের মধ্যে আবদ্ধ ছিলো, থেকে থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় ঘাম পড়ছে। অনুভব করলাম, এই সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি ঘামে সমস্ত শরীর আমার ভিজে গেছে।
কে যেন কেশে উঠলো। কেমন ঘড় ঘড় আওয়াজ। কে হতে পারে? আনিস? দুলাল? আজাদ? আতিক ?
কেউ কাউকে চিনতাম না, তবু সবাই সবার চেনা হয়ে গেছে।
সকাল হলে দরজা খোলার শব্দ হয়, সময়টার জন্যে আমরা উৎকর্ণ থাকি; প্রত্যেকেই ভাবি আজ আমাকে নেবে কিন্তু সবাইকে নেয় না, কোনদিন ৮জন, কোনদিন ১২ জন, আবার কোন দিন ৪জন ৫জনকেও নিয়ে যায়।
রাতের বেলা তারা ফেরে টলতে টলতে। আমরা যারা থেকে যাই, সারাদিন নানান কথার মধ্যেও ভাবি, যে ক'জন গেলো সবাই ফিরবে তো?
রাতের বেলা যখন ফেরে তখন মনে মনে গুণি। না, এ ক' দিনে একজনও মারা যায়নি, নতুন কাউকেও আনেনি ওখানে: আর আনবে কোথায়?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

প্রথম যেদিন আমায় আনলো ১০ জন ছিলো সেদিন। আমাকে ভেতরে আটকিয়ে দিয়েই সেন্ট্রি দরজা বন্ধ করে দিলো বাইরে থেকে।
এতোক্ষণ আমি যেন অন্য কারো শরীর কাঁধে করে বয়ে নিয়ে গেছি। দরজা বন্ধ হতেই সে শরীরের ভার আর বইতে পারলাম না, হোগলা বিছানো কোনো মেঝেতে অপরিচিত মানুষগুলোর মধ্যেই লুটিয়ে পড়লাম। ঘরের ভেতর চলে যেতে যেতে কারু কথা যেন শুনতে পেলাম: ভয় পেয়েছে। কিন্তু ভয়েরও রূপভেদ আছে। এমন হতো, আজকে এখন এই রাতে বলা হলো, কাল সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে তোমাকে বাইরে পাঁচিলের ধারে দাঁড় করিয়ে রেখে মারা হবে। তাহলে সেটা যতক্ষণ না শেষ হচ্ছে ততক্ষণে প্রতি মুহূর্তের যে ভীতি তার সঙ্গে এই যে, ততদিন সঙ্গীদের নিয়ে যাচ্ছে, টারগেট করছে, অত্যাচার করছে [এবং সবই নেপথ্যে) তারপর আবার সরিয়ে দিয়ে যাচ্ছে, সেন্ট্রি দরজা বন্ধ চলে গেলে আমরা সেইসব সঙ্গীদের সেবা করছি, এর মধ্যকার ভীতির যথেষ্ট পার্থক্য আছে। বলা যায়, ভয় করেও এই পরিচিত দৈনন্দিনতার মধ্যে ভয়ের বিরুদ্ধে ভেতরে ভেতরে এক ধরনের প্রতিরোধ গড়ে উঠছে, আমার প্রথম দিনের ভীতির সঙ্গে যার ফারাক অনেক। তার মানে কি ভয়ের একটা নির্দিষ্ট সীমা জেনে গেছি আমরা?
কিন্তু আমার নিজের ব্যাপারে স্থির-নিশ্চিত হতে পারছি না এখনও।
কেননা সেই যে এখানে নিয়ে এসেছে আমাকে, এর মধ্যে একদিনও কোন জিজ্ঞাসাবাদ নেই, কোন নির্যাতন নেই, শুধু বসে থাকা। আড়াই দিন পরপর রুটির ছেঁড়া ধারগুলো, আর পচা ডাল। এই একঘেঁয়েমি, টেনশন, ক্লান্তি, শরীর ব্যথা, ভার হয়ে থাকা মাথায় সর্বক্ষণের দপদপে যন্ত্রণা নিয়ে নিজের চুল নিজেই ছিঁড়তে ইচ্ছা করে, মনে হয় প্রচন্ড চিৎকারে এই চারপাশের দেওয়াল ধ্বসিয়ে দিই।
কি করতে চায় এরা আমাকে নিয়ে? আমার ছোট ভাই দীপু জুনের শেষ দিকে হঠাৎ বাড়ি থেকে উধাও হয়ে যায়। নিদারুণ উদ্বেগের মধ্যে ৭/৮ দিন পর একদিন সন্ধ্যাবেলা একটি ২০/২২ বছরের ছেলে এসে খবর দিয়ে যায় দীপু মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছে, মা তাকে বসিয়ে এটা ওটা জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলো, ছেলেটির বোধহয় সারাদিন খাওয়া হয়নি, মা ছেলেটির হাত ধরে খেয়ে যেতে বলেছিলো, ছেলেটি দাঁড়ায়নি, খবরটা দিয়েই চলে গিয়েছিলো।
ততোদিনে মুক্তিযোদ্ধা ছেলেরা ঢাকা শহরের এখানে ওখানে বোমা ফাটাতে শুরু করেছে। এক সময় আমাদের এমন হলো যেদিন বোমর আওয়াজ শুনতে না পাই সেদিন মনটা বিমর্ষ হয়ে থাকে। কিন্তু আমি তো সেই ছেলেটিকে ছাড়া কোন মুক্তিযোদ্ধাকে দেখিনি, পরিচয় তো দূরের কথা। আমরা প্রতিদিন প্রতীক্ষায় থাকলেও দীপু আজ পর্যন্ত পাঁচ মিনিটের জন্যেও বাড়িতে আসেনি কখনো। অন্তত: গত বুধবার সকাল ছটা পর্যন্ত; এর মধ্যে এসে গেছে কিনা জানি না। আচ্ছা এমন কি হতে পারে, বাড়িতে এসে দীপু আমার কথা জেনেছে, আমি দীপুকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, মা তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে, বেবী মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে, গাল বেয়ে পানি নামছে। দীপু দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরেছে, চোয়াল শক্ত হয়ে উঠছে। আব্বা চেয়ারে চুপ চাপ বসে থাকতে থাকতে ধীর শান্ত গলায় বললো, ওকে [illegible] দিও না

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দীপু কি করছে এখন? এমন কি হতে পারে, আমরা যে এখানে আছি এ খবর সে জেনেছে, সঙ্গীদের নিয়ে প্ল্যান করছে কিভাবে এই থানাটিকে হঠাৎ করে এ্যাটাক করা যায়; খুব কঠিন কাজ, কিন্তু আমি তো তাঁর ভাই।

দূর, এসবই ছেলেমানুষী চিন্তা। কিন্তু আমাকে এখানে কেন? যাদের ধরে নিয়ে এসেছে তাদের দু/তিনজন ছাড়া কারু বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ নেই। তবু আমি ছাড়া আর সবাইকে বাইরে নিয়ে যাচ্ছে, জেরা করছে, অত্যাচার করছে কম বেশী, কিন্তু আমার ব্যাপারেই নীরব। আজ পাঁচ পাঁচটা দিন–এ–ও কি এক ধরনের শাস্তি। অত্যাচারের রূপ দ্যাখো আর টেনশনে ভোগো।

শাহীন খুব জুলিয়াস ফুচিকের রেফারেন্স দেয় কথায় কথায়। সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে, চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় মনটা কল্পনায় ঠাসা। ওকে ধরেছে মালীবাগের কোন রেষ্টুরেন্ট থেকে।

জেরা, মারধোর ওর ওপর দিয়েও গেছে বার কয়েক, কিন্তু ওর কথা হলো, জুলিয়াস ফুচিক কতো অত্যাচার সহ্য করে মরেছে, সে তুলনায়.......

ওর বোধহয় ভেতরে ভেতরে একটা বিশ্বাস ছিলো যে, ও যখন মোর‍্যাল সাপোর্ট ছাড়া মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে কোনভাবেই যুক্ত নয়, তখন ওকে ছেড়ে দেবেই, দুদিন আগে আর পরে। তাই অমন জুলিয়াস ফুচিক আওড়ায়। বেচারা নব্য যুবক, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের পরেই এক লাফে বোধহয় "ফাঁসির মঞ্চ থেকে" পড়েছে। কিন্তু সে বিশ্বাস কি ওর এখনও অবশিষ্ট আছে? তাহলে ও মুখ দিয়ে অমন ঘড় ঘড় আওয়াজ করছে কেন, অমন কেঁপে উঠছে কেন থেকে থেকে?

গত রাতে আতিক ভাইকে যখন ফেরত দিয়ে গেলো তখনো আমরা কেউ বুঝতে পারিনি। এমনিতেই আতিক ভাইয়ের ওপর টর্চারটা বেশী হয়। নিজে একদিনও তাঁর ওপর অত্যাচারের কোন বর্ণনা করেননি, কিংবা সহজে দেখতেও দেন না।

তাঁর বাড়ির উঠোন খুঁড়িয়ে পাকিস্তানী মিলিটারীরা ট্রাংক–ভর্তি অস্ত্র পেয়েছিলো একটি ছেলের বিশ্বাসঘাতকতায়।

আতিক ভাই ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, জেল খেটেছেন, '৫২–এর পর এদেশের প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে কোন না কোনভাবে জড়িত ছিলেন তিনি। কিন্তু তবু ২৫শে মার্চের পরও দেশ ছেড়ে যাননি। দিন কয়েক স্তব্ধ হয়েছিলেন, তারপর এক সময় যোগাযোগ স্থাপিত হয়, ধীরে ধীরে তাঁর বাড়ি হয়ে ওঠে মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাঁটি, অপারেশন করে এসে ছেলেরা তাঁর বাড়িতে উঠতো, কিংবা এখান থেকে প্ল্যান হতো অপারশেনের, নতুন নতুন ছেলেদের রিক্রুট করে খেলাঘর ক্যাম্পে পাঠাবার ব্যবস্থা করতেন তিনি। বাড়ির লোকজন বহুবার তাকে বলেছে ওপারে চলে যেতে। তিনি যাচ্ছি যাবো করে করে থেকে গেছেন। ভেতরে ভেতরে বোধ হয় দেশত্যাগের পক্ষপাতি ছিলেন না, তাছাড়া এখানেও তো অনেক কাজ, কাউকে না কাউকে থাকতে তো হবেই! এসব কথা আজাদের কাছ থেকে শুনেছি, ফিজিক্স–এ এম, এস সি ফার্স্ট পার্টের ছাত্র, আতিক ভাইয়ের কাছাকাছি বাড়ি।

আমি বলেছিলাম, এসব কথা যে বলছেন এটা কি ঠিক হচ্ছে? টর্চারের মুখে কেউ যদি বলে ফেলি?

আজাদ বলেছিলেন, [illegible], এসব প্রশ্ন আপনাদের কাউকে জিজ্ঞেস করবে না,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
বিকজ ইউ আর নট রিলেটেড উইথ হিম ইন দিস কনসার্ণ। সেগুলি, যা জানার ওরা সবই জেনেছে, এখন এসব কথা বললে নিজের তো কোন লাভই হবে না, বরং নিজেকে অহেতুক জড়ানো হবে। আমরা কে বাঁচি কে মরি জানি না, বিষয়টা জানা দরকার, সকলে হয়তো না-ও মরতে পারি, কারো না কারো স্মৃতিতে ব্যাপারটা থেকে যাবে, কেননা ইট ইজ সিওর, আতিক ভাইকে ওরা স্পেয়ার করবে না, হি উইল বি কীলড, কিন্তু সেটা খুব যন্ত্রণাদায়ক, তাঁর জন্যে এবং আমাদের জন্যেও-এ তো বুঝতেই পারছেন।
কাল রাতে যখন তাঁকে রেখে গেল আমরা ব্যস্ত হয়ে উঠলে তিনি শুধু বললেন, থাক, ঠিক আছে। তারপর দেওয়ালে হেলান দিয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকলেন। আমরা আর কোন কথা বলিনি। খুব যন্ত্রণা হচ্ছিলো বোধহয়, থাকতে না পেরে এক সময় আমাকে বললেন, একটু শুই।
আমি তাঁর মাথাটি আমার কোলের ওপর রাখতেই দেখতে পেলাম আতিক ভাইয়ের একটি চোখ উপড়ে নিয়েছে, দুহাতের প্রত্যেকটি আঙ্গুলের মাঝখান থেকে কেটে ফেলে দিয়েছে।
আমার ভেতর কি হলো বুঝে ওঠাব আগেই হঠাৎ চিৎকার করে উঠলাম, লুক শাহীন। শাহীন ও অন্যান্য সকলে আমার দিকে চমকে তাকালো, আমি আতিক ভাইয়ের চোখ এবং হাতের দিকে আঙ্গুল নেড়ে শাহীনের উদ্দেশে তেমনি গলায় বললাম, হিয়ার ইজ ইওর জুলিয়াস ফুচিক।
হতভম্ব বিস্ফারিত চোখে সকলে তাকিয়ে আছে আতিক ভাইয়ের দিকে। শাহীনের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে ঝুলে পড়েছে, ওর অজান্তেই খাবি-খাওয়া মাছের মতো ঠোঁট দুটো নড়ছে অবিরত।
রাত শেষ হয়ে আসছে, একটু পরেই ভোরের আলো এসে পড়বে ভেন্টিলেটরের ফাঁকে, সেই আলোর সঙ্গে আসবে চড়ুইটা, কদিন থেকেই লক্ষ্য করছি আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে ছোট পাখিটা এসে ডাকাডাকি করে ভেন্টিলেটরে বসে; দেখে অপরিসর এই বাথরুমটায় তালগোল পাকিয়ে কজন মানুষ পড়ে আছে। কি বোঝে কে জানে খানিকক্ষণ লাফালাফি ডাকাডাকি করে আবার উড়ে যায় বাইরে। আমি তার অবাধ উড়ে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকি, ভেন্টিলেটরের ওপারের ফাঁকা আলোকিত শূন্যতা বিশাল পৃথিবীটার আভাস দেয়।
আতিক ভাই নিথর হয়ে পড়ে আছে, কী অবলীলায় ওই বীভৎসতার দিকে তাকাতে পারছি। সমস্ত রুমটা জুড়ে এই যে সব পড়ে আছে, যেন অবহেলায় পড়ে থাকা লাশের স্তূপ।
শাহীন চোখ মেললো। চল্লিশ পাওয়ার বাল্বের আলোয় ওর ফ্যাকাশে মুখ আরো ফ্যাকাশে লাগছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে নিজের চোখে হাত দিয়ে দেখে, হাত দুটো চোখের সামনে মেলে ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আঙ্গুলগুলো দেখে নিয়ে আবার কাত হলো। মুখে গোঙ্গানীর শব্দ শরীরটা মৃদু মৃদু কাঁপছে।
বাল্ব নিভে গেলো। বাইরে ফর্সা হয়ে এসেছে। ভেন্টিলেটরে আলোর রেখা এসে পড়ছে।
কেন যেন বারবার মনে হচ্ছে আজ আমাকে নিয়ে যাবেই?
কী করবে? পা ওপর দিকে বেঁধে মাথা নিচের দিকে ঝুলিয়ে চাবকাবে? শরীরে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
সিগারেটের ছ্যাঁকায় ছ্যাঁকায় দগ্ধ করবে? আজাদের মতো আমারও আঙ্গুলের নোখ উপড়ে নেবে? নাকি আঙ্গুল কেটে ফেলে দেবে আতিক ভাইয়ের মতো? অথবা এই আমার চোখ, যে চোখ দিয়ে এখন সঙ্গীদের দেখছি, ভেন্টিলেটর দিয়ে আসা আলো দেখছি, এই চোখ আমার থাকবে না? কিংবা.....

চড়ুইটা এসেছে।

কি দেখছো তুমি পাখি? দেখছো কতগুলো বন্দী মানুষ মৃত্যুর প্রতীক্ষায় পড়ে আছে।

কিন্তু তুমি কি জানো, এরা তোমার চেয়ে স্বাধীন? ওই দেখো, আতিক ভাই, চোখ উপড়ে নিয়েছে, দুহাতের সবগুলো আঙ্গুল কেটে ফেলে দিয়েছে: তার প্রতি মুহূর্তের আর্তনাদের মধ্যে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। ওই যে শাহীন ভয়ে গোঙ্গাচ্ছে, কেঁপে কেঁপে উঠছে থেকে থেকে, ওর প্রতিটি গোঙ্গানী, শরীরের প্রতিটি কম্পনের মধ্যে আছে স্বাধীনতার আকাংক্ষা। যারা এখন ঘুমিয়ে আছে, তারা কেউ-ই পরাধীন নয়।

এই যে আমি, আমার বুকের ভেতর আতংক গুরুগুরু করে উঠছে। আমি দেখতে পাচ্ছি আমাকে একটি দেওয়ালের ধারে দাঁড় করিয়েছে, আমার সামনে একটি উদ্যত রাইফেল। আমি সেই রাইফেলের নলের দিকে তাকিয়ে ভয়ে কুঁ'কড়ে যেতে যেতে দেওয়ালের সঙ্গে মিশে যেতে চাইছি, আর আমার মুখ দিয়ে জন্তুর মতো আওয়াজ বেরুচ্ছে, সেই ভীতির মধ্যে স্বাধীনতার যে আকাংক্ষা তেমন করে স্বাধীনতাকে তুমি কখনো অনুভব করবে না।

বাইরে ভারী বুটের শব্দ দরজার দিকে এগিয়ে আসছে। চড়ুইটা উড়ে গেলো, আমি শূন্য-দৃষ্টি মেলে তার সেই অবাধ উড়ালের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দরজা খোলার শব্দ পেলাম।

প্রতারক জোস্না

প্রথম প্রথম খারাপ লাগতো। বিরক্তিকর ঝাঁকুনিতে তেল মবিলের গন্ধে শরীরময় একটা বিচ্ছিন্ন অনুভূতি। এখন গা সওয়া হয়ে গেছে। পথটার সঙ্গে আজ তিন বছরের অন্তরঙ্গ পরিচয়।

বাসটা পোলের গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। স্টার্ট নিচ্ছে না। ছোকরা এ্যাসিস্টেন্টটা বনেট তুলে পানি ভর্তি বালতি রেডিয়েটরের মুখে উপুড় করে দিলো, স্টার্টারটা বার কয়েক ঘোরালো, কয়েকটা ধাতব শব্দ হলো মাত্র, গাড়ি স্টার্ট নিলো না। বিড়বিড় করে গালাগালি করতে করতে রেঞ্চ হাতে ড্রাইভার নেবে গেলো। যাত্রীদের ভেতরও নেবে পড়েছে কেউ কেউ। ধারে কাছে কোন লোক বসতি নেই। দু'পাশে বিস্তৃত মাঠ। জানলার ধারে অঞ্জলি চেয়ে রইলো। আকাশে শাদা মেঘের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
আনাগোনা, মাঠের মাঝখানে দীর্ঘদেহী নিঃসঙ্গ তালগাছ। দূরে, আরো দূরে মাঠের শেষে নীলচে ধূসর অরণ্য নিঃশব্দ। একটা উদাস আর সুদূর প্রসারী অনুভূতি তার চেতনায় সঞ্চারিত হচ্ছিলো। যাত্রীদের টুক্‌রো টুক্‌রো কলরব, রেঞ্চের ঠুক্‌ঠাক্ আওয়াজ তাকে ব্যাঘাত করলো না, বরং দূর থেকে ভেসে আসা অস্পষ্ট শব্দের মতো তা আরো মাধুর্য ও কারুণ্যে ভরে দিলো।

এমন পরিবেশে ভেবে যেতে ভালো লাগে। যা হোক একটা কিছু নিয়ে শুধু ভবে যাওয়া। কিন্তু অঞ্জলি এই মুহূর্তে সবকিছু ভুলতে চাইলো। যে জ্বালা, যে নিঃসঙ্গ শূন্যতাবোধ, যে কান্নাটা তাকে নিরন্তর রক্তাক্ত করে তাকে ভুলে এই অখণ্ড নির্জনতায় ধীরে ধীরে একাকার হয়ে নিমজ্জিত হ'তে চাইলো সে।

বাসের ভেতর বসে থাকা লোকগুলোর, চোখে মুখে একটা চাপা বিরক্তি আর উৎকণ্ঠা ছায়া ফেলেছে। যারা নিচে নেমেছে তাদের ভেতর কেউ কেউ খোলা বনেটের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। পোলের রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা অঞ্জলির তন্ময় মুখের দিকে বারবার তাকাচ্ছে, দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টাও করলো, তারপর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সঙ্গীকে কি যেন বলে হাসলো। সঙ্গীও হাসলো। অঞ্জলি সে সব লক্ষ্য করলো না। কেউ কোথাও নেই, এই থমকে যাওয়া দশটা ছুঁই ছুঁই বেলা আর নির্জন প্রকৃতির মাঝখানে শুধু সে জন্ম জন্ম ধরে বসে আছে জীবনের সমস্ত দায়ভাগ থেকে মুক্ত হয়ে,এমনি একটা একান্ত ইচ্ছা সে প্রার্থনার মতো বিড় বিড় করে আবৃত্তি করলো মনে মনে।

.....অঞ্জু তুমি এতো অবুঝ হ'চ্ছো কেনো? আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পারছো না? ..... না, এরপর আর কোন মেয়ের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন। ..... কিন্তু আমি কি করতে পারি বলো? বিমানের কণ্ঠে বিপর্যস্ত নাবিকের হতাশা।। ..... এ কথা বলতে তোমার লজ্জা করলো না? অঞ্জু!.....

উঃ, অসহ্য। কী ভীষণ গরম। অঞ্জলির হাতে ধরে থাকা খাতাগুলো শূন্যে দুল্‌লো। যেন ছোঁ মারতে আসা এক ঝাঁক চিলকে তাড়াতে চেষ্টা করলো।

বাসের ভেতর সবাই উঠে এসেছে। কণ্ডাকটর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। এ্যাসিস্টেন্ট স্টার্ট দিচ্ছে। একটা আওয়াজ ভেসে আসছে পেছন থেকে।

অঞ্জলি দেখলো মাতালের মতো টলতে টলতে একটা বাস আসছে ধুলো উড়িয়ে। এ্যাসিস্টেন্ট বাসের গায়ে থাপ্‌পড় দিয়ে জানিয়ে দিলো খবরটা। কপালে কটা ভাঁজ পড়লো ড্রাইভারের, চোখ দুটো আরো একটু তীক্ষ্ণ হলো, নিচের ঠোঁটের ওপর সামনের দাঁতগুলোর চাপ পড়লো। ষ্টিয়ারিং কাঁপছে।

বিড়বিড় করে গালাগালি করতে করতে কণ্ডাকটর একবার নিচু হয়ে জানলা দিয়ে লক্ষ্য করলো পেছনের গাড়ীটাকে। যাত্রীদের টিকেট কাটার জন্যে তাগাদা দিলো তারপর। নোতুন যাত্রীদের কেউ কেউ টিকিট কাটলো। কণ্ডাকটর পয়সা গুনে ব্যাগে পুরলো।

লোকগুলোর ভেতর এখন কেমন একটা ঝিমধরা অবশেষময়তা। সামনে বসে থাকা বুড়োটা ঘুমুচ্ছে পেছন দিকে হেলান দিয়ে। মাথাটা বিশ্রিভাবে দুলছে। ভাঙাচোরা মুখটাতে খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ কেমন করুণ, অসহায়।

পোলের রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লোক দুটো এখন অঞ্জলির মুখোমুখি। চেয়ে রয়েছে। কী বিশ্রি।। একেবারে অভদ্রের একশেষ। মেয়ে মানুষ দেখলেই যেন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
গিলতে চায়। রাগ ধরলো, হাসিও পেলো। কাঙাল, লোভী কুত্তা। মনে মনে গালটা এসে গেলো। শান্তিদি বলতো: মেয়েমানুষ দেখলেই পুরুষগুলো মনে করে: আহা একে নিয়ে যদি বিছানায় শোয়া যেতো।.....
শান্তিদির মুখে কিছু আটকায় না। ভীষণ ঠোঁট কাটা মেয়ে। কলেজ জীবনে কোন ছেলে নাকি কালনাগিনী বলেছিলো। শান্তিদি, তুমি সুখী হও। জীবনে তুমি অনেক দুঃখ পেয়েছো। কেউ তোমাকে বোঝেনি, জানেনি, চেনেনি। নিজেকে তুমি আড়াল করে রাখতে। কিন্তু আমি জানতাম প্রতি মুহূর্তে তুমি কী যন্ত্রণায় পুড়তে। শান্তিদি, তুমি সুখী হও। শান্তিতে থাকো। ... .
অঞ্জলি বাইরে চোখ রাখলো। দ্রুত অপসৃয়মান পৃথিবী দেখতে লাগলো। কেমন যেন নেশা ধরে। নিজেকে নেশার ভেতর সঁপে দিতে চাইলো। অতীতের মায়াবী হাতছানি থেকে মুক্তি পেতে চায় সে।
দিনটা খুব ঝকঝকে। পরিষ্কার। অঞ্জলি ভাবলো: বাসটা আবার খারাপ হয়ে যাক। থেমে পড়ুক। সব যাত্রী ফিরে যাক। সে, এখানে, এই সময়টার কোলে বসে থাকবে। আহা মুহূর্তটাকে যদি ধরে রাখা যেতো! সময় বড়ো নিষ্ঠুর গো! ছোটবেলায় পড়া কবিতার লাইন মনে পড়লো: Time and tide wait for none ... কেমন একটা অসহায়তার অস্বস্তি ওকে অস্থির করে তুললো।
... বিমানের চোখের মনি জ্বলছে, ... গলার স্বর কাঁপছে
অঞ্জু, লক্ষীটি আজ আর আমাকে না, না, বিমানদা, তা হয় না...
অঞ্জু প্লিজ... ...
সেদিনও এমনি ঝকঝকে দিন ছিলো। বাড়ীর সামনের কৃষ্ণচূড়া গাছটার মাথা দপদপ করে জ্বলছিল। সমস্ত বাড়িটা কী নিঝ্‌ঝুম! ঠাণ্ডা! বিমানের চোখ জ্বলছিলো। স্বর কাঁপছিলো। অঞ্জলির কণ্ঠে মিনতি। বিমান তখন বধির, বর্বর, আদিম।
হু হু কান্নায় ভেসে যেতে চাইলো অঞ্জলি। কিন্তু বুকের ভেতর কাল নাগিনীটা ফুঁসছে। কান্নার বদলে এখন চোখের ভেতর একটা ঠাণ্ডা, মিহি, ধিকিধিকি আগুনের শিখা।

হাসিনার গলা শোনা যাচ্ছে। কাকে যেন ধমকাচ্ছে।
খুব সুন্দর একটা প্ল্যান করে ঢাকার বনানীতে বাড়ী করবো, তুমি দেখো। আর তো মোটে এক বছর। তারপরই...
পড়ন্ত বিকেলের ম্লান আলো মূর্ছিত হ'য়ে ঢলে পড়েছে মেঝের ওপর। জানালার পাশে কলা পাতার দুলুনি। ঘুনধরা আলমারিতে সাজানো বই। আকাশ কেমন মেঘ মেঘ করেছে। হাওয়া পড়ে গেছে। গুমোট। ব্লাউজের নিচে ব্রেসিয়ারের ফিতেটা আলগা করে দিলো। একটু জল খেতে পারলে হ'তো। নাহ্ থাক, উঠতে ভাল্লাগছে না। হেনা অমিতারা এতোক্ষণে নিশ্চয়ই সিনেমা হলে। অঞ্জলিকে বলেছিল, মাথা ধরার অজুহাতে এড়িয়ে গেছে। আসলে সকালবেলার সেই অস্থির জ্বালাটা, বুকের

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ভেতরের সেই দিশেহারা হাহাকারটা তখনো তাকে ক্ষ্যাপা ঘোড়ার মতো তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিলো।

হেনা বেশ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে আজকাল–অঞ্জলি ভাবলো: চোখে মুখে কেমন একটা আনমনা ভাব, একটা উদাস খুশির গুঞ্জন ওকে আলোড়িত করে। তার ছায়া নকসা কাটে মুখে। মুগ্ধ হ'তে গিয়েও একটা যন্ত্রণা অঞ্জলির বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে একটা কথা জিগেস করতে ইচ্ছে হয়। পারে না। সহকর্মিনী বন্ধু হ'লেও জিগেস করতে সঙ্কোচ হয়। কেমন বাধো বাধো ঠেকে। কথাটা ভাবতে গেলেই একজোড়া জ্বলজ্বলে ঘোর লাগা চোখ মনে পড়ে, কাঁপা কাঁপা কণ্ঠস্বর কানে বাজে। একটা দস্যু দুপুর স্মৃতির রোদে ঝলমল করে ওঠে। কখনো কখনো মনে হয়: আহা বেচারী ছেলেমানুষ, একটু সাবধান করে দিই। সচেতন হবার জন্যে উপেদেশ দিই। তারপরই কি ভেবে পিছিয়ে গেছে মনে মনে; কিন্তু একটা মেয়েলি কৌতূহল বারবার খুঁচিয়েছে তাকে।

ইস্কুল থেকে যখন ফিরলো বেলা তখন যাই যাই করছে। প্রবীর বসে বসে মার সাথে গল্প করছিলো। মিনতি ঘুর ঘুর করছিলো। প্রবীর এলেই করে। জিয়োমেট্রি বোঝার জন্যে বায়না ধরে। মাকে তখন উঠতে হয়। কিছুদিন ধরে দেখছে অঞ্জলি। হেনার কথা মনে পড়লো। খুব শিগগিরি নাকি ওরা বিয়ে করবে। ছেলেটাকে অঞ্জলি দেখেছে কয়েকবার। শ্যামলা। একহারা ছিপছিপে। ভাঙাভাঙা গলার আওয়াজ। চোখের দৃষ্টি নম্র। মুখে কেমন একটা কিশোর সুলভ কমনীয়তা। তবু সেই সন্দেহের সাপটা বিশ্বাসের ঝাঁপি থেকে মুখ বার করে।

মিনতি, তার ছোট বোন, সে ফ্রক ছেড়ে সবে মাত্র শাড়ি ধরেছে। গতবার ম্যাট্রিক ফেল করেছে, এবার আবার দেবে, তাকে এখন প্রবীর জিয়োমেট্রির বিয়োরাম বোঝাছে। মা বলছিল: ছেলেটা খুব ভালো, বড়ো ভদ্র, বড়ো অমায়িক। অঞ্জলি শুনেছে, কিছু বলেনি। সাপটাকে মাথা চেপে ঝাঁপিতে আবার ঘুম পাড়িয়েছে।

'ভালো, ভদ্র, অমায়িক' কথাগুলো অস্ফুট উচ্চারণ করলো। দুর্গাপুর ষ্টিল ফ্যাক্টরির বিমান ভট্টাচার্যও 'ভালো, ভদ্র, অমায়িক'

.... বিমান তুমি অমার্জিত লম্পটের মতো এলে না কেন? মুখোশ কেন পরেছিলে, আমাকে এতো স্বপ্ন দেখা শেখালে কেনো? তোমার কতো সাহস সেদিন আমি দেখেছিলাম। ডাক্তার চৌধুরীর ক্লিনিকের সেই দুঃস্বপ্নে ভরা মুহূর্তগুলো পায় পায় টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালো ..... তোমার উপায়হীন অসহায় মুখ দেখে আমার কান্না এসেছিল। বিমান তুমি ঝড়ের মতো প্রমত্ত হলে না কেন? বিমান, উহ্ বিমান.....

... দূর, তুমি যেন কি... দিদি ও ঘরে.... না না প্লিজ, আমার ভয় লাগে....

মিনতি, প্রবীরকে এই দুধটুকু দে তো।

অসুস্থ বাবার বরাদ্দ দুধ থেকে মা প্রবীরকে খেতে দিচ্ছে। অঞ্জলি শুনলো সব। মিনতির ভয় লাগে। কিসের ভয়। ছেলেমানুষ হলেও বোকা নয়, সহজে ধরা দেবে না। কিন্তু কতোদিন? যে লোভের আগুন ওকে ঘিরে জ্বলছে তার আঁচ থেকে ও কতোদিন বাঁচিয়ে রাখবে নিজেকে? তবু মিনতির কাছে সে যেন হেরে গেছে কোথাও–অঞ্জলি ভাবলো।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
আগামী কাল এসো কিন্তু প্রবীরদা, এগারোর থিয়োর‍্যামটা সম্পূর্ণ হ'লো না... যাও দুষ্টু...
প্রবীর চলে গেলো। মিনতিকে ডাকবো। .... না:, থাক। মা এখন বাবার ঘরে, তেল মালিশ করছে হয়তো, হাঁপানি ক'দিন থেকে বেড়েছে, সেই সঙ্গে ব্লাড প্রেসারটাও। বিধু এখনো আড্ডা দিয়ে ফেরেনি। কখন ফেরে কে জানে। মিনতি এতোক্ষণে শুলো। দরোজা বন্ধ করার আওয়াজ এলো। ওর কি আজ ঘুম হবে। ক'দিন থেকে এমন চলছে? আর প্রশয় দেওয়া যায় না। কোনদিন কি একটা অঘটন করে বসবে।

জানলার বাইরে ক্লান্ত জোস্না। "আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে"
উ:, ভগোবান, স্মৃতি এতো মুধর হয় কেন?
বাড়ীটা এখন নিঝঝুম। বিধু খেয়ে দেয়ে শুয়েছে। মিনতি কি ঘুমুচ্ছে? ওর ভয় লাগে। হেনা, হেনারও কি ভয় লাগে? শান্তিদি তুমি এখন কি করছো? ..... তোমার অনেক দুঃখ,.... মদখোর দাদা.... লম্পট, ফেরার স্বামী... অসহায় বৌদি, তার অবোধ ছেলেমেয়ে... শান্তিদি, তোমার অনেক জ্বালা।
অঞ্জলি দেখলো কুয়োতলায় ম্লান জোস্নায় ডালিম গাছটা দাঁড়িয়ে আছে একা। একা আর অসহায়। সে দিকে চেয়ে চেয়ে অঞ্জলির মনে হ'লো সেও ডালিম গাছটার মতো অসহায়। নিঃসঙ্গ। শান্তিদি সুখে দুঃখে তার সংসার নিয়ে আছে। ....অমিতা কোলকাতায় যাবে। .... হেনার হয়তো বিয়ে হবে শিগগিরি
মা বাবা, সংসারের পোড় খাওয়া দু'টি মানুষ অনেক জ্বালা, অনেক যন্ত্রণার ছাপ চোখে মুখে, তবু ওরা কাছাকাছি। বিধু নিজের গন্ধে নিজেই বিভোর। ..... মিনতি প্রবীরকে নিয়ে মেতেছে। কিন্তু তোমার কি রইলো?
তুমি কি নিয়ে বাঁচবে? .... তোমার দুঃখের কাছাকাছি তো কেউ নেই। ..... মা-বাবা-ভাই-বোন, পরিচিত বন্ধুবান্ধব সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে তুমি একা, নিঃসঙ্গ, বানচাল জাহাজের দিশাহীন নাবিক, তুমি কি পেলে? ...
..... খুব সুন্দর একটা প্ল্যান করে ঢাকার বনানীতে বাড়ী করবো, তুমি দেখো। ..... আর তো মোটে একবছর। তারপরই .....
বিমান, উহ বিমান। তুমি আমায় এতো স্বপ্ন দেখা শেখালে কেনো?
বিলীয়মান রাতের ক্লান্ত জোস্না বড়ো বিষন্ন। নীলাভ ম্লানতায় মোড়া বিধুর প্রকৃতি কি কথা বলে? শিশিরের শব্দ কি গাছের পাতায়, ঘাসের ডগায় রূপকথা শোনায়? রূপকথা... রূপকথা...রূপকথা?
ডালিম গাছটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় অঞ্জলির মনে হলো: পাতার ফাঁক দিয়ে একটা ছোট্ট, কচি, নীলচে আভার শাদা হাত তাকে ডাকছে। বাতাসে জোস্না দোল খায়। অঞ্জলি দেখলো হাত দু'টো ক্রমাগত তাকে ডাকছে। একটা নরোম, তুলতুলে, অবোধ, অসহায় হাত। অঞ্জলি তার নাড়ির কোথায় যেন একটা চিনচিনে ব্যাথা অনুভব করলো।

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
সেই নীলচে আভার শাদা হাত দু'টোর আকর্ষণে ক্রমশ আত্মহারা অঞ্জলি, টলতে টলতে দোর খুলে বেরিয়ে এলো। পাতার ফাঁক দিয়ে তখন দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছে কোলে আসার ভঙ্গিতে। নরোম তুলতুলে, নোনতা নোনতা গন্ধ, অবোধ অসহায় দু'টি হাত। ডালিম গাছটা কি রুদ্ধশ্বাস? দোল খাওয়া জোস্না খিল খিল হাসে। উদ্বেলিত দুটি হাত জোস্নায় কাঁপে।

–কি হলো রে বিধু? কুয়োতলায় কি যেন পড়ার আওয়াজ হ'লো দেখতো।

অঞ্জলির দু'চোখ বেয়ে তখন স্মৃতি–বিস্মৃতি–আশা–ভালোবাসা–সুখ–দুঃখ ঝরে ঝরে পড়ছিল।

বাতাসে জোস্না দোল খায়। শিশিরের শব্দ কি রূপকথা শোনায়?

ফজর আলীর গল্প

নিদারুণ খরা গেলো বছরটার।

দুপুরে সূর্য মাটি ফাটালো। ধানের চারা জ্বলে গেলো বীজতলাতেই। রাতের বেলা চাঁদটা উঠতে থাকলো রোজ। ডালডার টিনের কাটা ঢাকনির মতো ধারালো চাঁদের গা থেকে ঠিক্‌রে পড়া জ্যোৎস্না বিশাল শূন্য মাঠ জুড়ে কোমরে দু'হাত রেখে বুক চিতিয়ে ভারী অহঙ্কারী হাসি হাসতে থাকে, তার ভেতর মেঠো ইঁদুর ক্ষিদের জ্বালায় কি করবে ভেবে না পেয়ে ছুটে বেড়াতে লাগলো পাগলের মতো। মানুষগুলো মানুষ বলে তাদের দায়ও মানুষের মতো।

ফজর আলী গরীবের গরীব, ছোটলোকের ছোটলোক–গ্রাম পঞ্চায়েত–এর বিচারে সে সকলের পেছনে বসে, উঁচু হয়ে হাঁটুর ওপর কনুইয়ের ভর দিয়ে হাতের তালুতে থুতনি রেখে হাঁ হয়ে মানুষের দিকে চেয়ে কথা শোনে। কোন সিদ্ধান্তের কথা এলে গাঁয়ের রেইস মোড়লবা যখন জিজ্ঞেস করে, 'তোমরা কি বল গো?'–সে তেমনি বসে থাকে, কেউ যদি চাপা হাসি নিয়ে বলে, 'ফজরালি কি বলো?' –সে ভারী অপ্রতিভ হয়ে পড়ে, গলা তার শুকিয়ে আসে– যেনো ভারী লজ্জার কথা।

সেই ফজর আলী এখন গোরস্থানের ধারে দাঁড়িয়ে মাঠের দিকে চেয়ে আছে। দেখবার মতো এমন কোন শোভা নেই, ফুটিফাটা কর্কশ শূন্য মাঠ, তার ওপর দুপুর রোদের কাঁপন, তার ওপারে রেল লাইন, রেল লাইনের পেছনে ধূসর গাছপালার ভঙ্গিল আবেষ্টনী– দেখতে দেখতে মনে হয় চোখের ওপরই হয়তো ছানি পড়েছে। গোরস্থানের ধারে বাবলা আর আম গাছের ছায়ার নীচে দাঁড়িয়েও রোদের তাপ আগুনের আঁচের মতো বাতাসের সঙ্গে এসে গায়ে লাগে। তবু ফজর আলী দাঁড়িয়েছিলো।

অনেক খাপছাড়া ব্যাপারের মধ্যে ফজর আলীর এটাও একটা অভ্যাস, কোন

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
সমস্যায় পড়লে চলতে চলতে সে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে ভারী ফাঁকা দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে একদিকে। তখন তার ভাঙাচোরা চৌকো মুখ, খরায় পোড়া মাঠে নিতান্ত ভাগ্য-জোরে টিকে যাওয়া এক আধটা আগাছার মতো গরীব দাড়ি, মোটাসোটা আঙুল নিয়ে ধ্যাবড়া পায়ের পাতার ওপর কালো একজোড়া যেনো-তেনো প্রকারের পা, তার ওপর কালো টিনের তোরঙের মতো কাঠামোটা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ফজর আলীকে কী রকম যে দেখায় বলা মুস্কিল, সে এমন কোন সৌম্যদর্শন নয় যে তাকে দেখে মানুষের দুঃখে কাতর কোন মহাপুরুষের মতো মনে হবে, তবু তার ভঙ্গি-র ভেতর হয়তো বা তেমন একটা ভাব ফুটে ওঠে।
নিজের দুঃখ কষ্টের কথা কাউকে কখনো বলে না ফজর আলী। তার মানে এই নয় যে, সে খুব আত্মমর্যাদাবান,-নিজের কষ্টকে অনুভব করবার জন্যে মনের যে সৌখিনতা থাকবার দরকার তা তার নেই। তার কাছে যে কোন আঘাত বেদনার নয় সমস্যার।
দেবেন নাপিত। ছোট্ট একটা হাত বাক্স, সারিবাদি সালসার একটা বোতলে পানি নিয়ে গ্রামে আসে মাঝে মাঝে। পাড়ার জামরুল তলায় বসে গল্প করতে করতে চুল কাটে মানুষের। ফজর আলী দশইঞ্চি খান ইঁটটার ওপর বসে আমুণ্ডু গলা বাড়িয়ে দিলে মুখে ফ্যানা লাগানো ব্রাশ ঘষতে ঘষতে দেবেন হয়তো বলে বসে, 'তোর মুখের দিকে চাইলে মন বলে না যে দাড়ি কামাই।'
সবাই সুন্দর হয় না। দেবেনও বেছে বেছে সুন্দর মুখেরই দাড়ি কামায় এমনও নয়। অন্য যে কোন লোককে যে কথা বললে হাতাহাতি হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়, তেমন কথা দেবেন অবলীলায় ফজর আলীকে বলে। আর ফজর আলীও তখন গরুর গলায় হাত বুলিয়ে দিলে সে যেমন ভঙ্গিতে গলা বাড়িয়ে মাথা উঁচু করে আদর নেয়, তেমনি ভঙ্গিতে দেবেনের দিকে গলা বাড়িয়ে ব্রাশ আর সাবানের ভিজে কোমল স্পর্শ নিতে নিতে তার মাথা ডিঙিয়ে মুখ উঁচু করে অদূরের বাজ পড়া বাঁকা নারকেল গাছটার দিকে তাকিয়ে ভাবতে বসে, তাই তো.....
হয়তো এইসব কারণেই কখনো কখনো তার ভঙ্গিতে মহাপুরুষের ছায়া পড়ে। কিন্তু যেহেতু সে শুধু মাত্রই ফজর আলী এবং ফজর বউয়ের বাবা তার মেয়েকে ১০০১ টাকা দেনমোহরে তার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে এবং যেহেতু ফজর আলীর বউ মহাপুরুষ নয়, পুরুষ মানুষ চায়, অতএব ১০০১ টাকার বন্ধনের জোরে জমিরন বাঁশ ফাঁড়ার মতো গলায় বলেছে, 'নিজের মাগছেলেকে দু'বেলা দু'মুটো খেতে দেবার মুরোদ নেই যে মানুষের তার আবার সংসার করার সখ কেন?'
এ কথা অবশ্য বাড়াবাড়ি। আজ দশ বছর বিয়ে হয়েছে ফজর আলীর-তিন মেয়ে এক ছেলে স্ত্রী নিয়ে তার সংসার, দু'বছর আগের কথা ধরলে তার মা'কেও ধরতে হয়, এই দশ বছরে তার সংসার থেকে, চার চারটে ছেলেমেয়ে বিইয়ে, সব ক'টিকে নিয়ে জমিরন বেঁচে আছে, অতএব দু'বেলা দু'মুঠো খেতে দিতে পারেনি সে, এ কথাটা মানা যায় না। কষ্ট করে হোক, আধপেটা খেয়ে হোক-এই দশ বছর জমিরনকে, তার ছেলেমেয়েকে ফজর আলীই বাঁচিয়ে রেখেছে। মোটে দু'বছর আগে তার মা'র মৃত্যু হয়েছে, তা-ও ম্যালেরিয়ায় ভুগে; অতএব ফজর আলীর দোষ দেওয়া যায় না।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সে যা হোক, এসব অবশ্য ধরছে না ফজর আলী, কিন্তু এসবের সঙ্গে বিয়ে বা সংসার করার কী সম্পর্ক! এভাবেই তো বাঁচতে হয়–তার বাবা এভাবেই কাল কাটিয়ে গেছে, তার বাপের বাবাও এমন কোন রাজা–মহারাজা ছিলো না; যতো দূর বোঝে, তার দাদার বাপও নয়; জন্মের পর থেকেই ফজর আলী দেখে আসছে, দাদাকালি আমলের এবড়ো থেবড়ো নোনালাগা দু'কামরা মাটির ঘর, ডোঙা খোলার চাল, একফোটা উঠোন, উঠোনের পাশে আগাছার জঙ্গল, বাড়ীর পেছনে অনন্ত সা'র বাঁশবাগান আগেও যেমন বাড়ীটার ওপর ঝুঁকে খুপ্‌রীর মতো ঘর দু'টোকে দিনের বেলাও অন্ধকার ক'রে রাখতো, আজও তেমনি।

ফজর আলীর মতোই তার বাপেরও কোন বাঁধা কাজ ছিলো না–ঘরামির কাজ, বাঁশ কাটা, পরের জমিতে নিড়োনো, ধান কাটা, বাঁশের ঝাঁকা চুপড়ি বোনা–পেটে শল ব্যথা নিয়ে এইসব করে সংসার চালাতো; ফজর আলী, ফজর আলীর মা, দুই বোন তার ভেতরই আধপেটা খেয়ে, না খেয়ে মানুষ হয়েছে, কই তার মা কোনদিন স্বামীকে এমন কথা বলেছে বলে তো মনে পড়ে না।

বউয়ের কথায় ফজর আলী যে খুব দুঃখ পেয়েছে, তা নয়, তেমন লোকই নয় সে, বিষয়টাকে নিয়ে সে শুধু ভাবছে, তার বউকে বিয়ে করাটা তার দোষ হয়েছে কি না।

দোষ যদি করে থাকে তার বাপ করেছে, দাদা করেছে, দাদার বাপ... এমনি করে যতো পেছনে যাওয়া যায় সকলেরই দোষ। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়–মানুষের হাতের পাঁচ আঙুল যেমন সমান নয়, খোদার আলমে মানুষেরও তেমন ছোট বড়ো আছে, তা না হলে জগত চলে না, গরীব না থাকলে দান–খয়রাত, জাকাত, এইসব নিয়ম কি করে হবে? সেটাও ভাবো।

এমন করে সব জ্ঞানের কথা সে যে ভাবতে পারে তার ধারণাই ছিলো না, একটু উত্তেজনাই বুঝি বোধ করে ফজর আলী।

এমন সময় দূরে ট্রেনের হুইসিল শুনতে পায়, অনেক দূর থেকে ভেসে আসা প্রায় ঝাপসা ধ্বনির সঙ্গে মনে পড়ে, কথাগুলো তাঁর নিজের নয়, কোথায় যেনো শুনেছিলো? একথা মাথায় আসার সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের সামনে একটা সবুজ গাছ ঘুরতে ঘুরতে দূর থেকে কাছে আসতে থাকে, ধীরে ধীরে তার নীচে সাদা, নীল, কালো কতোগুলো রঙ জেগে ওঠে, রঙগুলো আরো স্পষ্ট হয়ে এক সময় জামাকাপড় কি খালি গায়ের কতোগুলো মানুষ হয়ে যায়, এবং সেখানে ফজর আলী নিজকে দেখতে পায়– খোদাবকস্ মৌলবী হাত নেড়ে নেড়ে কথাগুলো বলছে জামরুল তলায় দাঁড়িয়ে।

গ্রামের প্রাইমারী স্কুলের মাষ্টার আবদুর রহমান হাসতে হাসতে বলে, 'আপনার কথা মানি, হাতের পাঁচটা আঙুল সমান নয়, কিন্তু থালা থেকে ভাত তুলে মুখে দেবার সময় পাঁচটা আঙুলকেই সমান করতে হয়।' খোদাবক্স মৌলবীর মুখ লাল হয়ে যায়, আর দাঁড়ায় না, বেদীন, নাসারা, নাস্তিক বলতে বলতে রেগেমেগে চলে যেতে থাকে।

ছবিটা শেষ হয়ে যায়। বড়ো অসহায় হয়ে পড়ে ফজর আলী। মেলায় হারিয়ে যাওয়া শিশুর মতো এদিকে ওদিকে তাকাতে তাকাতে গোরস্থানের ভেতর নজর যায়, জ্বলে যাওয়া [illegible] পাতা, [illegible] মাটিতে লম্বা [illegible] ধ্বস নামা কি উঁচু হয়ে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
থাকা সারি সারি কবর দুপুরের রোদে কর্মহীন বেচারা মজুরের মতো ভারী ফাঁকা দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছে।
ফজর আলী কি মনে করে গোরস্থানের ভেতর ঢুকে পড়ে, মাথার ওপর কোন গাছ নেই, ছায়া নেই, চামড়া পোড়ানো রোদের মধ্যে সে গোরস্থানের ভেতর ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে তার বাপের কবরটা খোঁজে। বছর বারো আগে মরে যাওয়া বাপ এই শত শত কবরের ভেতর কোথায় যে পড়ে আছে কে জানে। বাপকে কবর দেবার সময় এমন কোন চিহ্ন দিয়ে রাখেনি, ফলে এই কয়েক বিঘে জমির ওপর গোরস্থানের সব ক'টি কবরকেই তার সমান মনে হয়। একবার মনে হয় এটা–কাছে গিয়ে মনে হয় এটা নয়, ঐটা–তার কাছে গেলে মনে হয় এটাও নয়– যেন বাপ বেটায় লুকোচুরি খেলা চলছে। ফজর আলী ঘামতে থাকে, মাথার তালুতে সূর্যরশ্মি বল্লমের মতো গেঁথে যাচ্ছে। পায়ের নীচে শুকানো আগাছার সরু সরু ব্যথা খোঁচা দিতে থাকে।
এই রোদে, এই অস্থিরতার মধ্যে ঘোর লাগা ক্ষ্যাপার মতো দেখাতে থাকে ফজর আলীকে।
বাবলা গাছ থেকে ঘুঘু ডাকে, গোরস্থানের শুকনো মৃত খটখটে ঘাস আগাছার ভেতর দিয়ে শিরিগিটি কি আরো সব নানান পোকামাকড় যার যার ধান্ধায় ঘুরে বেড়ায়। তাদের চলাফেরার আওয়াজ ফজর আলীর কানেও পৌঁছোয় না। ফজর আলী তার পিতাকে খোঁজে। খুঁজতে খুঁজতে একবার সামনে, একবার ডানে, একবার বাঁয়ে ঘুরে ঘুরে ঘুরতেই থাকে। এক সময় যখন প্রবল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে 'ঐ সামনেরটাই হবে মনে করে' এগোতে থাকে তখন হঠাৎ দেখতে পায় মাটি ফুঁড়ে একটি ফণা শূন্যে দুলছে, পাটকিলে রঙের শরীরটা ফুলতে ফুলতে আগুনের শিখার মতো লক্ লক্ করে ওপরে উঠতে থাকে। ফজর আলী দেখতে পায় যে কবরটার কাছে সে যেতে চাইছিলো ঠিক সেই বরাবর চন্দ্রবোড়াটি; হলদেটে–বুক পেট আর পাটকিলে রঙের জমির ওপর চকরা বকরা মাথা পিঠ লেজ সব নিয়ে রোদের ভেতর যাত্রায় দেখা রাজার মতো ঝলমল করে।
তার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ফজর আলীর ভেতর কি সব ভাঙচুর হতে থাকে, তার বুক ওঠা নামা করে, হাতের পেশী শক্ত হয়ে ওঠে; মুহূর্তের মধ্যে সে পাশের ধ্বস নামা কবর থেকে প্রায় পচা বাঁশটি টেনে নিয়ে মাথার ওপর তোলে, তার চেয়েও ক্ষিপ্রতায় প্রায় উড়ে এসে চন্দ্রবোড়াটি সগর্জন ছোবল মেরে আবার ফণা তুলে দ্বিতীয় বার ছোবল মারার জন্য দুলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ফজর আলী ঠিক ফণার ওপর সজোরে বাড়ি মারে। ফজর আলীর সেই একটি ঘায়ে সাপটি হাত কয়েক দূরে ছিটকে পড়ে, অমন মুকুট পরা রাজকীয় মস্তক ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে, তার বিশাল শরীর কয়েকটি পাক খেয়ে স্থির হয়ে যায়।
ফজর আলীর হাতের বাঁশটির অর্ধেকটি ভেঙে গেছে, বাকিটুকু এখনো শক্ত করে ধরা। সে নিজের পায়ের দিকে তাকায়, খুব ছোট দুটি বিন্দু পায়ের পাতার ওপর দামী পাথরের মতো চক্ চক্ করে।
ফজর আলী কবরটির দিকে না এগিয়ে সাপটির কাছে যায়। কী অকিঞ্চিতকর ভাবে পড়ে আছে। ফজর আলী হাতে ধরে থাকা আধ ভাঙা বাঁশটির দিকে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
তাকায়, সাপটিকে মারবার সময় যেমন জোরে বাঁশটিকে দুই থাবার মধ্যে চেপে ধরেছিলো, এখনো তেমনি টান টান করে ধরা আছে। ফজর আলী আবার সাপটিকে দেখে, তারপর বসে প'ড়ে মৃত সাপটিকে দমাদ্দম পিটতে থাকে। দু'চোখে কোথা থেকে যে এতো ঘৃণা এবং ক্রোধ জমা হতে থাকে কে জানে। পিটতে পিটতে তার প্রবল তৃষ্ণা পেতে থাকে, মাথা ঝিমঝিম করে; পরিশ্রান্ত ফজর আলীর ঘুম পেতে থাকে, ফজর আলী মৃত সাপটির পাশে শুয়ে পড়ে এবং ঘুমিয়ে যায়; তখনো তার হাতে বাঁশটি তেমনি ধরা থাকে।

পারাপার

আকবর আলীকে আমি বেশ কিছুদিন ধরে খুঁজছি কোথায় যে গেলো লোকটা।
আকবর আলীর বয়স ৩৫-ও হতে পারে, ৪০-ও হতে পারে। রোগা, শ্যামলা , পোড়া পোড়া রঙ, মাথার চুল ভীষণ অবিন্যস্ত, দাড়িতে সপ্তাহে একবারও ক্ষুর বা ব্লেড পড়ে কি পড়ে না।
চোখে কালো ফ্রেমের খুব মোটা কাঁচের চশমা, ফলে সেই কাঁচের ভেতর দিয়ে ভাঙা-গালের শীর্ণ মুখে চোখ দুটোকে খুব তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল এবং বড় দেখায়।
রোগা-পাতলা আকবর আলীর কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মোটা। খোঁচা দাড়ি-গোঁফের ফাঁক দিয়ে তার হলদে দাঁত বার করে আকবর আলী যখন গম গম করে হাসে তখন মনে হয় তার ভেতরটায় একটুও ময়লা নেই। কিন্তু যখন চুপচাপ বসে থাকে তখন তার চশমার ভেতর তীব্র তীক্ষ্ণ জ্বল-জ্বলে চোখের দিকে তাকালে যে কোন মানুষকে অস্বস্তিতে চোখ ফিরিয়ে নিতে হবে।
আকবর আলীর সঙ্গে পরিচয় আমার বেশি দিনের নয়। এক রেষ্টুরেন্টে আলাপ হয় প্রথম। অল্প দিনেই বুঝেছিলাম, লোকটা বেশ রগচটা। কোন বিষয়কে নাকচ করে দেবার সময় বিরক্তিতে তার রোগা মুখ কুঁচকে গিয়ে আরো কখনো তার অভিব্যক্তিকে এতো তেজী করে দিতে পারে আকবর আলীকে দেখার আগে আমার জানা ছিলো না।
আপনারা বুঝতেই পারছেন, এমন লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়া বেশ কঠিন ব্যাপার। প্রথম দিকে এতোটা কৌতূহল ছিলো না, তবে শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা আর নিছক কৌতূহল ছিলো আমার সাথে বলা যায় বন্ধুত্বই গড়ে উঠেছিলো। কিন্তু কথা নেই বার্তা নেই সেই মানুষ হঠাৎ কোথায় যে উধাও হয়ে গেলো। ব্যাপারটা প্রথম আমি জানতে পারি আকবর আলীর মেসে গিয়ে।
বেশ কিছুদিন থেকে লোকটার সঙ্গে দেখা নেই। একদিন ছুটির বিকেলে আকবর আলীর মেসে গিয়ে জানতে পারি, সপ্তাহ খানেক আগে সে মেস ছেড়ে চলে গেছে (কোথায় গেছে, কি বৃত্তান্ত মেসের লোকজন কিছুই জানে না। জানার গরজও

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
নেই তাদের। লোকগুলো আকবর আলীর উপর বেশ চটা মনে হলো।
আমি তার খোঁজে গেছি জেনে আমার দিকে এমন করে তাকাতে লাগলো–মনে হচ্ছিলো, আমাকে দেখে তারা কৌতুক বোধ করছে। ভাবটা এই রকম–ও, তুমি আকবর আলীর বন্ধু! অর্থাৎ আকবর আলীর বন্ধু যখন তখন আমিও একটা পাগল।
এখানে আমি একদিনই এসেছিলাম। আকবর আলীই নিয়ে এসেছিলেন আমাকে (সরু, স্যাঁৎসেতে গলির ভেতর খুবপ্রাচীন নোনা ধরা একতলা বাড়িতে মেস)।
আকবর আলীর রুমটা একটা গুহা বিশেষ। বাইরের খোলা বারান্দার চেয়ে ঘরের মেঝেটা নীচু। ভেতরে ঢুকলে প্রথমে কিছুই দেখা যায় না। শুধু একটা চাপা গন্ধ। সেটা পুরনো দেওয়ালের গন্ধ হতে পারে, আবদ্ধতার গন্ধ হতে পারে কিংবা দড়িতে ঝুলিয়ে রাখা আকবর আলীর জামা কাপড়ের গন্ধ হতে পারে অথবা আকবর আলী যে এ–ঘরে দীর্ঘদিন ধরে আছে তার অপরিচ্ছন্ন শরীরের গন্ধ এ–ঘরের হাড় মাসের ভেতর ঢুকে গেছে তার–গন্ধও হতে পারে।
উঁচু সিলিং থেকে ঝুলন্ত তারের ডগায় একটি চল্লিশ পাওয়ারের বাল্ব। আকবর আলী সেই বাল্ব জ্বালিয়ে ঘরের একটি মাত্র জানলা খুলে বলে, 'বসুন'।
এতোক্ষণে বোঝা গেলো, ঘরে একটা সরু তক্তপোষ আছে। শাদার ওপর সবুজ ষ্টাইপের একটা চাদর অত্যন্ত পাতলা এবং শক্তগদির ওপর বিছানো। চাদরের শাদা রঙ ময়লায় ময়লায় খানিকটা হলদেটে রঙ ধরেছে, সেই চাদরের ওপর চল্লিশ পাওয়ারের আলোয় আরো মলিন দেখায়।
বালিশের পাশে এলোমেলোভাবে পড়ে থাকা সস্তা মলিন মশারি মাথার দিকে দেওয়াল ঘেঁষে বেতের একটা বুক শেল্ফ–তাতে এলোমেলোভাবে কিছু বই, ছেঁড়া–খোঁড়া পত্র–পত্রিকা।
আকবর আলী আমাকে বসিয়ে রেখে একটা মগ নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। কালাম কালাম বলে কাকে যেনো ডাকাডাকি করলো। কোন সাড়া না পেয়ে নিজেই চলে গেলো চা আনতে।
আমি দিনের বেলায়ও বাতি জ্বালানো ড্যাম্প ঘরে ভ্যাপসা গরমের মধ্যে বসে বসে জীর্ণ দেওয়াল, পোড়া সিগারেটের টুকরো, দেশলাইকাঠি, খালি সিগারেটের প্যাকেট এবং ধূলোয় ভরা মেসের দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবলাম, আকবর আলীর উপযুক্ত আস্তানাই বটে।
চা খেতে খেতে আকবর আলী হঠাৎ প্রশ্ন করলো, আচ্ছা আমাকে দেখে কী মনে হয় আপনার? এ ধরনের প্রশ্নের জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না আমি। লোকটাকে আমি মোটামুটি জেনে গেছি ঠিকঠাক মতো উত্তর না দিলে চটে যাবে।
কিন্তু চট করে কী বলা যায়?
বললাম, খুব ক্লান্ত দেখায় আপনাকে।
আহ সে কথা নয়, ও তো যে কোনো লোককেই দেখাতে পারে। আমাকে কি পাগল মনে হয় আপনার?
এবার প্রশ্ন শুনে খুব থতমত খেয়ে যাই–না, না, না, পাগল মনে হবে কেনো? কী যে বলেন?–বলি, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ভারী অস্বস্তি বোধ করতে থাকি।
'মনে হয় না?' আকবর আলী তার মুখটা আমার দিকে এগিয়ে এনে যেনো খুব গোপনে খুব গোপন কোনো কথা বলছে, এমনভাবে বললো, আসলে কিন্তু আমি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
পাগল ছিলাম, জানেন?' তার চাপা কিসকিসে কণ্ঠস্বর, তার চোখ-মুখের অভিব্যক্তি-সব মিলিয়ে আমি ঘাবড়ে গিয়ে আকবর আলীর দিকে একটু বোকাটে ধরনের হাসি নিয়ে তাকিয়ে থাকলাম।-বিশ্বাস হলো না। জানেন, একবছর আমি মেন্টাল হসপিটালে ছিলাম।

আকবর আলীকে যে রকম জানি তাতে নিজের সম্পর্কে এমন করে বলা ঠিক মানানসই মনে হচ্ছেনা। কিন্তু সে বলতেই থাকে-একদিন, বুঝলেন তখন শীতকাল। আলনায় আমার বড় ভাইয়ের একটা কালো কোট ঝোলানো ছিলো। কোটটাকে হঠাৎ মনে হলো একটা খুব বড় আকারের বাদুড়। মনে হলো আলনায় পা আটকে আমার দিকে তাকিয়ে ঝুলছে। আমি যতো বার ভাবলাম, ওটা বাদুড় নয় ততোবার দেখলাম বাদুড়টা একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। বুঝলেন, এরপর থেকে আমার মাথার ভেতর খুব হালকা কিন্তু ভারী একটা ব্যথা শুরু হলো। তারপর একরাতে খোলা জানলার দিকে চেয়ে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ দেখতে পেলাম জানলার বাইরে শূন্যতার ওপরে একটি জানলা, সেই জানলায় একটি নীল পর্দা, পর্দার ফাঁকে একটি মেয়েলী হাত, সম্পূর্ণ হাত নয়, পাঁচটা আঙুল নিয়ে কব্জি পর্যন্ত হাতের একটা অংশ। দীর্ঘ ফর্সা মোমের মতো মোলায়েম সে আঙুলে কী যে লাবণ্য। ফুলের পাঁপড়ির মতো আঙুলগুলোর যেনো রেণু মাখানো। সেই আঙুলে হাত ছোঁয়ালেই পাউডারের মতো বেনু লেগে যাবে হাতে।

বুঝলেন, আমি মেয়েটির মুখ দেখার জন্য রোজ অনেক রাত পর্যন্ত জানলার ধারে বসে থাকতাম। একদিন মনে হলো হাতটা আমাকে ডাকছে। বুঝলেন, স্পষ্ট দেখতে পেলাম সেই নেপথ্য-সুন্দরী হাত নেড়ে ডাকছে আমাকে।

জানলার কাছে বসে বসে মনে হলো, আমি এসব জানলার বাইরে। আমার সামনে শূন্যতার ওপর সেই জানলা আর সেই হাত। আমি হাত বাড়াতে গিয়েই দেখলাম জানলা নেই, সেই বাদুড়টা ঝুলে আছে আমার দিকে তাকিয়ে।

তারপর আমি পাগল হয়ে গেলাম। বাড়ির লোকজন আমাকে পাবনা মেন্টাল হসপিটালে ভর্তি করে দিলো। সেখানে একবছর ছিলাম। কী, বিশ্বাস হচ্ছেনা?

আকবর আলী সেই জ্বলজ্বলে চোখে এমনভাবে তাকালো আমার দিকে, মনে হলো, তার কথায় সন্দেহ প্রকাশ করলে এখনই আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমি তাড়াতাড়ি বললাম না, না, না, বিশ্বাস হবে না কেনো, কিন্তু এখন তো আপনি একেবারেই সুস্থ।

শেষ কথাটা আকবর আলীকে খুশী করবার জন্যে বললাম। আকবর আলী আমার কথায় কান না দিয়ে বললো: কিন্তু পরশুদিন, বুঝলেন, পরশুদিন রাতে আমি শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম, একজন মানুষ তার ভেতরে কতোজন মানুষের চরিত্র ধারণ করতে পারে?

আলো নেভানো ছিলো, কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখলাম, জানলার গায়ে সেই বিশালদেহী বাদুড়টা ঝুলে আছে আমার দিকে তাকিয়ে।

এই পর্যন্ত বলে আকবর আলী হঠাৎ চুপ করে গেলো।

আমি চুপ করে আছি, আকবর আলী মেঝের দিকে তাকিয়ে চুপ করে আছে।

এ নিস্তব্ধতা পাথরের মতো চেপে বসেছিলো। নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনতে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
শুনতে সমস্ত শরীর আমার ঘামে ভিজে যাচ্ছে।
এই ঘর থেকে, আকবর আলীর সান্নিধ্য থেকে থেকে বাইরে ফাঁকা জায়গায় গিয়ে বুক ভরে বাতাস নেবার জন্যে যখন আমি অস্থির হয়ে উঠছি মনে মনে, তখন আকবর আলী আমার দিকে তাকালো। আচ্ছা, পাগল, আর সুস্থ মানুষের ভেতর আসলে কি কোনো পার্থক্য আছে?
এ প্রশ্নে আমি এবার খুব অসহায় বোধ করতে থাকলাম।
আকবর আলী বললো; প্রশ্নটা নিয়ে ক' দিন ধরে খুব ভাবছি, আমি যখন পাগল ছিলাম, তখন আমার মনে হয়নি আমি পাগল। এখন আপনি বলছেন আমি সুস্থ। কিন্তু, আমি বুঝতে পারছি না কেনো আমি পাগল নই।
আকবর আলীর স্বরে এমন কিছু ছিলো, মনে হলো, এই অপরিসর, অপরিচ্ছন্ন ঘরের দেওয়াল সরে গেছে, মাথার ওপর ছাদ নেই। তারা ভরা আকাশের নিচে, ফাঁকা প্রান্তরের ধারে, কোনো পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে আছে সে।
আকবর আলীর সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা।
আমার খুব জানতে ইচ্ছা করে, আকবর আলী কেমন আছে এখন।
সে কি তার প্রশ্নের সঠিক উত্তর পেয়েছে?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দি ন যা প ন

প্রকাশকাল: নভেম্বর ১৯৮৬

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

আজ আর নাম-গান করা হলো না নিবারণের। কেমনে হয়? বাড়ীটা কি আর বাড়ী আছে? যত্তসব ছোটলোকের আখড়া হয়েছে।

রাস্তার ধারে ঝুল বারান্দাওলা দু'তলা বাড়ীটি ঠাকুরদা ক্ষেত্রমোহনের আমলের। নীচে ওপরে, ছোটবড় মিলিয়ে দশখানা কামরা। নিবারণের বাবা উমাচরণ ছিলো ক্ষেত্রমোহনের একমাত্র পুত্র। ক্ষেত্রমোহনকে নিবারণ দেখেনি! খেতে বসে সৎমার এক কথায় আধখাওয়া থালা রেখে বিক্রমপুরের সুবচনী গ্রাম থেকে ১৪ পয়সা নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলো, আর গ্রামে ফেরেনি।

অনেক সময় ভেবেছে নিবারণ: এই যে মানুষ টাকা টাকা করে,কই সকলের তো হয় না। অথচ দেখো, চৌইদ্দটা পয়সা নিয়া গ্রামের এক পোলা ঘর থেইক্যা বাইরাইলো আর এক জীবনেই রাইজ্য গইড়া থুইয়া গেল। কপাল, কপাল লাগে! ভগবান না দিলে মানুষের সাইদ্য কি! এই যে মাগীগুলা চিল্লাইতাছে, নিত্য দিন এই যে ঝগড়াঝাটি , কুত্তা-বিলাইয়ের মতন কামড়াকামড়ি-বোঝে কিছু ? জগতে আইছে খালি হাউকাউ করতে!

তাকের উপর মন্দিরা দুটো রাখতে রাখতে নিবারণ বিড়বিড় করে, যামু গিয়া একদিন, বড়দার মতন একদিন যামু গিয়া!

ক্ষেত্রমোহন তখন আর নেই যদিও,কিন্তু ইম্পিরিয়াল টোব্যাকোর এজেন্সী, খুচরা এবং পাইকারি মনোহরি দোকান, সুদের কারবার, ক্ষেত্রমোহনের তৈরী বাগান তখন ফলে ফুলে ভর- ভরন্ত। এর মধ্যেই একদিন গৃহত্যাগ করলো ইন্দ্রমোহন। কেউ কেউ বললো, ঠাকুর তারে ডাক দিছে! কেউ বললো,আরে না, জুয়ান বয়সের খেয়াল ২/৪ মাস পরে আবার আইস্যা পড়বো, তখন বিয়া দিলে এইসব খেয়াল কই যাইব গিয়া!

কিন্তু বাইরে বাইরে যে কথাটি সবচেয়ে বেশী প্রচারিত হয়েছিল তা হলো, উমাচরণের বড়পোলা বিপ্লবী দলে যোগ দিয়া ঘর ছাড়ছে। বোমা পিস্তলের যুগ তখন, এসব কথা ভাবা অস্বাভাবিক ছিলো না, বছর তিনেক আগে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুঠ, ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালে ইংরেজ সাহেবকে গুলি করে বিনয় বসুর কলকাতা পলায়ন এবং সেখানে সুধীর গুপ্ত, দীনেশ গুপ্তকে নিয়ে রাইটার্স বিল্ডিংয়ের বারান্দা যুদ্ধ হয়ে গেছে, আর ঢাকা তো বরাবর বিপ্লবীদের বড় ঘাঁটি। মা রীতিমতো শয্যা নিল আমার পোলারে আইন্যা দাও!

কিন্তু স্বেচ্ছায় যে ছেলে ঘর ছেড়েছে তাকে পাওয়া এতো সোজা নয়, সে খেয়ালের বশেই হোক, সন্যাস নিয়েই হোক, কি দেশ উদ্ধার করতেই হোক, নিজে থেকে না ফিরলে তাকে ফেরায় কে?

ইন্দ্রমোহন যে রকম ছেলে তাতে তার চরিত্রে বৈরাগ্য কিংবা বিপ্লব দুটোই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
বেমানান। খেয়াল? কিন্তু কথা নেই বার্তা নেই ঘর ছাড়বার খেয়ালই বা হবে কেন?
পুলিশের কথাও তাই, তারা যথেষ্ট খোঁজ-খবর নিয়ে জেনেছে ইন্দ্রমোহন মোটেই খেয়ালি ছেলে নয়, অত্যন্ত ধীরস্থির এবং বুদ্ধিমান, টেররিস্টদের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিলো....
বাড়ীর বড় ছেলে নিখোঁজ, তার জন্যে দুশ্চিন্তা শোক করবে কি, পুলিশ সামলাবে কিভাবে সেই ভাবনাতেই সবাই অস্থির।
নিবারণ তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মুখটি দেখার জন্যে নিবিষ্ট হয়। নীচে কুয়োতলার মেয়েলি ঝগড়ার আওয়াজ এখন দূরাগত ধ্বনির মতো মৃদু এবং ঝাপসা, সেই ঝাপসা ধ্বনির ওপারে তার ভাইয়ের মুখটাও ঝাপসা দেখায়, ঘরের ভেতর শাদা চারদেওয়ালের মাঝখানে বসে নিবারণ দেখে, পাকা উঠোনে ঝলমলে দুর্গা প্রতিমা, রান্নাঘরের সামনে ৩/৪ জন মহিলা বটি নিয়ে বসেছে ফল কাটতে, বড়ো বড়ো কাঠের থালায় নানা জাতের কাটা ফলের স্তূপ হয়ে উঠেছে। খালি গায়ে পরনের ধুতির একাংশ গায়ে প্যাঁচানো বাবা ব্যস্ত হয়ে কাকে যেন ডাকছে, ঢাকের শব্দে ঠিক শোনা যাচ্ছে না। সে ডাক শেষ হতে না হতে ঢাকের শব্দ থাকে না, বাবা থাকে না, মানুষজনের ভিড় থাকে না, দুর্গা প্রতিমা থাকে না; 'জয় রাধে'-বলে হাতের মন্দিরা কপালে ঠেকিয়ে কাঁধে ঝোলা, গায়ে নামাবলী জড়ানো শীর্ণদেহী কৃষ্ণদাস বাবাজী এসে দাঁড়ায়। মাথায় ঘোমটা, ছোট-খাটো শরীরের মা মাঝারি আকারের কাঁসার থালায় চাল, দু'টি সবরি কলা, একটা ফজলি আম সাজিয়ে পূজারিণীর ভঙ্গিতে এগিয়ে আসতে থাকে, তার আসা শেষ হতে না হতে কৃষ্ণদাস বোষ্টমকে সরিয়ে দিয়ে সুরথ এক বিশাল রুইমাছ এনে ফেলে বারান্দার ওপরে: এই লন ঠাইরান, বাবু হেই দিনকা কইয়া দিছিল.....
-বেলা বাজে বারোটা অখন তুই আনলি মাছ, এই মাছ অখন কাটবো কুটবো ক্যাঠায় ক' দেহি?
-ভাল মাছটা।
-হ, ভালো না! বাজারে বিকে নাই, পচাধছা...
সুরথ জিভ কাটে,মাছের কানকো তুলে দেখায়, মিছা কথা কইলে আমার নরকবাস অইবো, এই দ্যাহেন। কি করুম, ন্যাপাইল্যা কাইল সুবিড্ডায় হারা রাইত পালা দেইখ্যা বারিত আইয়া চিত্তইর। মাছ মাইরা আইয়া দেখি গাও জ্বরে পুইড়া যায়, একা মানুষ কি করুম ঠাইরান, দেরী কিঞ্চিত ওইছে মানি, কিন্তু মাছখান সরস। হরিসাধনরে কই, হইরারে, বাবু মাছ দিবার কইছিল, তা হালায় একখানও জুতের মাছ পাইলাম না, মাছ না দিলে বাবু গাইলাইবো; কইলে বিশ্বাস যাইবেন না ঠাইরান, এই কথা কইয়া অবসর পাই নাই জালে পড়লো টান, আমি কই হালার কাউঠা নাইলে শিশু, এতো ভারী লাগে..... জালখান বুঝি গেল! টানতাছি, টানতাছি, টানতাছি....
সুরথ এবার গল্প বানাতে শুরু করবে। মা হাঁক দেয়, ও মরণীর মা, মাছখান নিয়া যা গো....সুরথকে বলে, বয়, জল খাইয়া যা । খানিক পরে কাঁসার বাটিতে কটা নাড়ু, দুটো কলা, এক ঘটি জল এনে সামনে রাখে।
কাউকে কিছু খেতে দিতে, তা সে যতো সামান্যই হোক মা'য় নিজের হাতে দিতো, নারায়ণের সেবা কি চাকর-চাকরানির হাতে হয়, না ঠাকুর তা লয়! এই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
আছিল মায়ের কথা।
কিন্তু সুরথের অভিব্যক্তি দেখার সুযোগ নিবারণের আর হয় না, কূয়োর পাড়ে ঝনঝন শব্দ এবং 'মাইরা ফালাইলো গো মাইরা ফালাইলো 'এই সম্মিলিত আর্তনাদ সুরথকে ঠেলে ফেলে দিয়ে তার সামনে কলা ও নাড়ুর বাটি জলের ঘটিকে ছত্রখান করে এই ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লে নিবারণ ঘর থেকে দোতলার বারান্দায় বেরিয়ে আসে; বাসুদেবের বউ হারাধনের মেয়ের চুলের মুঠি ধরেছে, আর এক হাতে কূয়োর জল তোলা বালতি হারাধনের বউ আর মেজদার মেয়ে সুনন্দা বাসুদেবের বউকে ছাড়িয়ে নেবার জন্যে টানাটানি করছে, বারান্দায় এবং উঠোনে বাড়ীর অন্যান্য বউ ঝি এবং বাচ্চা-কাচ্চার কোলাহল এবং কান্নাকাটি নরককে বলে তুই দূরে থাক।
দোতলার ওপাশের বারান্দায় রেলিং ঝুঁকে মেজদার দ্বিতীয় পক্ষ চেঁচাচ্ছে, বাসুদেববে খবর পাঠা, এই ডাকাইত বউরে নিয়া অখনই বাড়ী ছাইড়া যাউক গিয়া।
নিবারণের স্ত্রী ওপরের রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে, মোটা নার্ভাস টাইপের মহিলা, সে-ও চেঁচায় , ওমা, এইটা কেমুন কাণ্ড! ততক্ষণে সুনন্দা এবং হারাধনের স্ত্রী বাসুদেবের বউ সর্বানীকে ছাড়িয়ে নিতে পেরেছে, সর্বানীর হাতের মুঠোয় হারাধনের মেয়ের ক'গাছা চুল, সুনন্দা কূয়ার বালতিটা বারান্দার একধারে রেখে মায়ের দিকে মুখ তুলে হাসে।
নিবারণ ঘরের ভেতর ঢুকে স্ত্রীকে ডাক দেয়, অগো সরতে কও, আমি চানে যামু। রোজ রোজ এক রঙ পাইছে!
এ কথা বলা ছাড়া নিবারণের আর কি-ই বা উপায় থাকতে পারে! এক বাসুদেব ছাড়া পুরুষরা এখন কেউ বাজারে, কেউ ঘরে। (বাসুদেব ফরাশগঞ্জে এক আড়তে চাকরী করে, নিজের মামার আড়ত, বখে যাওয়া ভাগনেটিকে দয়া করছেন বলা যায়)। কিন্তু এই মেয়েলী ব্যাপারে কেউ ঘর থেকে বেরোয় না, ভেতর থেকে বড় জোর নিজের স্ত্রীকে ধমকে বলে, কি লাগাইছ তোমরা? ব্যস ওই পর্যন্তই ।
নিবারণ ঘরের ভেতর পেছন দিকের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকায়, পাশের বাড়ীর শ্যাওলা পড়া দেওয়াল এবং ছাদের রেলিংয়ের আড়ালে আকাশ দেখা যায় না।
কদিন হাঁপানিতে কষ্ট পাওয়ার পর নিশিকান্তর বেশ ঝরঝরে লাগছে আজ নিজেকে। জানালার ধারে তক্তপোশের ওপর বসে সে মনোতোষকে ডাকে, ও পণ্ডিত মশাই!
মনোতোষের বয়েস ৩৫/৩৬, শ্যামলা রঙের না লম্বা না বেঁটে, এক বেসরকারী স্কুলে মাস্টারী করে। স্কুলের বেতন এবং ছেলে পড়িয়ে মাসিক আয় তার হাজার দুয়েক টাকার মতো, সংসারে মানুষ বলতে স্বামী স্ত্রী আর দুটো ছেলেমেয়ে। সকালবেলা বাজার-হাট করে দিয়ে এক ঝাঁক ছেলে পড়িয়ে স্নান খাওয়া-দাওয়া ক'রে স্কুলে ছোটে, আবার বিকেল থেকে রাত দশটা সাড়ে দশটা পর্যন্ত টিউশনি করে বাড়ী ফেরে। নিশিকান্তর অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম আসে না। মনোতোষের সাইকেলের শব্দে সে সাড়া দেয়, কে ও মশাই নাকি? এর মধ্যে মনোতোষ আবার রাজনীতিও করে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
নিশিকান্ত পার্টি ফার্টির ধার-কাছেও নেই, কিন্তু রাজনীতির আলোচনায় মহা উৎসাহী। চাকরী করে সাধনা ঔষধালয়ের এক ব্রাঞ্চে। প্রত্যেকদিন দোকানে বসে খবরের কাগজটি তার পড়া চাই। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে বলে: হ, হ্যারা করব রাজনীতি। নেতা আছিল দেশবন্ধু, নেতাজী সুভাস বোস, গান্ধী। খালি চিক্কুর পারলেই যদি নেতা হওন যাইতো..কাশির ধমকে মাঝ-পথেই থামতে হয়।
একটু দম নিয়ে নিশিকান্ত স্ত্রীকে বোঝায়ঃ বুঝলানি, ওই মন্‌তোষ মাষ্টারের সমাজতন্ত্র, ওইসব ওইলো গিয়া বুলি, এক হালারে বালো মনে করো তুমি? সব খালি বোচকা মারনের ফন্দি।
হৈমবতী দেশবন্ধু, নেতাজী, গান্ধী কাউকেই চেনে না, রাজনীতির অতো ঘোরপ্যাঁচও বোঝে না, কিন্তু সে মনোতোষ মাষ্টারকে চেনে, হাসিখুশী মানুষটা, মনে কোনো কালি নাই , ঠ্যাকা বেঠ্যাকায় দুই দশ টাকা পাওন যায়। সে বলে: মন্‌তোষ মাষ্টারের কথাগুলা তো খারাপ না।
-আহ্, খারাপটা তোমারে কইতাছে কে, কিন্তু করনের লোকটা দেহাও!
-হ, তোমার লগে অহন আজাইরা প্যাচাল পারি। আমার আর খাইয়া কাম নাই। হৈমবতী ঘাড় টান করে সংসার সামলাতে উঠে যায়।
মনোতোষ এইমাত্র বাজার থেকে ফিরলো । নিশিকান্তর সঙ্গে চা খেতে খেতে বলে:নিশিদা, রাজনীতির ধারা অহন বদলাইছে, মানুষের চেতনা.....নিশিকান্ত বাধা দিয়ে ওঠে, এই আপনাগো এক দোষ, রাজনীতির বই পইড়া পইড়া সমস্ত দ্যাশ-দুনিয়াটারে বইয়ের পাতা মনে করেন। আমরা অত বই পড়ি নাই, আমরা দেখি মানুষ, দোকানে বইসা বইসা ওষুধ বেচি দেইখ্যা মনে করেন...না, না, থামেন, আমি তো দেখি আপনেগো রাজনীতির ধারে কাছে দিয়াও মানুষ নাই....
কিন্তু একটা কথা তো স্বীকার করবেন, আগে সমাজতন্ত্রের কথা মুখে আনন যাইতো না, অহন প্রকাশ্য জনসভায় কওয়া যায়, সমাজতন্ত্রের দাবীও করা যায়, যেসব রাজনৈতিক দল সমাজতন্ত্র তো দূরের কথা, পাইলে পিটাইতো, তারা অহন তাগো পার্টি থেইক্যা সমাজতন্ত্রের কথা না বইলা পারে না,আপনি কইবেন বিশ্বাস করে না, কিন্তু এটাও তো কম কথা না, বিশ্বাস যদি না-ও করে তবু রাজনীতি করতে গিয়া সমাজতন্ত্রের কথা কইতে হইতাছে, ক্যান? না, রাজনীতি করতে গেলে অহন সমাজতন্ত্রের কথা বা মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির কথা না কইয়া আর উপায় নাই। তার মানে হাওয়া অহন ঘুরছে, এর জন্যই কইতাছি মানুষের চেতনার পরিবর্তন হইছে, মানুষ বুঝতে শিখতাছে, অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়া.....
-যাউক গা, বাজার থেইক্যা তো ফিরলেন , আনলেন কি?
মনোতোষ নিশিকান্তর দিকে ভালো করে তাকায়। এই রোগা, গাল মুখ তোবড়ানো হেঁপো অকাল প্রৌঢ় লোকটা কি বলতে চায়?
নিশিকান্ত মনোতোষের মনোভাব বুঝে হেসে ফেলে , আরে না, না, রাজনীতির কথা না, রাজনীতির যে কতদূর কি হইবো তা তো বুইজ্জা সারছি, এমনে জিগাইতাছি, আনলেন কি? বাড়ী ভাড়া বলে আবার বাড়াইবো?
মনোতোষ কথাটা ঠিক বুঝতে পারে না, বাড়ী ভাড়া মানে?
আমারবই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
–আরে আমাগো বাড়ীওয়ালী নাকি বাড়ী ভাড়া বাড়াইবো । নিবারণবাবু পুরুষ মানুষ ওইলেই কি আর শরিক ওইলেই কি, হ্যায় আছে তার হরিসভা নিয়া, আর তার পরিবার তো মাটির মানুষ, আসল মালিক ওইলো নিবারণবাবুর বউদি। ঢের ঢের মাইয়া মানুষ দেখছি মশায় এমুন মাইয়া লোক.... নিশিকান্ত মাথা নাড়ে:আরে বাপরে, আপনেরা কি পলিটিকস করেন মশায়, হ্যায় আপনেগো সাতবার বেইচ্যা সাতবার কিনতে পারে। আমার তো ঘিন্না করে, ছি, ছি, ছি, মানুষ এমুন হয়! মনোতোষ ঠিক বুঝতে না পেরে বোকার মতো চেয়ে থাকে, নিশিকান্ত তাতে চটে, আপনে মশায় আরেক মানুষ, দ্যাহেন না কিছু? চোখে পড়ে না কিছু? ওই যে মোসলমান পোলাটা, হবিব না কি নাম, দিনে রাইতে যখন–তখন আসে, মাসীমা মাসীমা করে, খায়, ঘুমায়, ভালো কোন তরকারী ওইলে বাটি ভইরা দরদী মাসীমা পাঠাইয়া দেয়, কি ডাইকা আইন্যা খাওয়ায়; কোন কোন দিন রাইতে অগো ঘরেই ঘুমায়। রাইতে আমার ঘুম হয় না ভালো কইরা , জাইগ্যা জাইগ্যা এই জানালার ধারে বইস্যা বইস্যা কতো কিছু দেহি, রাইত দুফুরে জুয়ান মাইয়াটারে ওই রহম একজন যুবক পোলার লগে ছাদে ছাইড়া দিয়া মা ওইয়া কেমনে নিশ্চিন্তে ঘুমায়? ছ্যামরা নাকি মুক্তিযোদ্ধা আছিল, কিয়ের চ্যাটের মুক্তিযোদ্ধা,১৬ই ডিসেম্বরের পরে হগলতেই মায় রাজাকার শুদ্ধা মুক্তিযোদ্ধা...বোখারির পুরা বাড়ীটা দখল কইরা একা থাকতাছে,বন্ধু–বান্ধব লইয়া আড্ডা বহায়, মদ গাঞ্জা খায় ,মাইয়া ও আনে। বাড়ীউলীর মাইয়াটা ওইলো তার নিজস্ব, বুঝলেন না।

ঘরগুলোর সরু সরু নীচু দরজা ,ফোকরের মতো জানালা, ঘরের ভেতর ঢুকলে প্রথমেই মনে হবে ঠেলা দিয়ে দেয়ালগুলোকে সরিয়ে দিই ;এর ভেতরই তক্তপোশ, বাক্সপ্যাটরা, সস্তাদামের আলমারী, আলনা, ছেঁড়া লেপের তুলো ভরা চটের বস্তা, চালের টিন,গমের টিন, হাজারো গণ্ডা জিনিসপত্র স্যাঁতসেঁতে ঘরকে আরো অন্ধকার করে রাখে।

নিশিকান্ত অনেকক্ষণ একটানা কথা বলে এখন হাঁপায়। লোকটার মারাত্মক হাঁপানীর টান, কিন্তু কথা বলতে ওস্তাদ,কাশি আর হাঁপানীতে হোঁচট খেতে খেতেও কথা বলবে। আর, একটু ভালো থাকলে তাকে রোখে কে!

মনোতোষ এখন সরে পড়তে পারলে বাঁচে । কিন্তু নিশিকান্ত নিজেকে সামলে নিয়ে আবার শুরু করে, পাঠাটা নাকি বিজনেস করে, পকেটে ফাইফ ফিফটি ফাইভ; তা আর শক্ত কি! বাংলাদেশে বিজনেস করতে টাকা লাগে না,খুটার জোর থাকলে, চাপার জোর থাকলে আর একখান ব্রিফকেস থাকলেই টাকা। মাগীও চান্স লইতাছে, জুয়ান মাইয়া ভিড়াইয়া দিয়া আখের গুছাইতাছে, জুয়ান বয়সের রক্তের গরম, পাঠা হালার পুতে তো বুঝে না মাগী অরে জোকের মতন চুইস্যা লইব!

মনোতোষের ছেলে এসে মনোতোষকে উদ্ধার করে ঃবাবা , মায় ডাকে।

মনোতোষ এমন দ্রুত উঠে পড়ে যে নিজেই একটু আড়ষ্ট হয়ে যায়, কি জানি নিশিকান্ত অন্যের কাছে আবার বলে কিনা, আরে মন্তোষ মাস্টার যতোই রাজনীতি করুক আর যাই করুক বউয়ের কাছে ভ্যাড়া , ওইদিন এক কাণ্ড....

কিন্তু নিশিকান্তর চোখ মুখে কোন সুক্ষ্ম শ্লেষের আভা দেখা গেল না।

ঘরে ঢুকতেই জয়া বলে ওই লোকের লগে কিয়ের অত আলাপ... মনোতোষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
বিরক্ত হয়, ক্যান কি হইছে?
–হইব আবার কি, হ্যারা মুখে যতোই মিষ্টি কথা কউক মনভরা হিংসা, আমাগো সংসার ছোট,আমাগো কামাই বেশী...
মনোতোষের মাথায় এখন অন্য চিন্তা, সে বলে, দুর বাদ দাও তো ওইসব কথা। এক বাড়ীতে এতগুলো ভাড়াইট্টা, নানান রকম মানুষ, তাগো নানান রকম মন–মনোতোষ কথাটাকে ঝেড়ে ফেলে দিতে চায়। নিশিকান্তর কথায় মনে মনে যত বিরক্তই হোক তখন, কথাগুলো তার মাথার ভেতর ভালো মতোই জায়গা করেছে,হ্যাঁ দেখে বইকি ছেলেটাকে, মনোতোষকে দেখা হলে দাদা দাদা বলে ,কিন্তু....আচ্ছা জয়াও কি ব্যাপারটা জানে? না জানুক অনুমানও কি করেনি, মেয়ে মানুষের চোখে তো এগুলো আগে পড়ে! এক সময় মনে হয়, বাড়ীর সবাই ব্যাপারটা জানে, কিন্তু কেউ মুখ খোলে না, এমনকি নিশিদা যেমন তার সঙ্গে আলাপ করলো, নিজেদের মধ্যে এমন করে কেউ আলাপও করে না, কি জানি কে আবার শত্রুতা করে বাড়ীউলির কাছে লাগায়, শেষে ঘর ছাড়তেই হয় নাকি!
এ বাড়ীতে কালীনাথবাবু আছে, হারাধনবাবু আছে, নৃপেন বাবু আছে, বাসুদেব আছে। মনোতোষের সঙ্গে আলাপ হয় বলতে নিশিকান্তর সঙ্গে, আর সে ঘরে থাকেও বড় কম সময়, থাকলেও সকলের সঙ্গে ঠিক আলাপ করা যায়ও না; কিন্তু জয়া কি সত্যি জানে না? তা না হলে কথাটা সে তাকে বলে নি কেন?
স্নান করতে এসে নিজের ওপর নিজেই রাগে, জয়ার ডাকের সঙ্গে সঙ্গে চলে আসাটা ভুল হয়েছে। নিশিকান্তর কাছেও সে ছোট হল, আবার জয়াও না বুঝে ডাঁট নেবে মনে মনে,এখনই নিয়ে বসে আছে, না হলে নিশিকান্তর সঙ্গে গল্প করার জন্যে কেমন ভঙ্গিতে, প্রায় কৈফিয়ত তলবের মতো জিজ্ঞেস করলো!
মনোতোষের গা হাত ঘষার গতি দ্রুত হয়। জয়া আজকাল বহুত বাড়াবাড়ি শুরু করেছে।
–মনতোষদা আপনাগো স্কুলে অখন ছুটি চলতাছে, না?
কালীনাথের ছেলে সুকুমার এসে দাঁড়িয়েছে।
মনোতোষ তার দিকে একবার তাকিয়ে আবার গা ঘষতে ঘষতে গম্ভীর হয়ে বলে, হ। ক্যান ?
পেছনে ওল্টানো ঈষৎ ঢেউ খেলানো ঘাড় পর্যন্ত নেমে আসা চুল, ১৮/১৯ বছরের শক্ত শরীর, সিগারেট টানা কালচে ঠোঁট, চোখ মুখে কৈশোরের বিলীয়মান কমনীয়তার জায়গায় বালি বালি কাঠিন্য আসি আসি করছে, সুকুমার তার দাঁড়ানোর ভঙ্গি, কথা বলার ধরনের মধ্যে তাকে যেনো প্রতিপদে পথ করে দিচ্ছে। কে বলবে একে কালীনাথের ছেলে!
কালীনাথ চাকরী করে চিন্তাহরণ মেডিকেল স্টোরে। আজ তিরিশ বছর কেটে গেলো, ২৫ বছর বয়সে ঢুকেছিল এখন চুল দাড়ি পেকেছে, চামড়া কুচঁকেছে, গাল মুখ ভেঙেছে, কপাল চওড়া করে টাক পড়েছে, স্বভাব বদলায়নি মানুষটার। বাড়ী থেকে মাথা হেঁট করে এই যে বেরুলো আর তোলবার নামটি নেই। একেবারে সোজা এসে দোকানে। খদ্দের এসে হয়তো বললেঃ'ল্যারগ্যাকটিল সিরাপ' আছে? যদি থাকে কোন কথা না বলে আলমারী থেকে ফাইলটি বার করে এনে কাউন্টারের ওপর রাখে। যদি না থাকে বলবে 'নাই'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
'নাই' শব্দটি শুধু একটি ধ্বনি, চোখে মুখে কালীনাথের কোন অভিব্যক্তি ফোটে না। খদ্দের যদি বলে ঃ কোথায় পাব বলতে পারেন?
কালীনাথ এবার আর মুখে বলবে না, মাথাটি খুব সংক্ষিপ্ত নাড়িয়ে জানিয়ে দেবে সে জানে না।
সুকুমার মনোতোষের গাম্ভীর্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে জিজ্ঞেস করে: কবে খুলবো?
–ক্যান?
–আমার এক বন্ধুর ভাইরে ভর্তি করন লাগবো।
'ভর্তি করন লাগবো'–কথার ধরন কি! মনোতোষ আর একবার সুকুমারের দিকে তাকায়, সুকুমারের চোখের পাতা একটু নড়ে উঠলো, সে কি মনোতোষের চাউনিতে? হাসে সুকুমার, খুব কইরা ধরছে, আমি কইছি মন্‌তোষদা যখন আছে করন যাইব। সুকুমার মনোতোষের দিকে চেয়েই থাকে। গায়ে জল ঢালতে ঢালতে মনোতোষ শীতল হয়ঃ কিন্তু অহন তো মিড্‌ল অব দা ইয়ার...
–প্লিজ মন্‌তোষদা, আমার প্রেস্টিজ... এমুন কতো হইতাছে,আপনি চেষ্টা করলেই হইব। আমি জানি স্কুলে আপনার অনেক হোল্ড।
মনোতোষ হাসে মনে মনে, 'হোল্ড'। বেশ ভালোই বলেছে সুকুমার । আবার জল ঢালে: আইচ্ছা স্কুল খুলুক,তারপর দেখি। কোন ক্লাশ?
–ক্লাশ এইট; দেখি না, ভর্তি করনই লাগবো, আমি কথা দিছি !
–আমারে না জিজ্ঞেস কইরা এমন আর কাউরে কথা দিও না।
–আপনি রাগ করলেন?
–না, রাগ না,তুমি ছেলে মানুষ,বোঝ না সব, আইচ্ছা যাও। সুকুমার চলে যায়। মনোতোষ আরো কয়েক মগ জল ঢেলে স্নান শেষ করে।
মনোতোষের এক কামরা ঘর–কালীনাথ, নৃপেন, হারাধন,বাসুদেব, নিশিকান্ত সবারই তাই। তাই তবু মনোতোষের ঘরে শোকেস, ড্রেসিং টেবিল, খাট, খানতিনেক প্লাষ্টিকবোনা লোহার চেয়ার, একধারে একটা ছোট কাঠের টেবিল, চেয়ার টেবিলের ওপর জয়ার হাতের সূচিকর্ম করা শাদা কাপড়ের আচ্ছাদন, ছোট্ট ঘর, কিন্তু জয়ার সাজানোর গুণে বেশ মানিয়ে গেছে।
জয়া বলে, মাগো কেমনে থাকে সব, বাড়ীর মালিক নিবারণ বাবু, কি সুনন্দরাই বা কেমনে থাকে, আসবাবপত্রের তো বালাই নাই, মানুষের বসতে দেওনের একখান ভাল চেয়ার ও নাই।
শুনেছে একাত্তর সালে সব লুট হয়েছে। তা লুট হয়েছে বলেই কোনদিন আর করতে হবে না? খান দুই চেয়ারও কি কেনা যায় না ? আসলে স্বভাব।
জয়ার এখন স্বপ্ন একটা ষ্টিলের আলমারি এবং একখানা টেলিভিশন। তা আর হওয়ার জো আছে, স্বামীরে খাইয়া ননদ বিধবা হইয়া বাপের বাড়ী ফিরছে একপাল পোলাপান নিয়া, ঢাকা শহরে থাইকা ভাই লাখ লাখ টাকা কামাই করতাছে, ভাই টাকা পাঠাও কাপড় ছিড়া গেছে,দুইখান মাত্র কাপড়, শাড়ী পাঠাও, শুধু কি তাই, নিজের পোলা মাইয়ারে দিয়া মামার কাছে এইটার আবদার ওইটার আবদার কইরা চিঠি লেখায়। না দিলেই হাজারো দোষ, আর তার জন্যে দায়ী করবে জয়াকে।
আর ভাইটিও হইছে তেমনি, বোইন চিঠি লিখছে, যেমুন কইরা পারুক

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
বোইনের ফরমাশ পূরন করন চাই, এমুন মানুষের নিজের কিছু হইতে পারে!
এতেই মানুষের কতো চোখ টাটায়। কি আর করেছে মনোতোষ, খাটটা বিয়ের সময় জয়ার বাপের বাড়ী থেকে যৌতুক হিসাবে পেয়েছে, করার মধ্যে ডেসিং টেবিল আর শোকেস, এই তো! তা-ও কি হতো, জয়া কতো কায়দা করে, দু'টাকা পাঁচ টাকা জমিয়ে জমিয়ে করেছে, নাইলে ঘরের খাইয়া পরের মোইষ তাড়াইনা ওই মানুষের পক্ষে এইসব করন, হুঁ:।
মনোতোষ গম্ভীর মুখে খেয়ে যাচ্ছে, অন্যদিন খাবার সময় ছেলে-মেয়েদের পাতে এটা ওটা তুলে দেয়, এ নিয়ে জয়া কতদিন রাগ করেছে, আজ খাচ্ছে মনোতোষ ঠিকই কিন্তু মন তার খাবার দিকে নেই, খেতে খেতে নানান কথা বলে, আজ কোনদিকে তাকাচ্ছে না মোটে। ব্যাপারটা কি? পাখার বাতাস করতে করতে জয়া জিজ্ঞেস করে, কি হইছে?
মনোতোষ কোন জবাব দেয় না। মনোতোষের বুকে, কপালে, নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম। একটা ফ্যান কেনার কথা জয়া যে কতোদিন বলেছে; এই ছোট্ট একখানা ঘর, বাচ্চা দুইটা গরমে কষ্ট পায়; নিজে তো সারাদিন স্কুলে ফ্যানের নীচে থাকে। রাতে বাড়ী ফিরে ভোঁষ ভোঁষ করে ঘুমায়, পাখার বাতাস করতে করতে জয়ার হাত ব্যথা হয়ে যায়,তা মনোতোষ এ মাস না ও মাস করে আজ দু'বছর পার করে দিলো। আর জয়ার আজকাল গরম যেন বেশী লাগে। সবাই বলে জয়া মোটা হচ্ছে। তার নিজেরও মনে হয়, গরম কি সেই জন্যেই লাগে! সে যা হোক, ঘরে তো ফ্যান এমনিতেই একটা থাকা দরকার। কিন্তু মনোতোষের আজ হলোটা কি? জয়ার ছেলেমেয়ে দুটো আর আর বাচ্চাদের মতো কোন জ্বালাতন করে না, আজ বাবার ভাবগতিক দেখে চুপচাপ খেয়ে উঠে পড়লো। জয়া মনোতোষকে ভাত তুলে দিতে গেলে বাসনের ওপর হাত আগলে বাধা দেয় সে।
কি হইল তোমার ? ভালো লাগে না!
কি হইবো, কিছু না।
কিছু না তো এমুন কইরা রইছ ক্যান?
কি কইরা রইছি?
মাছের তরকারী পাতে তুলে দিতে দিতে জয়া বলে, কি কইরা রইছ নিজেই চিন্তা কইরা দ্যাহ।
তরকারী দিতে আর বাধা দেয় না। না, জয়াকে এখন চান্স দিলে চলবে না। জয়া হয়তো তাহলে খাওয়া-দাওয়া করবে না , মনোতোষ চলে গেলেও সে বিছানায় মুখ গুঁজে পড়ে থাকবে, সামান্য কারণে বাচ্চা দুটোকে ধরে পিটবে।
সারা দুপুর জয়ার সঙ্গে তার কথা হয়নি, বিকেলে টিউশনিতে গিয়ে রাত সাড়ে নটার দিকে ফিরেছে, ছেলেমেয়ে দু'টি আজ আগে আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে, মেয়েটা বিশেষ করে 'বাবার লগে খামু' বলে মনোতোষের না আসা পর্যন্ত জেগে থাকে অনেকদিন। ঘুমে চোখ বুজে এলেও ঘুমোয় না, মনোতোষ এই জন্যে মনে মনে ভারী পীড়া বোধ করে। আজ দুপুরে ছেলেমেয়েরা তার সঙ্গে খেতে বসেছিলো, কিন্তু আর দিনের মতো বাবার কাছে তেমন ব্যবহার পায়নি বলেই হোক কি মায়ের মেজাজ দেখেই হোক, সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়েছে দুজনে। বাইরে গিয়ে মনোতোষের ভেতরটা খচখচ করেছে।
আমারবই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ঘরে ফিরলে জয়া ভাত বেড়ে দিয়েছে, নিজে খেয়েছে, কিন্তু কোন কথা হয়নি, খাওয়া দাওয়া শেষ করে মনোতোষ বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে খানিক সিগারেট টানে, নিবারণবাবুর ছোট ছেলে সুখেন হারাধনের ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে, ছেলেটা বারদুই এস,এস,সি পরীক্ষায় ফেল করে এখন ইসলামপুরে এক কাপড়ের দোকানে চাকরী করে, বড় ছেলে ধীরেন চাকরী করে মিউনিসিপ্যালিটিতে, নিবারণ বাবু ঢাকেশ্বরী কটন মিলের হেড অফিসে চাকরী করতেন, এখন আছেন হরিসভা নিয়ে।

নিশিকান্তর কাশির শব্দের মধ্যে তার স্ত্রী হৈমবতীর ঝাঁঝালো স্বরঃ পড়নের সুম তোমার যত বায়না,.... নিশিকান্তর ছেলেমেয়েদের পড়ার স্বর বাড়ে।

নৃপেনবাবুর ঘর তালা দেওয়া। স্ত্রী পুত্র নিয়ে দেশের বাড়ীতে গেছে আজ ক'দিন ধরে। এই এক লোক, তড়বড় করে কথা বলে, জজকোর্টের কেরানী, মনে হয় দিনরাতই তার কোর্ট খোলা আছে এবং তার অপেক্ষায় জজ বসে আছে, কেসের রায় দিতে পারছে না।

–ওই দাদা, হাবিব ভাই না দিয়া গেল কাইল রাইতে?

সুনন্দার বড় ভাই অসিতের সমর্থন ঠিক শোনা গেল না। সুনন্দার কণ্ঠস্বর শোনা গেল অখন দ্যাখ আলা, বিশ্বাস ওইলো? জগা না দাদা, বিশ্বাস করে না!

অসিত ছেলেটা বিকম পাশ করে বসে আছে, ছুট ছাট দু'একটা টিউশনি বোধ হয় করে,মনোতোষকে খুব করে বলেছিলো তার স্কুলে ঢুকিয়ে দিতে। না, মনোতোষদের স্কুলে তেমন সুযোগ নেই। কথাটা হয়তো বিশ্বাস করেনি, কি রাগই করেছে বোধ হয়

অসিতের মা জয়াকে বলেছিলো, লোটুর বাপের লগে কতো লোকের জানাশুনা, নিজের স্কুলে না হউক অন্য কোনখানে তো পারে! জয়া বলেছিলো: আপনার দেওরের পোলা তো মিউনিসিপ্যালিটিতে কাম করে, হ্যায় পারে না জ্যাঠতুতো ভাইয়ের চাকরী দিতে!

–অগো কথা আর কি কমু, কইলে নিজে গো গায়েই পড়ে, অসিতের বাবা গত হওনের পর কম কষ্ট গেছে , একদিন জিগায় নাই পর্যন্ত, কেমনে খাই, কি করি! প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাটা তুইলা দেওনের কথা কম কইছি। উত্তুবুত্তু কইরা পাশ কাটাইছে, গরমেন্টের ঘর থেইকা টাকা তোলন যেই–সেই কথা! অসিত তখন কতটুক, কি–ই বা বুদ্ধি। আমি শ্যাষম্যাশ কইলাম, কাউরে লাগবো না, তুই আমারে নিয়া চল কই কই যাইতে ওইবো, ক্ষেত্রমোহন সাহার নাতি বউরে যদি তার নাতির প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা তুলতে অফিসে অফিসে দৌড়াইতে হয় তাতে যা গো মাথা হেঁট হওনের হইব, আমার কি! আমি নিজে গিয়া অনেক দেন দরবার কইরা হেই টাকা তুলছি। এক বছর পর আইলো একাত্তরের গন্ডোগোল, একলগেই কইলকাতা গেলাম, পোলা মাইয়া লইয়া কি কষ্টে গেছি হেই কাহিনী... যাউকগা গেলাম, কইলকাতা, হ্যারা উঠলো আমার সাইজা দেওরের বাসায়, আমরা উঠলাম আমার ভাইয়ের বাসায়, ভালোই আছিলাম, ভাই সাইদ্য মতো কম করে নাই! বুঝই তো কইলকাতা শহরের মইদ্যে থাকন, তার উপরে এতগুলা মানুষ গিয়া পড়া, কি কমু, তুমি আমার পেটের মাইয়ার মতই, তোমারে কইতে আর কি, ভাবলাম কি জানি এই মরার হাঙ্গামা কবে মিটবো কে কইবো, ভাই হউক আর যা–ই হউক, এক মাস দুই মাস, তারপর,

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
মানুষের মন, তার উপর তারও বউ পোলা মাইয়ার সংসার , নিজের মান নিজেই ঠিক রাখি, কইতে লজ্জা কি, এক পোলা রেশন দোকানে মেমো কাটার কামে ঢুকলো, এক পোলা শিয়ালদার মোড়ে ফেরি করছে।
দেশ স্বাধীন হওয়ার পর নিবারণরা দেশে ফিরতে গড়িমসি করে, কি ব্যাপার? না, ভেতরে ভেতরে এর মধ্যে তারা অন্য মতলব করেছে,ঢাকার বাড়ী বেচে ওখানে বিজনেস করবে।
–আমি ডরায়া গেলাম, এ সবই সাইজা দেওরের পরামর্শ, মাথার মইদ্যে যত কুমতলব, তেমনি চাপাবাজ, তোমারে এমুন বুজাইবো, এমুন কইরা ভিজাইবো যে কি কমু, তুমি কইবা এমুন দরদী মানুষ আর নাই, কিন্তু বিশ্বাস করলা কি মরলা। তা মা আমি ডরাইলাম, কুন ফাঁকে গোপনে কি কইরা ফালায়, শ্যাষে কি পোলা মাইয়া নিয়া পথে ভাসুম, ভাইও কইলো, 'না–দিদি, ব্যাপার সুবিধার না।' চইলা আইলাম, আইস্যা দেখি বাড়ী ঘর খাঁ খাঁ করতাছে। বিহারীরা বাড়ী দখল কইরা আছিল, যাওনের সময় পিছাখানও থুইয়া যায় নাই। শীতের সময় তখন, কী যে কষ্ট গেছে! মাইজার উপরে কাগজ বিছায়া রাইত কাটাইছি, রিলিফের কয়খান কম্বল–এতোগুলা মানুষ, বিছামু না গায়ে দিমু! এই এতো বড় বাড়ীখানায় এই পোলাপান লইয়া থাকন! কিন্তু যার কেউ নাই তার ভগবান আছে, ওই হাবিব , চিনি না শুনি না, ওই সময় যা করছে,নিজের পেটের পোলাও তা করে না। ও–ই পরামর্শ দিলো, নিচের তলা ভাড়া দেন। বসত বাড়ী কোন দিন ভাড়া দেই নাই, নিচের তলার এতোগুলা কামরা এমনেই পইড়া রইছে। দিলাম ভাড়া।
এপ্রিল মাসের দিকে নিবারণরা ফিরলো। –ক্যান যে মত পরিবর্তন করলো, না কি অন্য কোন মতলব আছে তখনও জানি না। আইস্যা তো চেইত্যা আগুন। বসত বাড়ীতে ভাড়াটিয়া বহাইছে। কে পারমিশন দিছে? আরো কত কথা।
মনোতোষ সিগারেট শেষ করে ঘরে ঢোকে।
জয়া শুয়ে আছে চুপচাপ। মনোতোষ এখন কি করবে ভেবে পায় না। অবস্থাটা সৃষ্টি করেছে যদিও মনোতোষ, কিন্তু তাই বলে জয়া তার এমন সুযোগ নেবে!
মনোতোষ এই অবস্থাটা কাটানোর জন্যে যতবার জয়ার ভালো দিকগুলো ভাবতে চাইলো, তার মধ্যে এমনকি আজ রান্নার কথাও ভাবলো, সে যেভাবে যে তরকারিটা খেতে ভালবাসে জয়া তেমনি করে চমৎকার রান্না করেছে, সে গম্ভীর হয়ে থাকা সত্ত্বেও জয়ার যত্নের কোন ত্রুটি হয়নি, এমনকি জয়া যে ভঙ্গিতে শুয়ে আছে তার মধ্যে একটা অসহায়ত্বের ভাব ফুটে উঠেছে– একথাও ভাবলো, কিন্তু মনোতোষের মন এমনই গোঁয়ার যে, এসবকে দু' হাতে সরিয়ে দিয়ে শুধু ঘাড় বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে,এমন একটা কথা জয়া তাকে না বলে থাকতে পারলো! তার ওপরে জয়া কি রকম শক্ত মেয়ে দেখো, কেমন নিঃশব্দে পড়ে আছে, একটু অভিমান করে কাঁদতে ও কি নেই! অন্য সময় হলে তো খুব ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করা যায়,আর মনোতোষের এই সঙ্কটে কেমন নির্বিকার পড়ে আছে! মনতোষ তবু আশায় কান পাতে,–না, কিসের কান্না! কাঁদছে তো না–ই, জয়া ঘুমোচ্ছেও না, আর এর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ার প্রশ্নই ওঠে না, পড়ে আছে চুপচাপ,মনোতোষের ওপর ডাঁট মেরে পড়ে আছে। ছি, নিশিকান্ত কী যে ভাবলো! এবার মনোতোষের রাগটা চনচন করে বাড়তে থাকে, পোলাপান গো যে ঠিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
মতো শোয়াইবো, তা নাই, বুঝবো না সুঝবো না, খালি আছে দেমাক। জগৎ সংসারের দিকে খেয়াল নাই, হয়ে আছে তার মেজাজ নিয়া।
মেজাজ আজ দুপুর থেকে মনোতোষই করে আছে, কিন্তু জয়া সে বিষয়ে কোন কিছু না বলে পাশ ফিরতে ফিরতে বিড়বিড় করে: জগতের সমস্ত ভার তো একজনই নিছে...
জয়া মনোতোষের রাজনীতি করার প্রতি কটাক্ষ করছে।
দিন কয়েক আগে এক বিকেলে জয়া কালীনাথের স্ত্রী গিরিবালাকে বলছিলো: কি কমু মাসীমা, কি যে পায় রাজনীতির মইদ্যে, আমার ভালো লাগে না, পোলাপান বয়সে করছে করছে, অহন কি? থাকি হ্যাগো দ্যাশে, হ্যাকেগো মাথা গরম, কুনসুম কি অয় কওন যায় ? আমরা ওইলাম গিয়া হিন্দু মানুষ, আমাগো অতো মাথা ব্যথা ক্যান? হ্যাগো দ্যাশ হ্যারা যেম্নে মনে লয় চালাউক গা, তোমার অতো রাজনীতির আউস ক্যান?
কুয়োতলা থেকে সর্বানী জবাব দেয়: পুরুষ মাইনষের কত রকমের আউস থাকে,তাই ধরলে কি আর চলে?
সর্বানীর মুখে 'পুরুষ মাইন্ষের কতো রকমের আউস থাকে' কথাটায় জয়ার কোথা যেনো ঘা খেলো।-কোথায় বাসুদেব, আড়তে বলতে গেলে কুলিগিরি করে, একটা অশিক্ষিত মাতাল, যার সংসারে ঠিক মতো হাঁড়ি চড়ে না, যে বৌ পেটায়, তার সঙ্গে যেনো সর্বানী মনোতোষকে একই পাল্লায় তুলে দিচ্ছে। জয়ার ভেতরটা রি,রি,করে ।
-হ, আউস তো অনেক রকমের, কেউ মদ গাঞ্জা খায়, জুয়া খেলে, বাজে পাড়ায় যায়, হেইটাও আউস আর কেউ রাজনীতি করে হেইটাও আউস; কি কন মাসীমা, দুইটা কি এক ওইলো?
-'কী' ! -সর্বানী সটান দাঁড়িয়ে পড়ে, তার আঁটসাঁট শরীরটা ফণা-তোলা সাপের মতো দুলতে থাকে; আমার স্বামী মদ গাঞ্জা খায় নিজে কামাই কইরা খায়, জুয়া খেলে, তাতে কার কি-হাত নেড়ে দু'চোখে আগুন নিয়ে সর্বানী চিৎকার করে বাতাস কাটতে থাকে: আমার স্বামী বাজে পাড়ায় যায়? ক্যান কারুর আত ধইরা কুনদিন টান দিছে, না কাউরে নিয়া...
-'চুপ করো।' গিরিবালা ধমক দিয়ে সর্বানীকে মাঝপথে থামিয়ে দিতে চায়। একটানা কথা বলে হাঁফ ধরে গিয়েছিলো, ছোট্ট করে শ্বাস টেনে সর্বানী আবার শুরু করে: না চুপ করুম ক্যান, বিচার করেন, কি খারাপ কথাটা কইছি আমি, হ্যায় আমার স্বামীর কথা কইবো? আমার স্বামী নি তারে নিয়া কুনদিন...
-আহ্ চুপ করো না, তোমার স্বামীর নাম নিয়া তো কয় নাই।
-ওই সব আমরা বুজি....
জয়া তেতো কথার খোঁচা যেমন দিতে পারে, ঝগড়া ততোটা গুছিয়ে করতে পারে না। তার জড়িয়ে জড়িয়ে যাওয়া কথা সর্বানীর চড়া গলার আওয়াজের নীচে চাপা পড়ে যেতে থাকে। এর মধ্যেই সে খুব একটা জুৎসই কথা বলে সর্বানীকে কাবু করতে পারে অবশ্য, কিন্তু সামনে গিরিবালা, তা ছাড়া বলে পরে সর্বানীকেই সামলাতে পারবে বলেও ভরসা পায় না।
ব্যাপারটা হলো, সুকুমার দিন পনেরো আগে রাতের বেলা,বাসুদেব তখন ফেরেনি, জয়া নিজের চোখে দেখেছে, সর্বানীকে সাপটে ধরে চুমু খাচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
মনোতোষের মুখে বেশ খানিকটা তেতো উঠে আসে: হ, জগৎ–সংসারের না হয় ভার নিছি, তাই বইলা ঘরের স্ত্রী কথা গোপন করবো এমন তো ভাবি নাই!
–কি–ই–ই কথা গোপন করছি ? চমকে গিয়ে জয়া সম্পূর্ণ উঠে বসে। স্বামীর এমন কথায় যে কোন স্ত্রীর–ই বুকের ভেতর রক্ত ছলকে উঠবে। জয়া হতভম্বের মতো স্বামীর দিকে তাকায়। জয়ার এমন ভাষাতীত দৃষ্টি মনোতোষ কোনদিন দেখে নি, সে একটু থমকায়,কিন্তু সোজাসুজিই বলে, কি গোপন করছো তুমি ভালো কইরাই জানো। জয়া খাট থেকে মেঝেতে নেমে স্বামীর মুখোমুখি দাঁড়ায়। দরজা খোলা,তার বেশবাস স্খলিত, কিন্তু জয়ার সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই, সে মনোতোষের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলে, কি? কি কথা? তোমার আইজ কইতেই ওইবো!
মনোতোষ এতটা ভাবেনি, সে খানিকটা ঘাবড়েই যায় ; কিন্তু মানুষ ভয় পেলে, ঘাবড়ে গেলে এক সময় যেমন মরিয়া হয়ে যায়, তেমনি ভাবে বলে, ক্যান হাবিব–সুনন্দার ব্যাপারটা তুমি গোপন করো নাই।
–মানে? –জয়ার চোখে মুখে বিস্ময় ফোটে। তবে তার বুকের ভেতর যেখানে দম আটকে ছিলো সেখানে হাওয়া ঢুকে তাকে হালকা করে দিতে থাকে।
ক্যান, হাবিব–সুনন্দা কি হইছে?
তুমিই জানো!
আমি আবার কি জানুম, বিপদের দিন হ্যায় উপকার করছে, হ্যার লগে হ্যাগো খাতির, আসে যায়, এই পর্যন্ত, আমি গোপনটা করলাম কি?
মনোতোষ কি বলবে! ইতিমধ্যেই ব্যাপারটা তার কাছে হাস্যকর মনে হতে শুরু করেছে, কেমন যেন লজ্জাই লাগছে তার, কি ছেলেমানুষী। এই ব্যাপারটা নিয়ে সে আজ দুপুর থেকে জয়ার ওপর রাগ করে আছে! জয়া সত্যিই কিছু জানে না, জানলে নিশ্চই বলতো; সুকুমারের সঙ্গে বাসুদেবের বউয়ের ব্যাপারটা তো জয়াই তাকে বলেছিল, তাছাড়া নিশিকান্তর ঘর থেকে যেমন দোতলাটা সম্পূর্ণ নজরে আসে, তার দিক থেকে শুধু নিবারণবাবুর সাইডটা দেখা যায়।
নিশিকান্তর সঙ্গে গল্পগুজব করে ফেরার পর থেকেই মানুষটা বিগড়ে আছে আজ সারাদিন, এখন বলছে, হাবিব–সুনন্দার কথা গোপন করেছে সে ! ঘাটের মড়া ওই নিশিকান্ত, বাড়ীতে থাকলে কি দিন কি রাত জানলা খুলে শকুনের মতো বসে বসে এ বাড়ীর মেয়েদের দিকে ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে থাকবে আর খকর খকর কাশবে। মাগীটাও তেমনি, হেসে হেসে কথা বলবে, এর ঘরে ওর ঘরে গল্পগুজব, একেবারে পেটের ভেতর ঢুকে যাবে তারপর স্বামীর সঙ্গে গুজুর গুজুর। আর স্বামীখানও !
মনোতোষ হাসে, তুমি কোন কামের না। বাড়ীতে থাকো, কোনদিকে দেখো না। খালি আছো আমার লগে ঝগড়া করতে। লও হইছে, তোমারে একটু চ্যাতাইলাম।
জয়া অভিমানে ঘাড় গোঁজ করতে থাকে। মনোতোষ কানের কাছে মুখ নিয়ে মৃদুস্বরে বলে, কনে বউ মুখ তোল!
থার্ড পিরিয়ডে নোটিশ পেয়ে মনোতোষের মেজাজটাই গেল খারাপ হয়ে, হেড মাস্টার ছুটির পর টিচারদের নিয়ে জরুরী মিটিং করবে। রাজাকার ব্যাটা মিটিং দেওয়ার আর সময় পেলো না।আজ বিকেল পাঁচটায় তার পার্টি অফিসে মিটিং।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

মনে মনে প্ল্যান করেছে সিক্সথ পিরিয়ডে সে ছুটি নিয়ে চলে যাবে, এখন এলো জরুরী মিটিংয়ের নোটিশ।

কি জরুরী মিটিং কে জানে,–এসিস্ট্যান্ট হেড মাস্টার লুৎফর রহমান সাহেব পার্টি না করলেও তাদের পার্টির সিমপ্যাথাইজার। পার্টি মিটিং–এর কথা বললে ছুটি পাওয়া যাবে। কিন্তু হেড মাস্টার মিটিং ডেকেছে, লুৎফর রহমান সাহেব ও ছুটি দিতে ইতস্তত: করবে, তার সঙ্গে আবার হেড মাস্টারের আদায় কাঁচকলা সম্পর্ক। ছুটি দিলে হেড মাস্টার তাকে ধরবে, আমি জরুরী মিটিং কল করেছি, আপনি আমাকে না জানিয়ে কি করে ছুটি দিলেন। সিক্সথ পিরিয়ডে মনোতোষের কোন ক্লাশ নেই, ফার্ষ্ট পিরিয়ডে লুৎফর রহমান সাহেবকে বলে রেখেছিলো, সিক্সথ পিরিয়ডে আমাকে কোন এক্সট্রা ক্লাশ দেবেন না,একটু কাজ আছে। লুৎফর রহমান সাহেব তার দিকে তাকিয়ে হেসেছিলেন। অর্থাৎ বুঝছি। মনোতোষও হেসেছিলো। আর এখন এই নোটিশ!

সুকুমারের বন্ধুর ভাইকে ভর্তি করতে হবে, সুকুমার বলেছে, আমি জানি: স্কুলে আপনার অনেক হোল্ড। মনোতোষের হাসি পেলো। হোল্ড। সুকুমার বেশ ভালোই বলেছে।

বছরের মাঝামাঝি স্কুলে ভর্তি করাটা নিয়ম নয়, অবশ্য অনিয়ম যে হয় না তা নয়, বেসরকারী স্কুলগুলোতে হরহামেশাই হচ্ছে, মনোতোষের স্কুলেও হয়, কিন্তু মনোতোষের ক্যান্ডিডেট যেহেতু সেহেতু ব্যাপারটা আলাদা, কেননা মনোতোষ আদর্শবাদী রাজনীতি করে, সেই মনোতোষ এমন একটা বেআইনী কাজ নিয়ে এসেছে! হেড মাস্টার তার দিকে সরাসরি তাকিয়ে হাসবে। মুখে কিছু না বলুক, ওই হাসিটাই মনোতোষকে ভেতরে ভেতরে কুঁকড়ে দেবে।না, মনোতোষকে ফেরাবে না হেড মাস্টার, সে ভদ্রতাটুকু দেখাবে। বরং অতি আগ্রহের সঙ্গেই করবে। কেননা এটা একটা উদাহরণ হয়ে থাকবে, মনোতেষের মুখ বন্ধ করার জন্যে এ এক পরম সুযোগ। তার ওপর আছে সেই অর্থপূর্ণ হাসি। আহ্ আর কি চাই!

মনোতোষের কান ঝাঁ ঝাঁ করে। সে সময়ই সুকুমারকে বলে দিলেই হতো,না, এ কাজ তার দ্বারা সম্ভব নয়। তা না করে মনোতোষ বললো,আচ্ছা স্কুল খুলুক। একটা ছেলে কাজ আদায় করার জন্যে একটু তোষামোদ করে বললো,স্কুলে আপনার অনেক হোল্ড! আর সে ফুলে গিয়ে রাজী হয়ে কথা দিয়ে ফেললো! এখন যদি সে সুকুমারকে বলে,না, করা যাবে না। সুকুমার বিশ্বাস করবে না, কারণ এমন যে ভর্তি হচ্ছে, তা কে না জানে, সুকুমারও সে কথা বলেছে,এমুন কতো হইতাছে। রাজী হয়ে এখন 'না' বললে সুকুমার ভাববে মনোতোষদা টাকা খাওয়ার জন্যে

মনোতোষের মাথা ঝিম ঝিম করে । না, সুকুমারের পক্ষে এ কথা ভাবা বিচিত্র নয়। সামান্য একটু বাহাদুরির লোভে কি বিশ্রী অবস্থায় পড়েছে মনোতোষ। না, লজ্জা শরমের মাথা খেয়েও সুকুমারের ক্যান্ডিডেটকে ভর্তি করাতেই হবে।

কিন্তু আজ ছুটির ব্যাপারটা কি করবে? হেড মাস্টারের কাছে যেতে হবে। ইস্, এমুন দুর্গতিতেও পড়ে মানুষ!

সন্ধ্যা থেকে সুকুমার প্রতীক্ষা করছে। যে করেই হোক আলাপটা আজ করতেই হবে। গতকাল রাতে শুয়ে শুয়ে সে নানাভাবে চিন্তা করেছে, আজ সারাটা দিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ভেবেছে, এখন তো রীতিমতো ঘামছে, তা ছাড়া রেষ্টুরেন্টটাও বেশ গরম। কোন জানালা নেই। সামনে সাটার ওলা দরজা, রেষ্টুরেন্ট ঘরের গায়েই লাগানো কীচেন, মাথার ওপর ফ্যান ঘুরলেই বা কি, জানালাহীন ঘরের গরম, মানুষজনের শরীরের গরম, কীচেনের চুলোর গরম, সবগুলো গরম এক সঙ্গে নিয়ে ফ্যান ঘুরলে সেই গরমই ঘোরে। তার ভেতরেই মানুষ চপ-কাটলেট,মোগলাই পরোটা, চা খাচ্ছে, কথা বলছে, বয়-বেয়ারাদের ডাকছে,তারাও হাঁক ডাক দিচ্ছে-কখনও কীচেনে কখনো ম্যানেজারকে।

-দুর, গরম লাগতাছে, চল বাইরে যাই। শাজাহানের কথায় সুকুমার উত্তর দেয় না। শম্ভু বলে,হ,চল্।

-কই যাবি?

-তগো গেটের সামনে দাঁড়াই গিয়া, যে গরম!

গেটের সামনে থেকে অবশ্য রেষ্টুরেন্ট দেখা যায়। নান্টুভাই রিক্সা থেইকা নামলে দ্যাহা যাইব। কিন্তু শাজাহান, শম্ভু যে জুইট্যা গেল,অহন কেমনহইবো? এই দুইটা থেইকা অহন কাটন যায় কেমনে? নান্টু ভাইয়ের লগে আইজ আলাপ করতেই হইবো, যা থাকে কপালে!

গেন্ডারিয়া, সুত্রাপুর, ফরাশগঞ্জ, সিংটোলা, বাঙলাবাজার এলাকা জুড়ে নান্টুর এখন দারুণ প্রতাপ। সঙ্গে রিভলভার থাকে সব সময়। নান্টুকে সুকুমারের এখন ভীষণ প্রয়োজন। দিন কতক আগে নান্টু সুকুমারকে জিজ্ঞেস করেছিলো, হাবিব তোমাগো বাড়ীতে খুব যায়; না?

সুকুমারের প্রায় অভিভূত হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা । হ, যায়,ক্যান নান্টু ভাই ? অসিতদা গো লগে হ্যার বহুৎ খাতির । হাবিব ভাই হ্যাগো বিশখান রেশন কার্ড কইরা দিছে । ক্যান কিছু কইতে...

-না,থাউক।

নান্টু চলে যায়। সুকুমার তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে ভাবেঃ কিছু একটা হইছে, লাগবো অহন! লাগবো না? যশোর না পাবনা কৈ থেইকা আইয়া ঢাকা শহরে মাতব্বরি করবো,নান্টু ভাই ছাইড়া দিবো? নান্টু ভাই ঢাকার পোলা। হউক না বিক্রমপুর। বিক্রমপুর তো ঢাকার মইদ্যেই। আর টাউনে হ্যাগো বাড়ী,আর তুমি হালার পুতে কই খ্যাতের থন আয়া হালায় বহুৎ রংবাজী করতাছো! হালার পুতের লেইগা অসিতদার মায় বহুৎ দাপট দেহায়, দুইদিন ভাড়া দিতে দেরী হইলে যা তা কয়।

শাল কাঠের বিশাল গেট, গেটের দু'পাশে উঁচু সান বাঁধানো বেদীর মতো বসার জায়গা। সুকুমার, শাহাজান এবং শম্ভু সেখানে এসে বসে। একটা রিকসা এসে থামে। সুনন্দা এবং তার মা নেমে তাদের দিকে দেখলো কি দেখলো না গেট দিয়ে সোজা চলে গেল।

খানিকক্ষণ তিনজনই চুপচাপ থাকে। টুং টাং করতে করতে দু'তিনটে রিকসা চলে গেল, গোঁ গোঁ শব্দে স্কুটার ছুটে এসে মোড়ের মাথায় মিলিয়ে গেল। লাইটপোষ্টের মিটমিটে বাল্বের ময়লা আলোর ভেতর দূর থেকে হঠাৎ চিৎকার শোনা গেল, হায় হায় রে, হায় হায়,আমার কি...

-কি হইছে, ও মিয়া, কি হইছে? চলমান লোকজন দাঁড়িয়ে যায়।

চেক লুঙ্গি, শাদা ফুলশার্ট পরা বছর চল্লিশেক বয়সের একটি লোক হাউমাউ

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

করে ওঠে, আমার সব শ্যাষ কইরা দিছে ভাই....
–আরে মিয়া কি হইছে কইবেন তো?
লোকটিকে ঘিরে মানুষ জড়ো হয়ে যায়। সুকুমাররা বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছে, শম্ভু 'চল' বলে নিজেই এগিয়ে যেতে গেলে শাজাহান বলে, আরে থো বুঝছি। শম্ভু থমকে তাদের দিকে তাকায়, ছিনতাই?
শাজাহান বলে: আর কি!
এ বাড়ীর জানালা ও বাড়ীর দোতলা বারান্দা থেকে মানুষজন বলে, কয়জন আছিল ?
–কয়জন দিয়া কি করবেন ! ব্যাটার টাকা গেছে এইটাই বড় কথা, বক্তা আর এক জনের কাছে সমর্থন চায়, কি কন?
–পাতলা খান লেনের মোড়টা খুবই খারাপ জায়গা, রেগুলার...
–খালি পাতলা খান লেন? হারা শহর, হারা বাঙলাদ্যাশ ভইরা খালি এই কাম চলতাছে , কারে কি কইবেন, যান গা ভাই, টাকা গেছে,জানে যে মারে নাই আল্লার কাছে হাজার শোকর। আক্রান্ত লোকটির স্খলিত কণ্ঠস্বর শোনা যায়,বুকে পিস্তল তো ঠেকাইছিলোই....
–ওই তো কইলাম, টাকার উপরে দিয়া গেছে। যান গা, কি করবেন, হালাগো উপরে আল্লার গজব পড়বো।
–আর গজব! গজব তো পড়লো অহন এই মানুষটার উপরে । পাঁচ শ টাকা,ঘড়ি...
লোকজন চলে যেতে যেতে বলে,..তবু ভাই,আল্লার মাইর দুনিয়ার বাইর। টাকা–ঘড়ি খোয়ানো লোকটা কোন সান্ত্বনা পেলো কি না বোঝা গেলো না, সে নীরবে তাদের কয়েকজনের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলে শাহাজান বলে, কামটা ভালই, ক্যাপিটাল লাগে না, লস হওনের ভয় নাই, রাস্তার মোড়ে বুক ফুলায়ে খাড়ালেই টাকা! এই যে পাঁচ শ টাকা, একখানা ঘড়ি, কতক্ষণ লাগছে, ম্যাক্সিমাম দুই মিনিট, কি তারো কম, হাজার টাকার কাম হয়া গেলো! বাহ্! আয় চল্, আমরাও হালায় শুরু কইরা দেই। শাহাজান হাসে।
নান্টুর কথা মনে হয় হঠাৎ সুকুমারের।
নান্টু পেটের কাছে প্যান্টের ভেতর রিভলভার গুঁজে রাখে, কারণে অকারণে আড়মোড়া ভাঙে সকলের সামনে, এমন ভঙ্গিতে ওপরের দিকে হাত তুলে শরীর মোচড়ায় যাতে করে তার কলারওলা বিদেশী গেঞ্জী কোমর বরাবর পেটের কাছে থেকে ওপরে উঠে গিয়ে রিভলভারের বাঁটটিকে দেখানো যায়। প্রথম দিন রাতে নিরিবিলি রেস্তোরাঁয় দেখে সুকুমার ভয় পেয়েছিলো, যত না ভয় পেয়েছিলো নান্টু কে, তার চেয়ে বেশী ভয় পেয়েছিলো নান্টুর ওইভাবে প্রকাশ্যে অস্ত্র দেখানোতে। পুলিশ যদি ধরে? সুকুমার এবং তার সঙ্গীরা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসেছিলো। কি জানি কি ঝামেলায় পড়ে যায়!
নান্টু এটাই চায়, অন্যকে ভয় দেখিয়ে তার সুখ। আর সুকুমার কি না তার জন্যে অপেক্ষা করছে তাকে খোশামোদ করে যদি কিছু সুবিধে [illegible] যায়, নিদেনপক্ষে ক'টা অতিরিক্ত রেশন কার্ড!
চিন্তাটা এসেছে গতকাল রাতে শুয়ে শুয়ে।
রাতের বেলা খেতে বসে থালাটাকে সামনে ঠে[illegible]দি[illegible] সুকুমার গর্জন করে

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
উঠেছিলো: এই দিয়া খাওন যায়?
হারিকেনের আলোয় তার ঘাড় পর্যন্ত নেমে আসা কোঁকড়ানো চুলভরা মাথার বিশাল ছায়া মেঝের ওপর ভল্লুকের মতো নড়ে।
–ই হি রে নবাব পুত্তুর, খাওন যায় না! লজ্জা করে না কথা কইতে! একখান ফুটা পয়সার মুরাদ নাই, আবার বর বর কথা,'এই দিয়া খাওন যায়?' মুখ বিকৃত করে মাথা দুলিয়ে গিরিবালা ভারী কুৎসিত একখানা ভঙ্গি করে । খাইতে তরে কয় কে? যা না যে বন্ধু গো লগে রাইত দিন আড্ডা দিয়া বেরাস্ হ্যাগো কাছে যা গিয়া, রাইত দুফরে অহন আইছস মুখ নারতে! এত বড় জুয়ানগাবুর একখান, একটু চিন্তা করে, একটু যদি ভাবে!
থালাটা একটানে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে বেরিয়ে গেলে ঠিকঠাক মানানসই কাজটা হয় এখন। কিন্তু সুকুমার ওঠে না, ধারালো চোখ-মুখ, টানটান ঘাড় নিয়ে ম্যাচ-ম্যাচ করে ভাত মাখতে থাকে মাথা নিচু করে। দেখলে মনে হয় সে ভাত মাখছে না আটা ছানছে।
বোইনটা বড় ওইতাছে, তার বিয়া দিতে ওইবো, ছোট ছোট ভাই-বোইনগুলোর মানুষ করতে ওইবো, এতো বড় পোলা হেই চিন্তা নাই...
সুকুমার মুখ তোলে, তার মুখ থমথমে: করুমটা কি? চাকরী আমার লেইগ্যা বহায়া থুইছে সব! ক্যান, বাবা...
গিরিবালা কথাটা চিলের মতো ছোঁ মেরে ধরে: ওই মেচি বিলাই তরে চাকরী দিবো? কথা কইতে জানে মাইনষের লগে? ভগোবান অর মুখ দিছে? হ্যায় আছে সব কয়টারে চিতায় তুইল্যা দিয়া পিন্ডি দেওনের অপিক্ষায়, হ্যায় তরে দিবো চাকরী ঠিক কইর‍্যা!
গিরিবালার তোপের মুখ কালীনাথের দিকে ঘুরে যায়: হারাজনম আমারে জ্বালাইয়া কয়লা করছে। হ্যায় কি একটা মানুষ ? পুরুষ মানুষ এমুন অয়? বাপ-দাদার ভিটাখান রক্ষা করতে পারলো না, একদিন গিয়া খাড়াইলে না পর্যন্ত! অহন মোসলমানেরা ভোগ করতাছে!
কালীনাথ সরু তক্তপোষটায় শুয়ে ছিলো চুপচাপ। এই লোকটার ওপর ভয়ানক রাগ ধরে সুকুমারের, বিশেষ করে তার এই চুপচাপ নির্বিকার আচরণে-অসহ্য লাগে তার। কিন্তু সুকুমার জেনে গেছে মানুষটিকে বলে কোন লাভ নেই তার বড়ো মারা হয়!
রাতে তার ঘুম আসে না। এলোমেলোভাবে একথা সেকথা ভাবতে ভাবতে নান্টুর কথা মনে পড়ে। হাবিবকে জগারা দখল করে রেখেছে, তাকে বলে লাভ নেই। জগার মাটাও কেমুন, মা যেমুন তেমুন-অসিতদাটা ! ডিগ্রি পাস করছস, মুখ বুইজ্যা থাকস কেমনে?
গেট ছেড়ে সিগারেট কেনার জন্যে কাশেমের দোকানের দিকে যেতে যেতে শাজাহান বলে, হাবিব মিয়া খুব চালাইতাছে, না রে সুকুমার? সুনন্দারে দেখলি শম্ভু, কেমুন...
–বাদ দে, সুকুমার বিরক্তি প্রকাশ করে।
শম্ভু কোন কথা বলে না, মুখ দেখে তার মনোভাব ঠিক মতো বোঝা যায় না। শাজাহান চুপ করে যায়, কি জানি,এ হ্যালাগো ঠিক বোঝন যায় না। মালাউন হালারা ভিত্‌রে ভিত্‌রে সব এক। ঠেকাইতে তো পারবি না, কইলেই গোয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
জ্বলে!
শাজাহানের মেজাজটাই যায় খারাপ হয়ে। বলে, না যাইগা, ভাল লাগতাছে না। শম্ভু-সুকুমারকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই হন হন করে চলে যায় সে। শম্ভু দু'পা এগিয়ে হাত তুলে তাকে ডাকতে গেলে সুকুমার বাধা দেয়,যাউক গা। শম্ভু থমকে যায় বটে তবু ভেতরে ভেতরে তার খারাপ লাগে, হাজার হোক ছেলে-বেলার বন্ধু , তার সঙ্গে এমন ব্যবহারটা না করলেই হতো। এসব সুকুমারের বাড়াবাড়ি।
সিগারেট টানতে টানতে শম্ভু বলে,কামটা খুব খারাপ ওইলো সুকুমার। শাজাহান আমাগো বন্ধু মানুষ।
সুকুমার কোন কথা বলে না। সে দেখে নান্টু পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে তার সেই বিশেষ মুঠো পাকানো ভঙ্গিতে সিগারেট টানতে টানতে রিক্সায় চড়ে আসছে। সুকুমার মনে মনে বলে, হালা হাইজ্যাকার!
হৈমবতীর খুব একটা ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু নিশিকান্তকে কি দিয়ে ঠেকাবে! হাঁপানি রুগী অথচ একদিন অন্তর তার চাই-ই চাই। সংসার করতে গেলে মানুষের কতো রকম অবস্থা হয়, কখনো রাগারাগি,কথা কাটাকাটি,কথা বন্ধ,এমনকি রাগ এবং অভিমান নিয়ে হৈমবতী অনেকদিন রাতে খায়নি পর্যন্ত, কিন্তু নিশিকান্ত-মুখে কথা নেই, অথচ হৈমবতীর দিকে হাত বাড়াবেই। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা-নিশিকান্তর নিয়মের ব্যতিক্রম নেই।
১৪/১৫ বছরের সংসার তাদের,এতোগুলো ছেলেমেয়ে হয়ে গেছে, কিন্তু হৈমবতী এমন একটা দিন মনে করতে পারে না নিশিকান্ত তাকে ছাড়া রাত কাটিয়েছে। আত্মীয় স্বজন দূরের কথা, বাপের বাড়ীতে হৈমবতীর বোধ হয় বার চারেকের বেশী যাওয়া পড়েনি এবং প্রত্যেকবার যথারীতি নিশিকান্তও সঙ্গে। সেবার নারুর বিয়েতে যা কান্ড-ভাবলে এখনও হৈমবতী লজ্জায় মরে। বিয়ে বাড়ীতে লোকজনের ভিড়, কাজেই নিজের ঘরের মতো সব হবে এতো আশা করা যায় না। দিনের বেলা যেমন তেমন রাতে শোবার ব্যবস্থা মানেই পুরুষদের আলাদা মেয়েদের আলাদা-সে কী কেলেঙ্কারী! রাত দুপুরে চোরের মত রান্না ঘরে...রাগে অপমানে ঘেন্নায় হৈমবতীর চোখে জল এসেছিল। পরদিনই জোর করে সকলের অনুরোধ ঠেলে নিশিকান্ত চলে এসেছিল সবাইকে নিয়ে।
না, স্ত্রৈণ নয় সে, মেজাজখানা ভগবান দিল ষোল আনা, পান থেকে চুন খসুক দেখি, নিশিকান্ত কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দেবে না তাহলে!
সেই নিশিকান্ত এখন পরিতৃপ্ত শিথিল আলস্য-বিলাসে শুয়ে শুয়ে স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করে! হৈমবতীর ঘুম আসছিলো, কিন্তু নিশিকান্তর কথায় সে প্রায় উঠে বসে পড়ে আর কি: কি কও তুমি ? মনতোষ ঠাকুরপো জমি কিনছে!
এমনিতেই হৈমবতীর চোখ বড় বড়, লাইট জ্বালানো থাকলে দেখা যেতো সে চোখ গোরুর চোখ হয়ে গেছে, কও কি তুমি!
-'আরে হ', নিশিকান্তর স্বর শান্ত বিজ্ঞের মতো শোনায়, তার সঙ্গে এবার খানিকটা শ্লেষ মেশায়: কিনছে মানে, চাইর কাঠা জমি কিনছে দৈইন্যায়। বিজনেস, বুঝছো,মহাজনেরা যেমুন চাইল ডাইল মজুত কইরা বাজারে দাম বাড়ায়,সুযোগ বুইজ্যা চড়া দামে মাল বেচে এ-হেমুন,জাগা জমিনের দাম বাড়তাছে, সস্তায় কিন্যা থুইলো, থাউক না পইরা কয় বছর,এতো আলু পটল না

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
যে পইচা যাইব, এ্যারে কয় জমি,জগতের লক্ষ্মী–মানুষের হাতে অহন জলের স্রোতের মতন পয়সা আইতাছে, দুই/চাইর বছর পর ওই জমি মনতোষ আট গুণ দামে বেচবো–বুজলা অহন, সমাজতন্ত্র কারে কয় হুঁ:!

হৈমবতী শুয়ে শুয়ে নিজের গালে হাত ঠেকিয়ে বলে, মাগ্‌গো মা, কি হুনাইলা তুমি, মাগী খালি গলা হুগায়! হেইদিনকা হাইস তামাশা কইরা কইছিলাম, তোমার চিন্তা কি, তোমার ছোট পরিবার সুখী পরিবার, তাইতে মাগীর কি গোস্‌সা, মুখ্‌ খান কালা কইরা কইলো, 'হ, বাইর থেইকা মানুষে ওইটাই দ্যাহে।' হৈমবতী বিকৃত উচ্চারণে জয়ার সংলাপটি শোনায় নিশিকান্তকে। মাগীর গাও ভরা হিংসা, বিধবা ননদেরে মাসে ছয় মাসে ৫০–১০০টা টাকা দিতে অয় তাইতেই বুক ফাটে, আর এদিকে জমি রাখে!

এই পর্যন্ত বলে হৈমবতী চুপ করে থাকে খানিকক্ষণ, তারপর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বলে, হ:, হগগলজনেরই হগলটা ওইবো, আমার কপালে যে আইঠ্যা কলা হেই আইঠ্যা কলা–ই! কী যে কপাল দিয়া ভগবান পাঠাইছিলো আমারে!

নিশিকান্তর সমস্ত শরীর প্রখর রোদে ঘামাচির মতো চিড়চিড় করে ওঠে: বেশী ফ্যাচ ফ্যাচ কইরো না, আমি কইলাম কি কথা আর হ্যায় কয় কি কথা! হালার মাইয়া মানুষ জাতটাই খারাপ, মাথার চুল থেইকা পায়ের চারি পর্যন্ত হিংসায় ভরা।

হৈমবতী চুপ করে যায়, কিন্তু তার মনে এই সংলাপটি রচিত হয়: নিজের মুরাদ নাই হেই কথা কইবো না , যতো দোষ মাইয়া মানুষের!

কিন্তু এ কথা বললে আর উপায় আছে! অথচ হৈমবতীর পক্ষে নিশিকান্তর অমন গাও জ্বালাইন্না কথা সহ্য করাও শক্ত,কাজেই সে সংলাপটিকে সংক্ষিপ্ত করে: হ, যতো দোষ মাইয়া মাইনষের।

কিন্তু এতে ধার তো কমেই না, বরং প্রচ্ছন্নতার ফলে তীক্ষ্ণতা আরো বাড়ে, আর তা ছাড়া 'কপাল', 'আইঠ্যা কলা' ইত্যাদি বলে হৈমবতী আগেই কেস খারাপ করে রেখেছে, কাজেই নিশিকান্ত সমস্ত পৌরুষ নিয়ে হুংকার দেয়: চো–ও–প!

তার গর্জনে ছেলেমেয়েদের ঘুম ভেঙে যায় কারো কারো,দু'একজন মিট মিট করে তাকায়, নিশিকান্ত বা হৈমবতী কারো কোন আর সাড়াশব্দ না পেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে আবার।

বাঙলা ছাড়া পোষায় না বাসুদেবের। কি মানুষে কয় রাম, জিন, ভ্যাট না চ্যাট–এইগুলো কি মদ ওইলো, মাল খাইলে খাও বাঙলা, যেইখানে দিয়া যাইব জানায়া দিয়া যাইব। তা না, বরফ দাও,লেবু দাও, যেমুন হালায় শরবত খাইতাছে, তার উপরে আছে মাংস, কাবাব আরো কতো কি!

না, বাসুদেবের ওসব নেই, দুইটা ঝাল বড়া কি এক মুঠ বুট ওইলেই যথেষ্ট, বাসুদেব বোতল থেকে নিয়ে ঢক ঢক করে ঢেলে দেবে গলায়, চোখ মুখ কোঁচকাবে না, হেঁচকি তুলবে না, আর মালে যদি ভেজাল থাকে বাসুদেব বোতলের মুখ শুঁকেই বলে দিতে পারবে, এই নিয়ে নরহরির সঙ্গে কতোদিন রাগারাগি হয়েছে।

আজ তার মেজাজ ভালোই ছিলো,আড়তের হাত সাপ্লাইয়ে বেশ ক'টাকা এসেছে আজ, কোথায় একটু ফুর্তিটুর্তি করবে বাসুদেব। দিলো মেজাজটা বিগড়ে। আর হালার পুতেরে নরহরি চুৎমারানি লাই দিয়া দিয়া মাথায় তুলছে, দুইদিনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
পোলা, হালায়, যেদিনই মাল খাইতে আইবো–ওইদিনই কারুর লগে না কারুর লগে বাজাইবো। এ দিকে আধা আউন্স পেটে পড়লেই আউট। কিয়ের আউট! একটা দেহায় আর কি! এই সুযোগে ভংচং করন যায়।
জমে শামসু মিয়া এলে। বয়েস হয়েছে কিন্তু রসে টুইটুম্বুর। নরহরির সঙ্গে ছেলেবেলায় ঝুলনবাড়ির অটল পন্ডিতের পাঠশালায় পড়াশুনা করেছে।
ঢুকেই হাঁক দেয়, ল্যাওড়াহরিবাবু আছো নাকি? নরহরি গজগজ করতে থাকে। কিন্তু কি বলবে, একে তো ছেলেবেলার বন্ধু , তার ওপর গাহাক। নরহরি বলে, তর আর কান্ডজ্ঞান ওইবো না শামসু, বুড়ো ওইলি, অখনও তর....ছি ছি,পোলাপানের সামনে....
লম্বা লোহাপেটা শরীর শামসু মিয়ার। চেক লুঙ্গি, হাফ শার্ট, হাতে সিগারেট, মাছের পিত্তর মতো গাঢ় রঙের চোখ–এইমাত্র নয়াবাজারের ম্যাথর পট্টি গুলজার করে পুরোনো দোস্তের আখড়ায় এসেছে, নরহরির ভুঁড়িতে তর্জনীর খোঁচা দিয়ে বলে, আমরা হইলাম ঢাকার রইস, পুরানা দোস্ত তুমি, তোমারে অনার কইরা কইলাম 'বাবু' আর তুমি গেলা চেইতা,..পোলাপান? আরে মালের মাইফিলে বাপে বাপ থাকে না,পোলায় পোলা থাকে না, সব এক গেলাসের ইয়ার। লও, মাল আন।
আসরের লোকজন হৈ হৈ করে ওঠে, বহেন শামসু ভাই বহেন, সবাই তাকে জায়গা করে দেয়। ছেলের বয়সী ছেলে–ছোকরারা তাকে অবলীলায় 'ভাই' বলে সম্বোধন করে।
এতোক্ষণ নরহরির ছেলে মন্টু সার্ভ করছিলো, শামসু মিয়ার গলা পেয়েই সরে গেছে । গম্ভীর মুখে নরহরি বোতল এবং গ্লাস এনে মেঝের ওপর রাখে। এই গ্লাসটি বিশেষ করে শামসু মিয়ার জন্যে, নরহরি কাউকে দেয় না, খদ্দের যদি বেশী হয়,যদি গ্লাসে টান পড়ে,শামসু মিয়া যদি এক মাসেও না আসে তবু এ গ্লাস তাকে তোলা থাকবে
–তর গেলাস কই?
–না, তুই খা।
–এইটা একটা কথা হইলো, তোমার হাবেলিতে মেহমান আইলাম, তুমি খাইবা না, মেহমান একলা খাইবো, এইটা তোমারো অপমান আমারো অপমান। কি কন আপনারা ? অন্যায় কইলাম?
উপস্থিত সকলের দিকে তাকিয়ে শামসু মিয়া প্রশ্নটা করে মাথা ঝাঁকিয়ে।
সবাই ততক্ষণে মজা পেয়ে গেছে । তারা সমস্বরে বলে, ঠিক, ঠিক, খাঁটি কথা।
একজন আবার বলে, ঠিকই তো শামসু ভাইতো খালি গাহাক না আমগো মতন, আপনার ছোটকালের বন্ধু।
শামসু মিয়া তারিফের ভঙ্গিতে বলে, বাহ্, লা–জবাব। তারপর নরহরির দিকে তাকিয়ে যাত্রার ঢঙে বলে, বন্ধু নরহরি, গেলাসখান লোয়া আহ্ জনতার রায়, তুমি আমি নিমিত্ত মাত্র!
সবাই হো হো করে হেসে ওঠে । বিপর্যস্ত নরহরিকে গ্লাস আনতে হয় অগত্যা
একেকদিন শামসু মিয়া চুর হয়ে খুব মেজাজ দিয়ে অনুচ্চস্বরে গান ধরে:
ও মা তর ছোকরা জামাই, দেয় না কামাই
প্যাট ফাইটা যায় মুতেতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
মা গো আমি আর পারি না বাটনা বাটিতে।
সমস্ত আসর জুড়ে হাসির হুল্লোড় পড়ে যায়।
কিন্তু আজ শামসু মিয়া আসেনি, এসেছিলো সেই মাস্তান ছামরারা। এরা এলে সাধারণত একসঙ্গে কয়েকজন আসে। নরহরি এদের আলাদা একটা কুঠরিতে বসায়। তবু এই হারামজাদারা একটা ঝামেলা বাধাবেই, হঠাৎ করে আজ বাসুদেবদের কামরায় ঢুকে পড়ে। তারপর গালাগালি, এর পকেটে হাত, ওর ঘড়ি ধরে টানাটানি।
মন্টু টানাটানি করে, আরে কি করেন, ওই ঘরে যান।
–ক্যান, ওই ঘরে যামু ? এই ঘরে খামু।
–আচ্ছা খান, কিন্তু এইসব কি?
–চোপ হালা মালাউন, তর বাপের কি?
হৈ চৈ শুনে নরহরি দৌড়ে আসে, কি অইছে? আরে আপনেরা ? আহেন, আমার লগে আহেন।
ছেলের উদ্দেশে বলে, মানুষ চিনস না, এনারা কি এইখানে বইতে পারে।
যে ছোকরাটি বেশী হৈ চৈ করছিলো, যে মন্টু কে 'মালাউন' বলে গাল দিলো, রোগা, পাতলা, কুবলাই খাঁর মতো ঝোলানো গোঁফ, ষ্টাইপের গেঞ্জি পরা সেই তরুণটির কাঁধে নরহরি হাত রাখে, 'আহেন বাবু'
শাখাঁরী বাজারের দম–চাপা গলিতে হাঁটতে হাঁটতে বাসুদেব দেখে দু'পাশের উঁচু দুর্গের মতো বাড়ীগুলো বাচ্চাদের নামতা পড়ার মতো সামনে পেছনে দোল খাচ্ছে। দ্যাখো, কান্ড দ্যাখো, পুরোনো ইট, জোড়–মুখের রস–কস সব শুকিয়ে ঝুরঝুরে হয়ে আছে, অতো দুল্লে অহনই ভাইঙ্গা পড়বো না! সব হালায় মাল টানছে, সামনে পিচনে পুরা শাঁখারী বাজার মালে চুর! একাত্তর সনে টিক্কা খানের কথা মনে নাই? গুলি চালায়া, ভাইঙ্গা, আগুন দিয়া শ্যাষ করছিলো, মনে নাই? তবু হালার পুতে গো গোয়ার রস কমে না,আঁ? অহনও মাল টাইন্যা বুইড়া খাটাস হালার পুতেরা রাইতে দুফরে রংবাজি করতাছ? অহন নতুন রংবাজ জালাইছে, টিক্কা খান নতুন রংবাজ পয়দা কইরা দিয়া গেছে, তাগো জমা খরচ দিয়া চলতে ওইবো। এতো আউস কিয়ের, আঁ?
শঙ্খের কারবার তো লাটে উঠছে। ভাঙ্গা লুট হওয়া বাড়ীর কোনা কাঞ্চি থেইকা টোকায়া পাঁচখান কড়ি, দুজোড়া বালা, দুই পেকেট শঙ্খ গুড়া লইয়া খোচা খোচা দাড়ি ভরা শুকনা মুখে বইস্যা থাকন, রাস্তার কলের জল নিয়া মাথা ফাটাফাটি–এই তো! তাইলে আর এত রংবাজি ক্যান?
শাঁখারী বাজারের সদা চলমান ভিড়, পানের দোকানের ঝুলন্ত তারের মাথায় ফ্লুরেসেন্ট বাল্বের আলো, ড্রেন এবং ড্রেনের পাশে জমে থাকা ভিজে আবর্জনা, সাজের দোকানের ঝকঝকে জরির পোষাক, মুখোশ, টিনের ঢাল–তলোয়ার, পরচুলা পেছনে রেখে, বাদ্যযন্ত্রের দোকানের হারমোনিয়ামের ভাঙা ভাঙা আওয়াজ পেছনে রেখে, নরহরির মদ পেটে নিয়ে বাসুদেব চিত্তরঞ্জন এভিন্যুর সামনে এসে টাল খেয়ে সোজা হয়ে যায় হঠাৎ, একটা পুলিশের জিপ ধীর গতিতে গির্জার দিকে চলে যাচ্ছে।
না, হৈমবতী কাঁদে না, কেঁদে কি হবে! যথেষ্ট হয়েছে, এখন ভগবান তাকে তুলে নিলেই শান্তি! কিন্তু তাতেই কি শান্তি পাবে হৈমবতী? পেটে যে শত্রুগুলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ধরেছে, নিশিকান্তর দেওয়া এই শত্রুগুলোর জন্যেই তো তার চিন্তা, ওই তো একখান মানুষ, জন্মরুগী, ওই মানুষের কি ভরসা! তখন..?

–আমারে নৃপেন পাইছে? নিশিকান্তর চাপা গলায় উত্তাপ গনগন করে, হালার মাইগ্যা, রাইতে বউ মুততে গেলে পিছে পিছে যায়, বউ মোতে আর ভাউড়া হালারপুতে বউয়ের মাথায় হাত দিয়া খাড়ায়া থাকে, আমারে তেমুন পাইছে...

ব্যাপারটা নিশিকান্ত হৈমবতীর কাছ থেকেই শুনেছিলো, সেই হৈমবতী এখন চুপচাপ পড়ে আছে। সারাদিন সংসারের ঝামেলা, নিশিকান্তর ধকল সব সামলে হৈমবতী এখন একটু ঘুমুতে চায়, সে জায়গা চায় না, জমি চায়না–তার কপালে ভগবান ওসব রাখেনি–হৈমবতী এখন ঘুম চায়!

কিন্তু নিশিকান্তর এই বকর বকর কতক্ষণ চলে এক নিশিকান্ত আর তার ভগবানই জানে। ভগবান, দোহাই লাগে, আর যাই কর পরজন্মে মাইয়া মানুষ কইরা আর পাঠায়ো না!

হরিসভায় আজ দুদিন ধরে নাম সংকীর্তন চলছে । সুনন্দার একদম ইচ্ছা ছিলো না, ওই বুড়ো বুড়িদের ভেতর বসে বসে 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ' শোনা কতোক্ষণ ভালো লাগে! ওতো কাকার মুখে রোজ সকালে শোনে, আর কাকার গলা কতো সুন্দর এখনো,–কিন্তু শেষ পর্যন্ত মার সঙ্গে যেতে হয়েছে সুনন্দাকে। অবশ্য সে না গেলেও মা তাকে জোর করতো না, কিন্তু হাবিব ভাই বললো, সে–ও ভেবে দেখলো ঘরে বসে থেকেই বা কি করবে , যাই ঘুরে আসি।

বাসুদেব দেখলো,সুনন্দা তার মা এবং হাবিব কোথা থেকে যেনো এতো রাতে ফিরছে । তাদের দেখে বাসুদেব চলার গতি মন্থর করে।

রাতে খাওয়ার পর থেকে হারাধনের পেট ব্যথা শুরু হয়েছে, এ ব্যথা ক'দিন চলে কে জানে। সোনার দোকানের কারিগর সে। ডাক্তার তাকে বলেছিলো, ও কাজ না ছাড়লে হারাধনের এ ব্যথা ভালো হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এসিডের গন্ধ, গ্যাস, সব মিলিয়ে হারাধনের এই ব্যথাকে আরো পোক্ত করে দেবে দিনে দিনে একথা হারাধন জানে, হারাধনের স্ত্রী জানে, ইদানীং হারাধনের বড় মেয়ে বড় হয়েছে সে–ও বুঝতে শিখেছে বাপের এই ব্যথা ভালো হবার নয়।

হবার নয়।

কিন্তু কি করবে হারাধন ? তার কোন ছেলে নেই। উপযুক্ত ছেলে থাকলে হারাধন একটা ভরসা করতে পারতো দেশে জায়গা জমি থাকলে হারাধন অন্য কিছু ভাবতে পারতো।

আর হারাধনের বউটি হয়েছে আর এক জিনিস । হারাধন অসুস্থ হলে সে বসে কাঁদতে। ভাবটা এমন–এখনই তার হাতের শাঁখা ভাঙতে হবে, সিথির সিঁদুর মুছে থান পরে হবিষ্য করতে হবে!

ব্যথার মধ্যেও হারাধন ক্ষেপে যায়, আর ক্ষেপে গেলে হারাধনের শ্লীল অশ্লীল জ্ঞান থাকে না, সন্তানদের সামনেই সমানে চালাতে থাকে, কোঁকাতে,কোঁকাতে,হাঁপাতে হাঁপাতে সে মুখে ফ্যানা তুলে ফেলে,এতে সে ব্যথার কোন উপশম না পেলেও ব্যথার বিরুদ্ধে তার নিজস্ব ধরনের লড়াই করতে পারে মনে হয়।

মাকে সরিয়ে দিয়ে বড় মেয়ে স্বপ্না কখনো তেল মালিশ, কখনো কাঁসার বাটিতে

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ঠান্ডা জল পেটের ওপর রেখে বাপকে শান্ত করতে চেষ্টা করে।
ব্যথা যখন ওঠে কোন ওষুধেই কাজ করে না, এক সঙ্গে ৪/৫ খানা সেডাকসন-৫ খাইয়ে তার ঘুম আনা যায় না।
মনোতোষ হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলো, কিন্তু হাসপাতালে ভর্তি হলে হারাধনের সংসার দেখবে কে ?
-আচ্ছা বেশ, এক্সরে করান।
কিন্তু এক্সরেতে যদি এমন কিছু ধরা পড়ে যাতে তাকে অপারেশন করতে হয়! না হারাধন কাটাছেঁড়ার মধ্যে নেই।
এটাই হলো আসল ব্যাপার, হাসপাতালে ভর্তি না হতে চাওয়ার কারণ সংসার নয়, হারাধন জানে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া মানে হাসপাতালের হাতে চলে যাওয়া, সেখানে কোন কথা চলবে না, ডাক্তাররা নির্ঘাৎ এক্সরে করবে,তারপর বলবে এতাবড় এক ঘা হয়ে আছে, অপারেশন করতে হবে, কি তা-ও বলবে না, এক্সরে করে সোজা অপারেশন ঘরে নিয়ে যাবে। তারপর যদি জ্ঞান আর না ফেরে ? না, হারাধনের বড় বাঁচার সখ, যতো কষ্ট পায় পাক তবু সে বাঁচতে চায়, সে জানে অপারেশন হওয়া মানে তার মৃত্যু!
এই ভয়ে সে এখন আর ডাক্তারের কাছেও যায় না, পুরোনো প্রেসক্রিপশনটি যত্ন করে রেখে দিয়েছে। তাছাড়া প্রেসক্রিপশন হারালেও তার কোন অসুবিধে নেই, ওষুধগুলো কোনটা কিসের, কখন কোনটা খেতে হবে হারাধনের সব মুখস্ত।
সিঁড়ির মুখে এসে সুনন্দা বলে ,মা স্বপ্নার বাপের মনে হয় আবার প্যাট-ব্যাথা উঠছে। মেয়ের কথায় নিহারবালা থমকায়। তার পেছনে হাবিব। সিঁড়ির মুখে কোন আলো নেই। অন্ধকারের ভেতর হারাধনের হাড় মাংস নাড়ি-ভুঁড়ি থ্যাতলানো শব্দ মুচড়ে মুচড়ে ওঠে।
নিহারবালা বলে, তরা যা, আমি একটু দেইখ্যা আহি।
কয়েক ধাপ উঠলেই সিঁড়ি বাঁক নিয়েছে, এখান থেকে মোটা দেওয়ালের আড়াল উঠে গেছে দোতলার চওড়া বারান্দার মাথায়। বারান্দার চল্লিশ পাওয়ার বাল্বের মলিন জ্যোৎস্না সিঁড়ির মাথায় এসে পড়েছে।
হাবিব সুনন্দার দু'কাঁধে হাত রেখে তাকে ঘুরিয়ে ধরে নিজের দিকে। সুনন্দা একবার সিঁড়ির গোড়ার দিকে, একবার মাথার দিকে দ্রুত দেখে নিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্যে পেছন দিকে সরে যায়, না, দূর....
হাবিব হাসে । সুনন্দাও হাসে । তারপর তারা ওপরে উঠে যায়।
বাসুদেব সদর দরজা পেরিয়ে অন্ধকার সুড়ঙ্গটায় পৌঁছলে তার মাথা দোল খায়। শরীর গুলিয়ে ওঠে। সে অন্ধকারের মধ্যেই হাত বাড়ায়। দেওয়াল খোঁজে, কিন্তু দেওয়াল তো দু'পাশে এবং দূরে, সামনে শুধু শূন্য ফাঁকা অন্ধকার। সে সেই ফাঁকা শূন্যতার দিকে হাত বাড়ায় , এক পা দু'পা করে এগোয়। তার কি বমি হবে? সে কি এখানেই শুয়ে পড়বে? লও হালায়,এইটা আবার কেমুন হইলো, এতো পথ হাইটা আইসা..কোঁকায় কে? ও, হারাধনদা, আবার বুঝি ব্যথা উঠছে ? ভালো,ব্যথা উঠছে খুব ভালো কথা; মইরা যাও, দেখবা কুনো ব্যথা নাই, কিন্তু অহন না, এই রাইতে কোনখানে বাঁশ,কোনখানে নতুন কাপড়, কলস, মধু,চন্দন কাঠ, ঘি, কড়ি, দা, তার উপ্‌রে আবার কান্ধে কইরা নিয়া চল পোস্তাগোলা। না,এতো, রাইতে এইসব ঝামেলা ভালো লাগবে না, তার চাইতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কাইল দিনের বেলা মইরো , ভাল কইরা দাহ কইরা আমুনে, এমুন কইরা চিতা সাজাইয়া দিমু যেমুন গদিওলা খাটে শুইয়া রইছ, দয়া কর দাদা, অহন মইরো না, অহন বিছানায় গিয়া একখান ঘুম দিমু।

অন্ধকারের ভেতরই হারাধনের উদ্দেশে বাসুদেব হাত জোড় করে,প্লিজ হারাধনদা! ততক্ষণে সে বারান্দার মুখে এসে গেছে। চারপাশ–জোড়া চৌকো বারান্দা এবং ঘরের সারি,নীচু বারান্দার নীচে পাকা উঠোন। উঠোনের এক কোণে কূয়া।

বাসুদেব যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানটায় একটা ঘর হতে পারতো; ওপরে দোতলা, দোতালাকে মাথায় নিয়ে দুটো চওড়া চৌকো থাম দাঁড়িয়ে আছে, এই থামের গা ঘেঁষেই সরু চৌকো বারান্দা সমস্ত উঠোনটাকে বেড় দিয়ে আছে।

বাসুদেব থামের গায়ে হেলান দিযে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হারাধনের গোঙানী এবং নিহারবালার কণ্ঠস্বর শোনে, 'না,না, দুইদিন পর পর...প্যাটের ভিত্‌রের ব্যাথার'..সুকুমার হারাধনের ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে। বাসুদেব নিজেকে থামের আড়ালে লুকোয়। হারাধনের ঘরের পাশেই নৃপেনের ঘর, তার পাশে বাসুদেব থাকে। নৃপেনের ঘর তালা দেওয়া। সবগুলো ঘরের দরজা বন্ধ। বাইরে কোন আলো জ্বলে না, কিন্তু ফাঁকা জায়গা, বিশেষ করে উঠানের ওপরে ফাঁকা আকাশ, কাজেই পরিষ্কার দেখা যায় সুকুমারের ঝাঁকড়া চুল, আঠারো উনিশ বছরের চিতোনো বুক, শক্ত কাঁধ,তলোয়ারের মত দোলায়মান দুই হাত,–সুকুমার উঠোনের ওপর দিয়ে কোণা–কুণি হেঁটে যাচ্ছে।

বাসুদেবের চোখ জ্বালা করে, আচ্ছা তার অনুপস্থিতিতে কি সুকুমার এমনি নির্জন অন্ধকার রাতে বাসুদেবের ঘর থেকে বেরিয়ে কোণা–কুণি উঠোন অতিক্রম করে? বাসুদেব থামের আড়াল থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরের দরজায় গিয়ে টোকা দেয়। কোন সাড়া নেই, আবার টোকা দেয়, এবার আওয়াজ কিঞ্চিৎ জোরে। সর্বানীর সাড়া আসে, কে?

–আমি।

'আমি' শব্দটিকে বাসুদেব এমন এক স্বরে উচ্চারণ করে যেন এই অন্ধকার,এই রাত্রি,এই বাড়ী ঘর, হারাধনের আর্তরব, সুকুমার, সর্বানী–সবাইকে তার সামনে নতজানু করিয়ে দেয়।

বারান্দার ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুকুমার দেখে বাসুদেব ঘরে ঢুকে গেল। সর্বানী দরজা বন্ধ করতে গিয়ে তাকে দেখলো কি? সুকুমারকে সর্বানী না দেখলেও সর্বানীকে দেখেছে সে, স্খলিত আঁচলের একপাশে হলুদ ব্লাউজে ঢাকা স্ফীত স্তনের ওপর হলুদ আলো–চকচক করে ওঠে । সর্বানী দরজা বন্ধ করে।

বাসুদেব মাতাল হয়ে এসেছে। সর্বানী এখন তাকে খেতে দেবে বাসুদেব হাত মুখ ধুয়ে খেতে বসবে। তারপর তারা পাশাপাশি শোবে।

না, সর্বানী বউদির সঙ্গে সুকুমারের কোন গোপন সম্পর্ক নেই। একদিন মাত্র সে সর্বানীকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়েছিলো ওই থামের আড়ালে। সেদিন রাতে সুকুমার বাইরে থেকে ফিরছে, সর্বানী দোতলা থেকে নামছে–হয়তো অসিতদা কি সুখেনদের ঘর থেকে ফিরছিলো–সিঁড়ি থেকে সর্বানীও নেমেছে, সুকুমারও অন্ধকারে বুঝতে না পেরে হোঁচট খেয়ে একেবারে তার ওপরে । 'কে, ঠাকুর পো?' সর্বানীর কণ্ঠস্বরে হাসি। অন্ধকারে তার মুখ দেখা যায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

কিন্তু সর্বানীর শরীরের স্পর্শ, সর্বানীর হাসি–সুকুমারের মাথার ভেতর দপ করে নীল একটা শিখা জ্বলে ওঠে, পলকে সে সর্বানীকে টেনে এনে থামের আড়ালে চেপে ধরে।

বাসুদেব এসবের কিছু জানে না, কোনদিন জানবে না। সর্বানী রোজ বাসুদেবের পাশে শোয়, আজও শোবে। বাসুদেবের বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে সুকুমার থুতু ফেলে, 'বেশ্যা মাগী।'

সকালে ঘুম থেকে উঠে নামগান করতে করতে বারান্দা প্রদক্ষিণ করা কতো কালের অভ্যাস, অথচ আজ সে উত্থানরহিত।

ডাক্তার বলেছে, ব্রেন সম্পূর্ণ পরিস্কার থাকবে, কিন্তু কোনদিন আর উঠা–হাঁটা করতে পারবে না নিবারণ ।

পরের উপ্‌রে নির্ভর কইরা বাইচ্যা থাকোন? এ কোন শাস্তি তারে দিলো ভগবান! লোকে কয়, বিপদে ফালায়া ঠাকুর ভক্তের মন পরীক্ষা করে, কিন্তু ঠাকুর কি নিবারণের মন জানে না? তার নাম না নিয়া কুনদিন জলস্পর্শ করে নাই, আইজ তিন যুগ ধইরা সে প্রতি সকালে নামগান কইরা আইছে, হরিসভার এতো বড় দায়িত্ব কান্ধে নিয়া এই বৃদ্ধ বয়েসেও আহার বিশ্রাম ভুইল্যা পইড়া রইছিলো, তারও পরীক্ষা!

ঘটনাটা ঘটে হরিসভাতেই। বত্রিশ প্রহর চলছিলো। শেষদিন যখন ভক্ত নারী পুরুষ হরিনামে বিভোর হয়ে চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছে, নিবারণ তখনই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়।

আসরের মধ্যে হলে মানুষ মনে করতো নিবারণ 'দশায়' পড়েছে, খানিকক্ষণ পরেই ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু নিবারণ হঠাৎ সটান পড়ে যায় হরিসভার গেটের কাছে দাঁড়িয়ে উমানন্দ'র সঙ্গে আলাপ করতে করতে।

ডাক্তার যতোটা না অবাক হয়েছে বিরক্ত হয়েছে তার চেয়ে বেশী। এ–তো একদিন দুদিনের ব্যাপার নয়, এমন হাই প্রেসার নিয়ে দিনের পর দিন নিবারণ চলা–ফেরা করতো কি ভাবে?

এ–ই হয়, শতকরা ৮০ জন লোকেই বুঝতে পারে না তার প্রেসার আছে, মনে করে শারীরিক দুর্বলতা। এই তো তার ফল! এখন আর কিছু করার নেই, যে ক'দিন বাঁচে বিচানায় পড়ে পড়ে ওষুধ খেতে হবে।

নিবারণ স্ত্রীকে কাছে ডেকে বসায়, আমি তাইলে এক্কেরে বাতিল ওইয়া গেলাম! স্ত্রী তার চিরকালের সোজা সরল মানুষ, স্বামীর ওই সব–হারানো দৃষ্টির দিকে তাকাতে পারে না। হাউ মাউ করে কেঁদে ওঠে

ছেলে এসে মাকে ধমকায়, কান্দনের কি আছে, আঁ, কান্দনের কি আছে? কয়দিন রেস্টে থাকলেই সব ঠিক ওইয়া যাইব গিয়া। ওঠ।

নিবারণের মনে খটকা লাগে, পোলা কি সান্ত্বনা দিতাছে আমারে? বাবা যেমুন ভাইঙ্গা না পড়ে, তারই ছলনা?

কিন্তু এই সন্দেহ ধরে রাখার মতো জোর কোথায় নিবারণের? কাজেই ভাবে, প্রেসার তো আর নতুন জিনিস না, কত লোকের ওইতাছে, তারা হাটা–চলা করতাছে, অফিস আদালত করতাছে; এ আর এমুন কি? সে–ও দু'চার দিন পর উঠে দাঁড়াতে পারবে।

নিবারণ তার ঠাকুরের উদ্দেশে দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম পাঠাতে পারে না,

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চিত হয়ে পড়ে পড়ে ভাঙা গলায় বলে, হরি হে মাধব, তুমিই জানো......
কিন্তু দু'চার দিনের ভেতর নিবারণ বুঝে যায় ব্যাপারটা ফাইনাল।
স্ত্রীকে বলে, বুঝলা মনার মা, (মনা তার প্রথম সন্তানের নাম, বাল্যকালেই মেয়েটি মারা যায় নিউমোনিয়া হয়ে, কিন্তু স্ত্রীকে সে আজো 'মনার মা' বলেই সম্বোধন করে।) অনেক ভাইব্যা দেখলাম, আসলে মরণটাই সত্য।
মনে কষ্ট নিও না, এই যে সংসার আর তার মায়া, এই মায়ার বন্ধনে আটকা পইড়া জীবনটা কাটায়া দিলাম, অখন আমার সামনে মরণ ছাড়া আর কি আছে, কও?
যে এই সংসার-বন্ধন কাটায়া ঠাকুরের খোজে পথে নামে, ঠাকুর তারেই পথ দেখায়, তার জনমই সার্থক জনম।
এই যে আমার দাদা জুয়ান বয়সে গৃহত্যাগ করল, ক্যান কও দেহি?
নিবারণের স্ত্রী অনুচ্চ স্বরে জবাব দেয়, ঠাকুরের টানে।
-হ-অ! কেউ কইছে প্রয়াগের কুম্ভ মেলায় তারে দেখা গেছে, কেউ কইছে কেদার বদরিনাথের পথে লছমনঝোলায় তারে দেখছি।
কী তপ্ত কাঞ্চনের মতন গায়ের রঙ ওইছে, কী মধুর হাসি, চোখ দুইটা সব সময় ভাবে বিভোর.....বলতে বলতে নিবারণের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে, এ্যারাই প্রকৃত মানুষ, সিদ্ধ পুরুষ!
নিবারণ শ্বাস নেবার জন্যে থামে। ফলে তার কান্নার ঢেউ তীরভূমিতে এসেও ফিরে চলে যায়। নিবারণের স্বরে আবার ডাঙা জেগে ওঠে; তুমি একটু আগে যে কইলা, দাদা ঘর ছাড়ছে ঠাকুরের টানে' ওই টানই তোমার গিয়া আসল কথা। সেই টান আমার ভিত্রে নাই দেইখ্যা আমি ঠাকুররেও চাইছিলাম সংসারও চাইছিলাম, ঠাকুর তাই আমারে সংসারের বন্ধনে এমুন আতুর কইরা বাইন্দা দিছে-এখানে এসে নিবারণের ভেতর আবার জোয়ার আসে,'আমার আর মুক্তি নাই, মুক্তি নাই, মুক্তি নাই'.... ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে নিবারণের চোখ মুখ একেবারে লন্ডভন্ড করে দিতে থাকে।
নিবারণের স্ত্রী যেন অবুঝ সন্তানকে থামাচ্ছে এমনভাবে তার বুকে হাত বুলোতে বুলোতে বলে, কাইন্দো না, কাইন্দো না, ঠাকুররে ডাকো!
নারায়ণপুর বাজারে গোবিন্দর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। মনোতোষ দেশে এলে চোখ-মুখ ভরে, সামনের সবগুলো ধবধবে দাঁত বার করে হাসে, দাদা আইছেন!
গোবিন্দ মনোতোষদের বাড়ীতে বহুদিন ধরে আছে। পরের বাড়ীতে কাজ করে এতো ফুর্তি কোথা থেকে যে পায় সে!
কিন্তু আজ তাকে বেশ ম্রিয়মান দেখালো। মনোতোষ এখনও জানে না বাবা কেন তাকে টেলিগ্রাম করেছে, ডমবণ _দটরয !
সারা রাস্তা সে এসেছে ভাবনায় ভাবনায়।
বাস থেকে নেমেই এই বাজার। এখান থেকে খাল বেয়ে মাইল খানেক গেলে, সিদঁলকাঠি, সেখান থেকে মিনিট দশেক হাঁটলেই মনোতোষের গ্রাম-তার বাপের ডিস্পেন্সারী, প্রাইমারী স্কুল, অবিনাশদা'র মুদি[illegible] দোকান: মনু ঢাকা থেইকা ফিরলি? খবর সব ভাল?
-হ দাদা, ভাল। তোমরা কেমুন?
-আর আমরা! আছি আর কি, যা বাড়িত যা, [illegible] গিয়া, পরে আলাপ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
হইবো।
কিন্তু গোবিন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে মনোতোষ থমকে যায়, তার ভ্রূর মাঝখানে ভাঁজ পড়ে, বাড়ীর খবর কি গোবিন্দ?
তার হাত থেকে ব্যাগ নিতে নিতে গোবিন্দ বলে, ভালই, চলেন।
ব্যাপারটা আর কিছু নয়, জমি সংক্রান্ত, জমির ধান দলু মৃধার লোকজন জোর করে কেটে নিয়ে গেছে।
এসব ব্যাপার আগে বাবা নিজেই সামলাতো। এখন একটু এদিক-ওদিক হলেই ছেলেকে খবর দেয়। বয়েস হয়ে যাচ্ছে, শরীরের জোরের সঙ্গে সঙ্গে মনের জোরও কমছে। তাছাড়া উপযুক্ত ছেলেকে না জানিয়ে কোন কাজ করতে, কোন সিদ্ধান্ত নিতে এখন আর মন সরে না মহীতোষের।
মহীতোষ ন্যাশনাল পাশ করা ডাক্তার। যৌবনে কংগ্রেস ওয়ার্কে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছে, বিদেশী কাপড় পুড়িয়েছে, খদ্দর আন্দোলন করেছে, পিকেটিং করতে গিয়ে জেলও খেটেছে বার দুয়েক। কিন্তু ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর বীতশ্রদ্ধ হয়ে রাজনীতি ছেড়ে দেয়।
মনোতোষকে মাঝে মাঝে বলে, ওইসব রাজনীতির খেয়াল বাদ দে, সব মানুষের তরা সমান করতে চাস; আরে এই দ্যাশে মানুষ আছে নাকি! এই সাব-কন্টিনেন্টে মানুষ একটাও নাই, এ্যারা হয় হিন্দু নয়তো মুসলমান, মানুষ কই! মানুষ থাকলে কি দ্যাশ ভাগ হইতে পারতো? আর তরা চাস তাগো সমান করতে । সমাজতন্ত্র করবি! হুঁ:, যত্তোসব পাগলামী।
মামলা মকদ্দমা করা যায় দলু মৃধার বিরুদ্ধে, কিন্তু মনোতোষ থাকে ঢাকায়; এই তো, সে আজ ছ'মাস পরে দেশে এসেছে তিন দিনের ছুটি নিয়ে স্ত্রী ছেলে-মেয়েদের সূত্রাপুরে শ্বশুর বাড়ীতে রেখে। বাবা এখানে একা, তারপর বাবার শরীরের যে অবস্থা হয়েছে এই ক'মাসে, মনোতোষ রীতিমতো অবাক,এর মধ্যে শরীরের এতো পরিবর্তন!
মা বলছিলো, তর বাপে মনে অয় আর বেশী দিন নাই। খালি আগিলা দিনের কথা কয়, খালি পোলাপান বয়সের কথা। ডাক দিলে যদি লগে লগে না যাই মান করে। হ্যায় চায় সবসুম তার সামনে বইসা থাকি।
না, এসব মৃত্যুর পূর্বলক্ষণ কিনা মনোতোষ জানে না, তবে বাবার শরীর যে ভাবে ভেঙেছে তাতে মনে হয় বেশী দিন টিকবে না।
তার ওপর দেশ গ্রামের যা অবস্থা-চুরি ডাকাতি, খুন জখম, জায়গা জমি জবর দখল-মান সম্মান তো দূরের কথা জীবনেরই নিরাপত্তা নেই ।
মনোতোষের আগমন সংবাদ পেয়ে আসমত, রজত, বজলু, নেপাল, সালামরা এসেছিলো গতকাল সন্ধ্যায়,না দাদা,এ্যাগো লগে এক সাথে কাজ করা অসম্ভব, চোর-ধাউর, গুন্ডা-বদমাশগো লগে আর যাই হোউক রাজনীতি করন যায় না, তাতে আমাগো উপরে, পার্টির উপরে যে আস্থা আছিল মানুষের, তা নষ্ট হইতাছে; আপনারা শহরে বইসা নির্দেশ দেন, গ্রামের অবস্থা অন্যরকম, ঢাকায় গিয়া আমাগো কথা কইবেন পার্টিতে ।
শহরে বসে মনোতোষ যে একেবারেই কিছু শোনে নি বা খবর রাখে নি তা নয়, তবু সে পার্টি লাইনের কথাই বলে, কিন্তু অগো বাদ দিলে, অগো বিরোধিতা করলে রাজাকারগো হাত শক্ত হইবো, চক্রান্ত চলতাছে নানাভাবে, আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
এককভাবে কিছু করার শক্তি যখন আমাগো নাই তখন স্বাধীনতার পক্ষের শক্তির লগে...
রজত বলে, বুঝলাম, কিন্তু স্বাধীনতার পর অগো যে রূপ তাতে তো...
রজতের কথার মধ্যেই মনোতোষ বলে, যতটুকু পারা যায়...খুব ট্যাক্‌টফুলি, বুঝলি না, ক্ল্যাশ এড়াইয়া নিজেগো স্বার্থেই... যতটুকু পারা যায়...
মনোতোষ বোঝে রজতরা তার কথায় সন্তুষ্ট হয়নি । কিন্তু সে নিজেও কি এসব কথায় জোর পায়? সে নিজেও ভাবে, পার্টি কি ভুল করছে? কিন্তু এ ছাড়া এ মুহূর্তে উপায়ই বা কি ?
রাতে মনোতোষের ঘুম আসে না। বাবার সঙ্গে আলাপ করতে করতেও রজতদের মুখগুলো ভুলতে পারেনি: 'দলু মৃধা কাগো জোরে কোদে বুঝেন না?'
বুঝবে না কেন, মনোতোষ শহরে থাকে বলে কি বিদেশী হয়ে গেছে ?
দলু মৃধারা কোথায় নেই? গ্রাম শহর সর্বত্রই এদের দাপট। কি বলা যায় এদের? মুৎসুদ্দি, ফড়িয়া, টাউট? না,সরাসরি লুটেরা বলাই সঙ্গত।
এই নব্য লুটেরা শ্রেণীটিই আজ সবকিছুর নিয়ন্তা হয়ে উঠছে। এদের নিয়ে 'দেশ গড়া'ই বলো গণতান্ত্রিক বিপ্লবই বলো আর সমাজতন্ত্রই বলো, কিভাবে সম্ভব? রজতরা সম্ভবত: এ কথাটাই বোঝাতে চায়। কিন্তু পথটা কি? তাদের মতো পোড়-খাওয়া একটি দায়িত্বশীল পার্টি কোন অতিবিপ্লবী হঠকারী লাইন নিতে পারে না, এ-কে তো পার্টির স্টেংথ কম, তার ওপর দেশের যা পরিস্থিতি এই মুহূর্তে হার্ড কোন লাইন নিলে পার্টি ক্ষতিগ্রস্ত তো হবেই, মাঝখানে থেকে রিএ্যাকশনারী ফোর্সের হাত ভারি হবে।
আল্ট্রা-লেফ্‌টরা শ্রেণী সংগ্রামের নামে যা করেছে বা এখনো করছে তা তো প্রতিবিপ্লবী কার্য-কলাপ। জন-বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসবাদ যে ভুল লাইন সে তো পরীক্ষিত সত্য, এই ভুল বুঝতে পারা থেকেই তো একদিন এ দেশে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টিতে যোগ দিয়েছিলো সেই সব ন্যাশনালিস্ট রেভ্যুলিউশনারীরা। আজ সেই সন্ত্রাসবাদের ওপর শ্রেণী সংগ্রামের লেবেল এঁটে তাকে মার্ক্সিট লেনিনিস্ট তত্ত্ব বলে চালালেই হলো!
চল্লিশ দশকের শেষ দিকে রণদিভের 'দালাল হালাল' লাইনও অনেকটা আজকের এদের মতোই ছিলো, সেই ভুল লাইনে গিয়ে পার্টির যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছিলো সেদিন।
না, এতাদিন পর পার্টি প্রকাশ্যে কাজ করার সুযোগ পেয়েছে, যতো প্রভোকেশনই আসুক না কেন ঠান্ডা মাথায় এগোতে হবে। সোজা কথা এই সুযোগ কাজে লাগাতে হবে;এখন প্রধান কাজ পার্টিকে দ্রুত বিল্ড-আপ করা এবং স্বাধীনতার পক্ষের শক্তিকে সহযোগিতার মাধ্যমে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশকে গড়া। হুঁসিয়ার থাকতে হবে পরাজিত শত্রুরা আবার যেনো মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে না পারে।
কাজেই পেটি বুর্জোয়া হোক আর যাই হোক, এরা মুক্তিযুদ্ধ করেছে, রিএ্যাকশনারী ফোর্সকে উৎখাত করেছে--এটাই তাদের বড়ো পরিচয়। এই পোটেনশিয়াল ন্যাশনালিস্ট ফোর্সকে শ্রেণী সংগ্রামের নামে শত্রু শিবিরে ঠেলে দেবার মতো মারাত্মক ভুল শ্রমিক শ্রেণীর সাচ্চা কোন পার্টি করতে পারে না। কেন, বিপ্লবের আগে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ফোর্সের সঙ্গে লেনিন মোর্চা করেনি রাশিয়াতে?
আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ভাবতে ভাবতে মনোতোষ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। হবে, এ দেশেও হবে। বাবা যতো ঠাট্টাই করুক তার রাজনীতি নিয়ে, কিন্তু সব কিছুরই স্তর আছে, এক সময় ধর্ম নিয়ে রাজনীতি হয়েছে, ধর্মের ভিত্তিতে একদিন পাকিস্তান হয়েছিলো, সেই মোহ মানুষের ভেঙ্গেছে, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে তারাই করেছে বাঙলাদেশ। এর পরের স্তরই তো অর্থনৈতিক মুক্তির প্রশ্ন। সেই প্রশ্নের একমাত্র সমাধান সমাজতন্ত্র। সেই লড়াইয়ের মধ্যবর্তী স্তরে আছে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব, তার সহায়ক শক্তি কে? ওই পেটি বুর্জোয়া ফোর্স–যারা রিএ্যাকশনারী ফোর্সকে উৎখাত করে জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিয়েছে। এদের মধ্যেই রয়ে গেছে একটা র‍্যাডিক্যাল ফোর্স, যারা আগামী দিনের লড়াইয়ে শ্রমিক শ্রেণীর পাশে এসে দাঁড়াবে বা নিদেন পক্ষে সেই লড়াইয়ের পথে একটা পর্যায় পর্যন্ত এগিয়ে আসবে। কাজেই তাদেরকে বাদ দিয়ে অতি উৎসাহে এখনই এককভাবে কোন উদ্যোগ নিলে পার্টির পক্ষে তা হবে সুইসাইড্যাল এবং দেশ চলে যাবে রিএ্যাকশনারীদের হাতে।

সকালে বেরিয়ে মনোতোষ দুপুরের রোদে ফিরলো ঘেমে পুড়ে। উদ্দেশ্য ছিলো দলু মৃধার সঙ্গে আলাপ করে একটা মিটমাটের ব্যবস্থা করা।

কিন্তু দলু মৃধা সাফ জবাব দিয়ে দিয়েছে, ও জমি তার। মনোতোষদের অন্য শরিক–তার খুড়তুতো ভাই সুভাষ গত সালে কলকাতা থেকে এসে দলু মৃধাকে বিক্রি করে গেছে। কেন, একথা মনোতোষের বাপকে বলেনি দলু মৃধা? সুভাষ ইন্ডিয়া থেকে চিঠি লিখলেই হলো! দলু মৃধার কাছে দলিল আছে না!

মহী ডাক্তার হুমকি দিয়েছে মামলা করবে। ঠিক আছে করুক। কোর্টেই ফয়সলা হবে।

বাঙলাদেশ হওয়াতে তারা কি মনে করেছে যে, গোটা দেশটা তাদের হয়ে গেছে! দেশে এসে জমি বিক্রি করে দিয়ে ইন্ডিয়া থেকে বসে চিঠি লিখবে, 'না, জমি বিক্রি করি নাই', আর তাতেই সব হয়ে গেলো! ক্যান দ্যাশে আইন নাই?

মহী ডাক্তার কি ভাবে? সে কি এখনও বৃটিশ জমানায় বাস করছে মনে করে? বুড়ো মানুষ, নিজের সম্মান নিজে যেন রাখে, অতো তেজ ভালো নয়; দেশে আছো সকলের সঙ্গে মিলে মিশে থাকো, বেশী বাড়াবাড়ি করলে তার ফল ভালো হবে না।

–কী! আমার জমি বেদখল করবো, আর আমি কইতে গেলে তা হইবো বাড়াবাড়ি, এ কি মগের মুল্লুক!

আমাগো জমিতে চাষ না করলে একদিন ভাত জুটতো না যাগো প্যাটে, ব্ল্যাক মার্কেটিং কইরা, লুটতরাজ কইরা পয়সা হইছে দেইখ্যা ভদ্রলোক হইয়া গেছে, উল্টা হুমকি দেয় অহন!

আমারে না জানাইয়া তুই গেলি ক্যান, ল্যাখাপড়া শিক্ষা কইরা এই জ্ঞান হইছে,এই বুদ্ধি নিয়া তুই শহরে চলস, রাজনীতি করস!

দলু মৃধা ভাবতাছে, মহীতোষ ডাক্তার পোলারে পাঠাইছে আপোষ করনের লাইগ্যা। লাভটা হইলো কি? নিজেও অপমান হইলি আমারেও অপমান করাইলি। তার উপরে আমাগো দুর্বল ভাইব্যা আরো দাপট দেহাইবো।

মনোতোষ যে এসব ভাবেনি তা নয়, কিন্তু মামলা করলেই কি ও জমি পাওয়া যাবে? মনোতোষ থাকে ঢাকায়,ফি মামালার দিনে দিনে আসা, তদ্‌বির তদারক

দুনিয়ার পাঠক এক হও

করা–এসব কি কম ঝামেলা! তার পর সুভাষের চিঠিই যথেষ্ট নয়, তাকে আসতে হবে, তার মানেটা কি দাঁড়ালো? তাকে এক মহা জটিলতায় ফেলা। দলু মৃধা কি সহজে ছাড়বে? জাল দলিল প্রমাণ করার জন্যে সে যতরকম প্যাঁচ কষতে হয় কষবে, দেশ গ্রামের যে অবস্থা–চুরি ডাকাতি, খুন, গুমখুন–দলু মৃধা নতুন পয়সা করেছে, পেছনে খোঁটার জোর আছে–দলু মৃধা কি না করতে পারে! তা ছাড়া সুভাষ আসবে না কি? সে ভিন দেশের নাগরিক এখন, আসবার আগে নিজের পজিশন সম্পর্কে চিন্তা করবে না? অন্যান্যরাই বা আসতে দেবে কেন? বাঙলাদেশে জমির ঝামেলায় গিয়ে কোন বিপদে পড়ে।

তাছাড়া মনোতোষের বাবা একা মানুষ,১৫ কাঠা জমির জন্যে বুড়ো বয়সে শেষে কি প্রাণই দিতে হয়!

বাবা যেরকম একরোখা মানুষ, ভয় মনোতোষের তাকে নিয়েই।

ঢাকায় জমি কেনার কথা এখনও বলেনি মনোতোষ। সত্যি বলতে কি জমি কেনার পর ভারী একটা সংকোচ– সে প্রায় অপরাধের মতো তার ভেতর কাজ করছে, গতকালও যখন বজলু নেপালরা দেশের রাজনীতির কথা, পার্টির কথা বলছিলো, তখন নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হচ্ছিল, নিজের কথাগুলোই নিজের কানে কেমন ফাঁপা বুলির মতো শোনাচ্ছিলো মনোতোষের; মনে হচ্ছিলো, যদি শোনে মনোতোষ জমি কিনেছে তাহলে ছেলেগুলো কথা বন্ধ করে এখনই গম্ভীর হয়ে যাবে।

জমি মনোতোষের কেনা হয়েছে জয়ার তাড়নায়, সে জন্যে জয়ার ওপর রাগ হয় তার মাঝে মাঝে।

আকাশ–ভাঙা জ্যোৎস্নায় খোলা জানালার বাইরের পেয়ারা গাছের ছায়া এসে পড়েছে বিছানার ওপর।

গ্রামে এলে মনোতোষ বন–বাদাড়, খাল–বিল, মাঠ, জলা,আকাশ, পাখীর ডাক,গ্রামের নানা রকম শব্দ, ঝিঁঝির ডাক, মানুষের সঙ্গ, এমন কি কণ্ঠস্বরের বিশেষ টানটুকুর মধ্যেও খুব নিবিড়ভাবে নিজেকে অনুভব করে; কিন্তু এ দু'দিন যেন সে চোখ তুলে তাকায়নি কোনদিকে।

বাবার কাশির শব্দ শোনা যাচ্ছে। এতো রাতেও বাবা ঘুমোয়নি। শরীরটা এবার খুব ভেঙে গেছে। মা'র কথাই কি সত্যি হবে!

আগামীকাল সে ঢাকায় চলে যাবে। যে খোঁটার জোরে দলু মৃধা কোদে তাদের সঙ্গে আলাপ করে মোটামুটি একটা ব্যবস্থা করে রেখে যাচ্ছে। ফয়সলার জন্যে টাকা লাগে মনোতোষ দেবে; কিন্তু সে কথা তার বাপ যেন না জানে।

ঢাকায় ফেরার তিনদিনের দিন জয়ার সঙ্গে মনোতোষের লেগে গেলো। কথা প্রসঙ্গে সে জমি সংক্রান্ত ফয়সলার ব্যাপার নিয়ে আলাপ করতে গিয়ে টাকার কথাটা বলে ফেলায় জয়া সেই যে মুখভার করেছে গতকাল রাতে, আজ চব্বিশ ঘন্টায়ও তা আর স্বাভাবিক হলো না।

–তোমারে নিয়া আর পারা গেলো না! ক্রোধের তুলনায় বাক্যটি বড়ো বেমানান, কিন্তু মনোতোষের গলার আওয়াজে টের পাওয়া যায় কী অসীম চেষ্টায় নিজেকে সামলাচ্ছে সে। মনোতোষ দম নেয়।

–তোমার মনটা হইল এতটুক,বুঝলা?

মনোতোষ জয়ার দিকে হাত বাড়িয়ে ডান হাতের পাঁচ আঙুলকে একত্রিত

~ www.amarboi.com ~
করে জয়ার মনের আয়তনটা দেখায়। জয়া চোখ তুলতে গিয়েও তোলে না। তুললে দেখতে পেতো রাগটা মনোতোষের হঠাৎ করে নয়। বহুদিন ধরে একটু একটু করে জমতে জমতে ক্রোধ যখন গরল হয়ে যায় কেবলমাত্র তখনই রাগের সময় মুখের চেহারা মানুষের এমন হয়ে থাকে।
–বাবায় আইতে চায় না ক্যান জানো? শুধু তোমার কারণে। তুমি
জয়া ফোঁস করে ওঠেঃ ক্যান আমি তারে কী কইছি?
–কইতে হয় নাকি, মানুষের ব্যাবহারেই বোঝন যায়।
–তখন মনে আছিল না? ভাল ব্যাবহারের মানুষ আনলেই পারতা।
–তখন কি আর এত বুঝছি। তখন তো তুমি রং ঢং দিয়া ভুলাইছিলা।
বিষের জ্বালায় জয়া ছটফট করেঃ কী,আমি রং ঢং দিয়া ভুলাইছিলাম তোমারে? তুমি একথা কইলা?
রাগের মাথায় কথাটা বড়ো খারাপ বলে ফেলেছে মনোতোষ। কিন্তু তখন যা হবার হয়ে গেছে। জয়া দেওয়ালে মাথা ঠুকতে থাকে।
মনোতোষ উঠে গিয়ে জয়াকে ধরেঃ আহ্, কি পাগলামী কর।
গলার স্বরকে মনোতোষ প্রাণপণ বদলে ফেলতে চায়।
এখানে একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে।
ঢাকাতে এসে মনোতোষ জয়াদের বাড়ীতে ছিলো বছর কয়েক। কলেজে উঠেই ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে সে। সেই জড়িয়ে যাওয়া এমন এক পর্যায়ে গিয়ে ঠেকে যে, ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় ফেল করে বসে। বাপ তার কড়া মেজাজের মানুষ, কিন্তু মনোতোষও তখন মফস্বল কলেজের রীতিমতো ছাত্রনেতা। রাগারাগি তাকে করলেই হলো!
মনোতোষ সোজা চলে এলো ঢাকায়। প্রথমে উঠেছিলো মালাকারটোলায় তার গ্রামেরই এক লোকের বাড়ীতে। দিন দশেক পর সেখান থেকে উঠে গিয়েছিলো এক মেসে। অতিশয় বাজে মেস। থাকা খাওয়া থেকে শুরু করে ল্যাট্রিন পর্যন্ত যাচ্ছেতাই। মেসের বোর্ডাররাও তেমনি, একে তো এক এক রুমে চারটে করে চৌকি পাতা, পা ফেলাই দায়, তার ওপর লোকগুলো রাতের বেলা খাওয়া দাওয়ার পর বসে ফ্লাশে। গভীর রাত পর্যন্ত চলে জুয়া, অশ্লীল আলাপ, তর্ক, কথা কাটাকাটি, কখনও প্রায় হাতাহাতি। এর মধ্যে না যায় পড়াশোনা করা, না যায় ঘুমনো।
মালাকারটোলার রসিকবাবু জয়াদের বাড়ীতে টিউশনি ঠিক করে দিয়েছিলো। জয়ার ছোট দুই ভাই ও এক বোনকে পড়ানো। কিছুদিন পর শুধু টিউশনি নয়, থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাও হয়ে যায়। এখানে থেকেই মনোতোষ ইন্টারমিডিয়েট এবং ডিগ্রি পাশ করে।
ছোট্ট একতলা নিজস্ব বাড়ি জয়াদের।মনোতোষের রুমটা সামনের দিকে। বাইরের দরজা দিয়ে বেরুলেই ছোট্ট একটা বারান্দা, বারান্দার নীচে সদর দরজা এবং পাঁচিলের ধার ঘেঁষে একফালি জায়গা। সেখানে একটা কাঁঠালি চাঁপার গাছ, একটা জবা ফুলের গাছ। চাঁপা গাছটা নীচু ঝাঁপড়া–ঝোপড়া হওয়ার জায়গা নিয়েছে বেশ খানিকটা, বাকি স্বল্প পরিসর জায়গায় মৌসুমী ফুলের বাগান করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।
প্রথম প্রথম দরজায় তালা লাগিয়ে বাইরে যেতো মনোতোষ, এক মাস যেতেই সে ব্যবস্থা রদ করেছে জয়া। কাপড়–চোপড়, বিছানা বালিশ গুছিয়ে, ঘর–দোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ঝকঝকে তকতকে করে রাখা,তার স্নান, তার খাওয়া প্রতিটি ব্যাপারে জয়ার সজাগ যত্ন। দিনে দিনে মনোতোষ তাতে মজেছে। কে জানতো জয়ার ভেতর এমন অজানা মৈ আছে,যে মৈ বেয়ে জয়া একদিন আকাশ ছুঁতে চাইবে।

–না, তুমি আর আমারে ধরবা না, ছাড়ো,তোমারে আমি চিনছি, আর মিঠা কথা কইতে ওইবো না।

জয়ার নরম বাহুতে চেপে বসা আঙুলে কিছু একটা পাঠাতে চায় মনোতোষ, সে কি ক্রোধ, সি কি ঘৃণা, না অন্য কিছু?

টেনে এনে পাঁজাকোলা করে খাটের ওপর শুইয়ে দিতে গিয়ে মনোতোষ অবাক হয়: জয়া এত ভারী!

তার ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ে।

বালিশে মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা জয়ার গলায় কোন আওয়াজ নেই, শুধু মৃদু মৃদু শরীর কাঁপছে তার। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনোতোষের মাথার ভেতর বিদ্যুৎ চমকে ওঠে: ঐ যে জয়া শুয়ে শুয়ে ফোঁপাচ্ছে , ওর ভেতর দলু মৃধা আছে।

দলু মৃধার লোভ এবং প্রতাপকে মদত দেয় যে শক্তি তাদের সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করার ব্যাবস্থা করে এসেছে মনোতোষ।

জয়ার ভেতরেও সেই একই দলু মৃধা, তার সঙ্গেও তাকে কম্প্রোমাইজ করতে হবে। ঘর এবং বাইরের সঙ্গে প্রতিনিয়ত এই কম্প্রোমাইজ করতে করতে মনোতোষ শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? ভাবতে ভাবতে দু'হাতে কপাল চেপে চেয়ারে বসে পড়ে সে।

বাসুদেব এক গলা টেনে এইমাত্র ফিরলো: আমি বুঝি না, না? চোখে জল এসে যায় সর্বানীর । গালের জুলুনি মগজ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছে । কিন্তু কোন কথা বলে না, দু'হাতে গাল ঢেকে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে । তার মাথার চুল ভেঙে গড়িয়ে পড়েছে, আঁচল লুটোচ্ছে, এক দিকের স্তনচক্রের আভাস বাসুদেবকে আরো ক্ষিপ্ত করে: আমি বুঝি না, না ? রাইত দিন ঠাকুর পো, ঠাকুর পো! ক্যান,অতো মাখামাখি ক্যান.... টলমল পায়ে বাসুদেব এগোয়, আত্মরক্ষার জন্যে সর্বানী সামনে ঝোঁকে। বাসুদেব প্রহার করে না, আঁচল ধরে টান দেয়: 'আঁ'? এই 'আ' ধ্বনি দিয়ে সে বাক্যটিকে সম্পূর্ণ করে। নিরুত্তর সর্বানী প্রতি মুহূর্তে চপেটাঘাতের আশঙ্কায় কেঁপে কেঁপে ওঠে। বাসুদেব ক্ষিপ্র হাতে সর্বানীর বস্ত্রহরণ করে ।

মধ্যম পুত্রটির ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো, ঘুম চোখে ম্যাড়মেড়ে হলদে আলোয় বাসুদেবের কংসমূর্তি, চাপা গর্জন এবং উলঙ্গ মাতৃদর্শনে সিটিয়ে পড়ে থাকে সে। 'তরে খুন কইরা ফালামু' –বাসুদেব ন্যাংটো সর্বানীকে হ্যাঁচকা টানে কাছে নিয়ে আসে। অতঃপর ঘাড়ে রদ্দা মারলে সর্বানী তার শরীরে বাসুদেবের প্রত্যাশিত ভঙ্গিটি এনে দেয় । বাসুদেব মেঝের ওপর সর্বানীকে কুকুরেরর মত রমণ করে।

আকাশের খুব ওপর দিয়ে বালিহাঁসের একটি দল মালার মতো উড়ে যেতে যেতে ডেকে উঠে। কূয়োতলা থেকে কিচ্ কিচ্ শব্দে উঠোনের ওপর দিয়ে দৌড়রত ছুঁচো থমকে ওপরের দিকে তাকায়। ছাদের রেলিংয়ে বসে থাকা প্যাচাটি দোতলার বারান্দার কার্নিশে নেমে এসে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে উঠোন জরিপ করে । নিথর বাড়ীটায় শুধু নিশিকান্তর প্রবল শ্বাস টানার শব্দ। প্যাঁচাটি মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে টানা শব্দটির উৎস সন্ধান করে । তার মনে হয়, খুব গভীর থেকে , এই বাড়ীর ভিতের নীচে থেকে উঠে আসছে শব্দটা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ক বি তা

অপ্রকাশিত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

বোঝাপড়া

কথায় কথায় অনেকদূর চলে এসেছি তোমার সঙ্গে
এবার আমি ফিরতে চাই।
আমার কতো কাজ, কতো সব কাজ পড়ে আছে,
তুমি আমাকে পথের মধ্যে খালি দেরী করিয়ে দাও;

অনেক দিনতো হলো এখন অন্তত: তোমার বোঝা উচিৎ
আমাদের সামনে সমুদ্র নেই, পেছনে নদী নেই ডানে বাঁয়ে অরণ্য কিংবা
পাহাড়
কিছু নেই শুধু পথ আছে–
এমন করে, না জেনে শুধু শুধু পথ হাঁটার কোন মানে হয়!
এখন আমি ফিরবো।

নিজে যেটুকু আমি, তার বেশী আমি নই,
আমার চোখ দুটো আমারই চোখ, দুহাতের দশটি
আঙুল আমারই আঙুল,
আমি তাদের ভালো করে চিনে নিতে চাই,
আমি চাই আমার নিজের সীমানার মধ্যে শক্তপায়ে দাঁড়াতে।
বুঝলে?

দুপুর/১৪.২.৮০।

বউ

'বউ' বলে কাকে তুমি ডাকলে কিশোর?
কাহারে আলিঙ্গন করো তুমি অবেলায়
তিতাসের জলে, জলের কিশরে?
প্রেমই কি মৃত্যু অথবা মৃত্যুই প্রেম
কাকে তুমি 'বউ' বল ডাকলে কিশোর?

রাত /৩১শে জুলাই

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

চোখ

'আকাশে আকাশ নেই, চন্দ্রমা নক্ষত্র গেছে মরে;
তোমার ও কালো চোখ, ওই দীর্ঘ পল্লবে ছাওয়া চোখ ওখানেই আমার আকাশ–

মেঘের ছায়ায় তাকে ঢেকোনা আঁধারে!'
এই কথা প্রেমিকাকে লিখে যে নির্বোধ গাঢ় দুঃখে
নিদ্রাহীন রাত্রি কাটায়
সত্য থেকে তার বসবাস যোজন যোজন দূরে
কেননা হৃদয়–সম্পূর্ণ পারেনা দিতে তাহার হৃদয়!

রাত/ ৩১শে জুলাই

পাখিরা সব জানে

কখন হাওয়া কোন দিকে বয়,
কোথায় ফল পাকে, কোথা আছে তৃষ্ণার জল
পাখিরা সব জানে।
তাদের বুকেও সুখ দুঃখ আছে;
জন্ম মৃত্যু, মিথুন আনন্দ–সব জানে তারা।

কাকে খোঁজো

ক্লান্ত কিশোর কাকে খোঁজো
কোথায় তোমার ঘর
নাম কি তোমার,–পিতা মাতা?
আছে কি খবর?
নিজের কাছে প্রশ্ন করো

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কাকে তোমার চাই
মাঠ পেরিয়ে হাট পেরিয়ে
যেদিক পানেই যাও
–ছায়া বিহীন বিষম খরা
দেখবে শুধুই ছাই
তারচে বরং
যে দিকে তাকাও ছায়াহীন বিষম খরার
চিহ্ন–শুধু ছাই
উড়ছে, বিগত দিনের স্মৃতির মতো।

নিজের সঙ্গে কথা

তুমি যেখানেই যাও
ফেলে আসা দিনগুলো
তোমার সঙ্গে যায়।

কোথায় লুকোবে তুমি?

যেখানেই যাও
ফেলে আসা দিনগুলো
তোমার সঙ্গে যায়।

দ্বৈরথ

স্বাধীনতার মতো প্রিয়
তোমার কাছে কিছু নেই

ভদ্রতায় ভালোবাসায় উদারতায়
তুমি তাকে বারবার
শৃঙ্খল পরিয়েছো।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
পরাধীনতার মতো ঘৃণ্য
তোমার কাছে কিছু নেই
স্বাধীনতার মতো প্রিয়
তোমার কাছে কিছু নেই

এই দ্বৈরথ নিশি দিন
তোমার ভিতরে।

দুপুর

ঝাঁ ঝাঁ রোদ।
চষা মাঠ।
দূরে গাছপালা।
একটা ফড়িং শুধু
স্থির ছবির মতো দুপুরকে
জাগিয়ে রাখে
ডানার স্পন্দনে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
# প্রবন্ধ-নিবন্ধমালা

অগ্রন্থিত

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

ঘূর্ণির টান ও নিরাবেগ বোঝাপড়া

লেখক শিল্পীদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এক সময় তুমুল আলোড়ন হয়েছিলো আমাদের দেশে।

এখানে দৃষ্টিভঙ্গি বলতে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলা হচ্ছে–বিশেষত: চল্লিশের দশকে বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন এই রাজনীতির পাশাপাশি সাহিত্য–সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও স্বাভাবিক ভাবেই তার ধাক্কা লাগে।

ইদানীং শিল্প–সাহিত্য নিয়ে আবার নতুন করে প্রসঙ্গটি আসছে। এমন কথাও শোনা যাচ্ছে কারো কারো মুখে, যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেখানে শেষ করেছেন আমাদের সাহিত্য–বিশেষত: কথাসাহিত্য, সেখান থেকে শুরু করতে হবে। ব্যাপারটি যেন রীলে রেসের মতো–একজনের হাত থেকে নিয়ে দৌড় দেওয়া।

এভাবে আর যাই হোক শিল্পী–সাহিত্য হয় না, প্রতিটি লেখককে শুরু থেকেই শুরু করতে হয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও তা ঘটেছিলো।

হ্যাঁ, একথা সত্যি, একশোবার স্বীকার্য যে, একজন–লেখককে (জনমনতোষী বাণিজ্যবুদ্ধিসর্বস্বদের কথা আলাদা) এ যুগে মানুষের সপক্ষে দাঁড়িয়েই কলম চালনা করতে হবে।

কিন্তু তার জন্যে লেখককে নিজের পথ নিজেকেই নির্মাণ করে নিতে হয়। চিন্তা–চেতনার ক্ষেত্রে কোন একটি সুনির্দিষ্ট আদর্শকে বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ করলেই যে তিনি সেই আদর্শ অনুযায়ী গড় গড় করে সৃষ্টি করে ফেলবেন, তা হয় না। এ ধরনের রচনা তাৎক্ষণিক আবেগ–সঞ্জাত, মোটা দাগের অতি সরলীকরণ, যান্ত্রিক, ইচ্ছাপূরণ মাত্র। ভেতরে তার মস্ত ফাঁকি থেকে যায়।

গোটা বিষয়টাই গড়ে ওঠার ব্যাপার, হয়ে ওঠার ব্যাপার।

এ প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা জরুরী মনে করি যে, অধিকাংশ লেখক শিল্পীরই মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম এবং মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ মিশে থাকে তাঁর অস্তিত্বে, চেতনায়। আমাদের দেশের মধ্যবিত্তের উদ্ভব এবং বিকাশ হয়েছে খারাপভাবে। একটি ঔপনিবেশিক শক্তির ছত্রছায়ায় তারই পায়রবি করে যার বিকাশ, যে নিজের দেশ এবং তার মাটি ও সেই সুবৃহৎ মৃত্তিকা–নির্ভর জনগোষ্ঠী–যার সঙ্গে তার হাজার হাজার বছর ধরে রক্তের সম্বন্ধ, আপন দর্পিত অহঙ্কারে দিনে দিনে তার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে বিদেশী শোষকের উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেছে। এমনকি পররাজ্য গ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শক্তির বরকন্দাজ হয়ে স্বদেশবাসী কোটি কোটি কৃষকের মাথায় লাঠি ভাঙতেও কসুর করেনি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সেই বদ–রক্তের পরম্পরাগত ধারা তার (মধ্যবিত্তের) শরীরে প্রবাহিত।

কাজেই আমরা যখন দেশ, জনগণ, গণসাহিত্য, গণশিল্পের কথা বলি তখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
নিজেদের শ্রেণীগত অবস্থান এবং তার অন্দর মহলের নানা গলি ঘুঁজিতে ঘাপটি মেরে বসে থাকা রোমশ জন্তুর মতো সেই ধারাবাহিক অন্ধকার বিষয়ে অসচেতন থাকি। কৃষকের, শ্রমিকের 'সত্য আত্মীয়তা' অর্জন ঘোষণা দিয়ে হয় না।
বেনিয়া সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসক তার ঔপনিবেশিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যে যে সর্বনাশা শিক্ষা নীতির মাধ্যমে একদিন আমাদের পূর্ব পুরুষকে নিজ বাসভূমে পরবাসী বানিয়েছিলো, সেই একই ধারা আজো অব্যাহত রয়েছে।
এ এমনই এক আজব কল যে, ঘোর কৃষকের বাচ্চা ও এই কলের মুখ দিয়ে ঢুকে অন্য মুখ দিয়ে বেরোয় সম্পূর্ণ অন্য এক চিজ হয়ে–যার নাম 'ভদ্রলোক'। (এই শিক্ষার মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে এক সময় শিশু শিক্ষা বইতে লেখা হয়েছিলো, 'লেখাপড়া করে যে গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে।'
আমাদের দেশে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি প্রবর্তিত শিক্ষানীতির স্বরূপ সম্পর্কে সংক্ষেপে এমন চমৎকার প্রকাশ আর হয় না। শিশুমনকে অনুপ্রাণিত করার জন্যে এই লাইনটি লেখা হয়েছিলো; কিন্তু ওই লাইনটির মধ্যে আছে এক চরম নিষ্ঠুরতার ইতিহাস এবং চলমান বাস্তবতা)। আবার আর এক মজাও আছে, যেহেতু মধ্যযুগীয় সামন্ত সমাজকে উৎখাত করে ইউরোপের মতো এখানে পুঁজিবাদের উত্তরণ না ঘটে এদেশের অস্তায়মান সামন্ত সমাজের পরবর্তী স্বাভাবিক গতির অর্থাৎ বণিক পুঁজির বিকাশের যে সম্ভাবনা লক্ষণীয় হয়ে উঠেছিলো অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে, তাকে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি তাদের নিজেদের স্বার্থে রুদ্ধ করে দিয়ে, সেই ভগ্নপ্রায় সামন্ত সমাজ কাঠামোর কঙ্কালের ওপর বুর্জোয়া ধনতন্ত্রের লেবাস পরিয়ে দিলো। ফলে যা হবার তাই হলো, না হলো বাঁদর না হলো শিব।
এই কিম্ভূতকিমাকার বিকলাঙ্গ মানস গঠনসম্পন্ন উত্তরাধিারী দায়ভাগ নিয়েই আমাদের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এই শ্রেণী (ইতিমধ্যেই যার বহুস্তর তৈরী হয়ে গেছে) থেকেই আসেন আমাদের দেশের প্রতিটি লেখক। এই লেখকদের এটি অংশ যখন নিজেকে সমস্ত দেশের অংশ করতে চান, তখন তাঁর দায় হয় আরো মর্মান্তিক। তিনি দেখেন দেশ বলতে যা বুঝায় তার সম্পূর্ণটাই তাঁর মানসচৌহদ্দির প্রায় বাইরে।
তাই দেখা যায় বঙ্গদেশের গ্রাম সমাজের ভাঙা–গড়া সামন্তবাদের অবক্ষয়ের পাশাপাশি মাথা মুড়োনো নব্য ধনিক শ্রেণীর উত্থানের বাস্তব ছবিটি পাওয়ার জন্যে একজন গ্রামীণ সামন্ত পরিবারের সন্তান অমার্কসবাদী তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়, কি খাঁটি জেলে পরিবারে জন্ম এবং আত্মপরিচয়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল অদ্বৈত মল্ল বর্মণের কাছেই হাত পাততে হয়। কোন মার্কসবাদী লেখকের হাত দিয়ে তা বেরোয়নি।
এমন যে বিপুল শক্তিধর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর বিশাল ব্যাপক সাহিত্য জগতে এই জীবনের সন্ধান মেলে না। জেলে জীবন নিয়ে লেখা "পদ্মা নদীর মাঝি'র পাশাপাশি অদ্বৈত মল্ল বর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' পড়লেই বোঝা যায় একটি শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের রচনা অপরটি অপেক্ষাকৃত কম শক্তিমান হাতের লেখা হলেও তা ভেতর থেকে লেখা।
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিপুল সাহিত্যভূমিতে মধ্যবিত্তেরই পদচারণা, সেই জীবনের ক্লিন্ন কদর্যতায় বাতাস ভারী, এমন কি সাম্যবাদী মানিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও

বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরকালের রচনায়ও দেখি সেই মধ্যবিত্তই ঘুরে ফিরে বেড়ায়। গ্রাম জীবন নিয়ে তাঁর প্রথম পর্বের নানা দিক থেকে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা 'পুতুল নাচের ইতিকথা'য় গ্রামের ভূচিত্র থাকলেও মানুষগুলো সবই মধ্যবিত্ত মানসজাত। সেখানে কৃষকের পদপাত নেই। অমন যে গ্রামীণ মেয়ে কুসুম, কথাবার্তা চাল-চলনে তাকে বড়ো বেশী শহুরে মধ্যবিত্ত মনে হয়। (তাছাড়া তরুণ ডাক্তার শশীর সঙ্গে দরিদ্র পরাণের স্ত্রী কুসুমের কিংবা কুসুমদের সঙ্গে মতির সম্পর্ক-বিশেষত: এ দু'জোড়া মানব-মানবীর নির্জনে দেখা শোনা কথাবার্তা গাওদিয়া গ্রামের বড়ো নির্বিঘ্নে ঘটে। নির্জন তালবনে কাউকে উঁকি দিতেও দেখা যায় না, কোন কথাও ওঠে না। তাছাড়া এ উপন্যাসে গাওদিয়া নামের গ্রামটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামার বাড়ি ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের একটি গ্রাম, কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থায় নদী নৌকোর প্রাধান্য প্রসঙ্গ বাদ দিলে এর প্রকৃতি ও মানুষজন মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গের কোন গ্রাম-প্রধান শহরতলি বলে মনে হয়।) এর কারণও সেই বিচ্ছিন্নতা।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম এক ক্ষয়িষ্ণু গ্রামীণ ভূস্বামী পরিবারে, গ্রাম জীবনের সঙ্গে তাঁর নাড়ির যোগ, আধুনিক শিক্ষার বাতাস তাঁর ওপর দিয়ে-প্রবাহিত হলেও শিকড়টি বীরভূমের খাস মাটির গভীরেই ছিল, তাছাড়া সামন্ত কাঠামোর চৌহদ্দীতে বাঁধা চারপাশের জীবনের সঙ্গে তাঁর সামন্ত পরিবারের বিত্ত ও কৌলিন্য সত্ত্বেও মানস যোগাযোগে কোন বাধা সৃষ্টি হয়নি। তারাশঙ্কর আজন্ম এই জগতেরই মানুষ।

অপরদিকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাবডেপুটি কালেক্টর বাবা গ্রাম সমাজ থেকে উদ্ভুত হলেও বিক্রমপুরের মালপদিয়া গ্রামের প্রথম গ্রাজুয়েট হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষা ও কর্ম-জীবন সূত্রে সেই যোগাযোগ হারিয়ে ফেলে সারা জীবন তাঁর সন্তান ও সংসার নিয়ে তৎকালীন অখণ্ড বাঙলার মফস্বল শহরগুলোতে ভ্রাম্যমাণ থেকেছেন, জীবনের শেষাংশ ও শেষ নিঃশ্বাস মেশে মধ্যবিত্তের জন্ম ও বিকাশ ভূমির ভিত্তিস্থল কলকাতা শহরে। এতদসত্ত্বেও শৈশব-কৈশোরের গ্রাম জীবনের যেসব অনুষঙ্গ তাঁর মানসভূমিতে অবশিষ্ট ছিলো, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে একেবারেই বাইরের মানুষ। তিনি সর্ব অর্থেই শহরবাসী মধ্যবিত্ত নাগরিক। কাজেই এক্ষেত্রে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তাঁর জন্ম ও অবস্থানগত কারণে যে জগৎ কররেখার মতো আপন সে জগৎ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জগৎ নয়।

অবশ্য অদ্বৈত মল্ল বর্মণে জেলে জীবনের যে বিশ্বস্ত পরিচয় মেলে সেই অর্থে খাঁটি কৃষক জীবন তারাশঙ্করেও নেই, আজ পর্যন্ত রচিত হয়নি (এ ব্যাপারে সবেধন নীলমণি শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পটি)। তবু বাঙলার কৃষিভিত্তিক সামাজিক জীবনের ঘাত-সংঘাতময় মহাসংহিতাটি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলমই রচনা করেছে।

এ ব্যাপারে টলস্টয়ের কথা ভাবা যেতে পারে-বিপ্লব বিরোধী, প্রতিরোধ বিরোধ প্রবল ভোগী এই কাউন্ট'টির হাতেই সত্যিকার রুশ কৃষকের জীবন ফুটে উঠেছে। লেনিন তাঁর (টলস্টয়ের) ধর্ম প্রচারক ভূমিকাকে ধিক্কার দিয়েও তাই বলেন, "Tolstoy is great as the spokesman of the ideas and sentiments that emerged among the millions of Russian

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
Peasants at the time the bourgeois revolution was approaching in Russia".
কিন্তু এর পাশাপাশি আমাদের সাহিত্যের প্রধান পুরুষ রবীন্দ্রনাথ টলস্টয়ের মতোই ভূস্বামী পরিবার থেকে উদ্ভূত–পদ্মা তীরবর্তী কৃষকের মধ্যে গিয়েও সেই কৃষককে তিনি ধরতে পারেন না তাঁর সাহিত্যে।
কলকাতা শহরের জোড়াসাঁকোয় জন্ম, আযৌবন শহুরে মানুষ, আভিজাত্যের ব্যবধান সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ('ঐকতান' কবিতায় এ বিষয়ে স্বীকারোক্তি আছে)। এবং "এ আভিজাত্যের ইমারতটি' তৈরী হয়েছে ঔপনিবেশিক শক্তির প্রসাদে। টলস্টয়ের আভিজাত্য স্বাধীন রাশিয়ার মাটি থেকেই পাওয়া এবং তিনি জন্মগতভাবেই কৃষকের সংলগ্ন। রবীন্দ্রনাথের মতো বিচ্ছিন্নতা বহন করতে হয়নি তাঁকে।
তারাশঙ্কর কিংবা টলস্টয়, কেউ মার্কসবাদী ছিলেন না, তবু রুশ কৃষককে পেতে হলে টলস্টয়ের কাছে যেমন যেতে হয় বঙ্গদেশের গ্রাম সমাজের ভাঙ্গাগড়ার পরিচয়ের জন্যে তেমনি তারাশঙ্করই আমাদের একমাত্র উদ্ধার। এই সত্য কথাটি মনে রাখা জরুরী।
সেই সঙ্গে এ কথাও মনে রাখতে হবে, চল্লিশ দশকের শেষ পর্বের অমন যে তেভাগা আন্দোলন, তাকে নিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দু'চারটে গল্প ও গুণময়–মান্নার–,–এর মতো ইচ্ছাপূরণের অপটু প্রয়াস, কি অনুল্লেখ্য আরো এক আধটা গল্প ছাড়া আর কিছু নেই। লক্ষণীয় যে, যখন কৃষকরা গ্রামবাঙলার মাঠে মাঠে অসীম সাহসের সঙ্গে লড়ছেন, তখন মার্কসবাদী লেখকরা কলকাতায় বসে কলম যুদ্ধ করছেন একে অন্যের সঙ্গে, মার্কসীয় সাহিত্য কেমন হওয়া উচিত এই কূট তর্ক নিয়ে (ফ্যাসি বিরোধী আন্দোলন কি গণনাট্য সংঘের ভূমিকার কথা মনে রেখেও এ কথাগুলো এসে যায়)।
পাকিস্তান সৃষ্টির পর ঢাকা কেন্দ্রিক যে সাহিত্য প্রচেষ্টা শুরু হয় সেখানে পাকিস্তানবাদী ইসলামী সাহিত্য, ইউরোপীয় ধারার প্রচলিত সাহিত্য এবং চল্লিশ দশকের বামপন্থী ধারা পাশাপাশি চলে। পাকিস্তান উত্তর প্রথম পর্বে বামপন্থী ধারার লেখক হিসাবে যিনি সে সময়ে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় বলে বিবেচিত হতেন সেই আলাউদ্দিন আল আজাদ–এর গল্পগুলোতেও দেখা যায় চল্লিশ দশকের সাধারণ চরিত্র– সেই মোটা দাগের অতি সরলীকরণ, তরল আবেগতাড়িত যান্ত্রিকতা। (বলাই বাহুল্য আজাদ পরবর্তীতে তাঁর বামপন্থী সাহিত্যাদর্শ থেকে সরে দাঁড়ান)।

এ রচনায় কৃষকের প্রসঙ্গ বারবার এসেছে আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীটির বৈশিষ্ট্যকে স্পষ্ট করার উদ্দেশ্য থেকে। সেই সঙ্গে ইতিহাসের ধারাবাহিকতার সুবৃহৎ জনগোষ্ঠীটি থেকে কেমন করে একটি শ্রেণীর বিচ্ছিন্নতা এবং দূরত্ব সৃষ্টি হলো তাকে স্পষ্ট করা, কেননা, এই বিচ্ছিন্ন দূরত্বের ওপর দাঁড়িয়ে আছে আমাদের সাহিত্য, আমাদের রাজনীতি

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
আমাদের দেশের কল-কারখানার যে শ্রমিক সে শ্রমিক ক্ল্যাসিক্যাল শ্রমিক নয়, তাঁরাও উঠে এসেছেন কৃষি-নির্ভর জীবন থেকে, তাঁর মনের ভেতরও রয়ে গেছে জমির ক্ষুধা। যুক্ত হয়েছে নানা রকম মধ্যবিত্ত ঝোঁক। অন্যান্য শ্রমিকের মধ্যেও সেই মৃত্তিকার তৃষ্ণা।

শোষণের চেহারাও নানান সুক্ষ্ম জটিল রূপ নিচ্ছে। গ্রামে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বাড়ছে ভয়াবহ রকম। শহরের ওপর চাপ বাড়ছে, জটিলতা বাড়ছে। শহর ক্রমে ঢুকে যাচ্ছে গ্রামে, গ্রাম উঠে আসছে শহরে। চল্লিশ বছর আগের বাস্তবতার সঙ্গে আজকের বাস্তবতা এক হয় না, হতে পারে না। আর একটি বিষয়, বাংলাদেশের শ্রেণী বিন্যাসটিতে এখন চলছে দারুণ অস্থিরতা। এর ফলে শহরে-গ্রামে সর্বত্র জটিলতার নানান মাত্রা যুক্ত হচ্ছে।

এই সমুদয় বিষয় মিলিয়ে একজন লেখকের কাজের ধারাও হয়েছে জটিল এবং কঠিন।

সমাজ বদলের স্ফীত আবেগে যান্ত্রিক সরলীকরণের মাধ্যমে এই বাস্তবতাকে ধরা যাবে না। তা করতে গেলে হবে ব্যর্থ-পুনরাবৃত্তি।

শ্রেণী অবস্থান সম্পর্কে সচেতন থেকে নিজের সম্ভাবনা এবং সীমাবদ্ধতা বিষয়ে নিরাবেগ বোঝাপড়ার মাধ্যমে এগোতে হবে আজকের লেখককে।

খুঁজে দেখতে হবে কোথায় লেগেছে ঘুর্ণির টান, সে টানে কেমন করে পাড় ভাঙছে, নতুন ধারা কোথায় বাঁক নিচ্ছে। শহর, গ্রাম-যাঁর যেখানে স্বাচ্ছন্দ্য সেই সেই ক্ষেত্রে অনুসন্ধান চালাতে হবে।

বলা বাহুল্য, এ অনুসন্ধানের কোন সহজ উপায় নেই, এক্ষেত্রে একমাত্র হাতিয়ার লেখকের প্রখর চেতনা এবং সামগ্রিক সততা।

শিল্পের দাবি, শিল্পীর দায়

লেখকের দায়বদ্ধতা বা দায়বদ্ধ লেখক কথাটি খুব স্পষ্ট নয়, কেননা এর বহু মাত্রা আছে।

তিরিশের দশকের মধ্য পর্বে পৃথিবীতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের করাল ছায়া ঘনিয়ে আসতে থাকে। জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ, স্পেনে ফ্রাঙ্কোর উত্থান, ইতালীর মুসোলিনী ও জার্মানীর হিটলারের দাঁত ঘসটানির মধ্য দিয়ে পৃথিবীর কোটি কোটি শান্তিকামী মানুষ এক প্রবল পরাক্রান্ত ভয়াল দানবিক রূপকে প্রত্যক্ষ করে, যার নাম ফ্যাসিবাদ।

দেশে দেশে মানুষ এই দানব ফ্যাসিবাদকে রুখে দাঁড়াবার জন্যে জোট বাঁধতে থাকে। স্পেনীয় প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে ১৯৩৬ সালে ফ্রাঙ্কোর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদ যখন আক্রমণ চালায় তখন স্পেনের পপুলার ফ্রন্ট সরকারের আহ্বানে সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রগতিশীল মানুষ স্পেনের পাশে এসে দাঁড়ালেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

গড়ে তুললেন 'আন্তর্জাতিক ব্রিগেড।'

এই আন্তর্জাতিক বাহিনীতে ছিলেন পৃথিবীর বহু সেরা বুদ্ধিজীবী লেখক। ফ্যাসিবাদকে রুখতে গিয়ে সশস্ত্র যুদ্ধে স্পেনের মাটিতে প্রাণ দিয়েছেন ক্রিস্টোফার কডওয়েল, র‍্যালফ ফক্স প্রমুখ লেখক।

পৃথিবীর মানুষ বুঝতে পারে স্পেনের পপুলার ফ্রন্টের বিরুদ্ধে ফ্যাসিবাদের এই আক্রমণ বস্তুত: আসন্ন মহাযুদ্ধের স্টেজ রিহার্সাল।

মানবতাবিরোধী এই অন্ধ দানবিক শক্তির বিরুদ্ধে রোমারলা থেকে রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববাসীকে হুঁশিয়ার করেছেন। বারবার, প্রবল ধিক্কার দিয়েছেন এই বর্বর মূঢ়কে।

কিন্তু ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর পোল্যাণ্ডের ওপর হিটলারের আক্রমণের মধ্য দিয়ে শুরু হয়ে যায় দ্বিতীয় মহাসমর।

ফ্যাসিবাদের উত্থানের পর থেকে শিল্প সাহিত্যে লেখক শিল্পীর দায়বদ্ধতার প্রসঙ্গটি সামনে চলে আসে।

ফ্যাসিবাদ মানব সভ্যতার সাধারণ শত্রু অতএব একে রোখা জরুরী –এই ভিত্তিতে ধনতন্ত্রী, সামজতন্ত্রী উভয় শিবিরই সেদিন এক কাতারে দাঁড়িয়েছিলো।

কিন্তু লেখক শিল্পীর দায়বদ্ধতা শেষ পর্যন্ত শুধু ফ্যাসিবাদকে রোখাই নয়, সমষ্টির আর্থ–সামাজিক মুক্তির সঙ্গে তা একাকার হয়ে যেতে থাকে। ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ ক্রমে রূপান্তরিত হয় প্রগতি লেখক সংঘে।

সাম্যবাদী রাজনৈতিক চিন্তা প্রসূত মাত্রাটি প্রাধান্য পেতে থাকলে প্রচলিত সাধারণ মানবতাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে যাঁরা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে একাত্ম হয়েছিলেন তাঁরা এই সংঘ থেকে সরে দাঁড়ান।

সেই থেকে লেখকের দায়বদ্ধতার প্রসঙ্গটি আমাদের কাছে উঠে আসে মার্কসবাদের সঙ্গে সংলগ্নতার মাধ্যমে।

আমাদের দেশে এবং পৃথিবীর অন্যত্রও এ ধরনের চিন্তাই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তার পাশাপাশি ইউরোপে আর এক নতুন দর্শন নিয়ে হাজির হন ফরাসী লেখক জাঁ পল সার্ত্র। জার্মান বন্দী শিবিরে থাকাকালে তিনি এই চিন্তাসূত্রটি লাভ করেন। সেই চিন্তাসূত্রটিকে আপন কালের যন্ত্রণা এবং নিজের জীবনের উবলব্ধির মাধ্যমে ব্যাপ্তি এবং গভীরতা দিয়ে নিজস্ব এক দর্শনের জন্ম দেন।

অস্তিত্ববাদী সার্ত্র বলেন, ঈশ্বরহীন পৃথিবীতে ব্যক্তি কেবল তার নিজের কাছেই দায়বদ্ধ, অন্য কারুর কাছে নয়–তার সত্তা স্বাধীন। ব্যক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ তার স্বাধীন সত্তারই প্রকাশ।

ইউরোপের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী সমাজের যুদ্ধবিধ্বস্ত বিপন্ন মানুষের কাছে এ দর্শন ব্যাপকভাবে আদৃত হয়।

গল্পে, নাটকে, উপন্যাসে প্রবন্ধে এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁর সেই দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তি জীবনের নানান সাহসী ভূমিকার মাধ্যমে সারা বিশ্বে তিনি পরিচিতি লাভ করেন দায়বদ্ধ লেখক হিসাবে।

বিশ্ব মানবতার বিভিন্ন সঙ্কটে ও বিপন্নতায় কথায় ও কাজে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মানুষ হিসাবে এবং লেখক হিসাবে যে ভূমিকা তিনি পালন করেছেন দায়িত্ববোধের তাগিদ থেকে সে তো সারা বিশ্বের লেখক শিল্পী তথা গোটা মানব সমাজের কাছে সর্বকালের দায়বদ্ধতার সশ্রদ্ধ উদাহরণ হয়ে থাকবে।

সার্ত্র মার্কসবাদী ছিলেন না। সার্ত্র–এর দর্শনকে [illegible] স্বাতন্ত্র্যবাদের চরম প্রকাশ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
বলে নিন্দা করেই কি তাকে নাকচ করা যায়? ব্যক্তির দায়িত্ব গ্রহণের যে প্রবল তাগিদের কথা বলা হয়েছে তাকে অস্বীকার করা যাবে কিভাবে?
রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় এবং বিভিন্ন সময়ে স্বদেশের নানান সঙ্কটে বিপন্নতায় সক্রিয়ভাবে যে রকম সাহসী ভূমিকা পালন করেছেন তা দেশের অনেক বড় বড় রাজনীতিবিদ নেতাও করেননি। তাঁর আন্তর্জাতিক ভূমিকা বাদ দিলেও দেশবাসীর একজন হয়ে তাঁর এই দায় পালনকে কি একজন সামন্তবাদী চেতনা–পালনকারী বুর্জোয়া ভাববাদী কবির ভাব বিলাস বলে নাকচ করে দেয়া যায়?
চল্লিশ দশকে এমন চেষ্টা হয়েছিলো। শুধু তাঁর দায়বদ্ধতা নয়, গোটা রবীন্দ্র সাহিত্যকেই প্রতিক্রিয়াশীল বলে নাকচ করার কথা তুলে ছিলেন প্রগতি শিবিরের একাংশ, সে প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ঐ শিবিরেরই অন্যান্য প্রতিবাদ করেছিলেন প্রবলভাবে।
কিন্তু এ কথাও সত্যি, সম্পূর্ণ নাকচের কথা না বললেও এখনও সেই ঝোঁকটি একেবারে অবসিতও হয়নি।

শিল্প সাহিত্যে 'আধুনিক' ও 'প্রগতিশীল' এই দুটি শব্দ বহুকাল ধরে চলে আসছে, বিশেষত: বাঙলা সাহিত্যে এই দু'টি শব্দ প্রায় পরস্পর বৈরী হিসাবে বিবেচিত।
আধুনিকতার মূল ভিত্তিই হলো যুক্তি: এই যুক্তিই একদিন মধ্যযুগের প্রশ্নহীন আত্মসমর্পণের অন্ধত্ব ঘুচিয়ে মানব চৈতন্যকে স্থিতাবস্থা সম্পর্কে প্রশ্নশীল, নিরন্তর জিজ্ঞাসু এবং আত্মতৃপ্তির আলস্য বিলাস থেকে টেনে তুলে কঠিন মাটিতে দু'পায়ের ওপর ভর করে দাঁড়াতে শিখিয়েছিলেন, সেই সঙ্গে তাকে দিয়েছিলেন ঐতিহ্য অবগাহনের অবাধ স্বাধীনতাও।
যার ওপর দাঁড়িয়ে একদিন কার্ল মার্কস সর্ববিধ শোষণের বিরুদ্ধে কামান দেগে ছিলেন। আমাদের দেশের এক শ্রেণীর aesthetically badly traind প্রগতিবাদী আধুনিকতার সেই নির্যাসকে না বুঝে প্রগতিশীলতাকে দাঁড় করিয়েছেন তার বৈরী হিসাবে।
আধুনিক ও প্রগতি শব্দ দু'টি এক সময়, এমন কি আমাদের দেশেও সমার্থক বিবেচিত হতো। (বিশের দশকে ঢাকা শহর থেকে প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'প্রগতি' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিলো যা ছিলো একান্তভাবেই রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক সাহিত্যান্দোলনের বাহন।
'প্রগতি' নামটি তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন 'আধুনিক এর বিকল্প হিসাবেই।) কালে তা রাজনৈতিকতায় অবলিপ্ত হয়ে পড়ে, এই অনুলিপ্তিরও এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আছে।
ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকল্পে যে জটিল সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো মানুষ তার নিজের প্রয়োজনেই গড়ে তুলেছিলো, কালে সেই প্রতিষ্ঠানগুলোই হয়ে দাঁড়ালো তার আত্মবিকাশের পথে বাধা। এই ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত দানবিক রূপটি বিশাল হতে হতে শোষনে পীড়নে ব্যক্তি তথা সমাজের অন্তর বাহিরকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
শূন্য, রিক্ত, ধূসর এবং বিভিক্ত করে ফেলতে থাকে।
'আধুনিকতা' রেনেসাঁসের সমস্ত ইতিবাচকতা হারিয়ে হয়ে উঠলো এই যন্ত্রণা কাতর বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ মানুষের অন্তহীন দায়টানা ক্লান্ত অশ্ব।
১৯১৭ সালের রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর থেকে এই ক্ষয়গ্রস্ত মুমূর্ষু ব্যক্তি তার মুক্তির নিশানা দেখতে পেলো সমষ্টির মুক্তির মধ্যে।
প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশের দশকে ধনতান্ত্রিক বিশ্বের অর্থনৈতিক মন্দা, যারা বিশ্বে ঔপনিবেশিক শাসন শৃঙ্খলা চুর্ণ করার অপরাজেয় উদ্যত হাত এবং সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে ক্রমপ্রসারিত জোয়ারের মুখে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপন্ন জরাগ্রস্ত রূপটি প্রকট হয়ে ওঠে।
'প্রগতিশীল' ক্রমে হয়ে ওঠে ধনতান্ত্রিক সভ্যতা সজ্ঞাত 'আধুনিকতার প্রতিস্পর্ধী।
যুদ্ধ, রাষ্ট্র বিপ্লব বা সামাজিক পরিবর্তনের পর যে বিষয়টি লক্ষ্য করা যায় তাহলো পুরোনো মূল্যবোধের বিপর্যয়, এই বিপর্যস্ত ধ্বংস স্তুপকে সরিয়ে সেখানে যদি সাবলীল কোনো ইতিবাচক মুল্যবোধ গড়ে তোলা না যায় তাহলে যেমন দেখা যায় মারাত্মক নৈরাজ্য, প্রগতিশীল শিল্প সাহিত্য আধুনিতার প্রতিস্পর্ধী হতে গিয়ে সেই অবস্থায় পড়ে।
মার্কসবাদের সবচেয়ে জোরালো হাতিয়ার দ্বান্দ্বিকতা; জীবন ও জগতের সমস্ত কিছুকে যেখানে দ্বান্দ্বিকতার নিরিখে বিচার করাই মার্কসবাদ সম্মত সেখানে লক্ষ্য করা যায় রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক অর্থনৈতিক-তাবৎ বিষয়ের ক্ষেত্রে এই পথ অনুসরণ করা হলেও শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয় পারম্পর্যহীন এক উদ্ভট যান্ত্রিকতা।
দ্বান্দ্বিকতার পারম্পর্যময় বন্ধুর ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে যেমন রেনেসাঁস উত্তর ধনতন্ত্র ও আধুনিকতা, তেমনি সেই ধনতন্ত্র ও আধুনিকতার সুফলগুলোর ওপর দাঁড়িয়ে আছে মার্কস-লেনিন অনুসৃত সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া।
ধনতন্ত্রের ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই সমাজ সৃষ্ট আধুনিক শিল্প সাহিত্যও ক্ষয়গ্রস্ত হবে এ যেমন সত্য তেমনি তাকে অতিক্রম করতে হলে তার সমস্ত কলাকৌশল ও সুফলগুলোকে আত্মস্থ করেই তাকে এগোতে হবে। এও দ্বান্দ্বিকতারই শিক্ষা।
তত্ত্ব যতক্ষণ চেতনায় অভিসিক্ত হয়ে ফলিত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর না হবে ততক্ষণ তা তত্ত্বই থেকে যায়।

মার্কসবাদ একটি সৃজনশীল দর্শন, এই সামাজিক তথা রাজনৈতিক দর্শন সজ্ঞাত চেতনাকে শিল্প সাহিত্যের মতো অত্যন্ত সুক্ষ্ম ও সংবেদনশীল মাধ্যমের সঙ্গে মিশিয়ে রসমূর্তি গড়তে গেলে এই মাধ্যমের হাজার হাজার বছরের ধারাবাহিক পারম্পর্য বিষয়ে সতর্ক ও শ্রদ্ধাশীল থাকা প্রয়োজন, কিন্তু কার্য ক্ষেত্রে তা হয় না বলেই আধুনিকতার প্রতিস্পর্ধী এই নতুন সাহিত্য নানা বিভ্রান্তিতে আজো ঘুরপাক খাচ্ছে।

লেনিন একদা যে মস্কোর কমসোমল যুব কর্মীদের কাছে কমিউনিষ্ট কবি ভ্রাদিমির মায়কোভস্কির চেয়ে অকমিউনিষ্ট আলেকজান্দার পুশকিনের কবিতার প্রতি তাঁর অধিকতর পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করেছিলেন, কিংবা কার্ল মার্কস তাঁর সমকালীন সমাজতন্ত্রী কবিদের চেয়ে ইসকিলাস, দান্তে সেক্সপীয়ার, গ্যেটে এবং তাঁর বন্ধু স্থানীয় হাইনরিখ হাইনের কবিতার অনুরাগী ছিলেন অনেক বেশী

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
পরিমাণে, রাজতন্ত্রী বালজাক ছিলেন তাঁর প্রিয় লেখক। এসবের কারণ কি? কারণ, মার্কস ও লেনিন এঁদের মধ্যে দেখেছিলেন মানব প্রগতির সৃজনশীল নির্যাসকে যার নাম শিল্প; যে হয়ে ওঠে, যাকে জোর করে হওয়ানো যায় না।

এই হয়ে ওঠা শিল্পের দাবীকে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের চেয়ে অধিকতর মূল্য দিয়েছিলেন বলেই ব্যক্তি বালজাকের প্রতিক্রিয়াশীল রাজতন্ত্রী চিন্তাকে পরাস্ত করে লেখক বালজাক ও তাঁর সাহিত্য অমর হয়ে আছে, একই কারণে বিপ্লব বিরোধী, প্রতিরোধ বিরোধী, ধর্ম প্রচারক টলস্টয়কে ছাপিয়ে তাঁর সাহিত্য হয়ে ওঠে লেনিনের ভাষায়: 'রুশ বিপ্লবের দর্পণ,' গান্ধী বাদী তারা শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে বেরিয়ে আসে ভেঙে পড়া সমাজতন্ত্রের সঙ্গে নব্য ধনিকতন্ত্রের দ্বন্দ্বমুখর রূপচিত্র।

দূর্ভোগ্যের বিষয় মার্কস বা লেনিন সমাজ ও রাজনীতির মতো শিল্প সাহিত্যের নান্দনিক দিকটিকে যথেষ্ট খোলসা করে যাননি। ফলে মার্কসবাদী বা প্রগতিশীলদের হাতে থাকে মার্কস লেনিন প্রবর্তিত রাজনৈতিক তত্ত্বটি। শিল্প সাহিত্যের ওপর এই তত্ত্বটিকে সরাসরি প্রয়োগের ইচ্ছা থেকে একটি ছাঁচ তারা নির্মাণ করেছেন, সৌন্দর্য সৃষ্টির স্বাভাবিক নিয়ম বহির্ভূত বলে যে ছাঁচটি তাদের নিজেদের কাছেই খুব স্পষ্ট নয়, সে কারণে স্বগোত্রীয় লেখক শিল্পীকেও কখনো কখনো এক কথায় প্রতিক্রিয়াশীল বলে নাকচ করার উগ্রতার লক্ষ্য করা গেছে।

প্রয়াত ওস্তাদ গুল মোহাম্মদের একটি সাক্ষাৎকার পড়েছিলাম বহুকাল আগে, হুবহু লাইন মনে করতে পারবো না, মোদ্দা কথাটি হচ্ছে, তিনি বলেছিলেন, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের গায়কদের মধ্যে তিনিই সার্থক যিনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ব্যাকরণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ শ্রোতাকেও তাঁর গাঁয়ে মুগ্ধ করতে পারেন।

তত্ত্ব যতো অভ্রান্তই হোক শিল্প সৃষ্টির নিয়মের অধীনতা তাঁকে মাথা পেতে নিতে হবেই। শিল্প সৃষ্টি মানেই সৌন্দর্য সৃষ্টি, সৌন্দর্য সৃষ্টির নিয়ম জানার গণ্ডি ছাড়ানো– হোথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোনখানে।' আরো স্পষ্ট করে বললে, বলতে হয়, 'সাহিত্য সৃষ্টির ধারা আর তত্ত্বের ধারা এক জিনিস নয় বলেই শিল্পীর মনের চূড়ান্ত যন্ত্রণা অবিশ্রান্তভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে যেতে চায়।'

(বলাই বাহুল্য সাহিত্য বলতে এখানে তাবৎ শিল্পকলাকেই বোঝানো হচ্ছে)।

এও দ্বান্দ্বিকতা। এই দ্বান্দ্বিকতা যেমন সমাজ, ইতিহাসের ক্ষেত্রে সত্য তেমনি শিল্প সাহিত্য ও তার স্রষ্টার ক্ষেত্রেও সত্য।

শিল্প সাহিত্যের স্রষ্টার কাজ যে জীবন তিনি যাপন করছেন লক্ষ কোটি মানুষের সঙ্গে, তাকে অর্থময় করে তোলা বহির্জাগতিক ও আন্তর্জাগতিক দ্বান্দ্বিকতায় স্রষ্টার ব্যক্তিসত্তা যেভাবে বিকশিত হতে থাকে তিনি সেভাবেই সারা দেন, তাঁর দায়বদ্ধতা সেই নিরিখেই বিচার্য। কোনো ক্যাটাগরির নির্দিষ্টতার ভিত্তিতে নয়।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

অন্য অবলোকন [হাসান আজিজুল হক]

হাসান আজিজুল হক-এর গল্প ধারণ করে আছে দু'টি ভিন্নতর ভূগোল- একদিকে ধূসর রুক্ষবৃক্ষ বিরল রাঢ়, অন্যদিকে সুন্দরবনের কোলঘেঁষা সজল শ্যামল নরম পলির খুলনা এলাকা।

জন্ম তাঁর পশ্চিম রাঢ়ে। শেষ কৈশোরে সেই রাঢ়ের স্মৃতিধারণ করে চলে আসেন খুলনায়, এখানেই স্থায়ীভাবে বাসা বেঁধেছেন। তারপর তো দিনরাত্রি গত হয়েছে এখানকার রোদ বৃষ্টি, আলো আঁধারি গায়ে মেখে। মাঝে মাঝে ফেলে আসা রাঢ়কে দেখে আসেন।

ফলে একজন হাসান আজিজুল হক যিনি এই দুই বিপ্রতীপ অঞ্চলের মাটি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, মানুষ, সময় এবং প্রকৃতিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানেন, তিনি তার গল্পে এই সমস্ত কিছুকে গভীর ভালোবাসায় কিন্তু শৈল্পিক নিরাসক্তিতে দুমড়ে মুচড়ে আমূল তুলে আনেন।

নিজের গল্প সম্পর্কে হাসান আজিজুল হক,'-এর একটি উক্তি এ, প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: আমার প্রতিটি গল্প আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে, নিজস্ব অভিজ্ঞতা ছাড়া কোন গল্প আমি লিখি না।'

এই 'প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা' সামাজিক বাস্তবতারই নামান্তর। কিন্তু দৃশ্যমান বাস্তবতাই শেষ কথা নয়, তাকে তিনি আপন উপলব্ধিতে জারিত করে নিয়ে নিজস্ব একটি বাস্তববোধ তৈরী করেন। সেখানে আবহাওয়া প্রকৃতি, মানুষ এমনকি জীবজন্তু পর্যন্ত মিলেমিশে যায়, কিন্তু নিজস্ব entity হারিয়ে নয়-মানুষের মতো প্রকৃতি ঋতু বৈচিত্র্য এবং জীবজন্তুও হয়ে যায় গল্পের চরিত্র।

এ প্রসঙ্গে তারাশঙ্করের গল্পের উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে বোধ করি, তারাশঙ্করের বহু গল্প রাঢ়ের প্রকৃতি মানুষ এবং জীবজন্তু বিধৃত, তারাশঙ্করের এই পটভূমির চরিত্রাবলী সমাজের নিম্নতলবাসী। হাসান আজিজুল হক-এর গল্পেও এই সমুদয় বিষয় উপস্থিত।

কিন্তু তারাশঙ্করের মানুষরা সামাজিক এবং পরিবেশগত পরিচিতির আবেষ্টনীর ভেতর থেকে বেঁচে থাকার নিজস্ব মুদ্রা, শরীর এবং ভঙ্গি নিয়ে ধরা দেয় না, তাঁর (তারাশঙ্করের) ঝোঁক যেহেতু আখ্যান রচনায় ফলে কাহিনীর টানেই তারা ভেসে যায়। তারাশঙ্করের নিসর্গ চিত্রও মোটা রেখায় আঁকা।

হাসান আজিজুল হকের গল্প তারাশঙ্করের মতো tale জাতীয় নয়। তাঁর (হাসান আজিজুল হকের) শিল্পদৃষ্টি ভিন্নতর, ফলে কী রাঢ়ের কী খুলনার পটভূতি সর্বক্ষেত্রেই তাঁর গল্প আলাদা।

হাসান আজিজুল হকের গল্পে মানুষ তার আপন পরিবেশগত, সামাজিক এবং গোত্র পরিচয়ের যথার্থ প্রতিনিধি। অথচ তারাশঙ্করের 'ডাক হরকরা' 'দীনু' গোত্র

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
পরিচিতিতে ডোম শ্রেণীর, কিন্তু 'দীনু ডোম'– লেখকের এই অত্যন্ত স্বল্প একটি পরিচিতির মধ্যে সে সীমাবদ্ধ থাকে, তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে ধরা দেয়নি। অর্থাৎ ওই শব্দটি ব্যবহার করা সত্ত্বেও দীনু একজন যে কোন সাধারণ গরীব, গ্রাম্য, সৎ ব্যক্তিই রয়ে গেছে। এছাড়া তারাশঙ্করের নিম্নতলবাসী অন্যান্য চরিত্রেও– তিরিশের অপরাপর লেখক–যাঁরা এদের নিয়ে গল্প লিখেছেন–তাঁদের গল্পের মতো এইসব চরিত্রের গায়ে পালিশ লেগেছে, হাসান আজিজুল হক সে ক্ষেত্রে সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বস্ত।

ঘরোয়া আলাপে হাসান আজিজুল হক যেমন প্রসঙ্গিত ব্যক্তির সংলাপ, কণ্ঠস্বর, চোখের ভঙ্গি, অংগপ্রত্যঙ্গের নাড়া কিংবা মুখের বহুতর ভাবকে নিয়ে অত্যন্ত সুনিপুণ এবং রসগ্রাহী 'মিমিক' করেন–গল্পও তা–ই।

আপাতদৃষ্টিতে তাঁর গল্পকে কাহিনী বা আখ্যান নির্ভর মনে হলেও আসলে সেখানে জমজমাট কোন কাহিনী থাকে না।

চরিত্রের মনোজগতের গভীর গহন অন্তর্লোকের বিশ্লেষণেও হাসান আজিজুল হক উৎসাহী নন, তাঁর লক্ষ্য বিভিন্ন অবস্থায় মানুষের সর্ব অবয়াবিক আচার–আচরণ অর্থাৎ তার সংলাপ এবং action-এর প্রতি। এবং এর মাধ্যমেই কী অনায়াসে অবলীলায় ভেতরের মানুষটিকে টেনে বের করে আনেন তিনি। মানুষের মুখের হুবহু সংলাপ এবং তার বিচিত্রমুখী শারীরিক ভঙ্গিমার সঙ্গে যুক্ত হয় প্রাসঙ্গিক জীবজন্তুর অবয়াবিক অস্তিত্ব এবং আচরণ, আবহাওয়া, নিসর্গ দিন রাত্রির আলো আঁধারীর চুর্ণচুর্ণ Detail –এর মাধ্যমে ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিতে তিনি তৈরী করেন তাঁর গল্পের অবয়ব। মনে হয় লেখক যেনো এই সমস্ত কিছুকে অসীম কৌতূহল নিয়ে প্রত্যক্ষ করছেন। এদের শারীরিক অস্তিত্ব, এমন কি তাঁর গল্পের বর্ণিত রোদ, ধুলো, বৃষ্টি, শীতকে পাঠক গন্ধ ও স্পর্শসহ অনুভব করে।

এসব সম্ভব হয় পরিবেশ এবং ধারাবাহিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে মানুষ এবং তার সামগ্রিক জীবন চর্যা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার জন্যে।

গল্পকথনের একটি ভাষাও তৈরি করে নিয়েছেন তিনি, যা তাঁর একান্ত নিজের– ঋজু, বেগবান, তীক্ষ্ণ অস্থিমজ্জা নিয়ে প্রবল দাহ্য সেই গদ্যে অব্যর্থ আয়ুধের মতো বিষয়কে তিনি চিরে ফেড়ে পাঠককে দেখান।

যার ভেতর ধরা থাকে মানুষের কাম, ক্রোধ, নৈরশ্যময়তা, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা, ভয়, সংস্কার, বিশ্বাস সারল্য, দুর্জ্ঞেয়তা, ঘৃণা, ভালোবাসা, বেদনা এবং সংগ্রাম নিয়ে যুগ যুগান্তের জনজীবন আর 'রং বীর্য, অন্ধ, নিস্পৃহতা' নিয়ে এই সবের সঙ্গে মিশে থাকে তার চিরসাথী নিসর্গ প্রকৃতি এবং সেই সঙ্গে জীবজন্তু।

আবার এই গদ্যও তাঁর গতিশীল, একই গল্প যেমন তিনি একাধিকবার লেখেননা, তেমনি গল্পের বিষয় এবং মেজাজ অনুযায়ী গদ্যকেও ভেঙেচুরে নতুনতর নির্মাণেও সাচ্ছন্দময় শক্তির অধিকারী তিনি।

তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ: 'সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য'–এর ভাষা এবং দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ: 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ'–এর ভাষার মধ্যে স্পষ্টত: পার্থক্য আছে।

'সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য'–র গদ্য দগদগে, ঝাঁঝালো, সংশল এবং রাগী। 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ'–এর ভাষা পরিপাটি, কাব্যের দ্যুতিময় রেণুচূর্ণ মাখানো। এ গ্রন্থের এবং বোধকরি হাসান আজিজুল হকের এ পর্যন্ত লিখিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও

গল্পের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সেই মহাকাব্যিক গল্প 'আমৃত্যু আজীবন'-এর বিরাট ক্যানভাসে ধরা লোকায়ত জীবনের ধ্রুপদী বিন্যাস, এর Treatment প্রতীকের, বিস্ময়কর ব্যবহার-এই সমুদয় বিষয়কে ধারণ করে আছে এর অতুলনীয় ভাষা। বিষয়ের বাহুমাত্রিক দ্যোতন হাসান আজিজুল হকের গদ্যের একটি বড় দিক, এ গল্পে সেই বৈশিষ্ট্যটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

"আমৃত্যু আজীবন' এর ভাষা এবং এই গ্রন্থের অন্যান্য গল্পের ভাষা যে একই এমন নয়, এখানেও তারতম্য আছে গল্পের বিষয় এবং মেজাজ অনুযায়ী, তবু সামগ্রিকভাবে তা প্রথম গ্রন্থ থেকে ভিন্ন এবং এই গ্রন্থের অন্যান্য গল্পের অধিকতর সন্নিকটবর্তী।

আবার তৃতীয় গল্পগ্রন্থ: 'জীবন ঘষে আগুন'-এর অন্তর্ভুক্ত তিনটি গল্পের ভাষা তিন রকম।

প্রথম গল্পটির নাম 'শোনিত সেতু'- এ গল্পের ভাষা এর যুধ্যমান দু'টি বলশালী ষাঁড়ের ক্ষীপ্রতার মতো ঋজু এবং বেগাবান। দ্বিতীয় গল্প 'খাঁচা'র ভাষা কিঞ্চিত আর্দ্র এবং স্পর্শকাতর। নাম গল্প 'জীবন ঘষে আগুন' এর ভাষায় রৌদ্র ঝলসিত রাঢ়ের মতো হুতাশনময়, এবং তেমনি এর আদিম মৃত্তিকার মতোই স্তরিত জটিল কাঠিন্যের সঙ্গে রহস্যময় আলো-আঁধারির খেলা চলে।

ভাষা এবং বিন্যাস প্রাকরণের এই ক্ষন্তিহীন ভাঙা গড়ার মধ্যেও হাসান আজিজুল হকের বাক্য গঠনের নিজস্ব ফর্ম, এবং অন্যান্য প্রবণতা গদ্যের কাঠামোর ভেতর ঠিকই থেকে যায়, কেননা তা লেখকের মনোভঙ্গি, ষ্টাইল এবং ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মিশে থাকে যা একজন যথার্থ শিল্পীর আপন পরিচয়ের চিহ্নবাহী। আর হাসান আজিজুল হক তাঁর গল্পের এই ভাষা ও বিন্যাস প্রকরণের ভেতরে ভেতরে চরিত্রের সংলাপ কিংবা বর্ণনাভঙ্গির মধ্যে একটা চাপা কৌতুক ছড়িয়ে রাখেন।

একটি বিষয় আমার মনে হয় তাঁর শিল্পকে ক্ষতিগ্রস্ত করে-বক্তব্যকে স্পষ্ট করার জন্যে প্রছন্নতা পরিহার করে মাঝে মাঝে লেখকের সরাসরি বলে ফেলার লোভ। এই প্রবণতা তাঁর প্রথম গল্প গ্রন্থ থেকে শুরু করে সর্বশেষ গ্রন্থ 'জীবন ঘষে আগুন' পর্যন্ত তা ছড়িয়ে আছে। কখনো কখনো নাটকীয়তার প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্বও এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এবং তৎপরবর্তী বাংলাদেশের সময় এবং জীবনের পটভূমিতে রচিত গল্পাবলীতে উল্লিখিত প্রবণতা দু'টি তীব্রতর হচ্ছে।

প্রকৃতি মানুষ এবং পারিপার্শ্বিক সব কিছুর ডিটেলের মাধ্যমে যেমন স্থপতির মতো ধীরে ধীরে গড়ে তুলতেন, সেই ডিটেল যেনো ঝরে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে পূর্বের মতো সমস্যা এবং সঙ্কট আর চরিত্রের নিজের থাকছেনা, লেখক নিজেই সেখানে প্রধান্য নিচ্ছেন সরাসরি বক্তব্য প্রকাশের মাধ্যমে,অনেক সময় তাও চরিত্রানুযায়ী হয়না, স্পষ্টত: সেখানে লেখকের কণ্ঠস্বরই সোচ্চার। (অথচ সংলাপ এবং ট্রিটমেন্টে তাঁর সেই অনন্যতা এই সব গল্পেও বিদ্যমান, হয়তো এ সবই তাঁর গল্পের নতুন করে মোড় নেওয়া, তবু এই সমুদয় বিষয় কেন জানি আশঙ্কিত করে, কষ্টও হয়!

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

নরেন্দ্রনাথ মিত্রকে প্রথম এবং শেষ দেখেছিলাম ১৯৭৩-এ বাঙলা একাডেমীর সাহিত্য সম্মেলনে।

বিরলকেশ, ধূতি পাঞ্জাবী পরা, অতি সাধারণ চেহারার ছোটখাটো শ্যামলা রঙের মানুষটি ছোটগল্পের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলেন। কি কি বলেছিলেন মনে নেই।

মৃদু স্বরে, থেমে থেমে বলছিলেন, যেনো কোন লাজুক কিশোরকে তুলে দেয়া হয়েছে এমন এক দিশেহারা অসহায় ভাব ছিলো তাঁর।

সেই শান্ত, ভালো মানুষ লোকটি সম্প্রতি মারা গেছেন।

তাঁর লেখার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় স্কুল জীবনে–হঠাৎ কেমন করে যেনো হাতে এসে পড়েছিলো একখানা উপন্যাস: দ্বীপপুঞ্জ– লেখক নরেন্দ্রনাথ মিত্র। নতুন কোন বই পেলে তখন এক নিঃশ্বাসে শেষ না করতে পারলে যেনো স্বস্তি পেতাম না। মনে আছে, প্রায় সারা রাত জেগে পড়েছিলাম বইটি।

তখন সাহিত্যবোধ যতো না ছিলো তার চেয়ে বেশী ছিলো কাহিনীর হাত ধরে এগিয়ে যাওয়া।

তাছাড়া, নাইনে পড়া কিশোর পাঠকটির দেহ এবং মনে তখন নানান ভাঙা-গড়া চলছে, কাজেই মঙ্গলা ও মুরলীর পরকীয়া প্রণয় ঐ বয়সী ছেলেকে রাত জাগাবে সে আর বিচিত্র কি।

এ কথায় নরেন্দ্রনাথ মিত্রকে ছোট করা হচ্ছে না। সেদিনকার সেই মূঢ় কিশোরটির মানসিক প্রতিক্রিয়ার সত্য ভাষণ করছি মাত্র। তবে হ্যাঁ, অবচেতনভাবে হলেও তার ভেতর ভালো লেখা মন্দ লেখার পার্থক্য নির্ণয়ের মোটা ধরনের একটা ধারনা ইতোমধ্যেই গড়ে উঠেছিলো বোধ করি, কেননা এতো দিনেও বেশ মনে করতে পারি লেখকটিকে তার ভালো লেগেছিলো সেদিন, তা শুধু কাহিনীর জন্যেই নয়, কাহিনীর মানুষগুলো নির্মাণের মুন্সীয়ানার জন্যেও।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র-র গল্প কিংবা উপন্যাসে একটি জিনিষ বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, কাহিনীর মধ্যে নারী চরিত্র বিশেষ প্রাধান্য পায়। তাদের চিত্তগত জটিলতার পথ ধরেই কাহিনী এগোয়।

অনেক পরে কোন পত্রিকায় সম্ভবত তার জবানিতে জেনে ছিলাম যে, তাঁর শৈশব এবং কৈশোর কেটেছে মহিলা অধ্যুষিত পরিবেশের মধ্যে। ফলে মেয়েদেরকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পান, পরবর্তীকালে এই অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্যের সহায়ক হয়েছে।

খুবই সত্যি কথা, তার মতো অর্ন্তমুখী, অনুভূতিপ্রবণ শান্ত মানুষের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। আর, নিজের স্মৃতি অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতিকে চূর্ণ চূর্ণ করে ছড়িয়ে দেওয়াই তো সাহিত্য।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র-র প্রধান প্রধান উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে দ্বীপপুঞ্জ, দেহমন,

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

দূরভাষিণী এবং চেনা মহল।

দ্বীপপুঞ্জ, দেহমন এবং দূরভাষিনী এই তিনটি উপন্যাস একই বছরে, অর্থাৎ ১৯৫২ সালে প্রকাশিত হয়।

দ্বীপপুঞ্জ সম্পূর্ণ পল্লী জীবনের কাহিনী। এই উপন্যাসের প্রধান সমস্যা মঙ্গলা তার স্বামী সুবল এবং প্রেমিক মুরলীর জটিল সম্পর্কের টানাপোড়েন।

স্ত্রীর সঙ্গে পরপুরুষের অবৈধ সম্পর্ক আকিষ্কারে সুবলের মনোভাব, গ্রাম্য লম্পট মুরলীর ভোগবাসনায় আবিল মনোলোক, মঙ্গলার শুভবোধ ও যৌন চেতনার জটিল দ্বন্দ্ব এবং সর্বশেষে সুবলকে জড়িয়ে ধরে নদীর জলে ডুবে মরা থেকে মঙ্গলার বেঁচে ওঠার আকুতি–এই সমুদয় বিষয়কে ধীরে ধীরে গড়ে তোলাতে, যথেষ্ট নিপুণতা, সংযম এবং পরিমিতি জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন তিনি। সেই সংগে প্রামাণ্য জীবন এবং তাদের সম্পর্ক বৈচিত্র্য উদঘাটনও কম উল্লেখযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে যে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং মানসিক বিপর্যয় ঘটেছে এবং সেই বিপর্যয়ের ঢেউয়ের ধাক্কা শুধু পাশ্চাত্যেই নয়, আমাদের নাগরিক জীবনেও যে এসে জেগেছে তার বিভিন্ন মুখী চিত্র দেখতে পাই দেহমন, দূরভাষিণী এবং চেনা মহল–এ।

মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনের প্রচলিত সামাজিক, নৈতিক এবং শত সংস্কারের আবেষ্টনী ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে চাওয়া upstairism–কে ধারণ করে আছে দেহমন উপন্যাসখানি।

রুবি নামের এক শিক্ষিতা, আধুনিকা তরুণীই এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র, যে অবাধ যৌন সম্পর্কে আস্থাশীল।

প্রচলিত বাঙালী জীবনের সামাজিক দৃষ্টিতে ওপর থেকে দেখে মনে হবে রুবি দেহপোজীবিনী, কিন্তু আসলে সে তা নয়, সমাজ স্বীকৃত মধ্যবিত্ত ভদ্র জীবনেই তার অবস্থান। কিন্তু এই সংস্কার লালিত এই বলয় থেকে বেরিয়ে এসে ভোগলিপ্সু upstair জীবনে উঠে যাওয়ার এষণাই তাকে এমন বেপরোয়া করেছে।

দূরভাষিণীতে টেলিফোনে চাকরি করা মেয়েদের রুক্ষ ধূসর জীবন এবং হৃদয়চর্চা–এই দ্বিবিধ দ্বন্দ্ব স্থান পেয়েছে। এ কাহিনী টেলিফোনে কাজ করা মেয়ে না হয়ে অন্য যে কোন বুদ্ধিজীবী মেয়েদের কাহিনী হতে পারতো। আসলে, দারিদ্র্যের পীড়নে ছিটকে বেরিয়ে এইসব মেয়েদের যান্ত্রিক কর্তব্য পালন করতে করতে যাদের স্বাভাবিক সৌকুমার্য এবং আবেগের সরলতা শুষ্ক হয়ে যায় অথচ তাদের বঞ্চিত জীবনে প্রেমের জন্যে প্রবল আকুলতা থাকে– এই দ্বিমুখী মানসিকতার জন্যে তাদের জীবনে যে ব্যর্থতা নেমে আসে নরেন্দ্রনাথ মিত্র সেই নিষ্ঠুর ট্র্যাজেডিকে উদঘাটন করেছেন এ উপন্যাসে।

চেনামহল অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের রচনা। এ উপন্যাস আমাদের ক্ষয়িষ্ণু একান্নবর্তী মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের অসামান্য দলিল।

অর্থনৈতিক সংঘাতে মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবন কেমন করে ভেঙে যাচ্ছে অতিশয় নিপুণভাবে তা এঁকেছেন এ উপন্যাসে।

চেনামহলে মানসিক সংঘাতের চিত্র আছে সত্য, কিন্তু তা অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের বলয়ে আটকে পড়ার মতোই চিরন্তন বাঙালী গার্হস্থ্য জীবনের সংস্কার ভেঙ্গে

আমার বই দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
বেরিয়ে আসার সাহসহীনতারই ছবি।
আলোচিত উপন্যাসগুলোর মধ্যে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, প্রত্যেকটি উপন্যাসে তিনি (নরেন্দ্রনাথ মিত্র), পুনরাবৃত্তি না করে, নতুনভাবে, ভিন্নতর দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনের এক একটি দিকের ওপর আলো ফেলেছেন।
এক দ্বীপপুঞ্জ বাদ দিলে, বাকী উপন্যাস তিনটিতে তিনি পরিবর্তমান সময়ের ভিন্নমুখী চেহারাকে যথাযথ বিশ্বস্ততার সঙ্গে ধরে রাখতে চেয়েছেন, এবং এ সব একজন সৎ এবং সক্ষম শিল্পীরই পরিচয়বাহী।
তাঁর রচনায় আঙ্গিকের আধুনিক জটিলতা হয়তো নেই, এবং তা খুঁজতে যাওয়াও মূঢ়তা, কেননা তাঁর attitude-এর মধ্যে তা নেই, আঙ্গিকের জটিলতা নয়, চরিত্রের মানসিক জটিলতার গহন অন্ধকারকে উদ্‌ভাসিত করে তোলাতেই তোর ঝোঁক, ভাষা তাঁর আটপৌরে, সেই আটপৌরে ভাষায় তিনি গভীরতা সঞ্চারী।
তাঁর ছোট গল্পের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য ছোট গল্পের ক্ষেত্রে নরেন্দ্রনাথ মিত্র বাংলা সাহিত্যে এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর 'রস' 'ঘাম, ইত্যাদি বহু গল্প বাংলা সাহিত্যে চিরায়ত সম্পদ হয়ে থাকবে।
অতিপ্রজ এই লেখক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এই মুহূর্তে সম্ভব নয়, ফলে তার ছোট গল্প সম্পর্কিত আলোচনার উল্লেখ মাত্র করলাম। তা ছাড়া এ আলোচনা নরেন্দ্রনাথ মিত্র-র সাহিত্যিক মুল্যায়ন নয়, এ হলো একদার সেই কিশোর পাঠকটির সেদিনকার ভালোবাসার এবং পরবর্তী পরিণত যুবার মুগ্ধচিত্তের শুদ্ধাঞ্জলি।

প্রতিকৃতি আত্মপ্রতিকৃতি

সেই ষাট দশক-যৌবরাজ্যে প্রবেশের প্রথম শিহরণে মন তখন সদা উন্মুখ-বড়ো উত্তজনা, বড়োই বিস্ময় আর সুখের সময় ছিলো সেটা চটি চটি সবপত্রিকা বেরুচ্ছে, আর কি সব লেখা মাথার ভেতর গিয়ে যেন ধাক্কা মারে।
এই দশ পনেরো বছরে অনেক তরুণ আমার সেই বয়েসে হাটছে, কিন্তু এখানকার সাহিত্যের ক্রান্তিকালের সেই উন্মাদনার প্রথম উত্তাপটাকে এরা জানেন-অনুভবে আনতে পারবে না এরা: হুমায়ুন চৌধুরী জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, সেবাব্রত চৌধুরী, হাসান আজিজুল হক, শহীদুর রহমান, আবদুল মান্নান সৈয়দ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, রফিক আজাদ, মোহাম্মদ রফিক, আফজাল চৌধুরী, হায়াত মামুদ, আসাদ চৌধুরী প্রমুখ জনের রচনার প্রথম স্বাদ পাওয়া একজন নব্য তরুণের আনন্দ বেদনা বিস্ময়ের সুখকে।
সমকাল উত্তরণপূর্ব মেঘ তো ছিলোই সপ্তক, সাক্ষর, সাম্প্রতিক, কণ্ঠস্বর, কালবেলা-কোন কোনটি এরা চোখেও দেখেনি।
হয়তো এদের অনেকেই জানেনা। তিনি ফর্মার চটি একটি পত্রিকা কালবেলা·

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
যার তিনটি মাত্র সংখ্যা বেরিয়ে ছিলো। পিজ বোর্ডের নীল মলাট লাগানে। তৃতীয় সংখ্যাটিতেই প্রকাশিত হয়েছিলো হাসান আজিজুল হকের আত্মজ। ও একটি করবী গাছ। গল্পটি শুধু আমার মতো একজন তরুণের মুগ্ধ বিস্ময়ের দৃষ্টি কাড়া নয়, হাসান আজিজুল হকেরও সাহিত্যিক মোড় নেওয়া। সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য পেরিয়ে ভাষা টিটমেন্ট কর্ম সবদিক দিয়েই আজকের হাসান আজিজুল হক এই গল্পের মাধ্যমেই পেরিয়ে এসেছিলেন সেদিন সেই ১৯৬৭তে।

এসব শুধুমাত্র তথ্যের জন্যে নয় উল্লেখ করছি এই জন্যে যে কালবেলা আজ আর নেই তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়ে গেছে। সাক্ষর, সপ্তক নেই, উত্তরনের সর্বশেষ সংখ্যাটির জন্যে এখনও রোমাঞ্চিত হই।

এরাঁ বিপুল জন-মনোতোষ করেনি, বৃহৎ পাঠক সাধারণের দৃষ্টির বাইরে এদের প্রবেশ ও প্রস্থান ঘটেছে। কিন্তু নিঃশব্দে আপন কাজটি করে চলে গেছে। প্রায় নেপথ্যে থেকে সাহিত্যের ওয়েদার কর্কটির মুখ ঘুরিয়ে দিয়ে গেছে। উল্লেখ সে কারণেই।

অবশ্য এর মানে এই নয় যে, এই পত্রিকার সব রচনাই উত্তীর্ণ বা দারুণ একটা কিছু। বহু লেখাই এখন আর আমার ভালো লাগবে না, তবু সেদিনকার সেই সব নব্য লেখকের তাজা জ্বলজ্বলে বেগবান প্রবাহ, তাকে অস্বীকার করি কেমন করে। এদের অনেকেরই বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ ধিক্কার উঠেছিলো সেদিন। চিরকালই উঠে থাকে এর মধ্যে থেকে যাঁরা টিকে থাকেন, তাঁরাই জয়ী হন।

মাঠ একদিন তাদের দখলেই আসে। তখন বোঝা যায়, সেদিনের নিন্দা ছিলো বস্তুত: শক্তিমানকে প্রাণপণ অস্বীকারের অক্ষম চিৎকার।

এমন এক একটা সময় আসে শিল্প সাহিত্য যখন প্রচলিত, প্রথাগত বাঁধা সড়ক চলতে আর মন চায় না। ঘাড় বাঁকানো জেদী ঘোড়ার মতো ভেতরে ভেতরে পা ঠোঁকে।

কখনও কোন পরাক্রান্ত একক ব্যক্তিত্বের হতে, কখনও একদল মানুষের সম্মিলিত সাধনায় পাস বদলের পতাকা ওড়ে।

এই দ্বিবিধ প্রচেষ্টার মধ্যেই থাকে কেন সমবায়ী ব্যাপার নয়-একক সাধনাই - তবু সমসাময়িক এদের মধ্যে কোথাও না কোথাও ঐক্য থাকে, সে ঐক্য কখনো কোন বিশেষ মতাদর্শকে কেন্দ্র করে, কখনো বিষয়কে নতুনভাবে দেখা এবং উপস্থাপনের তাগিদ থেকে।

এই দ্বিবিধ প্রচেষ্টার মধ্যে থাকে নতুনভাবে নতুন চোখে দেখা এবং দেখানোর অন্তর্লীন আর্তি এভাবেই শিল্পীয় মননগত রাখা বাঁধা হয়ে যায় পরস্পরের হাতে। রফিক আজাদ, আব্দুল মান্নান সৈয়দ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, হাসান আজিজুল হক, জ্যোতি প্রকাশ দত্ত-সম সাময়িক, এদের সাহিত্যিক মনোভঙ্গি বিষয়কে উপলব্ধি এবং উপস্থাপনের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য তবু পূর্ববর্তীদের সঙ্গে তুলনার সময়ে এদের আমরা একই কালের বেদনা এবং হর্ষের দোসর হিসাবে দেখি না কি?

এঁরা সবাই-ই এখন প্রতিষ্ঠিত বৃহত্তর পাঠক সমাজে স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব এঁরা, কোন বিশেষ গোষ্ঠী বা পত্রিকার ফসল এরা, এ কথা বলবো না, কিন্তু একথা তো ঠিক যে সেইসব ক্ষীনদেহী স্বল্পায়ু স্বল্পায়ু পত্র পত্রিকা প্রথম এদের কোল দিয়ে ছিলো, এদের স্পর্ধাকে তুলে ধরে ছিলো একদিন, যাকে আমরা লিটল

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
ম্যাগাজিন বলি, যে মন যোগাবার জন্যে আসেনা, আসে মন জাগাতে, ওইসব পত্রিকা ছিলো সেই গৌত্রের। আজ তারা নেই, তাদের জায়গাও পুরণ হচ্ছে না,অথচ প্রবল ভাবে অনুভূত হচ্ছে এমনি সব পত্রিকার কেননা কেমন এক প্রবল ক্ষয়রোগ চারপাশে, বিশেষ করে গদ্যের রাশি রাশি বারিশ জিনিসের জঞ্জালে ভরে যাচ্ছে।

দৈনিক পত্রিকার সাপ্তাহিক সাহিত্যের পাতাগুলোর জঠরাগ্নি নিবৃত্তির জন্যে যা যোগান চলছে তা যেনো ভাসা হাটে কানা বেগুনের মতো।

অনেক তো ধান ভানা হলো, ষাটের সেদিনকার তরুণদের পর এই ক'বছরের আরো অনেক নতুন মুখ এসেছেন এতোদিনে। তাদের মধ্যে থেকে অন্তত নিদেন পক্ষে দু'চারজন গদ্যকারকেও কি প্রত্যাশা করতে পারি না, যাদেরকে সময় বিশেষভাবে, বিশিষ্ট করে উপবীত পরিয়ে দেবে? ব্যক্তিগতভাবে আমার ধারণা, তাৎক্ষণিক প্রশংসার লোভকে একজন নব্য লেখকের পক্ষে জয় করে গভীর বিশ্বস্ত, দুঃসাহসী এবং আত্মবিশ্বাসী হতে সাহায্য করতে পারে একমাত্র আপোষহীন, সুসম্পাদিত স্থির লক্ষ্য একটি লিটল ম্যাগাজিন।

আজ এই ধরনের পত্রিকা প্রয়োজন, একটি নয় একাধিক। যাদের পাখার ঝাপ্টে যা জঞ্জাল, যা অপ্রয়োজনীয়, উড়ে যাবে।

স্বপ্ন আশার আসমানদারী

এমন অনেক মানুষ আছেন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার দিক দিয়ে শিক্ষিত ভদ্রলোক বলে সমাজে স্বীকৃত এবং সম্মানিত–যাঁরা সাহিত্যিক এবং সাংবাদিকদের মধ্যে পার্থক্যের ব্যাপারে সচেতন নন।

দৈনিক এবং সাপ্তাহিক পত্রিকায় সাহিত্যের জন্যে পৃষ্ঠা বরাদ্দ থাকে, সেখানে কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, সমালোচনা নানা ধরনের রচনা ছাপা হয়।

কবিতার ব্যাপারে বিভ্রাট হয় না। এই সব 'শিক্ষিতজন' কবিতা রচয়িতাকে কবি হিসাবেই দেখেন, কিন্তু গদ্য লেখককে নিয়েই তাঁদের বিভ্রান্তি বা উদাসীন অজ্ঞতা। যেহেতু পত্র–পত্রিকার সাংবাদিকগণ গদ্যেই লেখেন এবং সহিত্যিকের রচনা ঐসব পত্র–পত্রিকায় ছাপা হয় এবং তাঁর মাধ্যমও গদ্য, অতএব সাহিত্যিক ও সাংবাদিকের মধ্যে কোনো পার্থক্য ঐসব 'শিক্ষিত' জনের কাছে ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না।

এ ধরনের 'শিক্ষিত' ব্যক্তি অন্যের সঙ্গে কোনো লেখককে পরিচয় করিয়ে দেবার সময় বলেন, ইনি একজন সাংবাদিক। যিনি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন তাঁর চোখ মুখে গর্বের ঔজ্জ্বল্য ফুটে ওঠে এই ভেবে যে, তিনি একজন সাংবাদিকের পরিচিত বা ঘনিষ্টজন সেই সুবাদে অন্যের কাছে তাঁর গুরুত্ব বাড়ছে এবং যিনি পরিচিত হচ্ছেন সসম্ভ্রমে হাত বাড়িয়ে দেন যে তিনি একজন ক্ষমতাবান ব্যক্তির

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন।

আমার এক অগ্রজ লেখক বন্ধুকে এমনি এক শিক্ষিত বয়োজ্যেষ্ঠ ভদ্রলোকের সঙ্গে বেশ কয়েকদিন তাঁর (বয়োজ্যেষ্ঠ ভদ্রলোকের) কাজে ঘোরাফেরা করতে হয়। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি লেখকের পিতৃবন্ধু। লেখক পেশায় অধ্যাপক, কিন্তু যেখানেই লেখকের সেই পিতৃবন্ধু তাঁকে নিয়ে গেছেন সেখানেই সাংবাদিক হিসাবে পরিচয় করিয়ে দিতে থাকার একদিন লেখক অতিষ্ট হয়ে গিয়ে তাঁকে বলেন, আমি সাংবাদিক নই, লেখক। পিতৃবন্ধু অম্লান বদনে উত্তর দিলেন, 'ওই একই হলো'।

আধুনিক যুগে সংবদ মাধ্যমের চেয়ে শক্তিশালী আর কিছু নেই, এবং এই মাধ্যমের সঙ্গে যাঁরা জড়িত মানুষের চোখে তাঁরা মহাশক্তিধর ব্যক্তি। লেখকের পিতৃবন্ধু লেখক এবং সাংবাদিক তুল্যমূল্য জ্ঞান করলেও একটি বিষয়ে নিঃসন্দেহে হওয়া যায় যে, সাংবাদিক পরিচয় দিলে যে তাঁর গুরুত্ব বাড়বে এবং তাঁর প্রয়োজনীয় কাজটি অন্যের কাছে গুরুত্বের কাছে বিবেচিত হবে এ ব্যাপারে তিনি সচেতন।

এই সব কথার মধ্য দিয়ে সমাজে লেখকের সামাজিক অবস্থানের স্তর বিষয়ক কোনো আক্ষেপ প্রকাশ করছি না। আমার উদ্দেশ্য সাহিত্যিক এবং সাংবাদিককে এক করে দেখার ব্যাপারটার পাশাপাশি সাহিত্য ও সাংবাদিকতা বিষয়ে খানিকটা নাড়াচাড়াকরা।

একটা আশঙ্কা প্রকট হয়ে উঠেছে যে, সাহিত্য কি ক্রমে সাংবাদিকতার আত্ম-অহঙ্কার হারাচ্ছে?

লিখিত সাহিত্য এক সময় উচ্চবিত্ত শিক্ষিত জনের মানস বিলাসের উপায় ছিলো। তার ভাষা, তার উপস্থাপন ভঙ্গিমা সব দিক দিয়েই কুলিনফুল সর্বস্ব ছিলো। তারপর একসময় যখন 'গণে'র জোয়ার প্রবল হয়ে উঠলো সমাজে, তখন দাবী উঠলো সাহিত্যের ভাষাকে মানুষের মুখের ভাষার কাছাকাছি নিয়ে আসতে হবে যারা 'গণে'র মুখের ভাষার কাছাকাছি সাহিত্যকে আনতে চেয়েছিলেন তাঁরা সাহিত্যকে সাহিত্য হিসেবে দেখেছেন, সাংবাদিকতার সঙ্গে একাকার করতে চাননি।

বুদ্ধদেব বসু একদা বলেছিলেন , সাংবাদিকতা সাহিত্যের শত্রু। একথার মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, সাংবাদিকতা পেশাটি একজন সৃষ্টিশীল লেখকের রচনার জন্যে ক্ষতির কারণ হয়ে উঠতে পারে।

যদিও পৃথিবীর বহু খ্যাতনামা লেখক সরাসরি সাংবাদিকতার সঙ্গে জড়িত ছিলেন-যেমন হেমিংওয়ে, মার্কেজ, আলবেরার কাম্যু; এঁরা অবশ্য জীবনের বিশেষ বিশেষ পর্যায়ে সাংবাদিকতা করেছেন, সারা জীবন নয়, এবং এঁদের লেখক সত্তার ওপর প্রবল স্বায়ত্তশাসন ছিলো বলে এই পেশা বরং জীবন ও জগত সম্পর্কে নানা অভিজ্ঞতায় তাঁদের মননকে সমৃদ্ধ করেছে।

বাঙলা সাহিত্যেরও বহু লেখকের জীবন সাংবাদিকতা দিয়ে শুরু হয়েছে, অনেকে আমৃত্যু এ পেশায় নিযুক্ত থেকে সাহিত্য রচনা করে গেছেন বা এখনও করছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে বাঙলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গেছেন।

তবে দিনে দিনে বাঙলা সাহিত্যে যে সাংবাদিকতা হয়ে উঠেছে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই, আশঙ্কা সে কারণেই।

সাংবাদিকতা এবং সাহিত্যিকের মধ্যে পার্থক্য নিয়ে অসচেতন যে 'শিক্ষিত'

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
জনের এ রচনার শুরুতে উল্লেখ করেছি বর্তমান কালের অনেক লেখকই তেমনি নিজের লেখক-অহঙ্কার বিস্মৃত হয়ে গিয়ে সাহিত্যের নামে সাংবাদিতা করছেন, এবং তার চেয়ে লক্ষণীয় যে, এ ধরনের সাহিত্যের অনেক লেখক আছেন যাঁরা সাংবাদিকতার সঙ্গে মোটেও জড়িত নন।

মানুষের মুখের ভাষাকে সাহিত্যে আনা যেমন সাংবাদিকতা নয়, তেমনি সাহিত্য এবং সাংবাদিকতাও এক জিনিস নয়। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ'র একটি চিঠির উদ্ধৃতি ব্যবহার করছি। চিঠিখানা তিনি ১৯৬৯ সালে প্যারিস থেকে শওকত ওসমানকে লিখেছিলেন। সেই চিঠি সৈয়দ আবুল মকসুদের সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ'র 'জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডে চিঠিপত্র অংশে মুদ্রিত।

বাংলদেশের একজন বিশিষ্ট লেখক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ'র 'কাঁদো নদী কাঁদো' এবং 'চাঁদের অমবশ্যা' উপন্যাসের সমালোচনা করেন। সমলোচকের মন্তব্য প্রসঙ্গে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ শওকত ওসমানকে লেখা ঐ চিঠির একাংশে লেখেন, 'চিঠিটা লিখছি ধন্যবাদ (শব্দটা বড়ই বিদঘুটে) জানাবার জন্যে। আবুল ফজলের সমালোচনা পাঠিয়েছ বলে। আমি বিদেশে বলে সবাই আমাকে ইঙ্গিতে একটা খোঁচা না দিয়ে পারেন না। উনি বলেছেন দশ-বারো বছরে দেশে অনেক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে যার খবর আমি রাখিনা। শুনে বড় খুশি হলাম, কারণ দেশের পরিবর্তন হয়েছে তা সুখবর বইকি। তবে কোন কোন পরিবর্তন হয়েছে তা জানতে পারলে জ্ঞান-বৃদ্ধি হতো, লেখাও সমসাময়িক হতো। তিনি আরো লিখেছেন, মুহাম্মদ মুস্তফার মতো লেখকেরা কখনো আত্মহত্যা করে না। এ-কথাও নিতান্ত খাঁটি। তবে সেই জন্যেই তো আমার মুহাম্মদ মুস্তফা আত্মহত্যা করেছে। দরিদ্র গ্রাম্য শিক্ষকও সব জানে না করে না যা, 'চাঁদের অমাবশ্যা'র যুবক শিক্ষকটি ভেবেছে বা করেছে 'আমার ইচ্ছা সাংবাদিক কাগজের রিপোর্টারের উর্ধ্বে ওঠা। কিন্তু তোমরা যেন চাও সাহিত্যিক রিপোর্টার হয়েই থাকুক। সেটি হবে না। তা হলে কষ্ট করে লেখার প্রয়োজন কী? মনের কোণে লুকানো আশা বা স্বপ্নের (সে সবের দাম যা-ই হোক) কথা, কিছু প্রকাশ না করলে চলে কী করে?' ....

চিঠির উদ্ধৃতাংশটিতে অনেকগুলো মাত্রা আছে, তবে সাহিত্যিক ও সাংবাদিকের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য নির্ণয়ে এতো সংক্ষেপে এমন গভীর নিপুণ লক্ষ্যভেদী বিশ্লেষণ আমার চোখে আর পড়েনি।

স্মর্তব্য যে, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ এক পর্যায়ে বেশ কিছুকাল সাংবাদিকতায় নিযুক্ত ছিলেন।

অন্য অবলোকন [সাহিত্যে বাস্তবতা]

বন্যা সারা বাংলাদেশকে ডুবিয়েছে। মানুষ, পশু, শহরগ্রাম একাকার হয়ে গেছে। এ বন্যা নতুন নয়, বাংলাদেশের মানুষ হাজারো দুর্ভোগের মধ্যে এই দুর্ভোগকেও

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
তার জীবনের অংশ হিসাবে ধরে নিয়েই বেঁচে থাকে, লড়াই করে। বিচিত্র সে লড়াই।

বন্যা সমস্যা স্থায়ী সমাধানের কথা কোন্ ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি, আজ পর্যন্ত কোন সুরাহা হয়নি। এবারের বন্যায়ও আবার সেই পুরোনো কথা শোনা যাচ্ছে।

বন্যা নেমে যাবে। শহরবাসী মধ্যবিত্ত শ্রেণী–যাঁদের ঘরে পানি ঢুকেছে, নিরাপদ আশ্রয়ে যাঁরা সরে গিয়েছেন কিংবা জলাবদ্ধতার মধ্যেই অবস্থান করছেন তাঁদের ঘর থেকে পানি নেমে যাবে। মধ্যবিত্তের স্বাভাবিক জীবন আবার শুরু হবে। বন্যা সমস্যা তাঁদের কাছে আর কোনো সমস্যা থাকবে না। এ সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবীটিও মিলিয়ে যাবে বিস্মৃতিতে।

কিন্তু যারা মধ্যবিত্ত নগরবাসী নয়, সেই বিপুল জনগোষ্ঠীর সমস্যা আরো ঘনীভূত হবে।

যাদের ভাষা নেই, যারা কথা বলতে পারে না, সমস্যা তাদেরই। সে সমস্যার এতো মাত্রা যে নগরবাসী মধ্যবিত্ত তার সবটা বুঝতেও পারবে না। এমনি চলে আসছে।

আমি নিজেও একজন রাজধানীবাসী। ঘরে পানি ঢুকলেও হাজার হাজার নিম্নবিত্ত মানুষের মতো আমাকে কোনো ত্রাণ কেন্দ্রে আশ্রয় নেবার মতো পরিস্থিতি মোবাকেলা করতে হয়নি। বিত্ত না থাকুক, নিজের শ্রেণীরই আর কারুর বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় পাওয়ার মতো কৌলিন্য আমার এখনো আছে।

কোটি কোটি মানুষ থেকে দূরে, তাদের দুর্যোগ এবং সংগ্রাম থেকে নিজেকে যথা সম্ভব বাঁচিয়ে রেখে দেশের কথা, মানুষের কথা ভাববার সুযোগ করে নিতে পারি এখনো।

বেশ কিছুদিন ধরে সাহিত্যে বাস্তবতা নিয়ে ঘুরেফিরে ভাবনা আসছে মনে।

প্রায় দু' বছর হতে চললো কোনো গল্প, উপন্যাস লিখিনি, লিখতে গেলেই মনে হচ্ছে যেভাবে বললে বলাটা যথাযথ হবে সেভাবে আসছে না, ফলে দিন কাটে প্রতীক্ষায়, লেখা আর এগোয় না।

অগ্রজ লেখকের কাছ থেকে চিটি পাই, তিনিও জানান, বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতাকে ধরতে গিয়ে দেখছেন এতোদিনের প্রচলিত কলাকৌশল আর কাজে লাগছে না। তার মানে তিনিও আমার মতো সমস্যায় ভুগছেন। তার মানে ভাঙচুর একটা ঘটে গেছে কোথাও।

বাঙলা সাহিত্যে বাস্তবতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের আমলেই তুমুল হৈ চৈ হয়েছিলো।

বস্তুতঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে সারা পৃথিবী জুড়েই একটা পরিবর্তন এসেছিলো, তার ঢেউ এসে লেগেছিলো এদেশের সমাজে।

সেই পরিবর্তনকে ধরতে গিয়ে ভাষা ও আঙ্গিকেও পরিবর্তন এলো; কিন্তু সমাজবাস্তবতাকে সাহিত্যে বারণ করার এই 'কল্লোলীয়' উদ্যোগের মধ্যে ফাঁক ছিলো।

এঁদেরই স্বল্প পরবর্তী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এই ফাঁকটা প্রথম থেকেই ধরা পড়েছিলো, 'মাটির পৃথিবীর কান্নাকে তাঁরা ধরতে চেয়েছেন 'ভাবের আকাশের বাড়' দিয়ে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

সমাজ-বাস্তবতা কোনো অনড় চিত্র নয়, বাস্তবতা মানুষকে নিয়ে, সেই মানুষের সমাজকে নিয়ে, তার ভেতর-বাইরের রূপ, তার সময়-এ সবের মধ্যেই থাকে বাস্তবতা, সময় বসে থাকে না, সময়ের সঙ্গে বাস্তবতাও বদলে যায়।

এই বদলে যাওয়ার প্রতিক্রিয়াটি চলতে থাকে বড় সূক্ষ্মভাবে, সহজে তা নজরেও পড়ে না, একসময় দেখা গেলো সেই সূক্ষ্ম পরিবর্তন প্রকট হয়ে ধরা পড়েছে।

সজ্ঞান লেখককে এই পরিবর্তন প্রতিক্রিয়াটিকে অনুধাবন করতে হয় প্রতিমুহূর্তে চিকিৎসকের মতো হাত বাড়াতে হয় তাকে সময়ের মণিবন্ধে।

সমাজ, মানুষ এবং সময়কে যিনি এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন তাঁর ভেতর কোনো ভাবালুতা থাকতে পারে না, ভাবালুতা আসে দূরত্ব থেকে যিনি সরাসরি মোকাবেলা করেন অভিজ্ঞতা তার কাছে ভাসিয়ে তোলা বিষয় থাকে না, অভিজ্ঞতা রূপান্তরিত হয় উপলব্ধির সারাৎসারে, উপলব্ধি লেখকের চেতনায় আনে নৈর্ব্যক্তিকতা, এই নৈর্ব্যক্তিকতাই বাস্তবের উপরকার সমস্ত বারবীয় আবরণকে ছিন্ন করে দেয়।

যে নৈর্ব্যক্তিকতার জন্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাথা অনেক ভিড়ের মধ্যে থেকেও দূর থেকে আলাদা করে চিনে নেয়া যায় তিনি বাস্তবতাকে চিকিৎসকের মতো ধরতে চেয়েছিলেন বলেই তাঁর রচনায় পুনরাবৃত্তি নেই, বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গল্প-উপন্যাসের আঙ্গিকেরও পরিবর্তন এসেছে। প্রতিটি উপন্যাসে তিনি যে নতুন নতুন আঙ্গিক ব্যবহার করেছেন তা ঐ বিষয়ের তাগিদ থেকেই এসেছে।

যিনি বাস্তবতায় এই নব নব রূপান্তর প্রক্রিয়াকে ধরতে পারেন না তাঁর লেখায় থাকবেই, (ভাব বিকাশের বা ইচ্ছা পূরণের বাষ্প দিয়ে যতোই সেই ফাঁক ভরাট করা হোক না কেনো।) একঘেঁয়ে পুনরাবৃত্তির চক্রমনে তাঁর রচনা বন্দী হয়ে যেতে বাধ্য।

আজ যদি এতোদিনকার প্রচলিত কথাকৌশল অকেজো বা পঙ্গু হয়ে গিয়ে থাকে সমাজ-বাস্তবতাকে ধরার ক্ষেত্রে, তা হলে বুঝতে হবে সমাজ-বাস্তবতার ভেতরে ভেতরে বেশ বড় রকমের ওলট পালট হয়ে গেছে।

বলা বাহুল্য, ১৯৭০-পরবর্তী বাংলাদেশ তো আর আগের মতো নেই, এতো বিচিত্র ওলট-পালট আগের মতো থাকতে পারে না। এই পরিবর্তিত বাস্তবতাকে ধরতে নতুন আঙ্গিকেই ধরতে হবে।

কিন্তু নতুন আঙ্গিকে ধরতে হলে প্রথমেই চিনতে হবে এই বাস্তবতার স্বরূপটিকে, তাকে যদি যথাযথভাবে সনাক্ত করা যায়, তখনই আসবে তাকে ধরার কলা-কৌশলের প্রসঙ্গটি।

নতুন বাস্তবতার অভিজ্ঞতা লেখকের চৈতন্যকে কিভাবে মথিত করছে তার সারাৎসার লেখকের চেতনার নৈর্ব্যক্তিকভাবে ধরা পড়লেই এই বাস্তবতা তার স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করবে।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী

রথীনদা,

তাহলে এভাবেই সব কথা শেষ হয়ে গেলো! কিন্তু এমন তো কথা ছিলো না, কথা ছিলো আত্মজৈবনিক রচনাটি লিখবেন; সেখানে কতো সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা, বিশেষত যার সঙ্গে আপনার জীবন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে ছিলো সেই চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকের শিল্প, সাহিত্য ও রাজনৈতিক তরঙ্গের অভিঘাত ধরা থাকবে। প্রস্তাবটি ছিলো আমারই। সেই যেদিন আপনি আপনার সম্পাদিত 'অভিধারা' পত্রিকায় প্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এখন পর্যন্ত অগ্রন্থিত নেতা গল্পটিকে নিয়ে আপনার লেখা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতি পড়ে শোনালেন মোহাম্মদপুরে আপনার মেয়ের বাড়িতে বসে, সেদিনই আপনাকে এ প্রস্তাব আমি দিয়েছিলাম। কিভাবে শুরু করবেন সে ব্যাপারেও দুজনে মিলে পরিকল্পনা করেছিলাম। সেই থেকে শুরু। কতোবার বলেছি, সাক্ষাতে চিঠিতে; অনেক সময় রীতিমতো রাগ করে–চিঠি লিখে পরে মনে হয়েছে কি জানি বেয়াদবি করলাম না তো? অমিতের মুখে পরে শুনেছি আহত তো হনইনি, ছেলেকে বলেছেন, লেখাটি এবার শুরু করতে হবে। তোর কায়েস কাকু রাগারাগি করেছে খুব।

হ্যাঁ, খুব তাগাদা দিয়েছি আপনাকে রচনাটি লেখার জন্যে, আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার পর থেকেই জেনেছি আপনি হার্টের রুগী। ওষুধ আপনার নিত্যসঙ্গী, তাগাদা সে কারণেই, কিন্তু কোন অবস্থাতেই তা বুঝতে দিইনি আপনাকে।

আপনি যখন সেই প্রস্তাবিত রচনাটি শুরু না করে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বকে নিয়ে লেখা শুরু করলেন তখন আমার কেবলই আশংকা হতে লাগলো যে, এ ধরনের খুচরো রচনায় মেতে গেলে আপনার সঙ্গে বিশিষ্টজনের পরিচয়ের যে বিপুল পরিমণ্ডল তাতে কেবল এই খণ্ড খণ্ড ব্যক্তিরাই ক্রমাগত আসতে থাকবেন, অখণ্ড আত্মজৈবনিক রচনাটি দূরে সরে যেতে থাকবে ক্রমশ এবং এক সময়ে আর সময়ই থাকবে না।

আমার সে আশঙ্কাই শেষ পর্যন্ত ফলে গেলো। শান্তিনিকেতনের স্মৃতি থাকলো 'রবীন্দ্র তরুমূলে'তে। কিন্তু অনুক্ত থেকে গেলো আপনার আসল পরিচয়। সেই শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতা শহর, সেই তেরশ' পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ, ফ্যাসিবিরোধী লেখক সংঘে যোগদান, সেই অগ্রণী অরণি 'অভিধারা' পত্রিকা, সেই বামপন্থী রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ তেভাগা আন্দোলন, আত্মগোপন–সাহিত্য আর রাজনীতির রাখীবন্ধনের সেই ঝোড় যুগ, সে যুগের কতো খুঁটিনাটি, কতো খ্যাত অখ্যাত জনের জীবন ও সময়ের স্পন্দন, তার সঙ্গে একটি অত্যন্ত সংস্কৃতিমান পরিবারের মধ্যে আপনার বেড়ে ওঠা, বিকশিত হওয়া, কতো গূঢ় অনুভব উপলব্ধি কিছুই জানানো হলো না আপনার।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
কিন্তু কেনো লিখলেন না শেষ পর্যন্ত? আপনি কি বুঝতে পারেননি আপনার যে অসুখ তাতে একটি মুহূর্তকেও বিশ্বাস নেই? না কি অন্য কিছু? বয়েস অল্প? কোনো কিছুকেই বিবেচনা করেননি? এক চিঠিতে ঐ রচনাটির ব্যাপারে লিখেছিলেন, পেছনে তাকালে ব্যর্থতার হাহাকারে মন ভরে ওঠে। হাসিখুসি আলাপী হলেও মূলত : আপনি খুব চাপা স্বভাবের মানুষ বলে মনে হয়েছে আমার; কিন্তু ওই চিঠিতে, ওই একবারই আপনি সামান্য একটু আভাস দিয়েছিলেন নিজের ভেতরটার।

কিন্তু তারপরও আপনাকে ক্রমাগত চাপ দিয়েছি; আপনি লিখেছিলেন, পুরানো কাগজপত্র গুছোচ্ছেন, সন-তারিখ ভুলে গেছেন অনেক প্রসঙ্গে, সেগুলো যোগাড় করতে হবে।

এই একটি ব্যাপার, খুঁটিনাটি নানান বিষয়ে বড় খুঁতখুতি আপনার; তিরিশ/চল্লিশ বছর কি তারও আগের ছোট্ট এক টুকরো চিরকুটকেও আপনি অমূল্য জ্ঞানে আগলে রেখেছেন। কিন্তু এই রচনাটির ব্যাপারে দীর্ঘসূত্রতার পেছনে মনে হয় সেটাই একমাত্র কারণ নয়, আমার মনে হচ্ছে সেই যে 'ব্যর্থতার হাহাকার' করেছিলেন, এই বোধই আপনার মনে হানা দিয়ে গেছে।

এসবই আমার ধারণা, আজ আপনি নেই বলেই এসব কথা মনে হচ্ছে, যতো দিন ছিলেন ততোদিন ওই গুছোনোর ব্যাপারটাই সত্যি হয়েছিলো, ওই খুঁতখুতে স্বভাবটার কথাই বারবার সামনে এসেছে।

খুঁতখুতে স্বভাবের কথায় মনে পড়ছে, 'সুকান্তের হস্তাক্ষরে কবিতার পাণ্ডুলিপি' বইটা বেরুবে, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী থেকে কথা পাকা হয়েছে। আপনাকে সঙ্গে নিয়ে মফিদুল হকের কাছে গিয়েছি, ছাপা শুরু করতে কিছু দিন দেরি হবে, কিন্তু পাণ্ডুলিপিটি মফিদুলের কাছে রেখে আসতে আপনার দ্বিধা, বড় অস্বস্তিকর অবস্থা, আমাদের দুজনের মতো আপনি নিজেও সে পরিস্থিতিতে বিব্রত।

আমি জানতাম পাণ্ডুলিপিটি শেষ পর্যন্ত যদি রেখে যেতে হয় তাহলে আপনার টেনশান শুরু হবে, হার্টের রুগীর জন্যে তা খুবই ক্ষতিকর।

মফিদুল আমার চোখমুখের ইশারা বুঝে বললো ঠিক আছে আপনার কাছেই থাক।

কথাবার্তা শেষ করে ফিরে আসার সময় রিক্সায় বসে পাণ্ডুলিপির ফাইল কোলে আপনি বললেন, মফিদুল হক সাহেব বোধ হয় mind করলেন, ওনাকে ব্যাপারটা.....

আমি আপনাকে আশ্বস্ত করেছি, না না mind করেনি।

তবু আপনি একটু বুঝিয়ে বলবেন খানিকটা অভদ্রতা হয়ে গেলো প্রথম সাক্ষাতেই....

এতেও আপনার খুঁতখুতি। পরে একদিন গিয়ে মফিদুলকে ব্যাপারটা বলে আপনাকে জানাতে হয়েছে যে, মফিদুল কিছু মনে করেননি। তবে আপনার স্বস্তি ছাড়পত্র কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা সম্বলিত সুকান্ত ভট্টাচার্যের হস্তাক্ষরের এই মূল পাণ্ডুলিপিটি আপনি কিভাবে পেয়েছিলেন, কতো বিপদ আপদের মধ্যেও একে কি ভাবে আপনি রক্ষা করেছেন তার ইতিহাস আছে আপনার 'সুকান্তের হস্তাক্ষরে কবিতার পাণ্ডুলিপি' গ্রন্থটির ভূমিকায়। বস্তুত চার দশক ধরে এই পাণ্ডুলিপিটি আপনার শরীরের অংশের মতোই থেকেছিলো আপনার কাছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও

সে যা হোক, কিন্তু যে পাণ্ডুলিপির জন্যে আপনার এতো দরদ, এতো উৎকণ্ঠা, যাকে আপনি চল্লিশ বছর ধরে বুকে আগলে রাখলেন তার এখন কি হবে? সেই পাণ্ডুলিপি কি ফাইলবন্ধ হয়ে আপনার ঘরে জীর্ণ হতে হতে শেষ হয়ে যাবে? কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরী সাদরে নিতে চেয়েছিলো, আপনি দেননি, আপনার ইচ্ছা ছিলো জিনিসটা স্বদেশে থাকবে, কোনো প্রতিষ্ঠান একে যথাযথ মর্যাদায় রক্ষা করবে।

যেমন আপনি নিজে, শান্তিনিকেতনে চাকরির আহ্বান জানিয়ে পুলিনবিহারী সেন বার বার চিঠি লেখা সত্ত্বেও জন্মভূমি ছেড়ে যেতে রাজি হননি। অথচ নানান খুঁটিনাটি বিষয়ে আপনার যে রকম আগ্রহ, জানাশোনা (বিশ্বভারতী আপনাকে রবীন্দ্র গবেষণার ক্ষেত্রে একজন অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য source হিসাবে বিবেচনা করেছে বরাবর আপনিও বিভিন্ন সময়ে নানা তথ্য দিয়ে, ত্রুটি নির্দেশ করে তার যথার্থতা প্রমাণ করেছেন, পরিতাপের বিষয় হলেও সত্য তারা মুদ্রিতভাবে সে ঋণ স্বীকার করেননি কখনো। তাতেও আপনার দুঃখ ছিলো না, কাজে যে লাগছেন এই ছিলো আপনার আনন্দ।) তাতে শান্তনিকেতনে গবেষণামূলক কাজই আপনার জন্যে যর্থার্থ ছিলো। সে জায়গায় ফরিদপুরের (এখন শরীয়তপুর) কোন গণ্ডগ্রাম 'বালু চরে' পড়ে থাকলেন।

রিক্সা থেকে পড়ে পা ভেঙেছিলেন, ঢাকায় সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়েও স্বাভাবিক হাঁটাচলা আর ফিরে আসেনি আগের মতো তবুও আপনি সেই ভাঙ্গা পা নিয়েই ঢাকায় এসেছেন গ্রামের লাইব্রেরীর জন্যে বই কিনতে।

সেবার ওসমানী মিলনায়তনে বইয়ের মেলায় ভাঙা পা নিয়ে সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে উঠে বই দেখেছেন, পছন্দ করেছেন, কেনাকাটা করে নিয়ে গেছেন। কী আগ্রহ। গ্রামের লাইব্রেরীটাকে সমৃদ্ধ করতে হবে, মানুষ পড়বে, জানবে, মানুষ হবে।

প্রচণ্ড দরদ ছিলো আপনার নিজের এলাকার মানুষজনের জন্যে। ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে তাঁরাও আপনাকে নিজেদের অভিভাবকদের মতো ভালবেসেছেন শ্রদ্ধা করেছেন। ছাব্বিশ বছর একটানা চেয়ারম্যান ছিলেন আপনার এলাকায়। সেও তো মানুষের শ্রদ্ধা ভালোবাসার জোরেই।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা সপরিবারে বাড়ী ছেড়েছেন তখন সুদীর্ঘ ন' মাস আপনার বাড়ীর এক টুকরো কাগজও নষ্ট হতে দেননি আপনার এলাকাবাসীরা। নিজেদের বিপন্নতার মধ্যেও সব তাঁরা আগলে রেখেছিলেন। সুকান্তের সেই পাণ্ডুলিপিটিও।

কতোবার যেতে বলেছেন আপনার গ্রামে, কতোবার কথা দিয়েছি যাবো, আপনার ভাই রমেনদা, আপনার ছেলেরা অভীক, অমিত বার বার নিয়ে যেতে চেয়েছে, যাইনি বলে অভিমান করেছে, কিন্তু যাবো যাবো করেও যাওয়া হয়নি।

বড় ইচ্ছা ছিলো আপনার দেশ, আপনার এলাকা দেখাবেন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, আপনদের প্রাচীন পারিবারিক লাইব্রেরী, দুলর্ভ পত্র-পত্রিকার সংগ্রহ, আরও কতো কিছু।

ভবিষ্যতে সেই সব পত্র-পত্রিকা, কাগজপত্র থেকে আমি কাজ করবো এমন ইচ্ছা শুধু আমার কাছে নয় ছেলেদের কাছেও ব্যক্ত করেছেন।

শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছিলেন আপনি রবীন্দ্রনাথের আমলে, সেই সব দিনের স্মৃতি নিয়ে লিখেছিলেন 'রবীন্দ্রনাথের তরুমূলের মেলা। লেখার পর গোটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
পাণ্ডুলিপিটি' পড়তে দিয়েছিলেন মতামত জানতে বই হিসেবে ছাপার ব্যবস্থা করতে, সেই রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হলো সচিত্র সন্ধানীতে রচনার নামটা একটু সংক্ষিপ্ত করে। 'রবীন্দ্রনাথের তরুমূলের মেলা' হলো রবীন্দ্র তরুমূলে। আগের চেয়ে নামটি যেমন সুখশ্রাব্য তেমনি ব্যঞ্জনাময়। নামের এই সংক্ষিপ্ত-করণ আপনার ও নয় আমারও নয়, মফিদুল হকের। আপনার অনুমতি না নিয়েই করা, কিন্তু আমার মতো আপনারও খুব হয়েছিলো নামটি।

সেই 'রবীন্দ্র তরুমূলে' আর ক'দিন পরেই বই হয়ে বেরুবে 'রবীন্দ্র সঙ্গীত' সম্মিলন পরিষদের উদ্যোগে।

বইটি প্রেসে যাবার আগে থেকেই চিঠিতে তাগিদ আসতো অমুক ছবিটা যেনো যায়, বিশেষত শান্তিনিকেতন উদয়ন ভবনে রবীন্দ্রনাথের মুখে যে আলোচনার অনুলিপি আপনি করেছিলেন এবং সেই অনুলিপির মার্জিনে রবীন্দ্রনাথ নিজের হাতে যে মন্তব্য লিখেছিলেন (যা পরে পত্রিকায় ছাপা হয়েছিলো) সেটার ছবি যাতে যথাযথভাবে আসে বইতে সে ব্যাপারে আপনার উদ্বেগের অন্ত ছিলো না। কিন্তু মূল কাগজটি হাত ছাড়া করেননি, সেটার ফটোস্ট্যাট পাঠিয়েছিলেন। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের লেখা কাগজের ফটোস্ট্যাট থেকে ছবি করলে তা ভালো আসবে না জানালে সে কাগজটি লোক মারফত পাঠালেন বটে, তবে নির্দেশ থাকলো ছবি তোলার সময় সামনে থেকে কাজটি সমাধার পরই যেন তা ফেরত নিয়ে আসা হয় এবং অভীক বা অমিত যেন আপনার গ্রামের বাড়ীতে আপনার কাছে ফেরত নিয়ে যায়।

সেই মূল্যবান কাগজটি এখন আপনার ঘরে। এমনিভাবে নানান বিশিষ্ট জনের অজস্র চিঠি যত্নের সঙ্গে রেখে গেছেন আপনার সংগ্রহে। তেমনি আছে আপনার নানান সময়ের লেখা বিপুল ডায়েরী, ডায়েরী বুক থেকে শুরু করে এক্সারসাইজ খাতা ভর্তি, সে ডায়েরী সংক্ষিপ্ত লেখা নয়, বিস্তারিত খুঁটিনাটিতে পূর্ণাঙ্গ। আপনার সেই চামড়ার ব্যাগের ভেতর থেকে বার করে কতোদিন মোহাম্মদপুরে আপনার মেয়ের বাড়িতে পড়ে শুনিয়েছেন। বলেছেন ডায়েরী লিখবেন, খুব ভালো অভ্যাস, লেখা-লেখিতে কতো কাজে লাগে।

অথচ রথীনদা, আত্মজীবনী লিখতে গিয়েই আপনি ঠেকে গেলেন? তার চেয়েও বড় কথা আপনি চলে গেলেন এবং এই ঢাকা শহর থেকেই, অথচ আপনার সঙ্গে, শেষ দেখা হলো না আমার।

বরাবরের মতো এবারও ঢাকায় এসেই খোঁজ করেছেন আমার, যে গেছে তাকেই বলেছেন আমি যেন যাই, রমেনদা সেদিনও বললেন, সাক্ষাতের জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছেন, কি সব জরুরী কথা আছে।

আমি যাচ্ছি-যাবো করে শেষে হারালাম আপনাকে। জরুরী কি কথা ছিলো জানা হলো না।

অথচ এমন তো হয়নি কখনো। ঘন্টার পর ঘন্টা আলাপ হয়েছে, গেলে উঠতে দিতে চাইতেন না, চলে আসার সময় শিশুর ব্যাকুলতা নিয়ে সেই দৃষ্টি, সেই প্রশ্ন আবার কবে আসবেন? কিংবা বলেছেন আবার কবে দেখা হবে?

অথচ এবার এমন কেন হলো? চলে যাবো বলে? আমাকে অনুতাপের পীড়ন সইতে হবে বলে?

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~
গত বৃহঃস্পতিবার, ১৬ই জুনেও আমি ভাবছি আগামীকাল শুক্রবার ছুটির দিন রমেনদাকে নিয়ে আপনার কাছে যাবো, তখনও জানিনা তার আগের দিন আপনি চিরদিনের মতো ঢাকা ছেড়ে চলে গেছেন নিজের গ্রাম বালুচরে। আমি যখন সন্ধ্যায় জানলাম তখন আপনি বালুচরেও নেই। শ্মশান বন্ধুরা আপনার চিতা ধুয়ে চলে গেছে যার যার বাড়ীতে।

বরাবর প্রণাম জানিয়ে চিঠি শেষ করেছি, আজও এই শেষ চিঠি শেষ করছি প্রণাম জানিয়ে, কিন্তু এ প্রণামে অপরাধের ভার থেকে গেল।

বিনীত

কায়েস আহমেদ

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও

~ www.amarboi.com ~

কল্যানীয়া শারমীন নাহার
৫৯, ঢালকানগর লেন
ঢাকা

জানু

আজ ২১শে ফেব্রুয়ারী। দিনটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমার ছেলেবেলা। সেই ঢাকা, তার অলিগলি তার গায়ের নোনাগন্ধ মাখা আমার বাল্যকাল আমাকে ছেড়ে চলে গেছে সেই কোন কালে; কিন্তু অনেক কিছুর সঙ্গে ১৯৫২ সালের সেই বারুদের গন্ধে ভরা দিনটি আজো আমার বুকের ভেতর তাজা ফুলের মতো জেগে আছে।

'আমাদের ভাষার লড়াই' বইটি পড়ে যদি সেই দিনটিকে অনুভব করতে পারো, তার মধ্যে ১৯৫২ সালের একটি বেদনাক্লিষ্ট বালককে খুঁজে পাবে।

ইতি
নিত্য শুভার্থী
কায়েস
২১.২.৮২

বিয়ের ঠিক ১১ মাস পূর্বে স্ত্রী শারমীন নাহারকে লেখা কার্ড।

আমার বই
দুনিয়ার পাঠক এক হও